কণিষ্ক

জগৎশেঠের কাহিনী

নতুন
প্রকাশক

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৩৭২ সাল

প্রকাশিকা
এ. দত্ত.
২ সি রাম কমল সেন লেন
কলকাতা-৭

ছেপেছেন
শ্রীযুগোল কিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২এ কৈলাস বোস ষ্ট্রীট
কলকাতা-৬

প্রচ্ছদ এঁকেছেন
গণেশ বসু

দশ টাকা

বিনয় ঘোষ
অগ্রজ প্রতিমেষু

লেখকের অন্যান্য বই

ঘসেটি বেগম (২য় সংস্করণ)
মোগল হাটের সন্ধ্যা
ঝাড়খণ্ড সীমান্তে

এক

আসার হলে এমনি করেই আসে। যাবার হলে এমনি করেই যায়। দেব-দেবীর ছলের অভাব নেই। আসা-যাওয়ার স্থির-স্থিরতা নেই। ধরা যখন দেয় তখন ভাবতেও পারে না কেউ, ধরেছি। যখন যায়, খেয়াল হয় তখন। আর নেই। খোঁজো, খোঁজো। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় করো। পাবে না। কোথাও পাবে না। আসার হলে নিজেই আসে, পায়ে পায়ে। যাওয়ার হলে যায় চোখের পলকে। দেব-দেবীর ছল-চাতুরীর অভাব নেই।

লোকে বলে এসেছিল এমনি করে। কোজাগরী পূর্ণিমা। জ্যোৎস্নার ঢল নেমেছে। ফুলে ফুলে উঠছে ভাগীরথী। বিরাট পুরী শান্ত। চৌকিদার পাহারা দিচ্ছে বাইরে। লক্ষ্মীপূজার ঝক্কি-ঝামেলা মিটতে না মিটতেই শুকতারার উঁকি-ঝুঁকি। সারাদিন নিরম্বু উপবাস। এতখানি রাত কাবার। আর ক'প্রহরই বা আছে! আকাশ ফর্সা হয়-হয়। চার হাজার পুষ্যির কুবের পুরীর কাজ-কর্ম দেখা শোনা করার পর, কোজাগরী পূর্ণিমার জাঁকজমকের লক্ষ্মীপূজা সাঙ্গ হবার পর, শেঠবাড়ীর বউ সরবতের গেলাসটা মুখের কাছে ধরেছে সবে মাত্র।

দেউড়িতে চৌকিদার গান গাইছে। জানালা দিয়ে এক ঝলক বাতাস দাপাদাপি করছে ঘরময়। কালো পাথরের সিঁড়ির ওপর ভাগীরথীর জল-তরঙ্গ কান পেতে শুনতে শুনতে ভাবছিল শেঠবাড়ীর ছোট বৌ। দয়া, দান, সংযম, দেবপূজা, গুরুভক্তি, ক্ষমা, সত্য, তপস্যা, এগুলোই গৃহস্থের ধর্ম। গৃহস্থের বৌ সে।

ভাবতে ভাবতে চমকে উঠল: কে কাঁদে এত রাতে!

'কে কাঁদে রে,' জিজ্ঞাসা করলো বৌ। কান পেতে থাকলো দাসী। বল্লে, 'কই, কেউ না তো।'

কেউ না? নিজের কানকে কি করে অবিশ্বাস করবে বৌ?

জানালার কাছে গেল। পাথরের মেঝের ওপর শ্বেত পাথরের গেলাস। দূরে ভাগীরথী। জ্যোৎস্নায় ঢেউগুলো যেন হাজার হাজার রুপালী মাছের

ঝাঁক। ঘাটের দিক থেকে আসছে কান্নার শব্দ। এমন কান্না সে কোনদিন শোনেনি। কেউ কি কাঁদতে পারে এমন ক'রে? এমন সুর ক'রে। গভীর অভিমানের কান্না। বুকের ভেতর টন্‌টন্‌ ক'রে ওঠে বৌ-এর।

কি যেন ভর করেছে। আচ্ছন্নের মত দোরের দিকে যায়। নিশি-পাওয়া যেন। খেয়াল নেই কোন্ দিকে যাচ্ছে। মন তার কান্নার সুরের সঙ্গে ভাগীরথীর ঢেউ-এর মত উথালি-পাথালি করে।

চমকে ওঠে দাসী। বলে, 'কোথায় যাও ছোট বৌ?'

ছোট বৌ, শেঠ মানিকচাঁদের দ্বিতীয় পক্ষের বৌ। বড় আদরের। দাসী নিজের হাতে মানুষ করেছে ওকে। ওর মনের আঁতি-পাতি তার জানা। পূজোর পর এমন বিভ্রম হয় মাঝে মাঝে ছোট বৌ-এর। চমকে ওঠে দাসী। আবার বলে, 'যাও কোথায়?'

সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নেমে যায় ছোট বৌ।

কালো পাথরে বাঁধানো সিঁড়ির ওপর কনক-চাঁপা পা। তরতর করে নামে বৌ। কালো পাথরে ঠিকরে ওঠে বিদ্যুৎ।

কে কাঁদে এত রাতে?

সাড়া পড়ে দাসীদের পাড়ায়। দেউড়ির দরোয়ান সেলাম ক'রে সরে দাঁড়ায়। সামনে ভাগীরথী। কালো পাথরে বাঁধানো শেঠবাড়ীর ঘাট। ঘাটের ওপর ঢেউ-এর জলতরঙ্গ। বেহালার সুরের মত কান্না। কোজাগরী পূর্ণিমার চাঁদ গাছ-গাছালির ফাঁকে চুরি করে দেখে।

সিঁড়ির ওপর উপুড় হয়ে কাঁদছে পরমা সুন্দরী এক মেয়ে। এত রূপ? এ রূপের জ্বালা নেই। কোজাগরীর ডুবন্ত চাঁদের মত স্নিগ্ধ। সারাদিন নিরম্বু উপোসী ক্লান্ত ছোট বৌ যেন অকস্মাৎ পদ্মবনের ভেতর এসে পথ হারিয়েছে। চাপা সুগন্ধে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে তার। কষ্টিপাথরের সিঁড়ির ওপর উপুড় হয়ে কাঁদছে অনিন্দ্য সুন্দরী এক মেয়ে। পিঠময় একরাশ কালো চুল।

কোজাগরী পূর্ণিমায় প্রাণ দিয়ে পূজো করেছে সে। কিন্তু এ কে? মনে পড়ছে ধর্মের শিক্ষা। ধর্মের অবয়ব বহুবিস্তৃত হলেও সকল ধর্মের সার পরোপকার। কিন্তু তা নয়। এ শুধু ধর্মবোধ নয়। এ শুধু মাত্র পরোপকারও নয়। তার চেয়ে আরো কিছু আরো কিছু বড়। তা ভিন্ন বুকের ভেতর এমন টালমাটাল হবে কিসের জন্যে?

কি সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে। টকটকে রঙ। রোদ লাগলে রক্ত ফেটে পড়বে যেন। তাত লাগলে গলে যাবে। সর্বাঙ্গে সুলক্ষণ। লক্ষণ চিনতে ভুল করেনি কখনও ছোট বৌ। এমন সুলক্ষণা মেয়েরও এমন অনাদর? সংসারের ওপর রাগ ধরে যায়। পরক্ষণেই ভয়। দেব-দেবীর ছলের অভাব নেই। আবার কি পরীক্ষা?

কষ্টি পাথরের ঘাটের উপর ভাগীরথীর জলতরঙ্গ। বেহালায় সুরের মত কন্যার একটানা কান্না।

'তুমি কে মা?' মন্ত্রের মত শোনায় ছোট বৌ-এর কথা। দূরে দাঁড়িয়ে আছে দাসী।

'তুমি কেন কাঁদ?'

উত্তর নেই। শুধু আলাপের মত মিষ্টি বিষণ্ণ কান্না ওঠে কোজাগরী পূর্ণিমার শেষরাত্রে। গায়ে হাত দিয়ে ডাকতে গিয়ে পিছিয়ে আসে ছোট বৌ। সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ বয়ে গেলে এমন আচ্ছন্ন বিভ্রম আসে। শিউরে উঠলো গা। না, ভুল হয়নি তার। এমন লক্ষণ আর কিসের হতে পারে? আর কি ছলনা করতে পারবে? পাতলা ঠোঁটের ওপর স্তিমিত বিদ্যুৎ-হাসি। ছোট-বৌ আবার বল্লে, 'কেন কাঁদো মা।'

'আমার কেউ নেই।'

'কে বলে তোমার কেউ নেই। আমি আছি ত। আমি মা। তুমি আমার মেয়ে। আমার কোল আলো করে থাকবে।'

ডাগর চোখে ফিরে তাকাল মেয়ে। হাসতে লাগলো ছোট বৌ।

'কি, পারবে না?'

'তুমি আমাকে তাড়িয়ে দেবে না কখনো?'

'যে মা মেয়েকে তাড়ায়, সে মা নয়, ডাইনী। আমাকে কি ডাইনীর মত দেখতে?'

'না। তুমি আমার মা। আমার মা।'

'আবার ডাকো, আবার ডাকো' ডুকরে ওঠে মানিকচাঁদের অপুত্রক ছোট বৌ।

'মা।'

'আয়।'

কোজাগরীর শেষরাত্রে পদ্মবনের গন্ধ মেখে এল পরমাসুন্দরী কন্যা। অন্দর মহলে সোনার খাটে বসাল তাকে। সবাই দেখে অবাক। এত

রূপ, এত আলো কি কখনও মানুষের হতে পারে? ছোট বৌ বললে, 'মা, থাক এখানে। থাকবে ত?' খাটের ওপর বসে পায়ের মল বাজিয়ে উত্তর দিল মেয়ে, 'থাকবো। থাকবো। যতদিন না তাড়িয়ে দেবে, ততদিন থাকবো।'

'ঠিক?'

'ঠিক।'

'বস, আমি আসছি। আমি না আসা অবধি কোথাও যেও না। যাবে না তো?'

'না।'

খাটের ওপর মেয়েকে বসিয়ে দিয়ে আবার বাইরে এল ছোট বৌ। শুকতারা দপ্‌দপ্‌ করছে। ফর্সা হয়ে আসছে। বিরাট ব্যস্ততা নিয়ে জাগছে চার হাজার পুষ্যির শেঠবাড়ী। মন্দিরের চত্বর ধোওয়া হচ্ছে। পুরোহিত গঙ্গাস্নানে যাবে। পায়রার পাখা আড়ষ্টতা ভাঙছে। পূব আকাশ রাঙা হতে বেশী দেরী নেই। ভাগীরথীর ঘাট থেকে শেঠবাড়ীকে ভাল ক'রে দেখতে লাগলো ছোট বৌ।

বুক ভরে উঠেছে তার। আর কি চাই? অমন কন্দর্পের মত স্বামী রেখে, সোনার খাটের উপর বসিয়ে রেখে লক্ষ্মী প্রতিমা, চলে যাবে ছোট বৌ। যাতে বাঁধা থাকে লক্ষ্মী। চিরকাল বাঁধা থাকে। ওমন দুরন্ত চঞ্চলা লক্ষ্মীকে বাঁধতে পেরেছে ছোট বৌ। আর কিসের দুঃখ! ভাগীরথীর ঠাণ্ডা জল গলার কাছে। ঠাণ্ডা, চমৎকার ঠাণ্ডা। শেঠবাড়ীর দিকে মুখ করে এক-পা এক-পা করে নেমে যায়। একটু একটু করে বাড়ে জল। ওমন স্বামী যার, কন্দর্পের মত। তার আর ভয় কি। কি চমৎকার ঠাণ্ডা জল।

আর দেখতে পাইনি কেউ কোনদিন ছোট বৌকে।

সেই থেকে বাড়তে থাকলো শেঠদের ধনদৌলত। লক্ষ্মী বাঁধা। ফুলে ফেঁপে ওঠে হীরে-জহরৎ, মণি-মাণিক্য। লক্ষ মুখে গঙ্গা ঝাঁপিয়ে পড়ে সাগরে। লক্ষ পথে ধন-দৌলত আসে শেঠের ভাঁড়ারে। অন্ত নেই গঙ্গার, অন্ত নেই শেঠদের অর্থের। লোকে বলে কুবের বাড়ী। যক্ষরাজের ধন-রত্ন। মানুষের নয়। মাটির তলায় ছিল এতকাল। এখন ঢেলে দিয়েছে শেঠদের। ওরা মানুষ নয়। যক্ষ।

যখন আসার হয়, তখন এমনি ক'রেই আসে। আর যখন যাবার হয়?

তারও গল্প আছে। তখন শেঠবাড়ীর মালিক জগৎশেঠ মহাতপ রায়। বড় বিব্রত তখন মহাতপ। চারদিকে গণ্ডগোল। মাথা ঠিক রাখা দায়। একদিকে নবাব, অন্য দিকে কোম্পানী। মাঝখানে মহাতপ। যেদিকে ঝুঁকবে, সেদিকে জয় অনিবার্য। কৃষ্ণের নিদ্রা ছিল কপট। নিদ্রার ভাণ করেছিল মাত্র। নিদ্রা যায়নি। এ কথা ভাল করেই জানতো অর্জুন। তাই পায়ের কাছে বসেছিল।

শুতে পারেনি মহাতপ। বড় দুশ্চিন্তা। মহাতপ তো কৃষ্ণ নয়। মানসিক অশান্তিতে ছটফট করছে সে। ওদিকে সেই পরমা সুন্দরী মেয়ে বড় জ্বালাতন করছে তাকে। থামতে বল্লে বাড়ায়। এ কি জ্বালা। মাথা ঠিক রাখতে পারেনি মহাতপ। রাগের মাথায় চড় মেরে চিৎকার করে বলেছিল, 'যা আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যা।'

থ' হয়ে গেল মেয়ে। অভিমান করে বল্লে, 'তাড়িয়ে দিচ্ছ আমাকে?'

'যা, দূর হয়ে যা' আরো জোরে চিৎকার করে উঠল মহাতপ।

'তাড়িয়ে দিলে আমাকে?'

'দিলাম।'

তারপর থেকে আর কেউ দেখতে পায়নি সেই মেয়েকে। খোঁজ, খোঁজ। খোঁজাই সার। ডুবুরী ভাগীরথীতে ডুবে ডুবে সারা। বাঁকের মুখে জাল ফেলে ফেলে হয়রান হল জেলে। নেই, সেই মেয়ে আর নেই।

নেই আর শেঠবাড়ীর ধনদৌলত। এক নিমেষে শুকিয়ে গেল গঙ্গা। বালি জমে ভরাট হলো ভাগীরথী। টইটুম্বুর কোষাগার খাঁ খাঁ। লোকে বলে মাটির ধন গিয়েছে মাটিতে। যক্ষরাজ গুটিয়ে নিয়েছে। আছে পাতালে, থরে থরে সাজানো। হীরে, মুক্ত, পান্না, জহরৎ। সারা রাত ধরে শুনছে মণি-মুক্ত ঝরার শব্দ। মুর্শিদাবাদের লোকেরা নিজের কানেই শুনেছে ঝুপঝুপ আওয়াজ। যক্ষরাজ টেনে নিচ্ছে ধন-রত্ন। মাটির জিনিস মিশে গেছে মাটিতে।

যাবার হলে এমনি করে যায়।

কিন্তু এসব গল্প। লোকের মুখে মুখে ঘোরে। নানা জনে নানাভাবে বলে।

আর ইতিহাস আলাদা।

দুই

মহিমাপুরের পতিত জমির ওপর দাঁড়িয়ে আমি। এই সেই পুরানো ভিটে।

আমি কিছুতেই মেলাতে পারছিলাম না। এই সেই মহিমাপুর। আর কি জিজ্ঞাসা করতে পারতাম? তামাম ভারতবর্ষ জুড়ে নাম। অগাধ ধন-রত্ন। অতুলনীয় ঐশ্বর্য। মোগল রাজনীতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরোধা। এই ত জগৎশেঠ। গল্প কথায় লোকে যাদের বলে কুবের। বাদশা-নবাব বাঁধা হাতের মুঠোয়। দোরের কাছে দাঁড়িয়ে পরাক্রান্ত জমিদার। ইংরেজ ফরাসী ওলন্দাজ বণিক কৃপাপ্রার্থী। বাণিজ্য থেকে রাজস্ব, সৈন্যচালনা থেকে অন্দর মহলের পরামর্শ—সব ক্ষেত্রে ছিল শেঠরা। তাদের কথায় উঠতো বসতো নবাব। মুর্শিদকুলি খাঁ উন্নতির শিখরে উঠেছে তাদের জন্যে। তাদের ক্রোধের আগুনে পুড়েছে সরফরাজ খাঁ। গিরিয়ার যুদ্ধে আলিবর্দী জয়ী হয়েছে শেঠের কৃপায়। তেমনি কুটোর মত ভেসে গিয়েছে বাংলার রাজনীতির শেষ নায়ক সিরাজ।

বলেছিলো একজন ইংরেজ: হিন্দু ব্যাঙ্কারের টাকা আর ইংরেজ কর্ণেলের তলোয়ারের জোরে গিয়েছে বাংলার মুসলমান শাসন। আমি সেই হিন্দু ব্যাঙ্কারের ভিটের ওপর। মাথার ওপর সূর্য। দূরের আম বাগানে ঘুঘু ডাকছে। শীর্ণা ভাগীরথীর রোদ্দুরে তলোয়ারের মত।

দেখলাম কোপান জমি রোদ্দুরে পুড়ছে। কেবল ইঁট। স্তরে স্তরে ইঁট। ইঁটের তলায় কি কিছু আছে? কিবা ছিল ঢাকায়? মানিকচাঁদের পুরানো ভিটেতে? বাড়ী খুঁড়ে টাকা পায়নি। পেয়েছিল কয়েক পিপে তেল। বলেছিলেন মুর্শিদাবাদের বন্ধু, গুপ্তধন খুঁজতে এসে কতজন প্রাণ দিয়েছে সাপের ছোবলে।

সত্যিই তাই। সমস্ত মুর্শিদাবাদ প্রাণ দিয়েছে সাপের বিষে। দূরে একলা অশ্বত্থগাছ কয়েকটা ইঁট ধরে রেখেছে—পাড়াগাঁর পুরানো পণ্ডিত যেমন চুলের মুঠো ধরে শূন্যে দাঁড় করিয়ে রাখে অবাধ্য ছাত্রকে। তার পাশে জঙ্গল, গাঢ় জঙ্গল। ধ্বস নেমেছে। কয়েকটা থাম হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে। কি ছিল এখানে? জানার কোন উপায় নেই আর। একটা দেয়ালের জীর্ণ অংশ দাঁড়িয়ে আছে মূক অভিযোগের মত। দেয়ালের গায়ে

ঘুলঘুলি। মন্দিরের গায়ে দেখেছি অমন ঘুলঘুলি। দেখেছি গৃহস্থের বাড়ীতে। এখানে কি থাকতো শেঠদের? তার গা ঘেঁসে মাটির তলায় ড্রেনের মত পথ। এখানে নাকি ছিল গুপ্ত মন্ত্রণাঘর। নবাবের চরের চোখে ধূলো দিয়ে গুপ্তসভা বসতো। গুপ্তপথ গিয়ে উঠেছে জাফরগঞ্জে—জাফর আলিখাঁর প্রাসাদে। ইতিহাসে অবশ্য উল্লেখ নেই।

'পলাশীর যুদ্ধে' নবীন সেন বলেছেন:

'আপনি নবাব যিনি (অন্য কোন ছার)
ঋণপাশে বাঁধা সদা যাহার দুয়ারে।'

বার্ক বলেছিলেন, বাংলার 'রথস্‌চাইল্ড', মেকলে আর মিল আখ্যা দিয়েছিলেন 'সর্বশ্রেষ্ঠ ধনবান ব্যাঙ্কার।' সেই শেঠবাড়ীর বিন্দুমাত্র চিহ্ন আজ নেই। কোথায় ছিল ঠাকুরবাড়ী? পরেশনাথের মন্দিরে স্তম্ভ ও চৌকাঠের শিল্প-নৈপুণ্য? পরেশনাথের মন্দির থেকে গোবিন্দদেবের মন্দিরে যাবার জন্য ছিল সুড়ঙ্গপথ। শেঠবাড়ীর মেয়েরা যাতায়াত করতো সেই পথে। মন্দিরের পিছনে বৈঠকখানা। মাঝখানে ফোয়ারা। কষ্টিপাথরের ফোয়ারা। বৈঠকখানার পিছনে আমবাগান। এই আমবাগানে ছিল শেঠদের গদী। তার ভিন্ন ভিন্ন ঘরে থাকতো ভিন্ন ভিন্ন দেশের টাকা। বাটা, হুণ্ডী, দর্শনীর কারবার। টাকা ভাঙ্গিয়ে টাকা। চাই নানান্ ধরণের টাকা, নানান্ দেশের টাকা। সারাদিন লোক গম্ গম্ করতো এখানে। এখন দুপুরে পাতার ছায়ায় ঘুঘু গান গাইছে। তার নিকট চৌদুয়ারী। উত্তরদিকের মার্বেল পাথরে বাঁধানো পথ গিয়েছে অন্দর মহলে। পূর্বদিকের কালো পাথরে বাঁধানো পথ ঠাকুরবাড়ী ছুঁয়ে পড়েছে রঙমহলে। পশ্চিমদিকের পথ ভাগীরথীতে। দক্ষিণের লাল পাথরে বাঁধানো পথ মিলিয়ে গেছে খোসালবাগে। দক্ষিণদিকে যেমন, উত্তরদিকেও ছিল এমনি চৌদুয়ারী। ঠাকুরবাড়ী থেকে একটু দূরে, উত্তর পশ্চিমে, ছিল সুখমহাল। তাকে ফেলে গেলে পাওয়া যেত রঙমহাল। উৎসবের সময় আলোর ঝলমল করত সুখমহাল আর রঙমহাল। ঝাড় লণ্ঠনের ঝালরে ঝিকিয়ে-ওঠা সাত-রঙা আলো ঠিকরে পড়ত নবাবের বেগমদের মুখে, শেঠবাড়ীর বৌ-এর গায়। সুখমহালে বসত নবাব, আমির-ওমরাহ ইংরেজ বণিক। রঙমহাল জেনানাদের। খোসালবাগে বাংলোবাড়ী। মাঝখানে বসানো হয়েছে গৌড় থেকে আনা কষ্টিপাথরের হাউজ। হল্যাণ্ডের টালির ছাদ। টালির ওপর বাইবেলের অনেক উপাখ্যানের ছবি। মহিমাপুরের অন্য পারে, সিরাজের প্রাসাদের গা ঘেঁসে, খাল। খাল

কেটেছিল শেঠরা। লোকে বলত, শেঠের নহর। এই খালে নৌকা বিহার করতো জগৎশেঠেরা। আর ছিল জগৎ-বিশ্রাম। ভাগীরথীর অন্য পারে, ডাহাপাড়ার নিকটে। অতুলনীয় বাগান। মোতিঝিলের মতন বাগান। এখানে মাঝে মাঝে বিশ্রাম করত কুবের তনয়। মহিমাপুরের বিরাট বাড়ী পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের গায় খুপরী। ধনরত্ন রক্ষা করার জন্য সান্ত্রী থাকত খুপরীতে। পাঁচিলের ভেতর বাস করতো চার হাজার মানুষ—শেঠদের পোষ্য।

দুপুরের স্তব্ধ শ্মশানে দাঁড়িয়ে আমি অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সাঁকো গড়তে পারিনি। বারে বারে মনে হয়েছে, কিছু যেন নেই। কোথাও ছেদ পড়ে গেছে। উৎস বন্ধ হয়েছে কোথাও। কোথাও আছে সম্পর্কহীন বিচ্ছিন্নতা। অনুমান করে নিতে হয়। ফাঁক ভরাতে হয় কল্পনায়। কোন অনিবার্য অভিশাপে ছিন্ন হয়েছে অংশ। লুপ্ত অতীত। নিশ্চিহ্ন। এ কি সেই অন্ধশক্তি ইতিহাসের তলায় তলায় যার গতি দুর্জ্ঞেয় ও অপ্রতিরোধ্য? একেই কি বলে নিয়তি? দুপুরের ভূতুড়ে হাওয়ায় আমি যেন স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলাম পাগলা মেহের আলির চিৎকার,—তফাৎ যাও, সব ঝুটা হায়।

সব ঝুটা হায়—এই কথাই ঘুরিয়ে বলেছে ইমামবাড়ীর দরোয়ান। মনে পড়ে ক্লাইভের কথা—'শঠতা, জাল, জুয়াচুরী, হিংসা, চক্রান্ত, যুদ্ধ। ভগবান জানেন আরো কত আছে। এই অষ্টাদশ শতকের রাজনীতি।' ক্লাইভ বলেছিল, 'এ দেশের লোকেরা যদি ইচ্ছা করতো, তবে লাঠি আর ঢিল দিয়ে তারা তাড়িয়ে দিতে পারতো আমাদের।' কিন্তু তা পারেনি। কারণ, বাংলার জীবন-মানসে কোন পরিবর্তন আসেনি। বিপর্যয় এসেছে রাষ্ট্রে। এসেছে বাদশার পর বাদশা, নবাবের পর নবাব। কিন্তু গ্রাম-কেন্দ্রিক অর্থনীতি অনড়, অচল। কৃষি-নির্ভর প্রাণী স্থানু। জীবনের কোন নতুন মূল্যবোধ এল না। চেতনা বিপন্ন ক'রে কোন অনুভব আসেনি। কোন দুঃসাহসিক অভিযানের প্রেরণায় চঞ্চল হয়নি কেউ। আবিষ্কারের চমকে পুলকিত হয়নি প্রতিভা। যেমন রাষ্ট্র, তেমন সমাজ। বাঙালীর জীবন থেকে ঘুচলো না দৈব-নির্ভরতা। আত্মশক্তিতে স্বাধীন মানুষ অনুপস্থিত।

অথচ ক্ষেত্র আংশিক তৈরী। কুটির শিল্পের প্রসার হয়েছে। ব্যাপকতা বেড়েছে উৎপাদনের। কিন্তু জাতীয়তা-বোধ নেই। থাকতেও পারে না। জাতীয়তা-বোধ সভ্যতার বিশেষ স্তরের এক বিশেষ দান। সে অবস্থা

তখনও আসেনি। জাতীয় স্বার্থ, জাতীয় চৈতন্য পাওয়া যায় ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে। গ্রামকেন্দ্রিক, আত্মতৃপ্ত, সংকীর্ণ জীবনবোধের সে অনায়ত্ব।

তবু বলতেই হবে এ ইতিহাসের অভিশাপ। একদিন যে মুর্শিদাবাদ ছিল লণ্ডন শহরের সমান উজ্জ্বল, আজ সেখানে দাঁড়িয়ে সেই অভিশাপকে আর একবার অনুভব করলাম। নবাবী প্রভাবের প্রতীক ছিল বাদশাহী সঙ্গীত। কাক-ডাকা ভোরে দেউড়ি থেকে বাজতো বাদ্যযন্ত্র। বাদশাহী দস্তুর এটাই। সুবাদারদের সম্মানের চিহ্ন। নাগড়া, ঢোল, করতাল, মৃদঙ্গের মিলিত সঙ্গীতে ঘুম ভাঙতো বেগম বিবিদের। আমার কানে এখনো আধুনিক কথার প্রতিধ্বনি, নতুন বাজারের গণ্ডগোল।

নবাবী মুর্শিদাবাদ বিস্মৃত। অথচ কত আগের গৌড়। গৌড় এখনো ধরে রেখেছে কঙ্কাল। নবাবের মুর্শিদাবাদকে নিশ্চিহ্ন করেছে ভাগীরথী। অভিশপ্ত মুর্শিদাবাদ। এই সিংহাসনে বসে বংশ লোপ পেয়েছে মুর্শিদকুলি-খাঁর, আলিবর্দ্দীর। লুপ্ত হয়েছে কলাবতী মনিবেগম। মীরণ হত। মীরকাশেমের চিহ্ন নেই। মহতপচাঁদ, স্বরূপচাঁদ গঙ্গার জলে ডুবে গেছে কবে। নেই আর মুর্শিদকুলির সিংহাসন—যে সিংহাসন দুঃখে কাঁদত। আর কাঁদত লুৎফা—নরকের মধ্যে পবিত্র প্রার্থনার মত লুৎফুন্নিসা। ফষ্টর সাহেবও দেখে গিয়েছে সেই কান্না। পাগল হয়েছে লুৎফার মেয়ে জহুরা। মুর্শিদকুলির সাধের মুর্শিদাবাদ অভিশাপ নিয়েই এসেছিল। মুর্শিদাবাদ ধরে রাখেনি নবাবী গৌরব। সে কোনক্রমে বাঁচিয়ে রেখেছে কয়েকটা সমাধি, কয়েকটা মৃত্যুর মলিন স্মৃতি।

অথচ বেশী দিনের কথা নয়। এই তো সেদিন লক্ষ্মী এলেন পায় পায়।

তিন

বেশী দিনের কথা নয়। ১৬৫২ সাল, ৩রা বৈশাখ। সম্রাট শাজাহান দিল্লীর মসনদে। ঐ দিন ঘুরতে ঘুরতে হীরানন্দ সাউ এলো পাটনায়।

পাটনা তখন বাড়-বাড়ন্ত গঞ্জ। ব্যবসা-পাতি, লোকলস্কর, মাঝি-মল্লার হাঁক-ডাক। চৌপর রাতে শোনা যায় ব্যবসাদারের কলরব, দরদস্তুর, মারামারি। বিদেশীর কুঠিতে কাজ চলে হরদম। দেশী বণিকরা ভীড় করে থাকে সব সময়। ওদেরও বিশ্রাম নেই। এখুনি ফুরিয়ে যাবে যেন। তাড়াতাড়ি কিনে কিংবা দাদন দিয়ে আটক না করলে ফসকে যাবে। ফসকালে সর্বনাশ।

কম দামে কিনতে হবে। বিক্রি এখানে হবে না। হবে সাত সমুদ্র তেরো নদীর ওপারে, রাঙা-মুখো মানুষের দেশে। চড়া দাম সেখানে। বিরাট গঞ্জ পাটনা দিনরাত তাই মৌমাছির চাকের মত গুণ গুণ করতো।

নাগর থেকে এসেছে হীরানন্দ। মাড়বারের রাজধানী যোধপুরের পরই নাম করতে হয় নাগরের। নাগরের ইতিহাস পুরানো। হীরানন্দ পাটনায় ঘোরে।

মাড়োয়ারীর রক্তে আছে ব্যবসা। হিন্দুস্থানী প্রবাদ বলে, পরগাছা ইংরেজ আর মাড়োয়ারী নাকি আগাছার জাত। ওদের মৃত্যু নেই। যে কোন অবস্থায় বাঁচতে পারে। শুধু বাঁচতে পারে না, বাড়তে পারে। রক্তে তাদের ব্যবসা। পুঁজি-পাটার চিন্তা নেই। বিদেশ বিভূঁই জ্ঞান নেই। টাকা রোজগার করতে হবে। হীরানন্দের টাকা নেই। মনে সুখ নেই তাই। টাকা রোজগার করতে হবে। লোটা কম্বল নিয়ে মরুভূমি পাড়ি দিয়ে হীরানন্দ এলো পাটনা শহরে।

নতুন কথা নয়। এই-ই মাড়োয়ারী রীতি। এই তাদের চরিত্র। আজ হেন গঞ্জ নেই যেখানে মাড়োয়ারী নেই। সেদিনও তাই। এ তো জাতের ধর্ম। জাতের ধর্ম পালন করতে বার হয়েছে হীরানন্দ।

হীরানন্দ জৈন। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের লোক। জৈন সম্প্রদায়ের দুটো ভাগ—শ্বেতাম্বর আর দিগম্বর। এক উৎসের দুই স্রোত। মিলেছে নাকি এক মোহানায়। দুই সম্প্রদায়ই পুজো করে চতুর্বিংশতি তীর্থঙ্কর। এঁরা জিন। মন্দিরে এদের মূর্তি। দেব মন্দিরে পাঠ, সাধুদের বন্দনা, তীর্থ-ভ্রমণ, মৈত্রীভাবে অবস্থান, ইন্দ্রিয়সংযম—এই পাঁচটি পালন করতে হয়। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর দুই সম্প্রদায়ই মান্য করে এই রীতি। তফাৎ আছে তবু। শ্বেতাম্বর জৈনরা ক্ষমাশীল, সঙ্গ-রহিত, কেশ-সংস্কারবিহীন, ভিক্ষান্নভোজী। দিগম্বরেরা পিচ্ছিকা ও পয়ঃপাত্রধারী, উলঙ্গ। শ্বেতাম্বরেরা কাপড় পরে। স্ত্রী সম্ভোগে নিতান্ত বিরত। দিগম্বরদের কাছে সম্ভোগ উপাসনার অঙ্গ।

হীরানন্দ এই শেতাম্বর সম্প্রদায়ের। ধর্মপ্রাণ হীরানন্দ বিষণ্ন। নিজের কোন গদী নেই। এই তার ক্ষোভ। হীরানন্দ গদী পত্তন করতে এসেছে পাটনায়। সেকালে স্থলপথের চেয়েও জলপথের আধিপত্য ছিল বেশী। ব্যবসাপাতি চলত জলপথে। এই নদীপথে ত্রিশ হাজার মাঝি-মাল্লা রুজি-রোজগার করত। নৌকাও তৈরী হত নানান্ ধরণের, হরেক নামের। দীর্ঘকালের ঐতিহ্য। ভুলতে পারা যায় না। শিল্প সংহিতায় আছে নৌকা

নির্মাণের নির্দেশ। আছে কাঠের শ্রেণী বিভাগ, নদীর কুল নির্ণয়। ক্ষুদ্রা, মধ্যমা, ভীমা থেকে মন্থরা পর্যন্ত দশ রকম নদীতে চালাবার জন্য তৈরী হত লোলা, সম্বরা, জজ্বলা, গামিনী, প্লাবিনী ইত্যাদি দশ রকমের নৌকো। তাছাড়া ছিল পরের যুগের বজরা, ময়ূরপঙ্খী, খোষযান, সিরিজা।

পথ যে ছিল না, তাও নয়। জলপথ, রাজপথ অনেক। বাদশাহী সড়কই ছ'টা। এই পথে যেত সরকারী ডাক। পথ থাকতেও জলই প্রিয়। পাটনা জলের ধারে। পাটনা বড় গঞ্জ।

দোরে দোরে ঘোরে হীরানন্দ। ধর্না দেয় জাতভাইদের কাছে। দাঁড়িয়ে দেখে গদীতে কাজ হচ্ছে। টাকার লেন-দেনের অন্ত নেই। বিপাকে পড়েছে কেউ, টাকা ধার দিচ্ছে মহাজন। হুণ্ডী ভাঙাচ্ছে কেউ। কেউ এক ধরণের টাকার বদলে নিচ্ছে অন্য ধরণের টাকা। টাকায় কতখানি রূপো আছে এই নিয়ে তর্ক করছে কেউ হয়ত। না হয় দাদন দেবার টাকা নেই। ছুটে এসেছে গদীতে। গদীয়ানরা ব্যবসাদারদের প্রয়োজনমত টাকা ধার দিচ্ছে। হীরানন্দের গদী নেই। যদি থাকতো তাহলে সে এমন বিষন্ন মুখে রোদে পুড়ে গদী থেকে গদীতে ঘুরে বেড়াত না আর।

ওদিকে গঙ্গা। পাল তোলা জাহাজ। মাল ভর্তি হচ্ছে। কোনটাতে মাঝি-মাল্লা অলস। হাঁকডাক কুলির। যাচ্ছে নুন, সরষে, নীল, তুলো। আর যাচ্ছে সোরা। ফরাসী ও ওলন্দাজদের জাহাজ ভরে উঠছে সোরায়। আর এক নোতুন খদ্দের এসেছে সোরার—তারা ইংরেজ। সোরার জন্য পাটনা বিখ্যাত। বিরাট অঞ্চল জুড়ে সোরা হয়। বিদেশীর কাছে সোরা আর সোনা দুইই সমান। সোরা খুঁজতে ইংরেজও এল সে সময়।

উড়িষ্যার উপকূলে—হরিহরপুর, পরে বালেশ্বরে, কুঠি বসাবার আদেশ পেয়েছিল ইংরেজরা। হুকুম পাওয়ার জন্য মোগল শাসনকর্তাদের পায়ে চুমো খেতে হয়েছে ইংরেজকে। ব্রিজম্যান সাহেব দলবল নিয়ে বার হয়ে পড়ল বালেশ্বর থেকে। এল হুগলী। সেখান থেকে পাটনা। বিলেত থেকে কোম্পানীর ডিরেক্টর হুকুম দিয়েছে—সোরা চাই, সোরা পাঠাও। বাংলায় যত টাকার কারবার হবে তার অর্ধেক টাকা খাটাতে হবে সোরার ব্যবসায়। বিলেতের আদেশ, অমান্য করবার উপায় নেই। করতেই বা যাবে কেন? সোরায় লাভ বেশী। এত লাভ আর কোন কারবারে নেই। খাস বিলেতেই সোরার জন্য চেষ্টার অন্ত হয়নি। সোরা পাওয়া যাবে এই ভরসায় খোঁড়া হয়েছে ঘর, বাড়ী, আস্তাবল। ভাঙা হয়েছে পায়রার বাসা।

কিন্তু কোথাও সোরা নেই। জিনিষপত্র নষ্ট হয়েছে শুধু। ক্ষতি হয়েছে লাভের আশায়। ডিরেক্টরের হুকুম—সোরা চাই। চাই যখন, তখন পেতে হবে। পেতে গেলে সস্তায় পাওয়া আরো ভাল। পাটনায় সোরা সস্তা। ব্রিজম্যান ভিড়লো পাটনায়। হীরানন্দ তখন সেখানে।

পাটনা থেকে পাঠানোর সুবিধা। কিন্তু ঝক্কি অনেক। ঘাটে ঘাটে আছে নবাবের পাইক-পেয়াদা—রাজস্ব বিভাগের লোক, শুল্ক বিভাগের দারোগা। পদে পদে তারা কর চাইবে নবাবের, ঘুষ চাইবে নিজেদের জন্য। দাবী তাদের মেটাতেই হবে। না মেটালে আটক থাকবে নৌকো। নৌকো আটক থাকার মানে মাল পৌছোতে দেরী হওয়া। দেরী হলে ক্ষতি। তাই নবাবের লোকজনকে তোয়াজ রাখতে হবে। নবাবের শুল্ক বিভাগ থেকে যদি বা ছাড়পত্র মেলে, বিপদ বাধতে পারে জমিদার আর তার লাঠিয়ালের সংগে। তাদের জমিদারী দিয়ে যাচ্ছে নৌকো। সুতরাং প্রাপ্য তাদেরও আছে। হাজার রকমের সেলামি দিয়ে তবে নৌকো পৌছাত কলকাতার গুদামে। এরজন্য খণ্ডযুদ্ধ হয়েছে কতবার। মন কষা-কষির অন্ত ছিল না। তবু কুছ্ পরোয়া নেই। সোরা চাই। সোরা মানে সোনা।

সোনা খুঁজতেই এসেছে হীরানন্দ। প্রতিকূল পরিবেশে এসেছে ইংরেজ। বিরোধিতা করেছে ফরাসী, ওলন্দাজ। হীরানন্দেরও পরিবেশ অনুকূল নয়। সে বিরোধিতা পেয়েছে স্বজাতির কাছ থেকে। তবু লক্ষ্য তাদের এক। সোনা চাই। ভরসা তাদের ভাগ্য।

ইংরেজদের মতই হীরানন্দের ভাগ্য প্রসন্ন। কানা কড়ি সম্বল ছিল না যার, সেই হয়ে উঠলো নাম-করা ধনবান। ভারতবর্ষের সাত দিকে সাত গদী। সাত গদীতে সাত ছেলে। ধূলিমুঠি সোনা হয়ে যায়। চট থেকে একেবারে ময়ূর সিংহাসন। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি। বলা যাবে হয়ত ভাগ্য। কিংবা অন্য কোন সূত্র আছে যা এখনো অনাবিষ্কৃত। অন্ধকার থেকে কোন ঘটনা হয়ত বেরিয়ে এসে ভুল ভেঙ্গে দেবে। যতদিন না দেয় ততদিন গল্পে বিশ্বাস করতে হবে। গল্পটাই বলি।

নিজের কথা ভাবতে ভাবতে একদিন হীরানন্দ শহর থেকে বেরিয়ে পড়ল। কোন্‌দিকে যাচ্ছে খেয়াল নেই। যেতে যেতে কখন যে এসে পড়েছে বনের ভিতর। তখন রাত ডাগর। জ্যোৎস্না ফুটেছে। আলো-ছায়ায় ডোরা কাটা বন। গাছের পিঠে গাছ। পাতার সংগে পাতার বুনুনি। কোন্ দিকে যাবে খেয়াল করতে পারছে না হীরানন্দ। ফিরতে

হবে। রাত কত খেয়াল নেই। কতদূরেই বা পাটনা শহর। ফিরতে ব্যগ্র হীরানন্দ। কিন্তু ফেরার পথ কোথায় ?

সহসা কানে এলো মানুষের আওয়াজ। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে যেন কেউ। এত রাত্রে এই গভীর বনে কে কাতরাবে ? চঞ্চল হয়ে উঠলো হীরানন্দ। ফিরে যাবে ? না দেখবে এগিয়ে ? ভয় ? কি ভয় তার ? তার জীবন ত ব্যর্থই। অথচ লোকটি যদি সত্যিই বিপদে পড়ে থাকে তবে সে ত তাকে সাহায্য করতে পারে। মনে পড়ে ধর্মের আদেশ। পতিতের উদ্ধার, অহিংসা, বিনয়, সংযম, মৃদুতা পাপ নাশ করে। হীরানন্দ ধার্মিক। ফিরে যেতে পারে না কখনও।

এগিয়ে যায়। শুকনো পাতা মচ্‌ মচ্‌ করে। স্পষ্টতর হয় মানুষের কাতরানি। পীড়িত, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর ও ভয়যুক্ত হয়ে যদি কেউ আসে, তবে তাকে বিশেষভাবে অর্চনা করবে,—মহাজনের কথা। মহাজনের আদেশ অমান্য করতে পারে না হীরানন্দ।

যেদিক থেকে আওয়াজ আসছে, সেদিকে এগিয়ে যায়। ভয় নেই তার। ধর্ম পালনের জন্যই জীবন। তা ছাড়া জীবনের কোন অর্থ নেই। 'ধর্মের অঙ্গ বহুধা বিস্তৃত।' তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরোপকার।

সামনে ভাঙ্গা বাড়ী, জরাজীর্ণ। সময়ের শেষ ধাক্কার জন্য অপেক্ষা করছে। ইঁট খসে পড়েছে। ছাদ ঝুলছে। লতাপাতা ঘিরে ধরেছে। স্বর আসছে ঘরের ভিতর থেকে।

এগিয়ে গেল হীরানন্দ। চাম্‌চিকের গন্ধ নাকে লাগে। গায়ে লাগে পাখার হাওয়া। ভাঙা ছাদ দিয়ে দোল খাচ্ছে সংক্ষিপ্ত জ্যোৎস্না।

অন্ধকার চোখে সয়ে গেলে, হীরানন্দ দেখে এক বৃদ্ধ। যন্ত্রণায় মর-মর। সময় শেষ হয়ে আসছে বুঝি। হীরানন্দ সেবাব্রতী। সেবাই ধর্ম।

আপ্রাণ সেবা করতে থাকে হীরানন্দ। যতই সেবা করে, ততই নিস্তেজ হয় বৃদ্ধ। অস্ফুট হয়ে আসে গোঙানি। সময় প্রায় হল। সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করে হীরানন্দ মুমূর্ষুর মাথা কোলে তুলে।

গাঢ়তর অরণ্যের রাত, ঝিল্লীর ডাক। শোনা যায় নিশাচর পাখীর ঝাপটানি, হিংস্র পশুর চিৎকার, ভয়ার্ত হরিণের পলায়ন। নিবিড় অরণ্যে মুমূর্ষুকে কোলে তুলে ভোরের অপেক্ষায় থাকে হীরানন্দ। কতদূরে নাগর আর কতদূরে পাটনার জঙ্গল। আরো কি আছে কপালে কে জানে।

ভোর হয়-হয়। বৃদ্ধ কি যেন বলতে চায়। পারে না। গলার কাছে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ। অনেক মৃত্যু দেখেছে হীরানন্দ। আর একটা মৃত্যুকে দেখবে সে। প্রস্তুত হয়। কিন্তু কি বলতে চায় বৃদ্ধ?

মুখের দিকে ঝুঁকে পড়ে হীরানন্দ। কি বলবে যেন? ঝুঁকে পড়ে হীরানন্দ। বৃদ্ধ হাত দিয়ে দেখায় ঘরের কোণে।

ঘরের কোণে আবর্জনার স্তূপ। অল্প বাদাড়। সাপখোপ আছে নিশ্চয়ই। তবু এগিয়ে যায় কোণের দিকে।

বৃদ্ধ উত্তেজিত। মাথা উঁচু করে দেখায় ঘরের কোণে। মেঝেতে কিল মারে। উত্তেজনায় মুখ থুবড়ে পড়ে। মুখ থেকে গল্ গল্ করে রক্ত পড়ে।

আর একটা মৃত্যু। মৃত্যুর হাত থেকে নিস্তার নেই।

সৎকার করে ফিরে এল আবার সেখানে। কোথায় নাগর আর কোথায় পাটনা। ঘুরছে হীরানন্দ। কিন্তু কি বলতে চেয়েছিল বৃদ্ধ?

কি থাকতে পারে মাটীতে বাদাড়ের তলায়? এখন দুপুর। অন্ধকার নেই। বাদাড় সরাতে থাকে হীরানন্দ। কি থাকতে পারে বৃদ্ধের? কৌতুহলী হীরানন্দ বাদাড় সরায়, মেঝে খোঁড়ে।

অবাক। সাত পা পিছিয়ে আসে হীরানন্দ। নির্জন অরণ্যে অপরিচিত মুমূর্ষুকে কোলে নিয়ে এতটা চমকায়নি সে। ঝিকমিক করা আলো বিদ্ধ করেছে দুই চোখ। ভাল করে চোখ কচলে আর একবার দেখে। স্বপ্ন নয়, মায়া নয়, সত্যি। সোনা, তাল তাল সোনা। যার জন্যে সে বিষণ্ণ থেকেছে, অর্থহীন মনে করেছে জীবনকে, আত্মধিক্কারে পূর্ণ করেছে অন্তরে; সেই সোনা তার সামনে। তাল তাল সোনা,—হীরানন্দের জীবনের পুরুষার্থ।

সব সোনা নিয়ে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল সে। ভিক্ষুক হল রাজপুত্র। ধুলো থেকে ময়ূর সিংহাসন। মাটির তলা থেকে যক্ষরাজের বুকের পাঁজর নিয়ে পাটনায় এলো গর্বীয়ান হীরানন্দ।

গল্প এখানেই শেষ। কিন্তু এ নিতান্ত গল্প। ইতিহাসের কোন প্রমাণ নেই। কেউ জানে না কি ক'রে ধনপতি হয়েছিল হীরানন্দ। অনেক পণ্ডিত আন্দাজ করেছেন যে পাটনায় নবাগত ইংরেজদের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল নবাগত হীরানন্দের। ইংরেজদের সঙ্গে কারবার ক'রে বড়লোক হয়েছিল হীরানন্দ। কিন্তু তাও অনুমান মাত্র। কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি আজ পর্য্যন্ত। হীরানন্দের উন্নতির ইতিহাস এখনো অন্ধকারে।

শুধু জানা যায় অল্পদিনের মধ্যেই নাম-করা গদীয়ান হল হীরানন্দ। একটা হলে চলবে না। গদী বাড়াতে হবে। গদী যতই বাড়বে, ব্যবসাটা ততই আসবে আয়ত্তে। একটা গদীতে সাত ছেলের চলতে পারে না। মাণিকচাঁদ, গোলাবচাঁদ, নানকচাঁদ, আমীরচাঁদ, সদানন্দ, গোবর্দ্ধন ও দীপচাঁদ—এই সাত ছেলে হীরানন্দের। আর মেয়ে—ধনবাই। ধনবাই-এর বিয়ে হল বারাণসীর বিখ্যাত শেঠ উদয়চাঁদের ছেলের সঙ্গে। সাত ছেলের জন্যে থাকলো সাতটা গদী। বড় ছেলে মানিকচাঁদ পেল ঢাকার গদী। মাণিক-চাঁদের আমল থেকে শেঠবাড়ীর অন্য রূপ।

ছেলেদের নাম, আর কে ছোট কে বড় এই নিয়ে মতভেদ আছে। কিন্তু শেঠবাড়ীর তালিকা ঠিক বলে মনে হয়।

বড় ঘরে বিয়ে হয়েছিল মাণিকচাঁদের। হীরানন্দের বড় ছেলের বৌ কিশোরকুমারী। বড় আদরের বৌ। যেমন রূপ তেমন গুণ। লোকে বলত লক্ষ্মী। এমন পয়মন্ত বৌ আর কার ঘরে আসে? যেমন ছেলে তেমন বৌ। মাণিকচাঁদ সুন্দর। কিশোরকুমারী বলত কামদেব।

মহা ধুমধাম করে বিয়ে দিল হীরানন্দ। রথ ঘোড়া হাতীর শোভাযাত্রা। রাজার মত ব্যাপার। আড়ম্বরের অন্ত নেই। বিয়েতে যৌতুক পেয়েছিল প্রচুর। সুলক্ষণা বৌ নিয়ে ঘরে আসতেই ধন-দৌলতের অন্ত থাকলো না মাণিকচাঁদের। কিশোরকুমারীর নতুন নাম দেওয়া হল। মাণিকচাঁদের বৌ, নাম থাকলো মাণিকদেবী।

লক্ষ্মী লাভ করেই মারা গেল হীরানন্দ, মাঘ মাসের শুক্লা চতুর্থীতে। সেটা ১৭১১ সাল।

চার

মাণিকচাঁদের গদী ঢাকায়। মাণিকচাঁদের সৌভাগ্য। কারবারের দিক থেকে ঢাকার চেয়ে ভাল গদী আর কোথায় পাওয়া যাবে? দিল্লী আগ্রার কথা বাদ দিতে হয়। পাটনা থেকে দিল্লী অনেক দূর। তার চেয়ে ঢাকা কাছে। হীরানন্দ বুড়ো হয়েছে। মাণিকচাঁদও ছোট। অভিজ্ঞতা কম। হীরানন্দের কাছে কাছে থাকে মাণিকচাঁদ। বিপদে আপদে দেখতে পারবে হীরানন্দ।

ঢাকার কারবার ভালই। ঢাকা সুবা বাংলার রাজধানী। থাকে এখানে

নায়েব-নাজিম। থাকে দেওয়ান। শাসন করবার জন্য আছে সুবাদার। সে নায়েব-নাজিম। রাজস্বের জন্য আছে দেওয়ান। ১৫৭৯ সাল থেকে চলে আসছে এই ব্যবস্থা। সুবাদার যখন যে টাকা চাইবে, দেওয়ানকে দিতে হবে। এই হল আকবর বাদশার বিধি।

আরঙ্গজেব আকবরের ব্যবস্থাকেই একটু রদ-বদল করে চালাতে আরম্ভ করে। সুবাদার আর দেওয়ানের ক্ষমতার সীমা রেখা টানা খুব মুসকিল। রাজকাজে চুলচেরা ভাগ বিচার অসম্ভব। অথচ সীমারেখা দরকার। দেওয়ানকে যদি সুবাদারের অধীন করে রাখা যায়, তবে রাজস্বের অব্যবস্থা হতে পারে। আরঙ্গজেব অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝেছিলেন এই কথা। সুতরাং দেওয়ানীকে আলাদা রাখতে হবে সুবাদারী থেকে। কিন্তু দুজনেই থাকবে সম্রাটের অধীন। তাদের ক্ষমতা নির্দেশ করবে বাদশাহী পরোয়ানা—দস্তর-উল-আমল।

নবাবীর কথা বাদ দিলেও, গঞ্জের কথা বাদ দেওয়া যায় না। বিরাট গঞ্জ ঢাকা। অনেক দিনের পুরানো। ঢাকাই-মসলিনের নাম জগৎজোড়া। বাদশার হারেমে মসলিন চালু হয়েছে নূরজাহানের কৃপায়। রপ্তানি হয়েছে বাইরে। বিলেতে কদর বেড়েছে। কুঠি আছে তাই ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজদের। গঙ্গার দু'পারের চার ক্রোশ জুড়ে হাজার হাজার ছুঁতারের বসতি। দিনরাত নৌকো তৈরী হয়। ঢাকার গদী পেয়ে মাণিকচাঁদ ভাগ্যবান।

সুবাদার তখন আজিমুশ্বান। আজিমুশ্বান বাদশা আলমগীর আরঙ্গজেবের নাতি, বাহাদুর শার ছেলে। সুবাদারের সংগে মাণিকচাঁদের খুব ঘনিষ্টতা। টাকা কড়ির লেনদেনও হয়েছে।

বিশেষত, সুবাদারের আবার ব্যবসার সখ। টাকার ওপর বড় লোভ। দেওয়ানী আলাদা হয়ে গিয়ে সুবাদারের অসুবিধা হয়ে গেছে। আরঙ্গজেব বড় কঠোর। কাউকে পরোয়া করে না। আত্মীয় স্বজনকে সন্দেহ করা স্বভাব। মারাঠাদের উৎপাতে স্বভাবটা বরং বেড়েছে। অথচ টাকা চাই। ব্যবসায় টাকা। আজিমুশ্বান ব্যবসায় নামলো।

যেমন তেমন ব্যবসা নয়। নবাবী ব্যবসা। আইন যার মুখের কথা, যখন তখন কথা বার করলেই হল। নোতুন আইন জারি হল নবাব-নাজিম আজিমুশ্বানের।

বন্দরে যে মাল বিক্রির জন্য নামবে, তার একমাত্র একজন ক্রেতা

থাকবেন—তিনি স্বয়ং সুবাদার আজিমুশ্বান। এই আইনের নাম সোয়াদী-খাস। যে হাটে কেনা সে হাটেই বিক্রি। মাঝখানে ফড়ের লাভ। আইন হল, সম্রাটের ক্রীত মাল কিনে নিতে হবে বণিকদের। তার নাম সোয়াদী-আম্।

চর মারফৎ নাতির ব্যবসার কথা পৌঁছাল দাদুর কানে। দাদু তখন দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে বিব্রত। নবাবী ব্যবসার তারিফ করতে পারেনি সম্রাট আরঙ্গজেব। তীব্র শ্লেষের চিঠি এসে পৌঁছাল অকস্মাৎ। আজিমুশ্বান তখন ব্যবসার হিসেব দেখছে। আরঙ্গজেব লিখেছে: এত ব্যবসা নয়। এর নাম খানদানী পাগলামি।

আরঙ্গজেব শব্দের যাদুকর। সাহিত্যে নাম আছে। চিঠি পড়ে অবাক হল আজিমুশ্বান। আরো অবাক হল বাদশাহী পরোয়ানায় পদবী থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে। সুবাদারের মনসবী থেকে ছাঁটাই করতে হবে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী। সোজাসুজি তিরস্কার। মানমর্যাদার মাপকাঠি মনসবী। সেখান থেকে ছাঁটাই। তাও আবার ঘোষণা করা হয়েছে। আজিমুশ্বান চুপসে গেল।

শক্তিশেল তখনও বুকে পড়েনি। দেওয়ান জিয়াউল্লাখাঁকে পদচ্যুত করে আরঙ্গজেব যখন মির্জ্জাহাদী নামে প্রিয় ও অভিজ্ঞ কর্মচারীকে করতলবখাঁ উপাধি দিয়ে পাঠালেন "জাতির স্বর্গ" বাংলায়, তখনই বুঝলো আজিমুশ্বান আরো কঠিন বিপদ সামনে।

দক্ষিণ ভারতের গরীব বামুনের ছেলে মির্জ্জা হাদী। অনাথ; কিন্তু বড় বুদ্ধিমান। ইস্পাহানের হাজি সফী কিনে ছিল এই অনাথকে। নাম রেখেছিল মির্জ্জা হাদী। হাজী সফী মারা গেলে ইস্পাহান থেকে ফিরে এল মির্জ্জা হাদী। চাকরী পেল বেরারের দেওয়ানের কাছে। তখনি নজরে পড়েছিল বাদশার। বুদ্ধিমত্তার পুরস্কার হিসাবে বাদশা ডেকে চাকরী দেয় তাকে। সেই থেকে পরিচয়, তারপর হল সুবা বাংলার দেওয়ান। মির্জ্জা হাদী নাম তখন আর থাকলো না। সম্রাটের দেওয়া উপাধি পেল,—করতলবখাঁ। এই করতলব খাঁ-ই মুর্শিদকুলিখাঁ। ১৭০১ সালে নোতুন দেওয়ান এল ঢাকায়।

সেরেস্তার কাজে মুর্শিদকুলি ঝানু। দেশটাকে একবার দেখেই বুঝেছে রোগ কোথায়। প্রজাদের কাছ থেকে টাকা যে আদায় হত না, এমন নয়। প্রজারা খাজনা দিত ঠিক-ই। কিন্তু হিসেব পত্রের কোন বালাই নেই।

আয় ব্যয় বোঝা দুঃসাধ্য। তবে আয়ের চেয়ে ব্যয়ের হার বেশী। তা ঠিক টের পাওয়া যেত। কেন না বাংলা সুবা থেকে এক কড়ি রাজস্বও যেত না সম্রাটের কাছে। বরং মাঝে মাঝে অন্য সুবা থেকে টাকা এনে বাঁচাতে হয়েছে সুবাদারের মান সম্মান, জাঁক-জমক।

দেওয়ানীর কাজে অভিজ্ঞতা আছে মুর্শিদকুলির। এসেই নোতুন জরিপের আদেশ হল। দেখা গেল জায়গীরদার অধিকার করে আছে অনেক জমি। জায়গীরদারদের কাছ থেকে এক কড়িও রাজস্ব আদায় করা যায় না। তারা নবাবী সেনার সেনাপতি। মাইনের বদলে পেত পুরুষানুক্রমিক ভোগ-দখলের জমি। নগদী সৈন্যদের মাইনে দিতে হতো দেওয়ানকে।

ভাল ভাল জমি গিয়েছে জায়গীরদারদের ভাগে। সম্রাটের লাভের চেয়ে লোকসান বেশী। সম্রাটের মত নিয়ে মুর্শিদকুলী জায়গীরদারদের অনেক জমি খারিজ করে দিল। বাংলার জমির বদলে তারা পেল উড়িষ্যায় জায়গীরদারি। বাংলা দেশে যত জমি ছিল তার চেয়ে আরো বেশী জমি জুটলো কপালে। উড়িষ্যার জমি বাংলা দেশের তুলনায় খারাপ। খাসজমি বাড়ল যত, রাজস্বের পরিমাণ বাড়ল দ্বিগুণ। পশ্চিম বাংলা দেশ থেকে সব জায়গীরদারী ঘুচলো। থাকলো কেবল নাজিম দেওয়ান আর সিপাহসালারের জায়গীর। হাতে হাতে ফল। বছর ঘুরতে না ঘুরতে আয় দাঁড়াল এক কোটিতে।

আয় ব্যয়ের হিসেব রাখার কাজে মাঝে মাঝে পরামর্শ করতে হত মাণিকচাঁদের সংগে। ইতিমধ্যে মাণিকচাঁদ ঢাকার নামকরা গদীয়ান। আজিমুশ্বানের বড় ভরসা মাণিকচাঁদ। সুবাদারের সে তালিমদার। টাকা কড়ির সহায়। দেওয়ানও এল মাণিকচাঁদের কাছে। এই-ই চাইছিল সে। কাজ কারবার তার টাকার। টাকার সংগে সম্বন্ধ দেওয়ানীর। পরস্পরকে চিনতে দেরী হয়নি তাই। মুর্শিদকুলি মুগ্ধ হল মাণিকচাঁদের প্রখর ব্যবসা বুদ্ধিতে। মাণিকচাঁদও মুগ্ধ নতুন দেওয়ানের দক্ষতায়। দু'জন দু'জনকেই তারিফ করে। পরস্পর পরস্পরের স্বার্থ দেখে। আত্মীয়ের চেয়েও ঘনিষ্ট তাদের সম্পর্ক। দেওয়ানের সংগে যোগাযোগ যতই বাড়ে, গদীতে ব্যবসাদারের ভিড় হতে থাকে ততই। আজিমুশ্বান তিরস্কৃত। আজিমুশ্বানকে দিয়ে আর কিছু হবার নেই। ব্যবসাদাররা বুঝছে আগামীদিনের শক্তি বর্ত্তমান দেওয়ানকে কেন্দ্র করেই। মাণিকচাঁদের সংগে কারবার থাকলে, খাতির থাকবে দেওয়ানের সংগেও। তাই জমিদার মহাজন এসে দাঁড়ায় মাণিকচাঁদের গদীতে।

মাণিকচাঁদ ব্যবসাদার। লক্ষ্য তার ভাল করে ব্যবসা করা। জাতে মাড়োয়ারী সে। রাজনীতি তার কাজ নয়। দেশে সুশাসন না থাকলে ব্যবসা হতে পারে না। সুবা বাংলায় টাকার অভাব হয়নি। অভাব হয়েছিল শাসনের। দেওয়ানকে এক বছর দেখেই মাণিকচাঁদ বুঝেছে,—যদি পারে ত এ-ই পারবে। ঝানু ব্যবসাদার মাণিকচাঁদ মুর্শিদকুলির সঙ্গ ছাড়ে না।

মুর্শিদকুলির স্বপ্ন অগাধ। ঢেলে সাজতে হবে দেশ। তাতে অনেক বিপদ, বিঘ্ন। জমিদারের দাপট খুব। তাদের চটাতে হলে শক্ত হতে হবে। বন্ধুর দরকার, দরকার বিত্তের। মাণিকচাঁদ বুদ্ধিমান, ধনবান। মণিকাঞ্চন যোগ ঘটলো সেদিন।

আজিমুশ্বান দেখে করতলব খাঁর সংগে মাণিকচাঁদের ভাব ভালবাসা। দেওয়ানের ওপর খুসী আরঙ্গজেব। হুঁসিয়ার সম্রাট। কারো ওপর বিশ্বাস নেই। আমল দেয় না কাউকে। কার্যসিদ্ধি নিয়ে কথা। যাকে দিয়ে কাজ হাসিল হবে, তাকেই বুকে টানবে। ছলা কলা, কূটবুদ্ধিতে হিন্দুস্থানে জুড়িদার নেই তার। বাইরে দরবেশ, ভিতরে দানব। দাদুকে ভাল করে চেনে আজিমুশ্বান। দেওয়ান দাদুর প্রিয়। প্রকাশ্যে অসন্তোষ দেখাবার উপায় নেই। কার্যত তা হবে বাদশার বিরোধিতা। সমস্ত ভবিষ্যত নষ্ট হবে তা হলে। অথচ করতলবখাঁকে সহ্য করা অসম্ভব। সুবাদারের হাত পা বাঁধা পড়ছে। প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। শুধু ভিতরে ভিতরে পুড়তে থাকে সুবাদার।

রেসালাদার আবদুল ওয়াহেদের হাতে ছিল নাম করা নগদী সৈন্য। ওয়াহেদ আজিমুশ্বানের ছায়াসহচর। নবাবের ব্যথা বোঝে সে। মনসবদারী কমিয়ে দিয়ে বাদশা শুধু মাত্র সম্মানে মারেনি, পেটেও মেরেছে। মনসবদারী কমার অর্থ প্রাপ্য তন্‌খা কমে যাওয়া। একেই আজিমুশ্বান খরচে-নবাব। সেই খরচে টান পড়েছে এখন। ওয়াহেদ নবাবের ব্যথা ভাল করে বুঝতে পারে। মানিকচাঁদ যেমন বোঝে করতলবখাঁর সংকেত, ওয়াহেদ তেমনি বোঝে আজিমুশ্বানের।

দরবারে আসছিল করতলব খাঁ। পথ আটকে দাঁড়ালো ওয়াহেদের নগদী সৈন্য। তলব দিতে হবে এখুনি এই মুহূর্তে। না দিলে পথ ছাড়বে না। নগদীদের স্পর্দ্ধায় চমকে উঠলো মুর্শিদকুলি।

মুর্শিদকুলি ভাল করেই জানে এই সৈন্যরা গরীব। মাইনে তাদের কম। সাধারণ অশ্বারোহী পেত মাসে সাত টাকা কি আট টাকা। বিদেশী ঘোড়া

রাখলে পেত তেরো টাকা। গোলন্দাজদের মাইনে তিন টাকা থেকে সাত টাকা। বন্দুকধারীরা পেত তিন টাকা থেকে ছ টাকা আর পদাতিকেরা দু টাকা। ঠিকমত মাইনে না পেলে চলে না। অবস্থা চরমে ওঠে। বিক্রি করতে থাকে সাধের ঘোড়া, সড়কি, তলোয়ার। বিক্রি করার মত আর কিছু না থাকলে চলবে লুট পাট। জ্বলবে ঘরবাড়ী। মরবে নিরীহ প্রজা। এ কথা খুব ভালভাবে জানে দেওয়ান। তলব দেওয়ার রীতি দুমাস অন্তর। তলব দেওয়াও হয়েছে। তবু অভাব হতে পারে। হাজার অভাব অনটন হোক, দরবারের পথে দেওয়ানের পথ আটকে দাঁড়াবে নগদী সৈন্য—এমন স্পর্দ্ধা আসে কোথা থেকে।

কোথা থেকে আসে জানা আছে মুর্শিদকুলির। ক্রীতদাস থেকে দেওয়ান হয়েছে সে। জীবনের বহু অভিজ্ঞতার :পোড় খাওয়া মানুষ। মুখ দেখে বলে দিতে পারে চরিত্র। তাই দরবারে আসার সময় পোষাকের তলায় পরে আসত মজবুত বর্ম। জানতো, কাজে লাগবে। কাজে লাগালও। অকস্মাৎ রুখে দাঁড়াল দেওয়ান। পালিয়ে গেল ওয়াহেদের নগদীরা। তারিখ্-ই-বাঙালায় বলা আছে বাঘ দেখে ছাগল যেমন পালিয়ে যায়।

মসনদে বসে আছে আজিমুশ্বান। দরবারের দস্তর না মেনে সোজা আজিমুশ্বানের হাঁটুর ওপর পা রেখে চিৎকার করল দেওয়ান, এ কাজ তোমার, তোমারই। হয় এ পথ থেকে সরে এস, না হয় তোমার প্রাণ নিয়ে আমি প্রাণ দিয়ে যাই। কিন্তু বাদশা আমার প্রাণের বদ্‌লা নেবে।

আমতা আমতা করে কি যেন বলতে গেল আজিমুশ্বান। দরবার থ' হয়ে আছে।

ছাড়ার পাত্র নয় মুর্শিদকুলি। সমস্ত বিবরণ দিয়ে পত্র লিখলো সম্রাটকে। সুবাদারের কর্তৃত্বের বাইরে থাকতো বাদশার নিজস্ব বিভাগ—সোয়ানীনবিশ আর ওয়াকই নবিশ। এই বিভাগের কাজ অনেকটা গুপ্তচরের। পরগণায় পরগণায় কি ঘটছে তার বিবরণ পাঠাত সম্রাটকে। এদের কথায় কথা বলতে পারতো একমাত্র সম্রাট। আর ছিল খবরের কাগজ ওয়াইক। বাদশাহী সমাচার আর ফর্মান প্রকাশিত হত তাতে। মুর্শিদকুলি ঘটনাটা জানিয়ে দিয়ে এল সেখানে।

জানতো আজিমুশ্বান এবার যে আঘাত আসবে তাকে রোধ করার শক্তি কারো থাকবে না। মনে মনে তৈরী হয়। তৈরী হয় মুর্শিদকুলিও। থাকবে না আর ঢাকায়। দেওয়ানী সরাতে হবে।

পাঁচ

দেওয়ান খানায় সভা ডাকলো মুর্শিদকুলি। এলো জমিদার, কানুন গো, আমিল, পোদ্দার, তবিলদার। ডাকা হলো দেওয়ানীর সকল কর্মচারীকে। বিশেষ আমন্ত্রণ গেল মাণিকচাঁদের কাছে। দেওয়ান খানা ঢাকা থেকে সরাতেই হবে। এর কোন নড়চড় নেই। এখন বিবেচ্য—কোথায় সরানো যায়। উপযুক্ত জায়গা বাছাই করা হল সভার কাজ।

কয়েকদিন তর্ক বিতর্ক হয়েছে। মাণিকচাঁদের পরামর্শই গ্রহণ যোগ্য মুর্শিদকুলির। মাণিকচাঁদ বলেছে, মুখসাদাবাদই ভাল।

ভাগীরথীর ওপরে মুখসাদাবাদ। গঞ্জ হিসাবে নাম করা। ইংরেজ কোম্পানীর কাশিমবাজারের কুঠি আর ফরাসীদের ফরাস ডাঙা খুব পরিচিত দেওয়ানের কাছে। মুখসাদাবাদ সুবার মাঝখানে। চোখের মনির মত। পূর্ব-পশ্চিমে রাজমহল। সকরিগলি আর তিলিয়াগলি বহুদিন থেকে বহু যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্দ্ধারণ করে আসছে। দক্ষিণ-পশ্চিমে বীরভূম, বিষ্ণুপুর। জমিদারদের প্রতাপ ওখানে দুর্দান্ত। ওদের নিকটে থাকা দরকার। দক্ষিণ-পূর্বে বর্দ্ধমান, হুগলী, হিজলির বন্দর। পূর্বে রাজধানী ঢাকা। জায়গীর যা থাকবার তা আছে পূর্ববঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের জমি সম্রাটের খাস দখলে। রাজস্ব আদায় হবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে। বাংলা বিহার উড়িষ্যার সঙ্গে যোগ রাখার জন্য পাকা রাস্তা পাওয়া যাবে। পাটনা থেকে যে পথ বার হয়েছে, তা মুঙ্গের ও রাজমহলের ভেতর দিয়ে সুতীতে এসে দু'ভাগ হয়ে গেছে। তারি একটা শাখা মুখসাদাবাদ, পলাশী পার হয়ে গেছে গাজীপুরের দিকে। বর্দ্ধমানের রাস্তা বীরভূমের বক্রেশ্বর রেখে কাশিমবাজার এসেছে। রাজমহল থেকে মুকসাদাবাদ, সেখান থেকে বর্দ্ধমান ছুঁয়ে শ্রীক্ষেত্র বহুকালের প্রসিদ্ধ পথ। শেরশার সময়কার রাস্তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে আরো একটা পথ। এই স্থল পথ। জল পথের কথাই নেই।

মেনে নেওয়া হল মাণিকচাঁদের মত। স্থির হল দেওয়ান খানা উঠে যাবে মুকসাদাবাদে। সুবাদারের কোন হুকুম না নিয়েই উঠে যাবে। তৈরী হতে থাকলো কর্মচারী। বাঁধা ছাঁদার কাজ এবার।

মুর্শিদকুলি অনুরোধ করেছে মাণিকচাঁদকে তার সঙ্গে উঠে আসতে। মাণিকচাঁদ দ্বিধাগ্রস্থ। যে যুক্তি সে দেওয়ানকে দিয়েছে, সেই যুক্তির জালে

নিজেই জড়িয়ে পড়েছে এবার। মুর্শিদকুলি কথা দিয়েছে মাণিকচাঁদকে, —আমি যতদিন রাজ কাজে থাকবো, ততদিন তোমাদের ভাল মন্দ দেখবো।

এর চেয়ে আর কি নিশ্চয়তা থাকতে পারে? মুর্শিদকুলি কাজের লোক। আগামী দিনের ভার ওর ওপর আসবেই। মাণিকচাঁদ মনে প্রাণে বিশ্বাস করতো একথা। মাত্র দু'বছরের ভেতর প্রমাণও পেয়েছে। যখন সুবার খরচ উঠে না সুবা থেকে, তখন খরচ খরচা বাদ দিয়ে বাড়তি টাকা রেখেছে ধনাগারে। অদ্ভুত কর্ম ক্ষমতা না থাকলে এ কিছুতেই হয় না। মাণিকচাঁদ মুর্শিদকুলির কদর জানে।

আর যদি দেওয়ান খানা উঠে যায়, তবে কাজের চাপ কমে যাবে। জমিদার আসবে না খাজনার টাকা ভাঙাতে, ধার করতে। আরো হাজার রকমের কাজকর্ম থাকে তাদের। তারা সবাই ছুটবে মুকসাদাবাদে।

কাছাকাছি আছে বলেই দেওয়ানের সঙ্গে ভাব ভালবাসা। দূরে গেলে কি থাকবে? রাজ কাজ বড় দুরুহ। দেওয়ানকে হাতে রাখতে পেরেছে বলেই ত সে আজ ঢাকার প্রধান গদীয়ান। দেওয়ান বিমুখ হলে কিছুতেই এতটা প্রতাপ থাকবে না মাণিকচাঁদের। ওদিকে কাশিমবাজার দিন দিন বাড়ছে। দেওয়ান খানা গেলে আরো বাড়বে। কাশিমবাজারে কোন গদী নেই তাদের। অত বড় গঞ্জ এখনো হাত ছাড়া। ইংরেজরা বড় কারবারী। গদীর সম্পর্ক হয়নি এখনো তাদের সঙ্গে। বিচক্ষণ ব্যবসায়ী মাণিকচাঁদ বুঝলো, যাওয়া দরকার।

১৭০৩ সাল। দেওয়ান খানা উঠে গেল মুকসাদাবাদের পতিত জমি কুড়ুলিয়া মৌজায়। আর গদী বসাল মাণিকচাঁদ এক ক্রোশ দূরে, মহিমাপুরে। মুর্শিদকুলি খাঁর প্রাসাদ উঠলো। দরবারের নাম হল চেহল সুতন। চল্লিশটি থামের ওপর প্রাসাদ। কেল্লা বসল এখন যেখানে ইমামবাড়া। আর মহিমাপুরে এসে আবার তেজারতি কারবার আরম্ভ হল মাণিকচাঁদের।

আরঙ্গজেবের হুকুম এল আজিমুশ্বানকে ঢাকা ছাড়তে হবে। আজিমুশ্বান গেল রাজমহল। ঢাকায় থাকলো সুবাদারের প্রতিভূ হয়ে আজিমুশ্বানের ছেলে ফাররুকশের।

মুকসাদাবাদে আসার এক বছর পরে মুর্শিদকুলি খাঁ গেল দাক্ষিণাত্যে। সম্রাটের সঙ্গে দেখা করা দরকার। সম্রাট তখন বিব্রত। একদিকে মারাঠা মূষিক শিবাজী অন্যদিকে আহমদনগর, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা। ক্রমাগত যুদ্ধ। যুদ্ধ মানে অর্থ। একদিকে বাদশাহী খরচ অন্য দিকে যুদ্ধের খরচ।

বড়ই বিব্রত তখন আরঙ্গজেব। এমন সময় রাজকর, নজরানা জায়গীরের উপস্বত্ব সমেত এক কোটির বেশী টাকা সঙ্গে করে কুর্নিশ জানালো মুর্শিদকুলি। নিয়ে গেল হিসেবের কাগজ পত্র,—কাগজাৎ তকৃশীস, ওয়াশীল বাকী, খারিজ দাখিল। পাকা হিসেবী দেওয়ান বশ করলে সন্দেহ পরায়ণ বাদশাকে। সম্রাট খুশী হয়ে ছিল নতুন উপাধি নায়েব নাজিম। পেল খেলাৎ, বাদশাহী নাকড়া, ঝাণ্ডা আর মনসবী। ফিরে এসে মুকসাদাবাদের নাম রাখলো মুর্শিদাবাদ।

মুর্শিদকুলি খাঁ এর উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মাণিকচাঁদের উন্নতি। বাদশার কাছ থেকে পদবী পেলো মুর্শিদকুলি। বিরাট পদবী। মুতামিন-উল-মুলক আলাউদ্দুল্লা জাফর খান নাসিরি নাসিরি জঙ মুর্শিদকুলি খাঁ। মাণিকচাঁদ নবাবের কাছ থেকে পেল পোদ্দারী আর তবিলদারী।

এতদিন অবধি গদীর প্রধান কাজ ছিল বাটা আর সুদের। লোকে টাকা ধার করতে আসতো। হুণ্ডি, কবচ, ভাঙাতো। সব ক্ষেত্রে টাকা দিতে হতো ঘর থেকে। ঘরে কে কত টাকা রাখতে পারে? থাক না অঢেল ধনরত্ন। থাকারও ত সীমা আছে।

আজকালকার ব্যাঙ্কে টাকা জমা পড়ে। জমা-পড়া টাকা থেকে আয় হয়। সে দিন এমন আমানতের কোন উপায় ছিল না। বাড়তি সোনা দানা যদি বা কারো থাকে, তাকে নিয়ে ব্যবসা করার ধাত ছিল না অনেকের। সোনা রূপা টাকা কড়ি মাটির তলায় পুঁতে রাখতো। চোর ডাকাতের ভয়। সে ভয়ের ত কথাই নেই। অষ্ট প্রহর ভয় নিয়ে বাস করতে হয়। তার পরে জমিদার। রাজধানীর পাঁচিল ছাড়ালে জমিদারের প্রভুত্ব। তার ভয়ে তটস্থ সবাই। এক জনের উন্নতি, অন্য জনের গাত্রদাহ। তাই টাকা থাকতেও গরীব। জীবন যাত্রার কোন অদল-বদল নেই। মাটির তলায় সোনার তাল। তার ওপরে মাদুর বিছিয়ে বসে থাকতো কৃপণ ও অকৃপণ। সমাজের ওপরে আমীর ওমরাহ্ নবাব। চাকচিক্য এদের। ভোগ বিলাসের অন্ত নেই। খরচা করত দে-দার। টাকা ওড়াত ধুলোর মত। কিন্তু তাদের টাকা ত আর আসবে না গদীতে। জমা পড়বে না, ব্যবসায়ও খাটবে না।

গচ্ছিত ধন রত্ন যতই থাক, বিপদে পড়তেই হত। পোদ্দারী আর তহবিলদারী পেয়ে মাণিকচাঁদ এই বিপদ চিরকালের মত এড়িয়ে গেল। নবাবের রত্ন ভাণ্ডার এখন মাণিকচাঁদের তদারকে। এই তো গচ্ছিত।

মাণিকচাঁদ টাকা মারবে না। শুধু এই গচ্ছিত টাকা থেকে কিছু টাকা উপায় করে নেবে মাত্র। মাছের তেলে মাছ ভাজবে। নবাবের দরকার হলে ফিরিয়ে দেবে। দরকার মত দিতে পারলে কোন হাঙ্গামা নেই। মাণিকচাঁদ অসামান্য সুযোগের সামনে। মুর্শিদকুলি কথা দিয়ে কথা রেখেছে। এখন দে-দার কারবার। ওদিকে তহবিলদার হাওয়ার সঙ্গে বাজারে গুঞ্জন। কঠোর নবাব মুর্শিদকুলি। তার-ই তহবিলদার একজন গদীয়ান। কে আর তার গদীতে না যাবে? মুর্শিদাবাদে এলে মহিমাপুরের ধূলো পায়ে মাখতো সবাই।

পোদ্দারীর কাজই বা মন্দ কি। পরের ধনেই পোদ্দারী। তহবিলদার থেকে আলাদা কাজ কিছু নয়। পোদ্দারের কাজ বছরের শেষে ধন রত্ন গুনে গেঁথে ওজন করে বস্তা বন্দী করে রাখা। তাদের দেখতে হত টাকায় ঠিক মত রূপো আছে কিনা। দেশে টাকা জাল হচ্ছে কিনা। শুধু পরের ধনে পোদ্দারী করেনি শেঠরা। আরো অনেক বড় কাজ করেছে তারা। কিন্তু সে কথা পরে।

মুর্শিদাবাদে দেওয়ান খানা। ট্যাঁকশাল ঢাকায় রেখে কি লাভ? বরং ক্ষতি হচ্ছে। দরকার মত টাকা পাওয়া যায় না। বাজার দর ঠিক থাকবে না টাকার অভাবে। মাণিকচাঁদ পরামর্শ দিল মুর্শিদকুলিকে।

মুর্শিদকুলি ভেবে দেখলো: কথাটা ঠিক। দেওয়ানী মুর্শিদাবাদে, ট্যাঁকশাল ঢাকায়। কাজ চালানোর অসুবিধে। দেখা শোনা, তদবির তদারক করার জন্য অভিজ্ঞ ও নির্ভর যোগ্য লোক খুঁজে পাওয়াও দায়। টাকার অভাবে বাজার দর যদি চড়ে যায়, তা হলে বদনাম হবে মুর্শিদকুলির। জিনিষের দাম ঠিক রাখতে হবে। দেওয়ানের হুকুম। বাঁধা দর, দেওয়ান বেঁধে দিয়েছে। টাকায় চার মণ ধান। ধানের দর যেন না বাড়ে। নজর রাখতো ফৌজদার। হুগলীর ফৌজদারের ওপর ঢালাও হুকুম,—বিদেশীর নৌকো যেন ভাল করে দেখা হয়। দেওয়ানের ধারণা—ওদের স্বভাবটাই খারাপ। যতটা ধান চাল দরকার, মজুত করে তার চেয়ে অনেক বেশী। মজুতদার যেন না থাকে। জিনিষ পত্রের বাজার দর বাঁধা। প্রতি সপ্তাহে মেলানো হতো আগের সপ্তাহের দরের সঙ্গে। কিন্তু টাকার অভাবে যদি সত্যিই বাজারদর বানচাল হয়ে যায়, তবে দোষ ত দিতে পারবে না ব্যবসাদারকে। তাকে শাস্তি দিয়েও দর নামানো যাবে না। মাণিকচাঁদের কথাই ঠিক। ট্যাঁকশাল বসাতে হবে এখানে।

বসলো ট্যাঁকশাল ১৭০৬ সালে। নিজামৎ কেল্লার পাশে। ইমামবাড়া থেকে বেশী দূরে নয়। ইমামবাড়ার যে ঘাটটা নেমে গেছে ভাগীরথীর দিকে তারি নাম ট্যাঁকশাল-ঘাট। লোকে তখন তাই-ই বলত। ট্যাঁকশাল এলো। কিন্তু তখুনি—তখুনি কর্ত্তৃত্ব পায়নি মাণিকচাঁদ। মাণিকচাঁদ কাজ দেখা শোনা করত। আপদে বিপদে সাহায্য করত। সোনা রূপোর ঘাটতি পড়লে, বাজারে টাকার টানাটানি পড়লে, নিজের ভাঁড়ার থেকে রূপো পাঠাত ট্যাঁকশালে। সম্পর্ক ছিল মাত্র, খুবই নিকটের সম্পর্ক। ইংরেজরাও জানতো এ কথা। এই নিয়ে লেখা লেখি করেছে নিজেদের মধ্যে। কিন্তু ট্যাঁকশালের কর্তা তখন রঘুনন্দন। লোকে বলে রঘুনন্দন দারোগা। যতদিন বেঁচে ছিল রঘুনন্দন ততদিন দারোগা গিরি করেছে ট্যাঁকশালে। ১৭১৭ সালে রঘুনন্দন মারা যাবার পর ট্যাঁকশালের ভার এল শেঠদের হাতে।

ছয়

রাজনীতি করতে আসেনি মাণিকচাঁদ। সুবাদারির ওপর কোন আকর্ষণ নেই। মাণিকচাঁদ মাড়োয়ারী। ব্যবসা তার রক্তে। সে এসেছে শুধু মাত্র ব্যবসা করতে। নায়েব-নাজিমের সঙ্গে তার সম্পর্ক বন্ধুত্বের, ঠিক। কিন্তু সে বন্ধুত্বের ভিত্তিই ব্যবসা। দেওয়া-নেওয়ার নাম ব্যবসা। লাভ রাখবে দুপক্ষই। সে-ই স্বার্থে। নিঃস্বার্থ ব্যবসা হল সোনার পাথর বাটী। নায়েব-নাজিমের স্বার্থ দেশে অরাজকতা বন্ধ হোক। প্রজারা খাজনা দিক। জমিদাররা মাথা নীচু করে থাক। ব্যবসাদার মহাজনরা পাওনা কর ফাঁকি দেওয়া বন্ধ করুক। এইটুকু করতে পারলেই হল। বিশেষ করে বাংলায়।

ব্যবসাদার হিসেবে মাণিকচাঁদও এই চায়। দেশে শান্তি আসুক। শান্তি এলে কারবার। অশান্তিতে কারবার হয় না। অষ্ট প্রহর প্রাণের ভয় নিয়ে কে কেনা বেচা করবে? লুট পাট, মার ধোর, গুণ্ডামি বজ্জাতি অবাধে চলতে থাকলে, সবাই হাত পা গুটিয়ে বসে থাকবে। অনেক কাজ করেছে মুর্শিদকুলি। মগ, হার্মদ, বোম্বেটের ভয় নেই। চোর ডাকাতের উপদ্রব আছে। কিন্তু এখন কমেছে। কঠোর শাস্তি দেয় দেওয়ান। চুরি ডাকাতির খবর পেলে ডাক পড়ে সেই এলাকার ফৌজদারের কিম্বা জমিদারের। হুকুম দেয়—যে করেই হোক চোর ধরে আন। না হলে ক্ষতি পূরণ করতে হবে।

উপায় নেই। খুঁজতেই হবে। এই জন্যে থানাও বসিয়েছে কয়েকটা। চোর ধরা পড়লে আর রক্ষা নেই। তাকে জীবন্ত মারা হতো। চুরি ডাকাতি প্রায় নেই আর। লোকে নিরাপদে চলা ফেরা করতে পারে। রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে বাঁচে। সুনাম বেড়েছে মুর্শিদকুলির। ব্যবসা ফুলেছে মাণিকচাঁদের।

মাণিকচাঁদের বুদ্ধির ওপর নবাবের খুব বিশ্বাস। জমিদারীর একটা বিহিত করতে হবে। এই জন্যেই বাংলায় আসা। আকবরের বিধি ব্যবস্থা অনুযায়ী চলছে। কিন্তু কোথায় গোলমাল আছে যেন। তাকে ঠিক করা দরকার। মাণিকচাঁদ এবার নবাবের পেস্কার, আর তবিলদার।

দেওয়ান থাকতে যা করতে পারেনি, নায়েব-নাজিম হয়েও যা ছিল অসাধ্য ; নবাব হবার পর তা অনেক সহজ হল। জায়গীরদারদের বাংলা থেকে বিদায় করে রাজস্ব বাড়লো। কিন্তু কোন আমূল পরিবর্তন করা যায়নি। চাকলা, পরগনা, মহলের সীমা ও সংখ্যার হেরফের করে, খাজনা আদায়ের আরো ভাল ব্যবস্থা হল। প্রজাস্বত্ব দেখার জন্য বহাল হল আমিল,—চাকলার জন্য ফৌজদার। রাজস্বের পরিমান গিয়ে দাঁড়াল ১, ৪২, ৮৮, ১৮৬ টাকায়। অর্থাৎ শা সুজার সময় যা নির্দিষ্ট ছিল এখন তার পরিমান বাড়ল ন'গুণ। তারও পর আবয়াব,—অতিরিক্ত কর। তার পরিমান আড়াই লাখের বেশী।

এই ব্যবস্থা পুরোপুরি চালু হয় ১৭২২ সালে। তখন মাণিকচাঁদ মৃত। সম্পুর্ণ দায় দায়িত্ব তাই মাণিকচাঁদের নয়।

পেস্কার হয়ে খুলে গেল আয়ের নোতুন পথ। গদীয়ানের স্বাভাবিক ব্যবসা চলছে। খুব ভাল ভাবেই চলছে। নবাবের তহবিলদার আর পোদ্দার হবার পর আয়ের পথ বাড়ল। পেস্কার হবার পর টাকার বন্যা এল। বলেছিল এক ইংরেজ,—নদীর হাজার মুখের মত শেঠদের আয়ের পথ হাজার।

এবার থেকে জমিদারের খাজনা জমা পড়বে মাণিকচাঁদের খাজাঞ্চি খানায়। সেখান থেকে রাজস্ব যাবে দিল্লীর দরবারে। তখন হরেক রকম টাকা চালু। কিন্তু বাদশাহী দরবারে যাবে একমাত্র দুষ্প্রাপ্য শিক্কা টাকা। গ্রাম গ্রামান্তে কড়ির চলন। প্রজাদের কাছ থেকে আদায় করেই জমিদার খাজনা দেবে। খাজনা জমা না পড়লে রক্ষে নেই। নবাব জমিদারদের ওপর বড় নিষ্ঠুর। খাজনা বাকি পড়লে জমিদারী যেত। অপমানের চুড়ান্ত হয়েও নিস্তার থাকতো না। বাস করতে হত কয়েদ থানায়। তাই খাজনা

বাকি পড়ার উপায় নেই। খাজনা দিতে হবে শিক্কা টাকায়। এত শিক্কা টাকা পাওয়া যাবে কোথায়?

বিপদ তারণ মাণিকচাঁদ। শরণ নিতে হবে তার। তা ছাড়া আর উপায় নেই। ওখানেই জমা দিতে হবে খাজনা। দিতে হবে শিক্কা টাকায়। কিন্তু যে যেমন টাকায় পারে খাজনা জমা দিয়ে যায়। মাণিকচাঁদের কর্মচারী হিসেব করে। যে টাকা জমা দিচ্ছে, তার সঙ্গে শিক্কা টাকার হারের হিসেব। খাতায় উঠছে শিক্কা টাকা। কিন্তু জমা পড়ছে অন্য টাকা। অন্য টাকাকে শিক্কা টাকায় ভাঙিয়ে দিচ্ছে কর্মচারী। ভাঙানোর জন্যে পাচ্ছে বাটা।

প্রজারা খাজনা দিতে পারে নি। জমিদারী যায় যায়। বাঁচায় মাণিক-চাঁদ। জমিদারকে টাকা ধার দেয়। জমিদারী বাঁচে জমিদারের, রাজস্ব পায় নবাব বাদশা, মাণিকচাঁদ পায় সুদ।

বছরের প্রথম দিনে পুন্যাহ। বাকি বকেয়া মিটিয়ে নতুন ভাবে বছর আরম্ভ করতে হবে। এই রীতি চালু করে মুর্শিদকুলি। মহা ধূমধাম করে পালন করা হত পুন্যাহ। বড় আনন্দের দিন। রাজস্ব জমা দেবার শেষ তারিখ। নোতুন বছরের আরম্ভ। খাজনা জমা দিতে পারলে জমিদারী থাকবে। মহিমাপুরে সে দিন গাড়ী ঘোড়া আর পালকির গাদি। মানুষ চলা দায়। লোকে লোকারণ্য। লোকের চাপে গদী ভেঙে যাবে যেন। শুধু ত দেনা পাওনার দিন নয়। উৎসবের দিন। নবাব প্রসন্ন, প্রসন্ন উজির। মাণিকচাঁদের কাজের সীমা নেই। গোলাপ জল আর আতরের ছড়াছড়ি। ঠাণ্ডা জল বাদশাহী বিলাস। অকাতরে বিতরণ হচ্ছে ঠাণ্ডা জল। হিন্দুদের জন্যে রান্না হিন্দু মতে, মুসলমানদের জন্যে মুসলমানী প্রথায়। পুন্যাহের দিন বড় কঠিন। আনন্দ উৎসবের তলায় বাজে টাকার ঝংকার। ১, ৪২, ৮৮, ১৮৬ টাকা তবু রাজস্ব। তা ছাড়া আড়াই লাখ টাকার আবয়াব। তার হিসেব রাখতে হবে। তার সঙ্গে টাকা ভাঙানোর বাটা আছে, ধারের জন্য সুদ। সমস্ত টাকার জিম্মাদার মাণিকচাঁদ। পুন্যাহ আনন্দের দিন।

পুন্যাহ শেষ হবে। উৎসবের আনন্দ ঝিমিয়ে যাবে। অবসাদ আসবে মহিমাপুরে। শ্রান্ত নবাব যাবে বিশ্রামে। দেশের শান্তি বজায় রেখে সিপাহসালার উঠবে স্ফূর্তির চূড়ায়। হাতি শালে হাতি, ঘোড়া শালে ঘোড়া থাকবে নিরুপদ্রবে। কিন্তু ক্লান্তি নামবে না মাণিকচাঁদের গদীতে। কাজের অভাব নেই। এবার রাজস্ব পাঠাতে হবে দিল্লীতে, বাদশার 'রত্ন ভাণ্ডারে'।

যে টাকা রাজস্ব হিসাবে দিল্লীতে পাঠান হত তারও পরিমাণ অনেক। এক কোটি তিন লক্ষ থেকে কখন কখন বেড়ে দাঁড়াত এক কোটি ত্রিশ লক্ষ। মাণিকচাঁদ পোদ্দার এবং পেস্কার। পোদ্দারের কাজ এবার মাণিকচাঁদের। এই সমস্ত টাকা বাক্স বন্দী করে ভাল করে এঁটে গাড়ী বোঝাই করতে হবে। একটা দুটো গাড়ীর কাজ নয়। এর জন্যেই লাগে প্রায় দুশো গাড়ী। শুধু ত রাজস্ব নয়। রাজস্বের সঙ্গে যাবে নজরানা। এটা দরবারী কায়দা।

নজরানা না পাঠান আর অপমান করা এক জিনিষ। বাংলা দেশ থেকে রাজস্ব যাচ্ছে। বাংলা দেশে, যার নাম দিয়েছে বাদশা আরঙ্গজেব, 'জাতির স্বর্গ।' সেই স্বর্গের উপহার। তাই পাঠানোর আয়োজনও কম নয়। যাবে হাতি, ঘোড়া, মহিষ, হরিণ, চিতাবাঘ, বাঘের চামড়া। দরবারের পর বাদশা নিজেই দেখতে আসবে উপহার। পোষাক পরিচ্ছদে জমকালো হাতি শুঁড় নেড়ে মোবারক জানাবে বাদশাকে। হাঁটু পেতে বসবে সামনে। তারপর রাজকীয় গাম্ভীর্যে চলে যাবে। বাদশাহী আমলে ঘোড়ার বেজায় কদর। বাংলা থেকে পাঠান হত টাঙন ঘোড়া। টাঙন জাতের ঘোড়ার বাপ তুর্কী ঘোড়া আর মা পাহাড়ী ভুটিয়া ঘোড়া। খুব দুর্লভ ঘোড়া। এত ঘোড়া যোগাড় করা মোটেই সহজ ব্যাপার নয়। ঘোড়ার পর হরিণ। তারপর নীল গাই, মহিষ। বাংলা দেশের মহিষ বড় ভাল। লম্বা লম্বা পাকানো শিং তাদের। বাঘ সিংহকে ঘায়েল করে দিতে পারত তারা, এত জোর। এই মহিষের সংগে লড়াই হবে বাঘের। এই লড়াই দেখতে ভালবাসেন বাদশা। তাই বাছাই করা মহিষ পাঠাতে হবে। তা ছাড়া আরো আছে। আছে গঙ্গা জালি মশারি, সোনার পাড় দিয়ে মোড়া শীতল পাটি, হাতির দাঁতের কাজ করা জিনিষ পত্তর, গণ্ডারের চামড়ার ঢাল, মৃগনাভি, মণিমুক্তো। আছে বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে পাওয়া উপহার। স্বর্গের উপহার। তার দস্তুর আলাদা।

এই সমস্ত জিনিষ পত্তর গুছিয়ে বিদায় করার পর মাণিকচাঁদের ছুটি। তার পরের কাজ নবাবের। পাহারা দেবার জন্য পাঠাবে ছ'শো অশ্বারোহী আর পাঁচশো পদাতিক। নবাব যাবেন নিজে লালবাগের সীমান্ত অবধি। সেখানে সোয়ানীনবীশে লিখিয়ে আসতে হবে খবরটা এক সুবার প্রান্ত থেকে অন্য সুবার প্রান্তে এলে রাজস্বের দায়িত্ব সেই সুবাদারের। সে নিজে এসে নিয়ে যাবে এই রাজস্ব তার কেল্লার ভিতর। পুরানো গাড়ী বিদায়

করে দেবে তার নিজের সুবার গাড়ী। এই করে রাজস্ব গিয়ে পৌঁছাবে বাদশা আলমগীর আরঙ্গজেবের দরবারে।

এমন করে রাজস্ব পাঠানোর বিপদ অনেক। বিশেষ করে মোগলযুগের শেষ প্রান্তে। সিংহাসন নিয়ে যেমন রাজপুরুষদের অষ্টপ্রহর লোলুপতা, ষড়যন্ত্র, বিদ্রোহ, গৃহযুদ্ধ, তেমনি ভয় আছে দস্যুতার। চুরি চামারি লুটপাট হামেশাই হয়। দেশের অবস্থা শান্ত থাকলে, তবু কথা। কিন্তু অশান্ত হলে নিস্তার নেই। অভিজ্ঞতা থেকে জানে এই কথা মুর্শিদকুলি। ভুক্তভোগী সে। দু'-দু'বার হয়েছে। একবার ১৭০৭ সালে, আর একবার ১৭১২ সালে জেহান্দার শার সময়।

এই সব বিপদ এড়ানো যায় হুণ্ডি কেটে। কিন্তু কার এত বড় গদী আছে? কে কথার এক চুল নড় চড় না করে 'রত্ন ভাণ্ডারে' জমা দিতে পারে এত টাকা? এত টাকার জিম্মাদার হওয়ার মত বুকের পাটা আছে ক'জন গদীয়ানের? থাকে ত থাকবে একমাত্র শেঠদের। মাঝে মাঝে ঝুঁকি নিত মাণিকচাঁদ। কারবারের অবস্থা ভাল থাকলে দিল্লী থেকে খবর পেলে মাণিকচাঁদ হুণ্ডি দিত তাদের দিল্লীর গদীতে। কিন্তু তা বছর বছর হতো না। দিল্লীর কারবার তখন মুর্শিদাবাদের মত ফলাও হয়ে উঠতে পারেনি। মাঝে মাঝে হুণ্ডি দিয়ে রাজস্ব পাঠাতো নবাব, মাঝে মাঝে যেত বাদশাহী প্রথায়। মাণিকচাঁদের পর ফতেচাঁদের আমল থেকে রাজস্ব গিয়েছে বছর বছর হুণ্ডিতে।

বাংলা দেশের ধন দৌলত, মণিমুক্তো, সুবার সব রাজস্ব যখন নিজের হাতে নির্ভয়ে তুলে দিতে পারে মাণিকচাঁদের হাতে, তখন নিজের ধনরত্ন, ব্যক্তিগত সঞ্চয় কেনই বা রাখতে যাবে মুর্শিদকুলি নিজের কাছে? সুবে বাংলার কোষাগার অক্ষুন্ন যদি থাকে, তবে থাকবে নবাবেরও। তাই মাণিকচাঁদ শুধুমাত্র নবাবের পেস্কার, পোদ্দার আর তবিলদার নয়। সে নয় শুধু মাত্র সুবার টাকার জিম্মাদার। সে জিম্মাদার নবাবের নিজের টাকারও। সে ব্যাঙ্কার।

নবাবের সঞ্চয় জমা পড়ে মাণিকচাঁদের সিন্দুকে। জমা হয় মণিমুক্তো হীরে জহরৎ। মাণিকচাঁদ পাকা জহুরী। চিনতে কখনও ভুল করে না। ঠকবে না কখনও। জমা দিয়ে নিশ্চিন্ত হয় নবাব।

তা ছাড়া কখন কি হয় বলা যায় না। আইনের ফাঁক আছে। সেটা বড় ফাঁক। বাদশাহী আইনে নবাবের কিছু থাকার কথা নয়। হিন্দুস্থানের

সব সম্পত্তির মালিক একমাত্র বাদশা নিজে। ব্যক্তিগত মালিকানা বলে কিছু নেই। নবাব ত খোদ বাদশার প্রতিভূ। শক্তির প্রতীক মাত্র। তা ছাড়া আর তার কোন সত্বা নেই। বলা ভাল, আইনের দিক থেকে থাকতে নেই। কিন্তু প্রবৃত্তির দিক থেকে থাকে। আইন করে কি প্রবৃত্তি বদলান যায়! সঞ্চয় মানুষের প্রবৃত্তি। বিশেষ করে নবাবের মত মানুষের। আজ আছে বাদশার সুনজরে। তাই এত বোল বোলাও। কিন্তু কুনজরে পড়তে কতক্ষণ। বাদশারা স্বভাবতই একটু কান পাতলা। তা ছাড়া শঠতা, চক্রান্ত, ঈর্ষ্যা, হিংসা এবং শোষণ এর নামই ত রাজনীতি। বিশেষ করে মোগল যুগের শেষপ্রান্তে। তাই টাকা রেখেও ভয়। মাণিকচাঁদের কাছে রাখা এর চেয়ে ভাল। কিছুটা নিরাপদ। মাণিকচাঁদকে চটাতে সাহস করবে না বাদশা।

বাদশা সমীহ করে তাকে। প্রতি বছর উপহার আসে দিল্লী থেকে। বাদশাহী উপহার। নবাব যেমন এবং যে দামের পোষাক পাবে বাদশার কাছ থেকে, মাণিকচাঁদও পাবে ঠিক সেই দামের। সেই রকম পোষাক। মোগল যুগে মান সম্মানের আর একটা মাপকাঠি এই পোষাক। তাই ধনরত্ন গচ্ছিত রেখে শান্তি পেয়েছিল মুর্শিদকুলি।

আর, সম্পর্কটা ব্যবসার হলেও বোধহয় ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের বেশ কয়েকটা ধাপ পার হয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। দুজনের উন্নতি এক সংগে। পরস্পর পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল। একজনকে ছেড়ে অন্যজন উঠতে পারেনি। রাজস্ব বাড়িয়েছে মুর্শিদকুলি। ফাঁকা রত্ন ভাণ্ডার ভর্ত্তি করে বাদশার খেলাত পেয়ে মান বেঁচেছে। নবাব হয়েছে নিজে।

রাজস্ব বাড়াতে ভর করতে হয়েছে মাণিকচাঁদের। দরদস্তুর ঠিক রাখতে, ঠিকমত টাকার যোগান বজায় রাখতে, জমিদারদের তাঁবে রাখতে দরকার মাণিকচাঁদের। মাণিকচাঁদ ভিন্ন নবাব মুর্শিদকুলি যেন কৃষ্ণবিহীন অর্জ্জুন।

সাত

ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে নোতুন গদী পত্তন করে, একটা বড় আশা ছিল মানিকচাঁদের। এবার ইংরেজদের সঙ্গে কারবার করা যাবে ভাল করে। কাশিমবাজারের কুঠির নাম-ডাক। হাঙ্গামা হুজ্জুত হয়ে গেছে নবাবের সংগে এই কুঠি নিয়ে। তবু ওরা বড় কারবারী। ফরাসীরা মানুষ ভাল। কিন্তু গরীব। কারবারের চেয়ে বাড়ী আর গীর্জার দিকে আকর্ষণটা বেশী। ফরাসীদের চেয়ে ওলন্দাজরা অনেক বড় কারবারী। ইংরেজদের প্রায় সমান সমান। ইংরেজদের সংগে ব্যবসা করার বড় ইচ্ছে তাই মানিকচাঁদের।

ইংরেজদেরও কম নয়, কুটবুদ্ধিতে তাদের জোড়া মেলে না। ইংরেজ কোম্পানী হাড়ে হাড়ে জানে মুর্শিদকুলিকে। মুর্শিদাবাদে পা দিয়েই মুর্শিদকুলি তলব করলো কোম্পানীর কাছ থেকে শা'সুজার ফরমান।

বাজারে রাষ্ট্র ছিল শা'সুজা নাকি বছরে তিন হাজার টাকা শুল্ক ধার্য করেছে কোম্পানীর। এই টাকাটা মিটিয়ে দিতে পারলেই নবাবের আর দাবী থাকবে না। জুলুম করবে না সোয়ার দারোগা বা শুল্ক অফিসার। নবাব নিজের চোখে দেখতে চাইলো সেই ফর্মান।

কিন্তু দেখাবার উপায় নেই। হারিয়ে গেছে। যাই হোক তিন হাজার টাকা গুণে দেবার পর ব্যাপারটা কোন মতে ধামা চাপা দেওয়া গেল। চাপা দিতে সাহায্য করেছিল মানিকচাঁদ। মানিকচাঁদ মুর্শিদকুলির ডান হাত। মানিকচাঁদের সংগে সম্পর্ক হলে জানা যাবে নবাবের মতি গতি। হয়ত কিছু সুবিধেও করে দিতে পারে মানিকচাঁদ। মানিকচাঁদও ত তাদের মতই ব্যবসায়ী। তাই আগ্রহ ইংরেজদেরও কম ছিল না।

ইংরেজদের ওপর প্রসন্ন নয় মুর্শিদকুলি। কিন্তু তা বলে বাণিজ্য বন্ধ করতেও চায় না। মোগল আরবী ব্যবসাদাররা কারবার করে যায়। তারা শতকরা আড়াই টাকা শুল্ক জমা দিতে কখনও কসুর করেনা। কখনও বিব্রত হয়নি নবাব। খুসীমত কারবার করে যায় তারা।

কিন্তু মুর্শিদকুলির ধারণা ইংরেজরা নবাবের পাওনা কড়ি ফাঁকি দিতে চায়। তা ছাড়া কেউ কি বছরে তিন হাজার টাকার বিনিময়ে অবাধ বাণিজ্য করার জন্য জিদ ধরতে পারে? শা-সুজা হুকুম দিয়ে থাকতে

পারে। কিন্তু শা-সুজা সুবেদার মাত্র। সুবেদার কে? বাদশার প্রতিভূ। তা ছাড়া আর কিছু নয়। এমন ফর্মান দেবার অধিকার একমাত্র বাদশার। শা-সুজা এক্তিয়ারের বাইরে কাজ করেছে। সম্পূর্ণ বে-আইনী কাজ। আর, শা-সুজা ছিল সুবার শাসন কর্তা। সে নিজেও সুবার শাসন কর্তা। এখন তাদের এক পদ। সুতরাং শা-সুজার ১৬৫১ সালের হুকুম কি মানতে হবে ১৭০৪ সালেও? যুক্তিতে ইংরেজদের দাবী টেকে না। মুর্শিদকুলি অনেকক্ষেত্রে যুক্তিবাদী। তাই তার বদ্ধমূল ধারণা ইংরেজরা বাদশার পাওনা কড়ি ফাঁকি দিতে চায়। দেওয়ান সন্দেহ করে ইংরেজকে।

একদিন হুগলীর ফৌজদারকে ডেকে হুকুম করল মুর্শিদকুলি, এ দেশের বণিকদের জানিয়ে দাও তারা যেন ইংরেজদের সংগে কোন কাজ কারবার না করে।

হুকুম মাত্র কাজ। সভা ডাকা হল। ফৌজদার জানিয়ে দিল দেওয়ানের আদেশ। কে যাবে হুকুমের বিরুদ্ধে? কার ঘাড়ে কটা মাথা। যে দেওয়ান চোর ডাকাত ধরে কেটে দু'ফালা করে ঝুলিয়ে রাখে গাছে, বিচারের জন্য নিজের ছেলের প্রাণ নিতেও দ্বিধা করে না, তার আদেশে বাঘে ছাগলে এক ঘাটে জল খাবেই। এক বাসায় বাস করবে শ্যেন ও চকোর। সপ্তাহে দুদিন করে নবাব বসে চেহল সুতনের দরবারে। লোকের নালিশ শোনে, বিচার করে। আদেশ অমান্য করলে কেউ কি বলবে না তখন? চুপ করে থাকে এ দেশের বিক্রেতা। মাল জমে ওঠে। কাশিমবাজারের কুঠি অচল।

টনক নড়ে কুঠিয়ালের। মাল নেই গুদামে। বাজারে কেউ এক কড়ি বিক্রি করবে না। কুঠি ওঠার উপক্রম। বিরাট লাভের ব্যবসা তাদের। এ দেশের তেতাল্লিশ হাজার পাউণ্ড দামের মাল ফরাসী দেশে বিক্রি করে পায় দেড় লাখ পাউণ্ড। এমন সোনা ফলানো কারবারের ক্ষতি কি সহ্য করা যায়?

ইংরেজরা দরবার করল ঢাকায় ফারুকশেরের কাছে। ফারুকশের ডেকে পাঠালে ফৌজদারকে। ইংরেজদের বুকে ভরসা এল। যাক, বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে বোধ হয়। ফারুকশের রক্ষে করতে পারবে মুর্শিদকুলির পীড়ন থেকে।

যথা সময়ে এল ফৌজদার। জিজ্ঞেস করলেন ফারুকশের, তুমি হুকুম করেছো যাতে ইংরেজদের কাছে কেউ মাল না বেচে?

মাথা নীচু করে ফৌজদার উত্তর করে, 'হুজুর'।

'তুমি সভা করেছিলে?'

'হুজুর।'

'কার হুকুমে?'

মাথা একটু তুলে ফৌজদার বল্লে, 'মুর্শিদকুলি খাঁর।'

চুপ করে গেল ফাররুকশের। আর একটা কথাও বলেনি। মাথা নীচু করে বেরিয়ে এল ইংরেজ।

মুর্শিদকুলি মাইনে বাড়িয়ে দিল ফৌজদারের—বছরে চব্বিশ হাজার টাকা থেকে বছরে বত্রিশ হাজার টাকা।

ইংরেজরা তাই হাড়ে হাড়ে চেনে মুর্শিদকুলিকে। তা বলে কি কুঠি বন্ধ করা যায়? বিশেষ করে কাশিমবাজারের কুঠি। কাশিমবাজার আর মালদার রেশমের কাপড় বিলেতে চালু হয়ে গেছে। বড় লোকদের ফ্যাসন আর মধ্যবিত্তদের পছন্দকে জয় করেছে রেশম। তাই কুঠি বন্ধ করা যাবে না। দরবার করা যাক। মাঝামাঝি কোন রফা করার ব্যবস্থা করাই ভাল। দেওয়ান চেয়েছে ত্রিশ হাজার টাকা। টাকা দিলে অবাধ বাণিজ্য চলবে। আর কোন কর দিতে হবে না তাদের।

কুঠি থেকে এল ইংরেজদের উকিল রাজারাম।

উকিল থাকতো দরবারে। তারা দোভাষী এবং এজেণ্ট। কাজ কারবারের অসুবিধে হলে, নবাবের সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি হলে, উকিল যেত কোম্পানীর পক্ষ হয়ে কথা বলতে। নায়েব মুহুরীদের কাছে ধর্না দিয়ে কাজ আদায় করতো। দরবারের হাল চাল, নবাবের মতি গতি তাদের নখ-দর্পণে। উকিলের উদ্ভব হয়েছে অনেক আগে,—পাঠান যুগে। তখন তাদের বলত আম-মোক্তার। তারপর থেকে দরবারী প্রথা উকিল রাখা। রাজারাম কোম্পানীর উকিল।

রাজারাম নানাভাবে মুর্শিদকুলিকে বোঝাতে চাইলো যে ত্রিশ হাজার টাকার দাবী একান্ত অসঙ্গত। এত টাকা কর দিয়ে ব্যবসা করা চলে না। তাহলে এক কড়িও লাভ থাকবে না। এ দেশ ছেড়ে পালাতে হবে ইংরেজকে। চুপ করে শুনে যায় মুর্শিদকুলি।

রাজারাম ভাবলো জয় হয়েছে তার। খুব খুশী। নিজের বাগ্মিতায় নিজেই মুগ্ধ। মস্ত বড় কুর্নিশ ঠুকে দরবার থেকে নামতে যাবে রাজারাম, এমন সময় মুর্শিদকুলি দৃঢ় কণ্ঠে বল্লে: 'বলে দিয়ো কুঠিতে, ত্রিশ হাজার দিতে হবে।'

কথা শুনে চক্ষু স্থির। দাবীর বহর ক্রমাগত বাড়ছে। দাবী মেটানোর সীমা ও সাধ্য আছে। পাটনায় সোরার জাহাজ আটকে ফাররুকশের আদায় করেছে চোদ্দ হাজার। ১৭০৪ সালে হুগলীর ফৌজদারকে ভেট পাঠিয়েও মন পাওয়া যায়নি। ভেটের সঙ্গে দিতে হয়েছে এগারো শ'। চারপাশে দাবী। পাইক পেয়াদা থেকে সুবাদার দেওয়ান। লাঠিয়াল থেকে জমিদার। কোন দেবতাকে তুষ্ট করবে কোম্পানী? কাউন্সিল ঠিক করলো, ফর্মান আদায় করতে হবে। ফর্মান হাতে থাকলে পরোয়া নেই। ইতিমধ্যে কাজ চালাবার জন্য টাকা চাই। চাহিদা মত টাকা সব সময় পাওয়া যায় না। বিলেত থেকে যে সব মাল পত্র আনে কোম্পানী এ দেশের বাজারের জন্য, তার প্রায় সত্তোর ভাগই রূপো। সেই রূপোর অধিকাংশ, মাঝে মাঝে সবটাই ওঠে মানিকচাঁদের গদ্দিতে। তাই রূপো বিক্রি করে টাকার অসুবিধে ভোগ করার চেয়ে ট্যাঁকশাল থেকে টাকা তৈয়ারী করতে পারলে ভালো হয়। তাগ্ করে আছে কোম্পানী। এ অধিকারও আদায় করতে হবে।

কলকাতা থেকে নির্দেশ গেল কাশিম বাজারে: কুড়ি হাজারে রফা করো। ১৭০৫ সাল। উকিল এবার শিউচরণ। ভাল দোভাষী। তবু রফা হলো না। এক চুল নড়বে না দেওয়ান। ১৭০৬ সালে কলকাতা থেকে কাতর প্রার্থনা গেল কোম্পানীর।

দেওয়ানকে ত্রিশ হাজার টাকা দিলে কোম্পানীর পক্ষে সনদ দেওয়ার কথা চিন্তা করা যেতে পারে। এই টাকা না দিলে কোন রকম কথাবার্তা চালান অসম্ভব। ১৭০৬ সালের জুলাই মাসে এই কথা জানাল মানিকচাঁদ।

ইতিমধ্যে কুঠি বন্ধ। মেরামত হচ্ছে। দিন যায়। মেরামত প্রায় শেষ। কুঠি খুলতেই হয়। ১৭০৭ সালের জানুয়ারী মাসে বাজেন সাহেব গেল কুঠি খুলতে। কাউন্সিল রাজী হয়েছে দেওয়ানকে ত্রিশ হাজার টাকা দিতে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলে দিয়েছে কলকাতার কাউন্সিল,—সনদ হাতে না পেয়ে কোন মতে যেন টাকা হাত ছাড়া করো না।

টাকা দেওয়ার কথা পাকা। এমন সময় খবর এলো মারা গিয়েছেন বাদশা আলমগীর আরঙ্গজেব।

পিছিয়ে এল বাজেন সাহেব। এখুনি ত সিংহাসন নিয়ে কামড়া কামড়ি আরম্ভ হবে। কে জিতবে তার কোন ঠিক নেই। নতুন সম্রাট যে মুর্শিদকুলিখাঁকে দেওয়ান বলে স্বীকার করবে তার ত কোন স্থিরতা নেই।

যদি মুর্শিদকুলিখাঁর দেওয়ানী না থাকে, তবে তার সনদ যে শা-সুজার সনদের মত মূল্যহীন হবে না, এ কথাও বলা যায় না। বাজেন সাহেব পাঁচ-সাত ভেবে টাকাটা নিজের কাছেই রেখে দিল।

১৭০৮ সালে টাকাটা দিয়েও কার্যসিদ্ধি হয়নি। কোম্পানীর প্রার্থনা এবং দেওয়ানের সম্মতির ভেতর গরমিল। কোম্পানী চেয়েছিল বাদশাহী ফর্মান, যার ওপর কারো কথা চলবে না আর। কিন্তু কুলিখাঁ অতদূর যেতে নারাজ। তবু ত্রিশ হাজার টাকা পেয়ে ঝামেলা মিটলো সাময়িকভাবে।

কথাটা আবার উঠলো ১৭১১ সালে। দাবীর মাত্রা আরও বেশী এবার। নবাবের চাই পয়তাল্লিশ হাজার। দেওয়ান জানিয়ে দিয়েছে কাশিমবাজারের নাম করা কুঠিয়াল হেজেসকে।

ব্যাপারটা পরিষ্কার করে হেজেস চিঠি পাঠাল কলকাতায়। নবাবকে দিতে হবে পয়তাল্লিশ হাজার শুধু মাত্র সনদের জন্য। কোম্পানী যদি বাদশাহী ফর্মান চায় তবে আরো পনেরো হাজার লাগবে। আর সমস্ত ব্যাপারটা ঠিক করে নিতে, দরবার থেকে সনদ আদায় করতে কর্মচারী দের হাতে রাখতে হবে। হাতে রাখার জন্যে আরও কয়েক হাজার টাকা হাতে থাকা দরকার।

কাউন্সিলে হেজেসের খুব নাম। বাজে কথা বলার লোক নয় মোটেই। সুতরাং তার চিঠির ওপর আলোচনা চলতে থাকে। শেষে কাউন্সিল ঠিক করলো সোজা আঙুলে ঘি যখন উঠবেই না তখন আঙুলটা একটু বাঁকানো হোক। আবেদন নিবেদন খোসামোদ তোষামোদ যেমন চলছে তেমনি চলুক, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চোখও রাঙানো দরকার।

৩০শে জুলাই কাউন্সিলের নির্দেশ পেল হেজেস। সোজা ভাষা। কাউন্সিল লিখেছে, নবাবকে সহজভাবে জানিয়ে দাও যে কোম্পানী বাংলায় বাণিজ্যের জন্য ত্রিশ হাজার টাকার ওপর এক কাণা কড়িও দিতে অপারগ।[৮] এই ত্রিশ হাজার টাকার বদলে চাই নবাবের সনদ এবং বাদশার ফর্মান। নবাব যদি রাজী হয় ভালই। গররাজী হলে কাশিম বাজারের কুঠিতে কুলুপ পড়বে। মুর্শিদাবাদের সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে যাবে। শুধু তাই নয়, দেখা যাবে কি করে ফোর্ট উইলিয়মের পাশ দিয়ে একটাও মোগল জাহাজ যায়। এবং সমস্ত ব্যাপারটা দিল্লীতে সম্রাটের কানে না তুলে কোন উপায় থাকবে না।

৬ই আগষ্ট আবার সেই চিঠি—ত্রিশ হাজারে হয় যদি, ভালই।

তা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। সৌভাগ্যের দিন শেষ হয়েছে বলে জানতে হবে।

কাউন্সিল বুঝতে পারেনি যে সৌভাগ্যের দিন শেষ হয়নি। আরম্ভ হয়েছে মাত্র।

এই চিঠির পর সাত দিন যেতে না যেতেই আবির্ভাব হলো মাণিকচাঁদের। এবার একা মাণিকচাঁদ নয়, সঙ্গে ফতেচাঁদ।

ফতেচাঁদ মাণিকচাঁদের ভাগনে। মাণিকচাঁদের কোন ছেলেমেয়ে হয়নি। অপুত্রক মাণিকচাঁদ দত্তক নিয়েছে ধনবাই এর ছেলে ফতেচাঁদকে। ফতেচাঁদ এতদিন ছিল পাটনার গদিতে। পাটনার গদির কাজ অপেক্ষাকৃত সহজ। কিন্তু মুর্শিদাবাদের কাজ বড় জটিল। মরার আগে হাতে কলমে শিখিয়ে দিতে চায় মাণিকচাঁদ। যোগ্য উত্তরাধিকারি না হলে ভারত জোড়া তেজারতী কারবার ধ্বংস হবে একেবারে। মাণিকচাঁদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে তাই ফতেচাঁদ।

কলকাতার কাউন্সিলের মত হেজেসও বুঝেছিল, সৌভাগ্যের দিন বোধহয় শেষ হতে চলেছে। নবাব ইংরেজদের ওপর বিরূপ। বাজারে সবাই জানে। কেউ কোন মাল বিক্রি করতে চায় না কোম্পানীকে। ভয় সর্বদাই। দোর্দণ্ড প্রতাপ নবাবের। ইংরেজদের কাছে কয়েক টাকার মাল গস্ত করে কি ধনে প্রাণে মারা যাবে? গ্রাম গ্রামান্তে বৃথাই ঘোরে কাশিমবাজার কুঠির কর্মচারী ও দালালরা। দাদন দিয়ে মাল পায় না। ভয় হয় দাদন উসুল হবে না আর। সব টাকাই মার যাবে। মার্চ মাসে ছাড়বে বিলেতের জাহাজ। অথচ মাল নেই। খালি জাহাজ যদি ফিরে যায় বিলেতে, তবে ইয়োরোপের বাজারও যাবে। হেজেসের আহার নিদ্রা নেই। দিন রাত দুশ্চিন্তা। একদিকে কোম্পানী ডুবলো, অন্যদিকে ডুবলো তার ভবিষ্যত। হেজেস ভাবছে সৌভাগ্যের দিন শেষ।

স্বর্গ থেকে দেবদূত নেমে এলেও এমনভাবে চমকাত না হেজেস—সেদিন কাউন্সিলের চিঠি পড়ে যেমন চমকে উঠলো।

কাউন্সিল জানাচ্ছেঃ কাশিমবাজারে মালপত্র কেনা নিয়ে বিব্রত হয়ো না। একটা উপায় হয়ে গেছে। এই বিপদ থেকে যখন কোন প্রকার উদ্ধারের পথ ছিল না, তখন ফতেচাঁদ আমাদের সাহায্য করতে রাজী হয়েছে। ফতেচাঁদকে চেনো নিশ্চয়। অমন প্রসিদ্ধ ও সজ্জন কারবারীকে তোমার জেনে রাখার কথা। যাই হোক, ফতেচাঁদের সঙ্গে আমাদের একটা চুক্তি

হবার কথা প্রায় পাকা হয়ে এসেছে। বলতে পার, সে এখন আমাদের পক্ষে। কাশিমবাজার থেকে এ বছর যত টাকার মাল কিনবার কথা আছে, ফতেচাঁদ আমাদের পক্ষ থেকে নিজে টাকা দিয়ে সব মাল কিনে নেবে। আড়তে যত দাদন দেওয়া আছে, মালে কিম্বা আসলে, সে আমাদের হয়ে আদায় করে দেবে। এমন কি কলকাতার গুদামে সব মাল সে নিজেই তুলে দেবে। এই সব কাজের জন্য তাকে শতকরা সোয়া ছ' টাকা দিতে হবে। যে বিপাকে আমরা পড়েছি তা থেকে বাইরে আসবার এই একমাত্র একটি পথ, এবং এ পথটাই সর্বশ্রেষ্ঠ। এ পথ না নিলে বিলেতে খালি জাহাজ ফিরে যাবে।

২১শে আগষ্ট হেজেস জানালো: এই চুক্তি হলে খুব ভাল হবে। এ ছাড়া আর কোন পথ নেই। এক কড়ির মাল কেনা আমার পক্ষে অসম্ভব। নবাব নাছোড়বান্দা। সব রকম ভাবে আমাদের বাঁধা দেবার জন্য বদ্ধ পরিকর। এ অবস্থায় কেউ আমাদের কাছে মাল বিক্রি করবে না।

২৩শে আগষ্ট কাশিমবাজার থেকে কোম্পানীর হয়ে জিনিষপত্র কেনার জন্য চুক্তি সই করলো ফতেচাঁদ।

অক্টোবর মাসে নৌকোয় মালপত্র বোঝাই করে কাশিমবাজারের কুঠিতে তালা দিয়ে কলকাতায় যাবার জন্য হেজেস তৈরী। খবর গিয়েছে নবাবের কাছে। ইংরেজরা কুঠি ত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। বাড় বাড়ন্ত কুঠি কাশিমবাজারের। ১৬৬৮ সালের কুঠি। হেজেস নিজের হাতে তালা দিচ্ছে এত দিনের পুরানো কুঠিতে। হেজেসের মন খুব বিষন্ন।

দূত এলো নবাবের কাছ থেকে। জলদি সেলাম দিয়েছে নবাব। হেজেস এখন যে কোন পরিণামের জন্য তৈরী।

মুর্শিদাবাদে যেতেই জানতে পারলো হেজেস, নবাব নরম হয়েছে। কিছু হলেও হতে পারে। আশা করার এখনো কিছু আছে।

প্রস্তাব এলো নবাবের পক্ষ থেকে। বাংলা বিহার উড়িষ্যায় অবাধ বাণিজ্য করার নবাবী সনদের জন্য কোম্পানীকে দিতে হবে নগদ ত্রিশ হাজার। তা ছাড়া কোম্পানী যদি বাদশাহী ফর্মান চায় তবে দিতে হবে অতিরিক্ত সাড়ে বাইশ হাজার। বাদশাহী ফর্মান না পাওয়া পর্যন্ত কোম্পানীকে সে বাবদ কিছু দিতে হবে না। আপাতত, একটা হ্যাণ্ডনোট লিখে দিলেই চলবে।

হেজেস তখন কোন কথা দেয়নি। শুধু বলেছে: কলকাতায় জানাবো।

নবাবের প্রস্তাব নিয়ে বহু আলোচনার পর কাউন্সিল ঠিক করলো, রাজী হতে হবে নবাবের প্রস্তাবে। নবাব যখন নিজে এতদূর আগ্রহ প্রকাশ করছে, উপযাজক হয়ে মীমাংসার জন্য প্রস্তাব দিয়েছে, তখন এ সুযোগ অবহেলা করা উচিত নয়। বিশেষতঃ যখন দিল্লীতে নবাবের প্রভাব অসামান্য।

হেজেস জানালো : 'তথাস্তু।'

আট

কোম্পানীর টাকার অসুবিধে ভয়ানক। টাকার দুর্ভোগ ভুগে, নবাবের চোখ রাঙানি সহ্য করে, ফৌজদার, জমিদার, কোতোয়ালদের পূজো দিয়ে ব্যবসা চালান কঠিন হয়ে পড়ছিল ক্রমাগত।

মোগল যুগে বাণিজ্যের দাপট খুবই। বাংলায় ত আর কথাই নেই। তারি কল্যাণে বাংলার পদবী জুটেছিল 'জিন্নৎ উল বেলাৎ'—মর্ত্তের স্বর্গ।

বিদেশীরা এসে ব্যবসার প্রতাপ আরও বাড়িয়ে দিল। পর্ত্তুগীজদের আসার সঙ্গে পরিবর্তিত হল বাণিজ্যের প্রকৃতি। এশিয়ার বাজার খোলা। মালের কদর বেড়ে গেছে। পর্ত্তুগীজরা এল আর কপাল পুড়লো আরব আর স্বদেশী বণিকদের। জাহাজে করে মাল পত্তর চালান দেওয়ার কাজে বাঙালীরা কোনদিনই খুব পোক্ত নয়। তবু তারা বাইরে যেত। বহু যুগ থেকে তাদের যাতায়াত। সে যাতায়াত পাঠান আমলেও বন্ধ হয়নি। কিন্তু পর্ত্তুগীজ আর ওলন্দাজদের আবির্ভাবের পর থেকে দিন ক্ষণ তিথি নক্ষত্র দেখে যাতায়াত ক্রমাগত কমে আসতে থাকলো। তা ছাড়া সাগরের নোনা জলের ঝড় ঝাপটা খেয়ে, রোগে ভুগে, জীবনকে হাতের মুঠোয় করে সোনা কুড়োনোর চেয়ে আর একটা সম্ভাবনা খুলে গেছে তাদের কাছে। দেশের ভেতর বাজার তৈরী হতে আরম্ভ করেছে। তারা সে দিকে মন দিতে আরম্ভ করলো।

বাংলার জিনিষের বিরাট চাহিদা। গঙ্গা দিয়ে যেত কাপড় চোপড়। এক আধ রকমের কাপড় নয়। হাজার কিসিমের কাপড়। মসলিনের নাম ত দুনিয়া জোড়া। এক রকমের মসলিনের নাম ঝুনা। মাকড়সার জালের চেয়েও পাতলা এই কাপড়। বিদেশী লেখকেরা বলেন, এমন কোমল কাপড় যারা তৈরী করতে পারে, তাদের হাত নাকি পরীর

হাতের চেয়েও নরম। কুড়ি গজ লম্বা আর এক গজ চওড়া এই কাপড়ের ওজন মাত্র সাড়ে আট আউন্স। হারেমে বেগমদের আর রাজবাড়ীর নর্ত্তকীর গায়ে উঠত এই কাপড়। বৌদ্ধ যাজিকাদের পক্ষে ত এই কাপড় পরা একেবারে নিষিদ্ধ।

সব চেয়ে ভাল মলমলের নাম খাসা। সোনার গাঁ ছিল এই খাসার জন্যে প্রসিদ্ধ। সব চেয়ে ভাল খাসার নাম জঙ্গল খাসা। কুড়িগজ লম্বা আর এক গজ চওড়া খাসার ওজন হত সাড়ে দশ আউন্স।

সব-নমের নাম দিয়েছিল ইংরেজী কবি—a web of woven wind. পারশী কবি বলেছেন, 'সন্ধ্যা শিশির।' ঘাসের ওপর এই সব-নম পেতে রাখলে লোকে ভাবতো শিশির ভেজা দূর্বা বুঝি। একবার নাকি নবাব আলিবর্দী সত্যি সত্যি গরুকে বিপদে ফেলেছিল এই করে। গরুটা ঘাস ভেবে আস্ত একখানা কাপড়ই খেয়ে ফেলেছিল।

আব রোয়ান্ কাপড় পরে বাপের কাছে বকুনি খেয়েছিল আরঙ্গজেবের বেটি। আব-রোয়ান কথার মানে হল জল প্রবাহ। কাপড়খানা নাকি জলের সঙ্গে এমন ভাবে মিশে যেত যে লোকে ভাবত হারিয়ে গেছে। খুঁজতে হত। একদিন এই কাপড় পরে আরঙ্গজেবের মেয়ে বাপের সামনে গিয়েছিল। রেগে সম্রাট তাকে বলেছিল, বে-আব্রু। উত্তর দিয়ে ছিল বাদশানন্দিনী, তবুত আমি সাতপুরু কাপড় পরেছি।

যেত জামদানী। জামদানিতে তাঁতে তোলা ফুল আর কারুকার্য্য। বাঁশের স্থঁচ দিয়ে হত এই কাজ। মোগল বাদশারা জামদানী পছন্দ করতেন খুব বেশী। আরঙ্গজেব এক এক খানা জামদানির দাম দিতো আড়াইশো' টাকা। ১৭৭৬ সালে নাজিম রেজাখাঁ সাড়ে চারশ' টাকা দিয়ে কিনে ছিল জামদানী কাপড়। হরেক রকমের জামদানী ছিল: জলবার, তেরছা, পাশা। ছিল বুটিদার, ডুবলি-জাল, মেল, বালোয়ার। আরও অনেক।

মসলিনের কথা থাক। আর মসলিন ছিল। ছিল নয়ন-স্থখ, বদন-খাস, ঘরবন্দ, ঘরবতি। ছিল কুসাম, ডুরিয়া, চারখানা।

যাক সে কথা। পাটনায় যেত কাপড়, সোনা রূপার জিনিষ। আগ্রায় যেত মসলিন, মৃগনাভি আর আতর। সীসা, পারা, টিন, হাতীর দাঁত আর সিঁদুরের বড় বাজার গুজরাট। আজমীরেও বাংলার সিঁদুরের ভারী কদর। ত্রিপুরার বণিকরা আসত ঢাকার গঞ্জে। সওদা করত পলা, মৃগনাভি আর শাঁখ।

তা ছাড়া জলপথে বাণিজ্য হত বড় জোর সিংহল অবধি। তার ওপারে যেত পর্ত্তুগীজ ওলন্দাজ। ইংরেজরা এল পরে। তাদের কায়দা আলাদা। পর্ত্তুগীজরা যেত পেগু অবধি। নিয়ে আসত সোনা রূপো। মালদ্বীপ থেকে আনত কড়ি। সিংহল পাঠাত মনিমুক্তো আর হাতী।

লেন দেন ব্যবসা বাণিজ্যের ফলে প্রথমে একটু ক্ষতিগ্রস্থ হয়েও কিন্তু বাংলার এক শ্রেণীর লোক ধাক্কা সামলে নিল। বাইরের বাণিজ্য যেতে ঘরের বাণিজ্য খুলে গেল। বাজার তৈরী হতে থাকলো।

উৎপাদনকারী আর ভোগী এই দুটো শ্রেণীর মাঝামাঝি আর এক শ্রেণীর মানুষ তৈরী হতে আরম্ভ করেছে। তারা মধ্যবিত্ত শ্রেণী। সামন্ততন্ত্রের বিনাশের সূচনা হতে দেরী নেই। মোরল্যাণ্ড সাহেব ভারতবর্ষের অন্য জায়গায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অভাবের কথা স্বীকার করেও বাংলাদেশের বেলায় সংশয় পোষণ করেছেন। যাই হোক, লেন দেনের ফলে জিনিষ পত্রের দাম চড়তে থাকলো। বাজার তৈরী হবার লক্ষণ এটা। বাজার তৈরী যত হতে থাকবে, জমিদার জায়গীরদারদের ভিত ক্ষয়ে যেতে থাকবে ততই। মানুষের জীবন ধারণ প্রণালীর ও জীবন বোধের পরিবর্তন আসতে থাকবেই। কেন না এ যাবত কাল জিনিষ তৈরী হত ভোগের জন্য। নিজেদের ভোগ। কিন্তু তা বাজারের জন্য, বিক্রির জন্য নয়। বিক্রি বড় জোর গ্রামের মধ্যে। অর্থনীতিতে বাজার বলতে যা বোঝায়, তার জন্যে নয়। যে মুহূর্তে বাজারের জন্য তৈরী হতে থাকবে, সে মুহূর্তে তৈরী করার পদ্ধতিরও পরিবর্তন হবে। তারি ফলে আসবে অর্থনীতিতে বিরাট ভাঙা-গড়া। পণ্য, মুদ্রা, পুঁজি তিন চক্রের অমোঘ আবর্তনে নতুন সভ্যতার বিকাশ। আকবর বাদশার আমল থেকে এর সূত্রপাত। সতেরো শতকের প্রবাদ ছিল যে বাংলায় সোনা আসার পথ হাজারটা, কিন্তু বাইরে যাবার সব পথ বন্ধ।

সোনা না এসে আর উপায় বা কোথায়। দেওয়া নেওয়া নিয়েই ব্যবসা। বিনিময় করতে হবে। কিন্তু কি বিনিময় করতে পারতো সতেরো শতকের গোড়ার দিকের ইয়োরোপ? বাংলাদেশের মত উচ্চাঙ্গের জিনিষ ছিল না তাদের। শিল্প চাতুর্যের অমন চিহ্ন ইয়োরোপে তখন দুর্লভ। তা ছাড়া বাংলার মানুষের কেনার প্রতি অনিচ্ছা ছিল বোধ হয় তখন। জীবন ধারণের মান নিম্নগ থাকার জন্যে সঞ্চয় বৃত্তির প্রচণ্ডতা রোধ করতে পারেনি বিত্তবান। দেশীয় শাসকদের প্রতি ভয় এবং অরাজকতার দিনের সংশয় পোষকতা করেছে সঞ্চয়-প্রবৃত্তিকে। ইয়োরোপীয় পণ্যের দাম বাদশার দরবারে, মনসবদার

আর জায়গীরদারদের বৈঠকখানায়। সে জিনিষ বিলাসের জিনিষ। তার কোন গভীর তাৎপর্য নেই। তাই যা আনা যায়, তা রূপো।

ইংরেজরা রূপো আনত। তা ভিন্ন ব্যবসা করতে পারবে না। এ কথা কোম্পানীর জানা। তাই কোম্পানী আইন করিয়ে নিয়েছিল যে তারা বছরে তিরিশ হাজার পাউণ্ডের সোনা রূপো চালান দিতে পারবে। সে যুগে এর চেয়ে গ্লানিকর অবস্থা আর কিছু হতে পারত না। বৈশ্যতন্ত্র বা মার্কেন্টাইল ক্যাপিটালিজেমের চোখে দেশের সমৃদ্ধির এক মাত্র মাপ কাঠি হল মজুত সোনা। ব্যবসার একমাত্র লক্ষ্য সোনা কুড়ানো। সেই সোনা দেশ থেকে বিদায় করতে বুক ভেঙে যেত।

বুক ভাঙুক। কিন্তু ভারতের মাল ছাড়া যায় না। অথচ বছরে তিরিশ হাজার পাউণ্ডই বা কি। তাই অন্য ধান্দায় ঘুরত বণিক। দক্ষিণ আমেরিকা আর প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপপুঞ্জে ক্রীতদাস বিক্রি করে সোনা রূপো সঞ্চয় করতে হত তাদের। বহু কষ্ট করে অর্জন করা এই সোনা।

তাই ব্যবসা করতে এসে সেই সোনা রূপো নিয়েও এত কষ্ট ভোগ করতে রাজী নয় কোম্পানী। টাকার ব্যবস্থা করতেই হবে।

অথচ প্রচুর পর্য্যাপ্ত টাকা কোথায়? তা ছাড়া ব্যবসা চলবে কি করে? টাকা এ দেশে নেই। যত দরকার তত টাকা নেই। অথচ টাকার চলন আজকের ব্যাপার নয়। চলছে অনেক আগে থেকেই। হিন্দু যুগে ছিল। ছিল পাঠান যুগে। পাঠানদের তঙ্কা আমাদের টাকা। রূপেয়া কথাটা সৃষ্টি হয়েছে পরে। তামার টাকাও চলত। কিন্তু তাতে থাকতো না বাদশাহী ছাপ। সে টাকা অনেকটা গোরক্ষপুরী ঢেপুয়ার মত। আর চলত জিতাল। কিন্তু চলন বড় কম। কারণ, দরকার হত না। টাকার দরকার ব্যবসার জন্যে। অর্থাৎ জিনিষ যখন অর্থনীতির ভাষায় পণ্যের স্তরে উঠেছে, তখনই। বাজার যখন তৈরী হয়েছে, তখন তলব পড়বে টাকার।

বাজার তৈরী হল হালে। তার আগে কেনার সুযোগ এবং সামর্থ্য দুয়েরই অভাব। সাধারণের ভোগ বিলাসের জন্য জিনিষ নেই। জিনিষের দরকার অনুভবই করেনি এ-দেশের মানুষ। তাই টাকাও নেই। তখন টাকা বলতে যা বোঝাত এখন আর তা বোঝায় না।

আকবর বাদশার সময় রূপোর টাকা বা রূপেয়া কেনা বেচার মানদণ্ড হয়ে ওঠে। তামার টাকার নাম দাম। চল্লিশ দামে হত এক টাকা। আর

ছিল দামাড়ী বা ছিদাম। ১/৮ দামের সমান এক দামাড়ী। ১/২৫ দামের সমান এক জিতাল। জিতাল আমাদের গণ্ডার মত। ব্যবহার হত না। হিসেবের কাজ চালাবার জন্য তার দরকার। দশ টাকায় আকবরের এক সোনার মোহর। অন্য মোহর যা ছিল, তা দিয়ে বাজারের কাজ চলত না। ছেলের মুখে ভাত, মোহর দাও। নতুন বৌকে বরণ করতে হবে, দাও মোহর। জমিদার বাড়ী নজরানা দিতে মোহর চাই-ই। কিন্তু মোহর নির্দ্ধারিত মুদ্রা। অন্য দেশের সঙ্গে বিনিময়ে মোহর কিম্বা রূপেয়া গ্রাহ্য। সোনা রূপোর দাম বাড়লে মোহর কিম্বা রূপেয়ার দাম বাড়ত। কমলে, কমে যেত দাম। মোগল আমলে মোহরের দাম উঠত দশ থেকে ষোলো টাকার মধ্যে।

কিন্তু এত গঞ্জের কথা। গঞ্জের বাইরে গ্রাম। পাড়াগাঁর আত্ম তৃপ্ত স্বাবলম্বী গ্রাম। পরিমিত পরিধিতে অপার সার্থকতা সেই গ্রামের মানুষের। সেখানে সব চেয়ে সচল হল কড়ি। কেনা কাটার যদি কখনও দরকার পড়ত, তা করতো কড়ি দিয়ে। সোনা রূপো বিলাসের জিনিস। লোক লৌকিকতার কাজে দরকার পড়ে কচিৎ কখনো। হামেশা দরকার হয় না। তাই কড়িতে খুব অসুবিধে হত না। চব্বিশ শ' কড়িতে এক টাকা। ঘুম পাড়ানীর ছড়াতে মা ছেলেকে বলে: দোলায় আছে ছ' পণ কড়ি গুণতে গুণতে যাও। ছ' পণ কড়ি গোনার দায়িত্ব পেয়ে ছেলে ঘুমাবে নির্ঘাৎ। মা বাঁচবে। পাড়াও জুড়োবে। কিন্তু কড়ি গুণতে গুণতে যদি ব্যবসাদার ঘুমিয়ে পড়ে, লক্ষ্মী পালিয়ে যাবে পা টিপে টিপে সেই অবসরে। কড়ি দিয়ে তাই ব্যবসা হয় না। বিশেষ করে যখন চব্বিশ শ' কড়িতে হয় এক টাকা।

তাই ব্যবসার জন্যে চাই টাকা। যে সে টাকা নয়, শিক্কা টাকা। শিক্কা টাকা খোদ বাদশার টাকা। প্রত্যেক বাদশা তার রাজত্ব কালে বাজারে ছাড়ত শিক্কা। ওই হচ্ছে আদৎ টাকা। যতদিন তার রাজত্ব ততদিন শিক্কা টাকার দামের কোন নড় চড় নেই।

কিন্তু যেই গত হতো এক সম্রাট, সিংহাসনে বসত নতুন সম্রাট, তখনই ভোল পালটে যেত। শুধু দরবার হারেমের নয়, শিক্কা টাকারও। তিনি ছাড়তেন তার নিজের শিক্কা। অচল হত পুরানো শিক্কা। অথচ বাদশাকে রাজস্ব পাঠাতে চাই নতুন শিক্কা। দেওয়ানের কাছে খাজনা দিতে পুরানো শিক্কা চলবে না। এদেশের মহাজনেরা জিনিষের দাম চাইবে নতুন শিক্কায়। প্রয়োজন মত নতুন শিক্কা পাওয়া

মুসকিল। শুধু মাত্র বিদেশী বণিকদের পক্ষে নয়, এ-দেশের জমিদারদের পক্ষেও। তাই পুরানো শিক্কাকে বাঁটা দিয়ে নতুন শিক্কায় ভাঙিয়ে নিতে হয়। বাঁটা দিয়ে ভাঙায় গদিয়ানরা। গদিয়ানদের সঙ্গে টঁ্যাকশালের সম্পর্ক খুব নিবিড়।

সুবা বাংলার টঁ্যাকশাল ছিল ঢাকা আর মুর্শিদাবাদে। কিন্তু মুর্শিদাবাদের টাকার খুব নাম ডাক। প্রতি টাকায় তার একশ' পঁচাত্তর রতি রূপো। তা ছাড়া আসত ভারতবর্ষের নানান টাকা। আইনত তারা সচল। কিন্তু বাংলা দেশে ব্যবসার জন্যে চাই সুবা বাংলার টাকা। অবশ্য এই সব টাকা টঁ্যাকশালে জমা দিয়ে নতুন টাকায় পরিণত করা যেত। কিন্তু তার জন্য বাড়তি রূপো আর খরচ খরচা দিতে হত। কিন্তু খরচ খরচা দিয়ে শিক্কা টাকা তৈরী করা যায় কখন-সখন। প্রতি দিনকার ব্যাণিজ্যের জন্যে টঁ্যাকশালে ছোটা অসম্ভব।

কিছুদিন পরে আবার নতুন উপসর্গ। যে বাদশার নামের শিক্কা, অন্তত তার রাজত্ব অবধি সেই শিক্কার দামের কোন হেরফের হতো না। অন্য সুবায় এই-ই ছিল নিয়ম। কিন্তু বাংলায় তার ব্যতিক্রম। শিক্কার এক দর থাকতো তিন বছর অবধি। তিন বছর হাত ঘোরার পর দাম পড়ে যেত শিক্কার। তিন বছর আগের শিক্কা তিন বছর পরে হত সোনায়ৎ। এটা বাংলার নবাবের আইন। শিক্কার দাম বেশী, সোনায়তের দাম কম। একশ' ষোলোটা সোনায়তের বদলে পাওয়া যাবে একশ' এগারোটা শিক্কা।

শুধু শিক্কা সোনায়ৎ নয়। তা ছাড়া আরো বহু রকম টাকা চলত বাজারে। ব্যবসার জাত নেই। ভূগোলের সীমানাকে সমীহ করে ব্যবসা করা যায় না। ভূগোলের বেড়া ভাঙা ব্যবসার স্বভাব। নতুন নতুন বাজার দখল করা তার প্রবৃত্তি। দেশে দেশে টাকার প্রকার ভেদ। বহু দেশ বিদেশের সঙ্গে কারবার। লেন দেনের হিসেবের পর দেখা যেত বাংলারই পাওনা। পাওনা মেটান হত সোনায়। সোনাই বেশী। তা ছাড়া আসত সে দেশের টাকা। সবার ওপরে ভারতের বাজারে নানান ধরণের টাকা। তাই আর্কট, বেনারস, কোচবিহার, লক্ষ্ণৌ, মান্দ্রাজ, সুরাটের টঁ্যাকশালের টাকায় বাংলার বাজার ছাওয়া। আর্কটের নবাবের টঁ্যাকশালের টাকার নাম আর্কট মুদ্রা। ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজরা মান্দ্রাজ পণ্ডিচারী ও নাগাপত্তমে নিজেদের টাকা তৈরী করত।

মোগল রাজত্বে প্রত্যেক সুবাদারের নিজস্ব টঁ্যাকশাল। আরঙ্গজেব

যত দিন বেঁচে ছিলেন, এক সুবার টাকা অন্য সুবায় একই দামে চলত। কিন্তু আরঙ্গজেব মারা যাবার পর, সুবাদাররা ক্রমশই স্বাধীন হতে থাকে। আরঙ্গজেবের পর আবার সম্রাটরা খুব অল্প দিনের আয়ু নিয়ে বসতেন সিংহাসনে। ফলে শিক্কা টাকায়ও বিভ্রাট।

দেশে তাই দারুণ অব্যবস্থা। এই অব্যবস্থায় ভাল ব্যবস্থা করে নিত বাঁটাদার। দেশ জোড়া ঘাঁটি তাদের, গ্রামে গ্রামে গঞ্জে গঞ্জে গদি। এক গদির সঙ্গে অন্য গদির ভাব-ভালবাসা। হয় জাত ধর্মের, না হয় রক্তের সম্পর্কের যোগাযোগ। কড়ি থেকে টাকা করতে, এক টাকার বদলে অন্য টাকা নিতে, সোনা রূপোর বদলে টাকা নিতে, যেতে হত সর্ফদের কাছে। তাদের কাছে টাকা মজুত। কাজটা করে দিত। মজুরী তাদের বাঁটা। জমিদার তালুকদারকে খাজনা মেটাতে হবে নতুন শিক্কায়। নতুন শিক্কায় ত প্রজারা খাজনা দেবে না। জমিদার তালুকদারকেও আসতে হত বাঁটাদারের কাছে। বাঁটাদার কাজটা করে দিত মজুরী কেটে রেখে। মজুরী কাটা তাদের হাত। হিসেবের ব্যাপার বড় জটিল। গ্রামের মানুষের মাথায় ঢোকে না। তার ওপর সোনা রূপোর দামও চিরকাল এক থাকে না। বাজার দরের খবর রাখে বাজারে ঘোরে যারা। তাই সর্ফদের কথায় সায় দেওয়া ছাড়া উপায় কি। সায় দিত, কিন্তু খেদও করত। বলত:

পোদ্দার হইল যম
টাকা আড়াই আনা কম
পাই লভ্য লয় দিন প্রতি।

সাধারণ বাঁটাদার গদিয়ানরা যখন বেশ দু'চার পয়সা করেছে, মানিকচাঁদ করেছে তার হাজার গুণ। সাধারণ গদিয়ানদের টিকি বাঁধা মানিকচাঁদের কাছে। হাত পাততেই হয়। কেউ কেউ আবার মানিকচাঁদের দালাল। মানিকচাঁদেরই কারবার তারা দেখা শুনো করে। মানিকচাঁদ নবাবের পোদ্দার, তবিলদার। রাজস্ব জমা পড়ে ওখানে। জমিদারের ভিড় লেগেই আছে। এদিকে দেশী বিদেশী কারবারী। তারাও মানিকচাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে। সুদের হার যদি মানিকচাঁদের গদিতে বেশীও হয়, বাঁটার হার যদি হয় চড়া, সোনা রূপোর বদলে টাকা নিতে গিয়ে যদি বা দিতে হয় বেশী মজুরী, ব্যবসাদাররা দরাদরি করতে সমীহ করে। মনিকচাঁদকে হাতে রাখতে সবাই ব্যগ্র। নবাব মুর্শিদকুলি মানিকচাঁদের কথায় ওঠে বসে। নবাবের দরবারে ডাক পড়লে মানিকচাঁদ তখন

সহায় হতে পারে। নদী যেমন হাজার মুখে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাগরে, টাকা আসত মানিকচাঁদের সিন্দুকে হাজার পথ দিয়ে—বলেছিল এক ইংরেজ।

তাই অব্যবস্থায় পাকা ব্যবস্থা মানিকচাঁদের। বাজারের এই বিভ্রাট বিভ্রমের জন্যেই মানিকচাঁদের আয় বেড়ে গেছে প্রচুর। কিন্তু ইংরেজদের মহা অসুবিধা। তাদের ফলাও কারবার। সব সময় টাকার দরকার। দরকার অনুযায়ী পাওয়া মুসকিল। আবার, কোম্পানীর আর্কট টাকার সঙ্গে মুর্শিদাবাদের টাকার দামের ফারাক অনেক খানি। একশ' বারোটা আর্কট টাকায় পাওয়া যায় মাত্র, একশ'টা মুর্শিদাবাদের টাকা। বদলা বদলি করতে হলে লোকসান প্রচুর। তাই মুর্শিদাবাদের ট্যাঁকশাল থেকে যদি ইংরেজরা নিজেদের টাকা তৈরী করতে পারে, তবে কেনা বেচা করবে সেই টাকায়। গ্রাম থেকে মাল কিনতে, গঞ্জে দাদন দিতে, নবাবের টাকার দরকার হবে না মোটেই। শতকরা বারোটাকা দণ্ড দিতে হবে না। কোম্পানী এঁচে আছে কি করে তেমন সুবিধে আদায় করা যায়। নবাব বাহাদুর যদি প্রসন্ন হতো তাদের ওপর, তবে খাস বিলেত থেকে আনা জিনিষের ভেট পাঠিয়ে কাজ আদায় করা সহজ হত হয়ত। কিন্তু নবাব শুধু অপ্রসন্ন নয়। কোম্পানীর ধারণা নবাব তাদের শত্রু।

ফাররুকশের সিংহাসনে বসতে বুকে বল পেল কোম্পানী। হাজার হোক মানুষ হিসেবে ফাররুকশের খুব খারাপ নয়। ইংরেজদের ওপর যে একটু নেক-নজর নেই—এ কথাও বলা চলে না। কোম্পানীর ধারণা এবার দরবার করলে সুবিধে হলেও হতে পারে। কিন্তু নবাবের প্রতিপত্তি দিল্লীতেও ভয়ানক। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়ার চেষ্টা করলে হিতে বিপরীত হতে পারে ভেবে কোম্পানী ঠিক করলে দরবার করতে হবে এক সঙ্গে দিল্লী আর মুর্শিদাবাদে। সুরম্যানের কাজ উত্তরাঞ্চলে। ঠিক হল সুরম্যান যাক দিল্লীতে, আর স্যামুয়েল ফেক যাক নবাবের কাছে।

১৭১৫ সালের আগষ্ট মাসে আবেদন পাঠ করল স্যামুয়েল ফেক। টাকার অসুবিধের জন্যে ক্ষতির পরিমান দিয়ে আর্জি পেশ করলে: মুর্শিদাবাদের ট্যাঁকশাল থেকে সপ্তাহে তিন দিন প্রয়োজন মত টাকা তৈরী করবে কোম্পানী। কি জানি কি ভেবে মুর্শিদকুলি সেদিন বলেছিল তথাস্তু।

কথা দিয়ে কথা রাখতে পারেনি নবাব। কাজের সময় পিছিয়ে এল। ১৭১৬ সালের মার্চ মাস। বিলেতের দিকে জাহাজ পাল তুলবে তুলবে। ফেক

জানালো, বিনা নজরানায় কাজ হবে না। নবাবকে পনেরো হাজার আর দেওয়ান একরাম খাঁকে পাঁচ হাজার দিতে হবে। ট্যাকশালের দারোগা রঘুনন্দনকে হাতে না রাখলে কাজ হাসিল করা একেবারে অসম্ভব। তাই তাকেও দিতে হবে পাঁচ হাজার। মোট পঁচিশ হাজার টাকা নজরানা দেবার জন্য যদি তৈরী থাকে কাউন্সিল, তবে কাজে হাত দেওয়া যেতে পারে।

কোম্পানীর দূত হয়ে সুরম্যান কুঠিতে কুঠিতে ঘুরে বেড়ায়, কাজের তদারক করে। আপদে বিপদে সাহায্য করা, দিল্লীর দরবারে তদবির করা তার সব চেয়ে বড় কাজ। সুরম্যানের সঙ্গে আছে নিকিলসন। বুদ্ধি করে সুরম্যান নিয়ে গিয়েছে খাজা সরহাদকে। সরহাদ আরমাণি বণিক। তখন আরমাণিদের ব্যবসা নাম মাত্র। তাদের কাজ ছিল অন্য। উপায় হতো অন্ধকার পথ থেকে। ছলাকলা, জটিলতা আর কুচক্রী পনায় ওরাই গুরুমশাই। কূট বুদ্ধি মাথায় ঠাসা। নবাব বাদশার হাঁড়ি হেঁসেলের খোঁজ খবর নখ দর্পণে। লাগানি ভাঙানিতে ওস্তাদ। দিনকে রাত, আর রাতকে দিন করতে কোন কষ্ট হয় না। সেই আরমাণিদের চূড়ামণি আবার সরহাদ। খিদিরপুরে মস্তবড় বাগান, বিরাট বাড়ী। সুরম্যান সঙ্গে নিয়েছে সরহাদকে।

দিল্লীতে পৌঁছাবার আগেই এক বুদ্ধিতে সবাইকে তাক্ লাগিয়ে দিল সরহাদ। ফাররুকশেরকে জানতো সে ভাল করে। জানতো নবাব বাদশার দুর্বলতা। দুর্বল জায়গায় ঘা দিল সে। সরহাদ প্রচার করে দিল চারিদিকে, তারা বহু টাকার দামী উপহার নিয়ে দেখা করতে যাচ্ছে বাদশার সঙ্গে। কথাটা একেবারে বাজে নয়। কিন্তু প্রচারের জোরে তিল তাল হয়ে পৌঁছাল বাদশার কানে। বাদশা হুকুম দিল: ওদের যেন কোন বেগ পেতে না হয়।

বাদশা ফাররুকশেরের সঙ্গে দেখা করতে প্রথম দফায় কোন বেগ পেতে হয়নি। দরবারে পৌঁছাল সুরম্যান। বিরাট বড় হলঘর। মোটা মোটা থাম। অপূর্ব ছবি দেওয়ালের গায়। সোনার কাজ করা ছাদ। সেই হল-ঘরের মাঝখানে মানুষের চেয়েও উঁচু বেদী। সেই বেদীর ওপর সিংহাসন। সিংহাসনে বসে আছেন সম্রাট ফাররুকশের। সিংহাসনের নীচে রূপোর রেলিং দিয়ে ঘেরা জায়গায় আছে আমীর ওমরাহ। কিছু দূরে মনসবদার। আশে পাশে সাধারণ লোক। তারা এসেছে নিজেদের কথা পেশ করতে। সবাই দাঁড়িয়ে আছে মাথা হেঁট করে, হাত জোড় করে। দরবারে গিয়ে উপহার দিয়ে এল ইংরেজ। প্রতিদানে মণিমুক্তো

দেওয়া এক প্রস্থ পোষাক উপহার পাওয়া ছাড়া আর কিছুই লাভ করতে পারেনি স্বরম্যান।

কিন্তু স্বরম্যান দেখলো নবাবের ওপর খুব খুশী নন বাদশা। দিল্লীর দরবারে নবাবের প্রতিপত্তি তবু।

কাউন্সিল দেখলো শেঠদের গদির সঙ্গে ফাররুকশেরের বহুদিনের লেন দেন। গাঢ় পরিচয়। টাঁ্যাকশাল ব্যবহার করার হুকুম দিলে নবাবের ক্ষতি হবে না। লোকসান হবে শেঠদের। এ আবার মোগল দরবার। লাগানি ভাঙানির নাম রাজনীতি। এই অবস্থায় শেঠদের চটিয়ে রাখা বোকামি। কারণ শেঠদের গায়ে আঁচ লাগলেই রুখে উঠবে নবাব। তাই নবাবকে হাতে রাখতে অত টাকা দিতেই হবে। কলকাতার কাউন্সিল দিল্লী থেকে নাকি আরো জানতে পেরেছে যে বাদশা নবাব মুর্শিদকুলির মতামত জানতে চেয়েছে টাঁ্যাকশালের ব্যাপারে। নবাব এমনিতেই মনসা। অকারণে ধূনোর গন্ধ দিয়ে কি লাভ? কাউন্সিল ফেককে জানিয়ে দিল, নবাবকে টাকাটা দিতে পারো। কিন্তু কর্মচারীদের দেওয়ার ব্যাপারে একটু হাতটান করাই ভাল। ওদিক থেকে স্বরম্যান কি করতে পারে দেখতে হবে। তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। কাল হরণই সৎবুদ্ধি। দরদস্তুর করতে থাকো।

সেই মতো কাজ করে ফেক। কাশিমবাজার কুঠির ওপর আসে নিত্য নতুন দাবী। ফেক তাড়াহুড়ো করে না। কালহরণ করতে হবে। অপেক্ষা করতে হবে স্বরম্যানের জন্য।

অথচ চোদ্দ মাস চুপ করে বসে আছে স্বরম্যান। কথাবার্তা হতে পারছে না। কেন, ঠিক বুঝতেও পারে না। কিন্তু এইটুকু বুঝতে পেরেছে হাজার সরহাদের কূট বুদ্ধিও এ ব্যূহ ভেদ করতে পারবে না। উল্লেখযোগ্য কোন গোপন খবর সরহাদ দিতে পারেনি। স্বরম্যানকে শুধু এইটুকু জানাতে পেরেছে সরহাদ: নবাব বাংলা থেকে কি যেন বলে পাঠিয়েছে, আর তারপর থেকে উজীর আবদুল্লা খাঁ কথাটা পাড়বার ভরসা পাচ্ছে না বাদশার কাছে। জলের মত টাকা খরচ হয় মোগল দরবারে। খরচ করেও কাজ হাসিল করতে পারে না স্বরম্যান। নিরুপায় স্বরম্যান দিন দিন হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।

অতঃপর উপায় হয়। হলও। যোধপুরের রাজা অজিত সিংহের মেয়ের সঙ্গে ফাররুকশেরের বিয়ের দিন স্থির। রাজধানীতে আনন্দ। হারেমে ব্যস্ততা। উজীর ওমরাহ বিব্রত। বিয়ের দিন গোণে সবাই। এমন

সময় বাদশা অসুখে পড়লো। হৈ হৈ ব্যাপার। ত্রাহি-ত্রাহি করছে উজীর ওমরাহ। বিয়ের দিন নিকটে। কন্যা এসে পৌছাল দিল্লীতে। অথচ হাকিমী চিকিৎসায় কোন ফল হচ্ছে না। হাকিমী, কবিরাজী বাদ গেল। অসুখ মারাত্মক নয়। সারবে, তবে দেরী হবে। এমন ডাক্তার চাই যে তাড়াতাড়ি সারাতে পারবে। বিয়ের দিন পিছিয়ে দেওয়া যেতে পারে না কিছুতেই।

খান দৌরাণ পরামর্শ দিল, ডাকা যাক ইংরেজদের কুঠির ডাক্তার হ্যামিলটনকে। কথাটা মনে লাগলো উজীরের। ডাক গেল। ভাগ্য ভাল হ্যামিলটনের। অস্ত্র চালিয়ে সারিয়ে দিল বাদশাকে বিয়ের আগে। খুশী হয়ে বিয়ে করতে গেল বাদশা। বিয়ে করে আরো খুশী। ডাক পড়লো ডাক্তারের। বাদশা জিজ্ঞেস করলো, 'কি চাও?'

নিজের জন্যে কিছু চায়নি ডাক্তার। চেয়েছিল কোম্পানীর জন্য। বল্লে, 'একটা আর্জী পেশ করবো।'

হুকুম দিল বাদশা।

ডাক্তার বল্লে, 'কর নিয়ে বড় গোলমাল বাধে। কাজের অসুবিধে হয়। তাই কোন কুঠিয়ালের পাঞ্জা দেখালেই যেন নৌকো ছেড়ে দেয় নবাব আর তার কর্মচারীরা। নৌকা আটক করা চলবে না।'

টাকার অভাবে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাবার যো হয়েছে। দরকার মত টাকা সব সময় পাওয়া যায় না। তাই হুকুম দিতে হবে নবাব মুর্শিদকুলি খাঁকে, যাতে বাংলার কোম্পানী নবাবের ট্যাকশাল থেকে সপ্তাহে তিনদিন নিজেদের দরকার মত টাকা তৈরী করতে পারে।

আর কলকাতার আশ-পাশের আশী খানা গ্রাম কিনে নিতে চায় কোম্পানী।

বাদশা রাজী হবার আগেই ব্যাপারটা ধামা চাপা দিল উজীর। নবাব আর শেঠদের চটিয়ে কাজ করে লাভ নেই। অথচ খুলেও বলা চলে না। কিন্তু বাদশা খুশী। খুশী হলে প্রার্থনা মঞ্জুর করা বাদশাহী রীতি।

উজীর তাই বুদ্ধি করে নিজের নামেই এক আদেশপত্র বার করলো। সুরম্যান সেলাম করে নিল সেই হুকুম-নামা। ১৭১৭ সালের মে মাসে খবর এল কলকাতায়, বাদশা মঞ্জুর করেছে তাদের প্রার্থনা। এবার থেকে দস্তক দেখালেই নৌকো ছাড়তে হবে সায়ের-দারোগার। নবাবের ট্যাকশাল থেকে আসবে কোম্পানীর টাকা। তার ওপর আশী খানা

গ্রামের জমিদারী। কোম্পানীর সব সাধ পূর্ণ হয়েছে। আর কোন প্রতিবন্ধক নেই। এবার প্রাণভরে মাল বোঝাই করতে হবে। এতটা আশা করেনি কাউন্সিল।

মিটিং বসল কাউন্সিলের। ঠিক হল ফর্মান যখন পাওয়া গেছে তখন কয়েক দিনের ভেতরই তা 'ওয়াকে' জানানো হবে। সবাই জানবে। কিন্তু তার আগেই প্রচার করতে হবে এই হুকুম-নামা। তাই আগামী বুধবারে কোম্পানীর কর্মচারী আর কলকাতার ইংরেজদের নিয়ে ভোজ দেওয়া যাক্। পান ও ভোজন পুরোপুরি হবার পর রাতভোর বাজী পোড়াতে হবে। কেল্লা থেকে ঘন ঘন তোপ দাগতে হবে—যাতে খবরটা কারোও অজানা না থাকে। স্ফূর্ত্তিতে প্রাণ ভরপুর।

প্রথমে বোঝেনি, পরে বুঝলো সুরম্যান। উজীরের কাছে বুদ্ধির খেলায় হার হয়েছে তার। ওদিকে আবার সরহাদেরও মতিগতি ভাল নয় আর বিশ্বাস করা যায় না তাকে। উজীরের ফর্মানে কোন কাজ হবে না। নবাব মুর্শিদকুলি গ্রাহ্য করবে না এই হুকুম। অথচ উজীরকে এই ফর্মান ফেরৎ দেওয়া অসম্ভব। অপমান করা হবে তাকে। সুরম্যান পরামর্শ চায় সরহাদের। সরহাদ কূল কিনারা করতে পারে না। সুরম্যান ভাবে সরহাদ বিশ্বাসঘাতকতা করছে। চোদ্দ মাস দিল্লীতে জলের মত টাকা খরচ হচ্ছে বাদশাহী দস্তুর বজায় রাখতে।

বেপরোয়া সুরম্যান একদিন উজীরকে ফেরৎ দিয়ে এল তার ফর্মান। আশা করছিল চরম বিপদের। সুরম্যান খুব চালাক। গুরু তার আরমানি বণিক। গুরু মারা বিদ্যে এখন তার আয়ত্তে। দরবার থেকে হারেমের দিকে নজর ফেরালো সুরম্যান।

বাদশা ফাররুকশেরের প্রিয় খোজাকে হাত করেছে সুরম্যান ঘুষ দিয়ে। ঘুষ দেওয়া আর নেওয়া আজকে অনেকের কাছে লজ্জার ব্যাপার। আরঙ্গজেবের শেষ জীবনের দিকে দরবারে ঘুষ চলত প্রকাশ্য ভাবে। খোজা বাদশাকে জানাল, ইংরেজদের যুদ্ধ জাহাজ সুরাটের ঘাটে লাগে-লাগে। সামান্য ব্যাপার নিয়ে গোলমাল বাঁধানো কি ভাল? উজীর চুপ করে থাকে। এ খোজা যে তারও প্রিয়। এই কথাই আবার বাদশা ফিরিয়ে বলে উজীরকে। দরবার থেকে যা ছিল অসম্ভব, হারেম থেকে তাই মঞ্জুর করে নিয়ে ফিরলো সুরম্যান।

কুড়ি বাক্স রূপো আর বাদশার ফর্মান হাতের মুঠোয় নিয়ে নবাব মুর্শিদ-

কুলিখাঁর দরবারে দাঁড়িয়ে কি একবারও ভাবতে পেরেছিল স্যামুয়েল ফেক, যে এবারও তাকে শূন্য হাতে ফিরতে হবে? কিন্তু ঘটল অভাবনীয়, অচিন্তনীয়। একদিন দুদিন নয়। দিনের পর দিন নবাব নির্বিকার। ভ্রূক্ষেপ নেই বাদশার ফর্মানের প্রতি।

ট্যাঁকশালের দারোগা রঘুনন্দন অসুখে ভুগছে। অবস্থা খারাপ। ও সেরে না উঠলে কিছু হবে না। এই কথা জানানো হল দরবার থেকে।

রঘুনন্দন কবে আসবে তার ঠিক নেই। রঘুনন্দনের অবর্তমানে ট্যাঁকশাল ত বন্ধ নয়। আবার যায় ফেক। নবাব জবাব দেয়, হবে না।

ইংরেজরা বুধবার সারারাত নেচেছিল। কিন্তু কুড়ি বাক্স রূপো কাশিমবাজার কুঠিতে পড়েছিল কিছুদিন।

ওদিকে ১৭১৭ সালে রঘুনন্দন মারা গেলে ট্যাঁকশালের কর্ত্তা হল ফতেচাঁদ। ট্যাঁকশাল উঠে এল ভাগীরথীর ধারে শেঠবাড়ীর উল্টো দিকে, যাতে ঠিকমত দেখাশুনা করা যায়।

নয়

নবাবকে শেষ অবধি বাদশা ফাররুকশেরের ফর্মানের একটা সর্ত মানতে হয়েছে। সে সর্তটি হচ্ছে এই যে কুঠিয়ালের দস্তক দেখালে সায়ের দারোগা নৌকো আটক করতে পারবে না শুল্কের জন্য। ট্যাঁকশালের দাবী গ্রাহ্য হয়নি। রেগে গিয়েছিল ফেক। মাথা ঠিক রাখতে পারেনি। নবাবের মুখোমুখি কথা কাটাকাটি হয়েছিল তাদের। কাশিমবাজার থেকে ব্যাপারটা জানানো হল কলকাতায় ১৭১৭ সালের ১১ই নভেম্বরে। কুঠির চিঠিতে জানা যায়: ফেকের কথায় চমকে উঠলো দরবার। ভয় পেয়ে কেউ কেউ কানাকানি করে। গুম হয়ে থাকলো নবাব। পরে পান আনিয়ে মিষ্টি কথায় বল্লে, তোমাদের শত্রু নই। যা করতে পারি দেখব।—অর্থাৎ নবাবী কায়দায় বলা হল, যাও তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাইনে।

কলকাতার আশে পাশের গ্রাম কিনতে আইনের দিক থেকে কোন বাধা পায়নি ইংরেজ। কিন্তু নবাব জমিদারদের মুখে মুখে হুকুম দিয়েছে যেন কোন গ্রাম বিক্রি না হয়। ব্যবসা করতে এসে কেল্লা গড়া, গ্রাম কেনার সখ বরদাস্ত করতে পারেনি নবাব।

তবু দস্তকের অধিকার পেয়ে নবাবের বহু ক্ষতি হয়েছে। কারণ, অবাধ

বাণিজ্যের অধিকার কোম্পানীর। কোম্পানীর কর্মচারী কিম্বা বেণিয়ানরা ব্যবসা করলে তাদের নিয়ম মত কর দেওয়া উচিত। নীতিশাস্ত্রের ধার দিয়েও এরা যায় না। ব্যবসা করে, কর ফাঁকি দেয়। দস্তকের সুযোগ পেয়ে ফাঁকির পরিমাণ আরো বাড়ল। বাড়বে জানতো নবাব মুর্শিদকুলি। কিন্তু এত ভয়াবহ ভাবে বেড়ে যাবে বলে ভাবতে পারেনি নবাব।

কর্মচারীদের ব্যবসার বহর অল্প নয়। বেশ ভাল ব্যবসা তাদের। মাঝে মাঝে বিলেতের খোদ মালিকরাও টলে উঠত। চোখ রাঙাতো। কিন্তু ব্যবসা বন্ধ হতো না। হতেও পারে না। কোম্পানীর প্রেসিডেন্ট মাইনে পেতো বছরে ষোলশো টাকা। জুনিয়ার ও সিনিয়ার মার্চেন্টের মাইনে দুশো চল্লিশ আর তিনশো কুড়ি। সাধারণ কর্মচারী পেতো আরো কম। কেউ একশো কুড়ি, কেউ বা শুধু চল্লিশ। তাও বছরে। তাই সবাই জানতো মাইনের জন্যে কেউ বিলেত ছেড়ে সাপ-খোপের দেশে আসেনি। তারা এসেছে সোনার শিকারে। মাইনে উপলক্ষ্য মাত্র। সুতরাং ব্যবসা তারা করবেই। ব্যবসা না করলে কি করে ছ'ঘোড়ার গাড়ী ছুটিয়ে হাওয়া খেতে যাবে। খাওয়ার সময় ব্যাণ্ডই বা বাজাবে কি করে। ব্যবসা করবেই তারা।

করুক। মেনেও নিয়েছে কোম্পানী। কর্মচারীরা ব্যবসা করতে পারে। ভারতের উপকূল জুড়ে চলুক তাদের ব্যবসা। ভাল কথা। নিয়ে যাক ইয়োরোপে মণি মুক্তো, দামী পাথর। আপত্তি নেই। শুধু দেখতে হবে তাদের লাভের জন্যে কোম্পানীর বাজার যেন নষ্ট না হয়। তাই তাদের বাণিজ্য চলতো চীন থেকে পারস্য অবধি। একশো টনের ছোট ছোট প্রায় সব জাহাজের মালিক তারাই।

এখন দস্তকের সুযোগে শুল্কের বালাই নেই। কোম্পানীর কর্মচারীরা মাঝে মাঝে বিক্রি করতো দস্তক বেনিয়ানদের কাছে। লাভের বখরা পেত কর্মচারী।

কোম্পানীর এই রকম একজন কর্মচারী হল জোসিয়া চিট। খেলায় সবাই জেতে না। ব্যবসায় সবাই লক্ষপতি হয় না। কেউ কেউ ডোবে। জোসিয়া ডুবেছে। ধার দেনা তার প্রচুর। দেশীয় মহাজনরাও অপমান করে। কোম্পানীর টাকা ভেঙে বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে আরো গভীর বিপদের ভিতর তলিয়ে গেল জোসিয়া। এটা ১৭১০ সালের কথা।

বছর দুয়েক পরে কোম্পানীর টাকা যদি বা পুরিয়ে দিল, এ দেশের মহাজনের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া দায়। মহাজনদের ফাঁকি দিয়ে কোম্পানী জোসিয়াকে গোপনে বিলেতে পাচার করতে পারত। কিন্তু তাকে বাঁচাতে কোম্পানী নিজের ঘাড়ে বিপদ ডেকে আনবে না। উপায় নেই। জোসিয়ার অবশিষ্ট যা কিছু আছে তা বিক্রি করে উঠল মাত্র ২২,৬১১ টাকা। অথচ দেনার পরিমাণ অনেক বেশী—৬৮,১৩০ টাকা।

বারানসী শেঠ জানালো মাণিকচাঁদকে খুশী করতে পারলে বেঁচে যাবে জোসিয়া। এ ছাড়া জোসিয়ার আর কোন পথ নেই। শুধু জোসিয়া নয়, কোম্পানীরও। কারণ, জোসিয়া ত কোম্পানীর কর্মচারী। সুতরাং কোম্পানীই তার জিম্মাদার।

বারাণসী কোম্পানীর দালাল মাণিকচাঁদ পরিবারের কেউ নয়। ষোলো শতকের মাঝামাঝি সপ্তগ্রাম থেকে যে চার ঘর বসাক আর এক ঘর শেঠ উঠে এসেছিল সুতানুটীতে, তাদেরই বংশের একজন এই বারানসী শেঠ।

বারানসী খবর নিয়ে এসেছে যে যদি মাণিকচাঁদকে .সাত হাজার টাকা দিতে পারে জোসিয়া, তা হলে এ দেশের মহাজনরা কোন কথা বলবে না। নালিশ করবে না নবাবের কাছে। মাণিকচাঁদের প্রাপ্য বেশী, মান বেশী। ফলে মাণিকচাঁদকে কিছু দিতেই হবে। জোসিয়ার অন্য মহাজনদেরও এই মত।

কাউন্সিল দেখলো যে ব্যাপারটাতে মাণিকচাঁদ জড়িত। তাই যে কোন সময় নবাবের হুকুম আসতে পারে। তখন জটিলতা আরও বাড়বে। ভালোয় ভালোয় মিটিয়ে নেওয়া ভালো। কাউন্সিল মাণিকচাঁদকে সাত হাজার দিতে রাজী হল।

জোসিয়া কিং উইলিয়ম জাহাজে চড়ে প্রাণ বাঁচালো বিলেতে গিয়ে।

১৭১৬ সাল অবধি এ ব্যাপারটা মাঝে মাঝে উঠেছে। কিছু কিছু দিয়ে শান্ত করেছে কোম্পানী। পুরো টাকা পায়নি কেউ। অন্য মহাজনরা ছেড়ে দিয়েছে তাদের দাবী। সম্মানী হিসেবে সাত হাজার পেয়েছে মাণিকচাঁদ। মহাজনদের শিরোমণি মাণিকচাঁদ। টাকায় কিছু আসে যায় না। কিন্তু সম্মান বড়। টাকা একবার গেলে আবার হয়ত আসতে পারে। কিন্তু মান গেলে আবার ফিরিয়ে আনা অসাধ্য। অন্তত এই-ই ভাবত তখন মহাজনরা। বিশেষ করে মাণিকচাঁদের মান। প্রত্যেকটি গদিকে মাণিকচাঁদ নির্দেশ দেয়।

সমাজে দেখা দিচ্ছে আর একটা নতুন উপসর্গ। ব্যক্তির জন্ম হতে চলেছে। মাণিকচাঁদের ব্যক্তিত্বের মর্য্যাদা সামাজিক মর্য্যাদার সঙ্গে জড়িত। একদিন যে মান মর্য্যাদা ছিল প্রধানত কুল কৌলিন্যের, এখন সেটা অর্থের, বিত্তের। এই হল status personality.

দশ

জোসিয়ার সঙ্গে বিবাদ মিটে যাবার পরই গদি থেকে সরে দাঁড়াতে চাইলো মাণিকচাঁদ। বয়েস হয়েছে। পরপারের ডাক আসতে আর কতদিন। শ্বেতাম্বর জৈন সম্প্রদায়ের গুরুস্থানীয় সে। ভোরে পুজো অর্চনা না করে গদিতে বসে না। কিন্তু গদির মায়া এবার কাটাতে হবে। পেষণ যন্ত্র, ছেদন যন্ত্র, জলাধার আর বন্ধনী—এই পাপের আধার। আর কতকালই বা পাপ সঞ্চয় করবে মাণিকচাঁদ।

সংসারে থেকে যা করবার করেছে। হীরানন্দের অনেকখানি আশা মিটেছে। অজ্ঞাত অপরিচিত হয়ে এসেছিল হীরানন্দ। মাণিকচাঁদের বুদ্ধি আর চেষ্টায় শেঠ বাড়ীর নাম ভারত জোড়া। সাত দিকে সাত গদি। সাত গদির সঙ্গে চুলের টিকি বাঁধা আছে হাজার হাজার ছোট বড় বাঁটাদার আর সর্ফের। বাদশা নবাব হাত ধরা। হাত জোড় করে থাকে জমিদার মহাজন। তা ছাড়া বড়ো বিদেশী কোম্পানী, নবাব বাদশাকে যারা কথায় কথায় চোখ রাঙায়, তোপ বন্দুকের ভয় দেখায়, তারাওঃমাথা নীচু করে থাকে গদিতে। বাজার দর ওঠা নামা করে মহিমাপুরের ইংগিতে। এক জীবনে আর কি আশা করতে পারে মাণিকচাঁদ। এবার মুক্তি চায়।

কিন্তু মুক্তি নেই। আরো বাকি আছে মাণিকচাঁদের। বাদশা ফাররুকশেরের সঙ্গে শেঠদের ভাব-সাব অনেক দিনের। মাণিকচাঁদ তার চেনা, ফতেচাঁদ তার নিকটের। কাজ কারবার লেন দেন হত ফতেচাঁদের সঙ্গেই। অনেক বার বিপদ থেকে বেঁচে গেছে ফতেচাঁদের জন্যে। বাদশাহী বিলাসে ভাটা পড়তে দেয়নি কখনও।

বাদশা মারা যেতেই ছেলেদের লড়াই আরম্ভ হল। দেশের অবস্থা অশান্ত। কখন কি হয় বলা যায় না। যাদের আছে, ভাগ্য যাদের সিংহাসনের পায়ার সঙ্গে বাঁধা, বিপদ তাদের। গ্রামের মানুষের খেয়াল

নেই, কে কবে নবাব বাদশা হল আর গেল। কিন্তু তা বলে সর্বস্ব খুইয়ে কে আর চাষীর মত নিশ্চিন্ত থাকতে চায়। সাজ সাজ রব উঠেছে সহরে।

কেল্লা মেরামত করতে লেগে গেছে ইংরেজ। হুকুম জারী করেছে গোলা বারুদ মজুত করার জন্য। বক্সী প্রাণপণে গুদামজাত করছে রসদ। কেল্লার দু'শ ইংরেজ সৈন্য ছাড়া তলব পড়েছে সব কর্মচারীদের। ফিরিঙ্গি আর স্বাধীন ব্যবসায়ী ইংরেজরাও নাম লেখাল কেল্লায়। মাঝিমাল্লারা হুঁসিয়ার। কামানের মুখ উঁচিয়ে আছে হুগলীর দিকে।

অমন যে প্রতাপান্বিত নবাব, তিনিও বিষণ্ণ। গোলমাল বেঁধেছে কোথাও। মুর্শিদাবাদের চকবাজারে চাপা গুঞ্জন। তখন যুদ্ধ চলেছে আজিমুশ্বানের সঙ্গে সুলতান মুয়াজুদ্দীনের।

নবাব স্বীকার করেছে আজিমুশ্বানকে। ট্যাকশাল থেকে বাজারে এসেছে তারই নামাঙ্কিত টাকা। মসজিদে প্রার্থনা হয়েছে। দরগায় মানৎ হয়েছে সিন্নি, তার শুভ কামনায়। অথচ খবর এসেছে যুদ্ধে হেরে মারা গেছে আজিমুশ্বান। খবর চাপা যায় না। বাতাসের আগে ছড়িয়ে পড়ে। মুর্শিদাবাদের চক বাজারে হাজার বণিকের কানাকানিতে চাপা খবর মুখর হয়ে উঠলো। নবাব বিষণ্ণ।

নবাব ভরসা করেছিল শেঠদের ওপর। শেঠরাও বিশ্বাস ভাঙেনি। মাণিকচাঁদ আর ফতেচাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করে নবাব বিপদ থেকে মুক্তি পেয়েছিল সেদিন। নবাব জানে কানাকানিতে হাজার রকম গুজব হাজার-ভাবে ছড়ায় বণিকের মুখে মুখে। স্বার্থ ও সংশয় সব চেয়ে বেশী তাদের। বণিকের মুখ চাপা দিতে পারে একমাত্র শেঠ। সঠিক খবর রাখতে পারে শেঠরাই। দিল্লীতে তাদের গদি, দরবারে দহরম-মহরম। বণিকরা শেঠদের কথা মাথা পেতে মেনে নেবে।

নবাব প্রচার করে দিল দিল্লী থেকে খবর এনেছে মাণিকচাঁদ—সম্রাট হয়েছেন আজিমুশ্বান। প্রচারকে আরো বিশ্বাসযোগ্য করতে নবাব পুরস্কৃত করলো মাণিকচাঁদ ও ফতেচাঁদকে। পূর্ণ দরবারে মাণিকচাঁদকে উপহার দেওয়া হল হাতী আর শিরোপা। ফতেচাঁদ পেলো শিরোপা আর ঘোড়া। এ ১৭১২ সালের কথা।

চক বাজারের গুঞ্জন থেমে গেল। বণিকদের প্রখর বিষয়বুদ্ধিও বিমূঢ়। কিন্তু থেমে থাকেনি নবাব। সাময়িক বিহ্বলতার সুযোগে হুকুমনামা জারী

হল—শেঠদের আনা খবরে যারা অবিশ্বাস করবে, যারা বিশ্বাস করবে না যে আজিমুশ্বান বাদশা, কিংবা এমন ধরণের গুজব, ভয় ও সন্দেহের সৃষ্টি করে প্রজাদের আস্থা ও মনোবল ভেঙে দিতে চেষ্টা করবে, তাদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। অপরাধীর ঘরবাড়ী পুড়িয়ে তার বংশধরদের সর্বস্বান্ত করা হবে। চকবাজার একেবারে চুপশে গেল।

ব্যাপারটা জানতে কাশিমবাজারের আগ্রহ কম নয়। সেদিন সন্ধ্যার সময় হেজেস দেখা করতে এসেছিল নবাবের সঙ্গে। রাজ-রাজড়ার, যুদ্ধ-বিগ্রহের, ব্যবসা বাণিজ্যের খোস গল্প করে দু'ঘণ্টা কাটিয়েও হেজেস আন্দাজ করতে পারেনি সত্য ঘটনা। নবাবও জানতো অকারণে মুবারক জানাতে আসেনি হেজেস। তেমন পাত্র নয় ইংরেজ।

উঠি-উঠি করছিল হেজেস। নবাব বল্লে, 'এসে ভালই করেছো হেজেস। নতুন সম্রাটকে আনুগত্যের সেলাম জানানো দস্তর।'

মাথা নীচু করে কাশিমবাজারে ফিরে এসেছে চতুর হেজেস। সত্য ঘটনা বুঝতে পারেনি।

কিন্তু সত্যিই মারা গিয়েছে আজিমুশ্বান। যুদ্ধ করতে করতে মারা গিয়েছে। এখন দিল্লীর সিংহাসনে বসেছে আজিমুশ্বানের ভাই সুলতান মুয়াজুদ্দীন। নতুন বাদশাহী নাম তার জেহান্দারশা। সত্যকে অস্বীকার করতে পারে না কুলিখাঁ। রাজস্ব ও পেস্কস পাঠিয়ে বশ্যতা স্বীকার করেছে নবাব।

মোগল রাজনীতির দুর্যোগে খুব স্থিরভাবে নৌকো চালিয়ে নিয়ে গেছে মানিকচাঁদ। উথল পাথাল, টাল মাঠাল, চোরাঘুর্ণি চিনে চিনে, বাঁচিয়ে গুপ্ত পাথর, মহিমাপুরের গদিকে দ্বিতীয় নবাবের মর্য্যাদা দিয়েছে।

মানিকচাঁদের বিশ্বাস ফতেচাঁদের ওপর। এতদিনের অভিজ্ঞতায় মানুষ চিনতে ভুল করেনি মানিকচাঁদ।

সরহাদকে নিয়ে সুরম্যান যখন দিল্লীর দরবারে চোদ্দ মাস পড়ে আছে, তখন বিবেচনার পরিচয় দিয়েছে ফতেচাঁদ। তার প্রখর বুদ্ধিতে বিস্মিত হয়েছে মানিকচাঁদ ও নবাব।

মোগল দরবারে সুরম্যানের উদ্দেশ্য সিদ্ধি হলে ক্ষতিগ্রস্থ হত নবাব। পথে বসতে বাকি থাকতো না শেঠদের। নবাবের স্বার্থ আর মানিক-চাঁদের স্বার্থ তখন এক। উভয় স্বার্থের বিরোধী ইংরেজ। তাই ইংরেজদের হারাতে হবে নিজেদের জন্য। কিন্তু হারাবে বুদ্ধিতে,

কৌশলে। সোজা বিপক্ষে গিয়ে শত্রু বৃদ্ধি করে, অর্থ ক্ষয় করে কোন লাভ নেই। ইংরেজদের সঙ্গে যে কাজ কারবার জমে উঠেছে সবেমাত্র। তাও বানচাল হতে পারে। ফতেচাঁদ ভেবে রেখেছে—সে মাছ ধরবে কিন্তু জলে নামবে না।

নামতেও হয়নি। সে হাত করেছে উজীর আবদুল্লাকে। ওদিকে দিল্লীতে সুরম্যান টাকার অভাবে আটকে পড়েছে। চড়া সুদে কোম্পানীর হুণ্ডি ভাঙিয়েছে ফতেচাঁদ। খুশী হয়েছে কোম্পানী। লাভ করেছে শেঠেরা। ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি নবাব। ফর্মান পেয়েও কাজ করতে পারেনি ইংরেজ। ট্যাঁকশাল খোদ শেঠদের জিম্মায়।

তারিফ করেছে মানিকচাঁদ। ফতেচাঁদের ওপর সব ভার এখন ছাড়া যায়। নিজের ছেলে নেই বলে ক্ষোভ নেই তার। ফতেচাঁদই তার ছেলে। ধর্মসাক্ষী করে গ্রহণ করেছে তাকে ১৭০০ সালে। ফতেচাঁদ পাটনার গদিতে তখন। সে দুঃসময়েও ফতেচাঁদ অবিচল। পেরিয়ে এসেছে ঝড়ঝঞ্ঝা। ফতেচাঁদ ছেলেমানুষ। কিন্তু ইতিমধ্যে পোড় খেয়েছে অভিজ্ঞতায়। ব্যবসায় অভিজ্ঞতাই মূলধন। মানিকচাঁদ ব্যবসাদার, শুধুমাত্র ব্যবসাদার। অর্থের ব্যবসা তাদের, রাজনীতির নয়।

আজিমুশ্বান মারা গেলেও মারা যায়নি তার ছেলে ফাররুকশের। জেহান্দারশাকে স্বীকার করতে পারে মুর্শিদকুলিখাঁ কিন্তু অস্বীকার করবে ফাররুকশের।

ফাররুকশের তখন রাজমহলে। তলব পাঠাল নবাবকে, সৈন্য পাঠাও, টাকা পাঠাও। সিংহাসন আমার। আমি জয় করে নেবো।

উত্তর দিল নায়েব নাজিম, পারবো না। জেহান্দারশা যখন সিংহাসনে বসেছেন, তখন আইনত তিনিই সম্রাট। সুবাদার সম্রাটের কর্মচারী। তার সুবায় বসে রাজদ্রোহ বাঞ্ছনীয় নয়।

এই অপমানের জন্যে প্রস্তুত ছিল না আইনত নবাব এবং সিংহাসনের প্রতিদ্বন্দ্বী ফাররুকশের। ঢাকা থেকে নিজের সৈন্য আর তোপ নিয়ে পাটনায় চলে এল। পাটনায় থাকতো 'সৈয়দ ভাই'—হোসেন আলি আর আবদুল্লা খাঁ। সৈয়দ ভাইরা আজিমুশ্বানের পুরানো বন্ধু। আজিমুশ্বানের জন্যেই আজ তারা পাটনা আর এলাহাবাদের শাসনকর্ত্তা। সৈয়দ ভাইরা নিশ্চয় কৃতঘ্ন নয়। পাটনায় তাদের শরণ নিল ফাররুকশের।

সৈয়দ ভাইরা বিপদে পড়ল এবার। জেহান্দার শা সিংহাসনে।

প্রকাণ্ড রাজদ্রোহের ফল শাসনকর্তার অজানা নেই। ওদিকে ফাররুকশেরকে ত্যাগ করা অন্যায়।

দ্বিধা দ্বন্দ্ব নিয়ে রাজনীতি চলে না। রাজনীতিতে সংশয়ের কোন ঠাঁই নেই। প্রয়োজন শুধু মাত্র একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। এবং সেই সিদ্ধান্তে অবিচল থাকা। সৈয়দ ভাই সোজাসুজি দাঁড়াল ফাররুকশেরের পক্ষে।

সৈন্যদল বাড়তে থাকে। সেদিন সৈন্যদের চরিত্র ও মানসিকতা, দলের গঠন ও প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। দেশ জাতি ধর্ম নীতি ইত্যাদি মূল্য বোধ তখন অজ্ঞাত। সেনারা পেশাদার। যার কাছে মাইনে যত বেশী, তার কাছে তত বেশী লোক আসতো সেনা দলে নাম লেখাতে। মাসে মাসে যে মাইনে চুকিয়ে দিতে পারতো তার কাছে টিকে থাকতো সৈন্য। তারা অর্থের অনুগত। আর অনুগত্য থাকতো বড় জোর মালিকের প্রতি। মালিকের পতনের সাথে সাথে চুকে যেত আনুগত্যের পাট-বালাই।

বাংলার রাজস্ব যাচ্ছিলো দিল্লীতে। সঙ্গে ছিল নবাবের জামাই সুজাউদ্দীন। এলাহাবাদে আসতেই সব টাকা কেড়ে নিল আবদুল্লা খাঁ। এখন অনেক টাকা ফাররুকশেরের। অচল তার সৈন্য।

পাটনায় সভা ডেকেছিলো হোসেন আলি। শহরের গণ্যমান্য লোক আর বণিকরা আসতে বাধ্য হয়েছিল সভায়। ফাররুকশেরকে অর্থ সাহায্য করার জন্য আবেদন করেছিল হোসেন আলি। ফাররুকশের বলেছিল দিল্লীর মসনদ পেলে চুকিয়ে দেবে টাকা। পাটনার গদিয়ান ফতেচাঁদকে অনেক টাকা দিতে হয়েছিল।

তবু গদিয়ানদের ওপর খুব খুশী হতে পারেনি ফাররুকশের। সেই টাকার ওপর চাপিয়ে দিল নতুন কর। ফাররুকশেরের ওপর খুশী হতে পারেনি হোসেন আলিও। কিন্তু প্রতিবাদও করেনি। যারা কর দিতে পারেনি তারা পালিয়ে গেল। অনেকেই পালিয়ে গেল দেখে ফতেচাঁদ এল মুর্শিদাবাদে। তখন পাটনায় থাকার মানে হত ফতেচাঁদও হোসেন আলি আবদুল্লার দলে। নিজেকে প্রকাশ করতে চায় না ফতেচাঁদ। পক্ষভুক্ত হবার সময় আসেনি। কে জানে ফাররুকশের জিতবে কি হারবে? কি দরকার তার সমস্ত ভবিষ্যতকে বিপদাপন্ন করে? তার চেয়ে থাক সাপ ও ব্যাঙকে যুগপৎ তুষ্ট করা হল নিপুন বিষয়-বুদ্ধি। চার পাশে থাক একটু রহস্যের ঘোর। অথচ সিদ্ধ হোক তার স্বার্থ।

মুর্শিদাবাদে বসেও ফতেচাঁদ সাহায্য করেছে ফাররুকশেরকে। দিল্লীর সিংহাসনের আয় প্রচুর। সেই প্রাচুর্যকে পেতে খরচও করতে হয় প্রচুর। এখন অত টাকা নেই ফাররুকশেরের। ফুরিয়ে গেছে দল পাকাতে। মুর্শিদাবাদে বসে টাকার ব্যবস্থা করেছে ফতেচাঁদ। বারানসীর নাগরশেঠের কাছ থেকে এক কোটি টাকার কর্জের বিহিত করে দিয়েছে সে। প্রতিদানে ফাররুকশেরকে বন্ধক রাখতে হয়েছিল নাগরশেঠের কাছে দিল্লীর ভবিষ্যত সিংহাসন। কিন্তু শেষে ফাররুকশেরই বসল সিংহাসনে।

বিয়ে হয়েছে ফতেচাঁদের। নাতির মুখ দেখেছে মানিকচাঁদ। সাধও কোথাও অপূর্ণ নেই।

কিন্তু মানিকচাঁদের সাধের অপূর্ণতা একটু ছিল। তাও মিটিয়ে দিল সম্রাট ফাররুকশের। বাদশা হয়ে ফতেচাঁদের উপকার ভুলতে পারেনি। সম্মানিত করলো শেঠ পরিবারকে।

ফাররুকশেরের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে ফর্মান এল দরবার থেকে: এই জয়ও মঙ্গল যুক্ত সময়ে এই মহামান্য ও বিশ্বাসযোগ্য আদেশপত্র দ্বারা মানিকচাঁদ এই চিরস্থায়ী রাজ্য হইতে মানিকচাঁদ শেঠ খেতাব প্রাপ্ত হইলেন। অধিকৃত রাজ্যের সমুদয় বর্তমান ও ভাবী হাকিম আমল ও মুৎসুদ্দির প্রভৃতি উচিত যে তাহারা উল্লিখিত ব্যক্তিকে শেঠ লেখেন। ইহাতে বিশেষ যত্ন লওয়া আবশ্যক এবং হুজুরআলি হইতে তাগিদ জানেন।—ইতি তারিখ ৮ জিহজ্জল।

যে সম্মান এতদিন পেয়ে এসেছে মানিকচাঁদ অথচ বাদশার দরবারে কোন লিখিত স্বীকৃতি ছিল না, সেই সম্মান এখন ভারতবর্ষময় স্বীকৃত। এখন সম্মানের দিক থেকে নবাবের ঠিক পরেই শেঠ মানিকচাঁদ।

মোগল রীতিতে পায়ে কেউ সোনার গয়না পরতে পারতো না। পারতো একমাত্র নবাবের বেগম। এখন পায়ে সোনার গয়না পরতে পারবে মাণিকচাঁদের স্ত্রী মাণিক দেবী। বাদশা নিজে গড়িয়ে দিয়েছেন সেই গয়না। সম্মানের প্রতীক সেই গয়না মানিক দেবীর বড় প্রিয়।

নাগর থেকে আসার সময় আর কত বেশী কল্পনা করতে পেরেছিল হীরানন্দ? কল্পনা করতে পারেনি মানিকচাঁদ নিজে। এবার তার ছুটি।

১৭১৪ সালের দশই মাঘ মৃত্যু হল মানিকচাঁদের। সমাধি দেওয়া হল ভাগীরথীর ধারে, ট্যাঁকশালের পাশে। নাম তার 'দয়াবাগ'। কেউ কেউ বলে 'মানিকবাগ'। দয়াবাগ আজ নেই। কেউ জানে না কোথায় ছিল।

এগারো

গদিতে বসেছে ফতেচাঁদ। সম্পর্কে সে মাণিকচাঁদের ভাগনে—ধনবাই এর ছেলে। নিজের কোন ছেলে মেয়ে হয়নি মাণিকচাঁদের। দুবার বিয়ে করেও না। নিষ্ফলা গাছ হাওয়ায় দুলেছে শুধু। মাণিক দেবী দত্তক নিল ফতেচাঁদকে। নিজের হাতে গড়ে পিঠে মানুষ করলো মাণিকচাঁদ। ঢাকা পাটনা দিল্লী আগ্রার গদি ঘুরে ঘুরে অভিজ্ঞতা কুড়িয়ে এনেছে। হাতে কলমে কাজ শিখতে হয়েছে মানিকচাঁদের কাছে। রাজস্ব আর বাজার দরের অতি সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি জানা না থাকলে যে কোন সময়ে ভরাডুবি হতে পারে। বিশেষ করে সেই সময়ে। রাষ্ট্র তখন নড়বড়। শাসন ভাঙনের মুখে। শৃঙ্খলা ক্ষয়িষ্ণু। রাজনীতি শুধুমাত্র ষড়যন্ত্র। অর্থনীতির নির্ভরযোগ্য বনিয়াদ নেই। বাজার নতুন। দরের আইন কানুন নেই, স্থিরতা নেই। বিত্তবান মানিকচাঁদ এবং প্রতিষ্ঠাবান ফতেচাঁদ তাই কখনও নিশ্চিন্ত নয়। কোন এক অদৃশ্য শত্রুর মুখোমুখি সর্বদা। সবসময় শরীরের শিরা-উপশিরা উদ্বেগে উত্তেজনায় ধনুকের ছিলার মত টন্‌টন্ করতো।

রাজনীতিতে যেতে চাইনি মানিকচাঁদ। ব্যবসাকেই জীবনের চরম সার্থকতা বলে মনে করে এসেছে। মসনদের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। নবাবী করতে চায়নি কোনদিন।

কিন্তু নবাবের প্রধান মন্ত্রনাদাতা হয়ে কি করে একেবারে রাজনীতিকে বর্জন করা যায়? গাছ বড় হলেই ঝড়ের দাপট সইতে হবে। ঝড়ের ভয়ে মাথা নীচু করে থাকা যায় না। অস্বীকার করা যায় না জীবনের স্বাভাবিক বিকাশকে। বৃদ্ধি অথবা বিনাশ—এর মাঝখানে আর কোন তৃতীয় পথ নেই। তাই পুরোপুরিভাবে মানিকচাঁদকে মানতে পারেনি ফতেচাঁদ। কিন্তু ফতেচাঁদ শুধু এইটুকু বুঝেছে নিজেকে কারো কাছে খুলে দিতে নেই। মনের একদিককার কপাট সব সময় বন্ধ রাখতে হয়। সেখানে সে থাকবে একা। সেই একলা অন্ধকারে জবানবন্দী করবে নিজের সঙ্গে। লক্ষ্য ও উপায় নিয়ে গোলমালে পড়তে নেই। লক্ষ্যকে সব সময় উজ্জ্বল রাখতে হবে একান্ত মনের গভীরে। উপায় নির্দ্ধারণ করতে হবে শুধু মাত্র লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে। লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে যদি প্রতক্ষ্যভাবে রাজনীতি করতেই হয়, পক্ষভুক্ত যদি হতেই হয়, তাতেও পিছিয়ে যাবে না

ফতেচাঁদ। কিন্তু কখনও ভুলবে না, রাজনীতি তার উপায় মাত্র। তার লক্ষ্য নয় কোনদিন। কোনদিন মসনদ হবে না তার জীবনের পুরুষার্থ। নতুন পটভূমিতে শেঠবাড়ীর নতুন এই বিকাশের এই ব্যবহারিক সত্যকে উপলব্ধি করলো সেদিন।

ফাররুকশের 'শেঠ' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেছিল ফতেচাঁদকে। এই অনুষ্ঠান ঘটে বাদশার রাজত্বের পঞ্চম বছরে। ফতেচাঁদ তখন ছিল দিল্লীতে।

সৈয়দ ভাইরা সিংহাসনে বসিয়েছিল ফাররুকশেরকে। তারাই আবার ১৭১৯ সালে সিংহাসন থেকে তাকে টেনে নামিয়ে খুন করেছিলো। কথা বলেনি নবাব মুর্শিদকুলি। সৈয়দ ভাইদের ছায়া পড়েছে বাংলায়। উজীর আবদুল্লা মাঝে মাঝে এখানে দিন কাটিয়ে যায়। বাংলার জল হাওয়া নাকি খুব ভাল লাগে আবদুল্লার।

নবাবের চর সতর্ক। খবর পেয়েছে, কুলিখাঁর ভাগ্যও ফাররুকশের পথ নেবে। ছায়া দেখে চঞ্চল হয় নবাব।

বেশীদিন থাকেনি সৈয়দ ভাইদের প্রতাপ। মোগল সাম্রাজ্যের শেষ যুগে বেশী দিন প্রতাপান্বিত থাকতে পারতো না কেউ। ঘাতকের গুপ্ত ছোরা জামার হাতার তলায় সর্বদা উৎসুক। বাতাসে রক্তের গন্ধ। ষড়যন্ত্র শঠতা কৃতঘ্নতার পাঁকে জাঁকিয়ে থাকে লোভের পোকা। বেশীদিন ভোগ করতে আসেনি সৈয়দ ভাইরা। ১৭১৯ সালে খুন হল ফাররুকশের। সৈয়দ ভাইরা সিংহাসনে বসাল রফীউদ্দরজাতকে। বেশীদিন থাকলো না সেও। নতুন বাদশা হল রফীউদ্দৌলা। সৈয়দ ভাইএর খুশী মত সিংহাসনে বসে আর নামে বাদশা।

ক্ষমতা যত বেড়েছে সৈয়দ ভাইদের, ততই সংগঠিত হয়েছে তার শত্রু। আমীর ওমরাহ সুযোগ খুঁজেছে পথের কাঁটাকে তুলে ফেলতে। রফীউদ্দৌলার পর সম্রাট মুহম্মদ শা' বিশ্বাস করতে পারেনি সৈয়দ ভাইকে। সৈয়দ ভাই বিশ্বাস করতে পারেনি মুর্শিদকুলিকে। সৈয়দ ভাই-এর চর ঘুরেছে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনের চারপাশে ক্ষুধিত আত্মার মত। প্রতিহিংসার প্রেত পিছু নিয়েছে সৈয়দ ভাইদের।

একদিন ঘাতকের হাতে প্রাণ দিল হোসেন আলি। একটা শত্রুর পতনে বুকে বল পেল মুহম্মদ শা'। আমীর ওমরাহ উৎফুল্ল। নবাব মুর্শিদকুলি একটু নিশ্চিন্ত। প্রকাশ্য বিদ্রোহ করে প্রাণ দিল আবদুল্লা খাঁ। মুহম্মদ শা'

এবার নিষ্কণ্টক। মুর্শিদাবাদের সিংহাসনের চারপাশে ঘাতকের গুপ্ত ছায়া সরে গেছে।

মুহম্মদ শা'কে বাংলার রাজস্ব পাঠালো নবাব। সঙ্গে গেল তার ব্যক্তিগত নজরানা, দামী উপহার। নবাব দাবী করল যে, সব বিদেশী বণিকদের উপহার পাঠাতে হবে নতুন সম্রাটকে।

চারপাশে মোগল সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ছে। আকবরের মানবিক নীতি লুপ্ত। আরঙ্গজেবের কঠিন উদ্ধত শাসনের ভয় বেশীদিন বেঁধে রাখতে পারেনি বিভিন্ন প্রদেশ। বিরাট পুরানো জমিদার বাড়ী যেন সব সংস্কারকে তুচ্ছ করে মাটির দিকে নেমে আসছে অনিবার্য ভাবে। নবাব চেয়েছিল অবশ্যম্ভাবীকে প্রতিরোধ করতে। তাই হুকুম দিল, সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের প্রতীক হিসাবে উপহার পাঠাতে হবে বিদেশী বণিককে।

নবাবের আদেশকে কাজে পরিণত করার ভার পড়ল ফতেচাঁদের ওপর।

ফতেচাঁদ ডেকে পাঠাল ইংরেজ আর ওলন্দাজদের উকিলকে। বল্লে: 'নবাবের হুকুম হয়েছে নজরানা আদায় করতে। হুকুম যখন হয়েছে তখন তামিল আমাকে করতেই হবে। তাই ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি মিটিয়ে নেওয়া ভাল। মুহম্মদ শা' নতুন বাদশা। তার প্রতি আনুগত্য দেখানো কর্তব্য।'

ফিরে এল উকিল। ওলন্দাজরা ষাট হাজার টাকা দিতে রাজী। ইংরেজরা নড়ে বসে না।

মহিমাপুরে তলব পড়ল ইংরেজদের উকিলের। ফতেচাঁদ বল্লে: 'যদি পাওনা না মিটিয়ে দাও, তবে এখানে ব্যবসা করা খুব মুসকিল হবে। নবাব রেগে আছে।'

১৭২১ সালের মার্চ মাসে ফতেচাঁদ এই কথা বলেছে, অথচ মে মাস পার হয়ে গেল। এক কড়িও নজরানা দেয়নি ইংরেজ।

নবাবের আদেশে কাশিমবাজারের কুঠি থেকে বেঁধে আনা হল কান্ত-বাবুকে। কান্তবাবু কোম্পানীর দালাল, কাশিমবাজার কুঠির মন্ত্রণাদাতা। সমস্ত ব্যবসা, খরিদ, খাতাপত্র দেখাশুনা করে কান্তবাবু। এদেশের ব্যবসা-দারদের সঙ্গে ওদের বণিকের একমাত্র যোগপথ এই কান্ত। তার অভাবে কুঠি অচল। সোরগোল পড়ল কলকাতায়।

অপমানিত হয়েছে ইংরেজ। কোম্পানী এই অপমান মেনে নিতে পারে না কিছুতেই। পরিনাম যত ভয়াবহ হয় হোক। জবাব দিতেই হবে।

হুকুম এল কাশিমবাজারে। নবাবের ওপর চাপ দাও। এই নজরানা কিছুতেই দেওয়া হবে না। তাতেও যদি কিছু না হয়, আমাদের উকিল পাঠাও দরবারে। দরবার যখন চলবে তখন সে যেন দরজার কাছে 'বিচার চাই' বলে চিৎকার করতে থাকে। আমরা কাশিমবাজারে আরো সৈন্য পাঠাচ্ছি।

স্যামুয়েল ফেক চিঠি লিখলো নবাবকে। কড়া ভাষায় চিঠি। কোন কাকুতি মিনতি নেই। দয়া প্রার্থনার নাম গন্ধ নেই। গুজব রটেছে কাশিম-বাজার থেকে চকবাজার অবধি। কান্তবাবুর বৌ নাকি আত্মহত্যা করেছে।

নবাবের প্রিয় পাত্র আসাদ খাঁকে হাত করেছে ফেক। প্রতিশ্রুতি দিয়েছে আসাদ। ফেকের চিঠি পৌঁছে দেবে নবাবের কাছে, কিন্তু প্রথমে নিজের হাতে নিয়ে যায়নি সেই চিঠি। পাঠিয়েছিল তার সহকারীকে। ক্রুদ্ধ নবাব হাত দিয়েও স্পর্শ করেনি চিঠি। ব্যর্থ সহকর্মি ফিরে এল।

নবাবের কাছে নিজে আবেদন নিয়ে হাজির হয়েছে আসাদ খাঁ। আসাদকে দেখে নবাবের রাগ একটু পড়ে। বলে, 'এখন যাও। অবসর সময়ে এসো।'

নবাবের মেজাজ সরিফ দেখে আসাদ পড়ে শোনাল ফেকের চিঠি। কড়া চিঠি। তবু নবাব রাগেনি। ডেকে পাঠালো ফতেচাঁদকে।

ফতেচাঁদ হাজির হতেই নবাব বল্লে, 'কি ব্যাপার! কান্তবাবুর স্ত্রী নাকি আত্মহত্যা করেছে। তুমি নিজে দেখত ব্যাপারটা কি।'

হাজত থেকে কান্তবাবুকে আনা হল নবাবের কাছারীতে। নিজে জিজ্ঞাসাবাদ করল ফতেচাঁদ। হাজতে ফিরে গেল আবার কান্তবাবু। ফতেচাঁদ বলেছিল কান্তবাবুরই পক্ষে। ইংরেজদের নজরানার সঙ্গে কান্তবাবুর যোগাযোগ কতটুকু! কান্ত সামান্য কর্মচারী। আর তার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করা হয়েছে এবং যার জন্যে তাকে বন্দী করে রাখা হয়েছে, তাও প্রমান সহ নয়।

আসাদ খাঁ আর ফতেচাঁদের কথা প্রায় এক। হাজত থেকে আনা হল কান্তকে নবাবের সামনে। নবাব বল্লে, 'যাও। তোমার মালিকদের বলো যে তুমি ইংরেজদের কর্মচারী হতে পার, কিন্তু বাদশার প্রজা। তোমার বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ জমা হয়েছিল বলেই তোমাকে হাজত বাস করতে হয়েছে। সম্রাটের দরবারে রাজস্ব পাঠানোর কাজে বড় ব্যস্ত ছিলাম। এ

বিষয়ে নজর দিতে পারিনি। পারলে তোমার বিচার আগেই করতাম। তুমি এখন কুঠিতে ফিরে যেতে পারো। আর ভাল কথা, কুঠিতে গিয়ে বলো যে তারা যেন আগের মতনই কাজ কর্ম করে যায়।'

এরপর নজরানার কথা আর শোনা যায়নি।

সে বছর আগষ্ট মাসে ট্যাঁকশাল ব্যবহার করার জন্য আর একবার চেষ্টা করল ইংরেজরা। তারা হয়ত ভেবে থাকবে নজরানার ব্যাপারে নবাব যখন ধাক্কা খেয়েছে, তখন ট্যাঁকশালের ব্যাপারে সুবিধে হলেও হতে পারে।

যাই ভেবে আসুক, আসাদ খাঁ আর তার সহকারী যত সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিক না কেন, এক পাও এগুতে পারেনি ফেক। সে সহজ ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে কলকাতায়, যতদিন নবাবের দরবারে ফতেচাঁদের প্রতিপত্তি অক্ষুন্ন থাকবে, ততদিন ট্যাঁকশাল ব্যবহার করা ইংরেজদের পক্ষে অসম্ভব। খোলা বাজারে কোন বাঁটাদার কি ব্যবসাদার কড়ি রূপো কিনতে সাহস করে না, পাছে ফতেচাঁদ তাদের ওপর বিরূপ হয়। ফতেচাঁদ বিরূপ হলে তাদের সর্বনাশ। আমাদের সব রূপো কেনে একমাত্র ফতেচাঁদ।

বিলেত থেকে ফেরার পথে কোম্পানী নিয়ে আসত সোনা রূপো। বাংলার বাজারে একমাত্র ক্রেতা শেঠ ফতেচাঁদ। সোনা রূপো ছাড়া থাকতো ফরাসী ও স্পোনীয় ক্রাউন। ওজন দরে কিনে নিত শেঠরাই।

বাজারের একমাত্র ক্রেতা বলেই দর সব সময় তার পক্ষে। দুশো চল্লিশটা শিক্কা টাকা তৈরী করতে যে পরিমান রূপো লাগতো, তার দর বেঁধে দিয়েছিল ফতেচাঁদ দুশো সাত টাকা চার আনায়। দরে পোষায়নি কোম্পানীর। বিক্রি করেনি সেদিন। চুপ করে ছিল ফতেচাঁদ। সেই একমাত্র ক্রেতা। কিছুদিন পরে ফিরে আসতে বাধ্য হল। ইংরেজরা ফতেচাঁদের দর মেনে নিয়ে মাল তুলে দিল শেঠ বাড়ী।

ব্যবসাদার ফতেচাঁদ। দরদস্তুর করা তার রীতি। এক পাই আধ পাই নিয়ে কম কষাকষি করতে হয়নি তাকে। ফতেচাঁদ দর দিল একবার— এক ডুকাতুনের দাম হবে দু'টাকা সাত আনা তিন পাই। এক ডুকাতুন তখন প্রায় ছ' শিলিং এর সমান। এক টাকার দাম তখন দু'শিলিং ছ' পেন্স। কোম্পানী দেখলো ডাহা লোকসান। প্রতিবাদ করলো। বল্লে, 'তারা আগে আরো চড়া দাম পেয়েছে।'

'পেয়ে থাকবে। কিন্তু এখন বেশী দাম দিতে পারবো না কিছুতেই। যদি না পোষায়, মাল ধরে রাখুক কোম্পানী।'

কিছুদিন ধরেও ছিল। তারপর রফা হল,—তিন পাই আর ছ' পাই মাঝামাঝি সাড়ে চার পাইতে।

দর কষাকষি হয়েছে। মাল ধরে রেখেছে ইংরেজ। মাল কিনবে না বলে বসে থেকেছে ফতেচাঁদ। অনেক সময় মতান্তর থেকে হয়েছে মনান্তর। মাঝে মাঝে সব সম্পর্ক চুকে যাবারও উপক্রম হয়েছে। কিন্তু বেশী দূর গড়ায়নি। আবার সেই ভাব ভালবাসা, সেই বিশ্বাস। কোম্পানী বিশ্বাস হারায়নি শেঠদের ওপর। শেঠরাও অনুরক্ত ছিল ইংরেজদের। হয়ত এ কথাও বলা যায় যে ইংরেজের বন্ধুত্ব পাওয়ার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শেঠরাই। কোম্পানীর কর্মচারীরা ব্যবসা করত। নিজেদের ব্যবসা। তার সঙ্গে কোম্পানীর ব্যবসার কোন যোগাযোগ নেই। কিন্তু তবু তারা কোম্পানীর কর্মচারী। তাদের দেনা-পাওনার দায়ী হবে কোম্পানী। কিন্তু তা তারা হত না। শেঠরাও চাপ দিত না। এই ভাবে বহু টাকাই ছেড়ে দিয়েছে শেঠরা ইংরেজদের বন্ধুত্ব রাখার জন্য। শুধু মাত্র বন্ধুত্ব নয়, ব্যবসা করার জন্যও বটে।

শেঠ ফতেচাঁদ ব্যবসাদার। তার লক্ষ্য ব্যবসা, রাজনীতি নয়। ধর্মকে সে চেনে। কিন্তু জাতিকে জানে না। জাতি মানে বড় জোর মাড়োয়ারী। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে ভারতীয় নামে যে নৈর্ব্যক্তিক সত্বা আছে, যার নাম দেওয়া যায় জাতীয়তা, তাকে কোন দিন বুঝতে পারেনি ফতেচাঁদ। বোঝার সময় আসেনি তখনও। শুধু এইটুকু বুঝেছে যে দারুণ পরিবর্তনের মুখোমুখি ভারতবর্ষময় অসংখ্য গদি, আর তার গদিয়ান শেঠ ফতেচাঁদ। বুঝেছে খুব সাবধানে চলতে হবে। লক্ষ্য ভ্রষ্ট হলে চলবে না। যে কোন উপায়ে, ছলে বলে কৌশলে, উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে হবে।

বারো

১৭২২ সালে ভারতবর্ষ জুড়ে টাকার দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। বাদশার তবিল খা খা করছে। বাংলার হাল তথৈবচ। বাদশা তাগাদার পর তাগাদা দিচ্ছে টাকা পাঠানোর জন্য। কিন্তু পাঠাতে পারছে না নবাব। টাকা নেই। আদায়-পত্র একেবারে পড়ে গেছে। ওদিকে মুহম্মদ শা'র উজীর তখন নিজাম উল্-মুলক্। নবাবের ওপর উজীর সদয় নয়। মন পাওয়ার জন্য নজরানা পাঠিয়েছিল নবাব। উজীর তা ফেরৎ দিয়েছে। উজীর

বিরূপ অথচ দিল্লীর কড়া তাগাদা। কি হয় বলা যায় না। আপ্রাণ চেষ্টা করেও টাকা যোগাড় করতে পারেনি নবাব। তখনও পঁয়ত্রিশ লাখ টাকার ঘাটতি। পূরণ করা দায়। প্রায় অসম্ভব।

ফতেচাঁদের কাছে রূপো বিক্রি করেছে কাশিমবাজারের কুঠিয়াল। কিন্তু সব দাম দিতে পারেনি। কুঠিয়াল চিঠি লিখেছে কলকাতায়। নবাবের টাকার দরকার। নবাব জোর করে ফতেচাঁদের গদি থেকে আদায় করেছে পাঁচ লাখ টাকা। তাই সব দাম মিটিয়ে দিতে পারেনি ফতেচাঁদ। বলেছে, কাল দেবে।

আঠারোই জুন কুঠিয়াল এই চিঠি লেখে। এ খবর দেয়নি উকিল। বাজারের গুজব। গুজবের ঠিক ঠিকানা নেই। তিল থেকে তাল হয়। উকিলের খবর তবু পাকা। সে দেয় দরবারের খবর। আমীর মনসবদারদের কথা। নবাবের সঙ্গে খাতির যাদের খুব বেশী, তাদের কাছে ঘুরঘুর করে উকিল। চাই পাকা খবর।

নবাবের টাকার দরকার। দরবারের তাড়া থেকে রেহাই পেতে নবাব বিব্রত। কিন্তু নবাব জানতো শেঠদের গদি থেকে টাকা কেড়ে আনার বিপদ কতখানি। যে মানিকচাঁদকে আশ্বাস দিয়ে, আশ্রয় দিয়ে এতখানি বড় করে তুলেছে মুর্শিদকুলি, সে মানিকচাঁদের গদি তার স্বাভাবিক বিকাশের পথ ধরেই ছাড়িয়ে গেছে মরণাপন্ন নবাবীয়ানার প্রতাপকে। নবাবের কাছে থাকতে পারে রাজশক্তি। কিন্তু এখন তার একটা নতুন শক্তি এসেছে। আগে জানতে পারেনি নবাব। এখন জেনেছে। সে শক্তির নাম অর্থ। তার কাছে রাজশক্তি হীনপ্রভ। সেই অর্থ আছে শেঠ ফতে-চাঁদের। নবাব তা জানতো। ফতেচাঁদকে তাই আহত করেনি কোনদিন। আর জানতো কোম্পানী। সে জন্য ওই বছরই আগষ্ট মাসে কোম্পানী ধর্ণা দিয়েছিল মহিমাপুরে।

·

ঢাকার ওলন্দাজ বণিকের উকিলের বিরুদ্ধে পঞ্চাশ হাজার টাকার তহবিল তছরূপের অভিযোগ এল। নবাব বন্দী করে আনলো ঢাকার উকিলকে। ঢাকার উকিলের কাকা মুর্শিদাবাদে ইংরেজদের উকিল। নবাবের সন্দেহ হল, নিশ্চয়ই দুই উকিলের ভেতর কোন যোগাযোগ আছে। বন্দী করা হল ইংরেজদের উকিলকেও।

ইংরেজরা তাদের উকিলকে ছাড়িয়ে আনতে তৎপর। নবাব বল্লেঃ

'ছেড়ে দেবো। কিন্তু তাকে লিখে দিতে হবে যে, যদি তার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ প্রমাণিত হয়, তবে টাকা দিয়ে ক্ষতিপূরণ করবে।'

নবাবের প্রস্তাবে রাজী হয়নি কোম্পানী। তাদের মতে, এ নবাবের জবরদস্তি। তাই পাঠানো হল বোরলেসকে শেঠ বাড়ী। বোরলেস কাশিমবাজারের ইংরেজ সেপাইদের ক্যাপটেন।

মহিমাপুরে ফতেচাঁদের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বলেছিল ক্যাপটেন বোরলেস। বোরলেস জানিয়ে দিয়েছে যে নবাবের এই সব অন্যায় জুলুম ইংরেজদের পক্ষে ক্রমাগত মারাত্মক হয়ে উঠছে। ইংরেজরা কিম্বা তার উকিল কোনক্রমে মুচলেকা দেবে না। তারা চায় যে তাদের উকিলকে এখনি ছেড়ে দেওয়া হোক। নবাব যদি অস্বীকার করে, তাহলে ইংরেজরা উচিত মত ব্যবস্থা করবে। সামরিক কায়দায় অভিবাদন জানিয়ে বেরিয়ে এল বোরলেস।

ক্যাপটেনের সঙ্গে কথাবার্ত্তার পরই ফতেচাঁদ সোজা গিয়েছিল চেহল স্তুনে। সাহেবদের মেজাজ চড়া। ফতেচাঁদের সঙ্গে পরামর্শ হল বহুক্ষণ। পরের দিন ছাড়া পেল ইংরেজদের উকিল। কিন্তু ধরা পড়ল ডাচদের মুর্শিদাবাদের উকিল।

নবাব আহত করেনি ফতেচাঁদকে। বরং নবাব ক্রমাগত বিনীত হয়েছে। নবাবের সঙ্গে শেঠবাড়ীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে এসে গেছে বহুদিন।

নবাবের টাকার টানাটানি হয়েছিল ঠিকই। টাকার টানাটানি সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে। সমগ্র ভারতবর্ষে টাকার এত চলন ছিল না কখনও। ফতেচাঁদ নবাবের অবস্থা বুঝে সাহায্য করেছে। কিন্তু শেঠদের ওপর দাবী নিয়ে আসেনি শুধুমাত্র নবাব। স্বয়ং বাদশা মুহম্মদ শা' শেঠবাড়ীর প্রার্থী। মান রাখতে হয়েছে দিল্লীশ্বরের। তাই রূপোর দাম মিটিয়ে দিতে দেরী হয়েছিল একদিনের। তামাম ভারতবর্ষে টাকার টানাটানি। দুভিক্ষ ছড়িয়ে পড়েছে উত্তর ভারতে বেশী করে। মুহম্মদ শা' বাদশা হয়েই বিপদে পড়েছিল। শূন্য রত্নভাণ্ডার নিয়ে তার সাম্রাজ্য আরম্ভ। সেনাদের মাইনে বাকি। দলে দলে তারা ছাউনি ছেড়ে চলে যায়। নিরাপদে রাজত্ব করার সময় নয় তখন। অষ্টপ্রহর বিপদের আশংকা নিয়ে বাঁচা। রাজত্ব পেয়েও সুখ পায়নি বাদশা। একমাত্র বাংলা থেকে টাকা যেতে পারতো। বাদশার অন্তত তাই-ই বিশ্বাস। কিন্তু বাংলার কামধেনু তখন

বিকল। হাজার চেষ্টা করেও নবাব টাকা যোগাড় করতে অসমর্থ। অভাব ছড়িয়ে পড়ছে সর্বত্র।

বাজারে যে ধান চাল নেই তা নয়। কিন্তু কেনার সামর্থ নেই। কাতারে কাতারে মানুষ প্রাণ দিচ্ছে অনাহারে। বিলাসের নগরী কোনদিন এমন ছবি দেখেনি। রোশনাই আতরের শহর দিল্লী। মোটামুটি কেতা দুরস্ত থাকতে চেষ্টা করে মধ্যবিত্ত। দরিদ্র লোক থাকে শহরের বাইরে। সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে আসে গ্রামের ভূমিহীন কৃষক। কিন্তু যারা থাকে নগরে, যাদের জন্যেই এই নগর, তারা অন্য লোক।

আমীর ওমরাহ, রাজা রাজড়া, মনসবদাররা অধিকার করে থাকে দিল্লী। ঘোড়ায় চড়ে আসে কেউ কেউ দুর্গে, দরবারে। চার জন চাকর আগে পিছে প্রভুর জন্যে পথ পরিষ্কার করতে ব্যস্ত। কেউবা যায় হাতীর পিঠে। ছয় বেহারার পালকিতে মখমলের গদিতে হেলান দিয়ে সুগন্ধি পান চিবুতে চিবুতে যায় কেউ কেউ। পালকির সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াতে থাকে পোর্সেলীন বা রূপোর পিকদান নিয়ে খাস চাকর। থাকে তার দু'পাশে দু'জন নোকর। তাদের হাতে ময়ূরপুচ্ছের পাখা। তারা ধুলো ঝাড়ে, মাছি তাড়ায়। তিন জন চাকর দৌড়াতে থাকে পালকির আগে আগে। তারা পথের লোক হটায়, জন্তু তাড়ায়। পিছনে ঘোড়ায় চড়ে আসে অশ্বারোহী। এইতো বাদশার দিল্লী।

গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্য মাটির নিচের ঘরে যায় আমীর ওমরাহ। কারো বাড়ীতে টানানো থাকে সপসপে ভিজে খস্‌খস্। পাঁচিল দেওয়া বাড়ী। ভেতরে বাগান। বাগানে নানান রঙের ফুল। মাঝখানে বসার বেদী। বাগানের পর ঘর। অনেক কামরা। বসার ঘরে চার ইঞ্চি পুরু গদির ওপর ধপধপে সাদা চাদর। মেঝেতে সিল্কের কার্পেট। ঘরের কোণে আরো কয়েকটা গদি। গদির ওপর ভেলভেটের মখমলের কাজ করা তাকিয়া, —ছড়ানো, ছিটানো। এইতো আমীর ওমরাহের দিল্লী।

বাজারে মদ আছে অঢেল। শরিয়তের নিষেধ সত্বেও হিন্দুস্থানের আঙুরের মদ চাই-ই। পারস্য থেকে আসা শিরাজ আর ওলন্দাজদের ক্যানারি মদ না হলে মাটি হয় সন্ধ্যার আসর। তুলোয় ঢাকা পেস্তা, বাদাম, আখরোট, খুবানী আছে প্রচুর। ডালিম বেদানা আপেল ভিন্ন শরীর থাকে না। গরমকালে দুর্মূল্য তরমুজের সরবৎ ভিন্ন চলে কি করে। কি করেই বা বাদ দেওয়া যায় বাদশাহী খানা।

আমীর ওমরাহ, রাজা রাজড়া, মনসবদারেরা চুপ করে যায় খোদ দিল্লীর ওপর ক্ষুধার্তের অভিযান দেখে। সে এক করুণ কান্নার শোভাযাত্রা। মোগল বাদশাও চমকে ওঠে।

শেঠ ফতেচাঁদ তখন দিল্লীতে। দরবারে আসতেই মহা সমারোহে অভ্যর্থনা করলেন বাদশা। দুর্ভিক্ষের কথা উঠলো। না উঠে উপায় নেই। শেঠ ফতেচাঁদ তখন বলেছিল, অভাব মেটাতে চেষ্টা করব।

দুর্ভিক্ষর প্রকৃতি শেঠের জানা। জিনিষের অভাব হয়নি। অভাব কেনার ক্ষমতার। ফতেচাঁদ বল্লে, 'রাষ্ট্র করে দেওয়া হোক, আমার দিল্লীর গদি থেকে হুণ্ডি ছাড়া হবে। কেনা বেচার সময় টাকার মতন সমানভাবে গ্রাহ্য হবে এই হুণ্ডি।'

ফতেচাঁদের কথামত কাজ করেছেন বাদশা। রাষ্ট্র করা হয়েছে শহরের দরিদ্র এলাকায়। যেখানে ছোট ছোট ছাউনি ফেলে গায়ে গায়ে জড়োসড়ো হয়ে কোনক্রমে মানুষ নামক জীব প্রথম ও শেষ কান্নার অন্তবর্তী দীর্ঘ সময়টা কাটিয়ে দেয় কায়ক্লেশে। তারপর দাম পড়েছে। সহজ জীবনযাত্রা আরম্ভ হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, দরবারে দাঁড়িয়ে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল শেঠ ফতেচাঁদ তার তাৎপর্য বড় গভীর। পরবর্তী কালে নোট প্রচলিত হবার সূত্রপাত হয়েছে সেদিন থেকে।

তাই নবাব চটেনি শেঠের ওপর। বরং ফতেচাঁদ কিনে নিয়েছে নবাব এবং বাদশাকে।

স্তম্ভিত হয়েছে আমীর ওমরাহ। হয়ত নিজেও অবাক হয়েছিল শেঠ ফতেচাঁদ। কারণ যে সত্যজাত শক্তি তার হাতের মুঠোর ভেতর, তার ক্ষমতা এত গভীর ও সর্বব্যাপ্ত হতে পারে ভাবতে পারেনি। ক্ষুদ্র আয়তনে অপরিমিত শক্তি দেখে বিমূঢ় হয়েছে সেপাহ্-সালার। উপযুক্ত সম্মান দিতে অকুণ্ঠিত বাদশা মুহম্মদ শা'।

১৭২৪ সালের অক্টোবরের শেষ। দরবারের পূর্ণ অধিবেশনে ফর্মান পড়া হল সম্রাট মুহম্মদ শা'র।

'এই শুভ ও আনন্দযুক্ত সময়ে এই চিরস্থায়ী সাম্রাজ্যের কিরণস্বরূপ জগৎমান্য ও জগদবশীভূতকারী আদেশ দ্বারা শেঠ ফতেচাঁদ বিশ্বস্ততা ও গৌরবের নিদর্শনস্বরূপ জগৎশেঠ উপাধি এবং মতির কানবালা ও হস্তী এবং তাহার পুত্র আনন্দচাঁদ শেঠ উপাধি ও মতির কানবালা খেলাৎ প্রাপ্ত হইলেন। অধিকৃত রাজ্যের সমুদয় বর্তমান ও ভাবী হাকিম, আমলা

ও 'মুৎসুদ্দীদের উচিত যে, উল্লিখিত শেঠ ফতেচাঁদকে জগৎশেঠ ও তাহার পুত্রকে শেঠ আনন্দচাঁদ লেখেন। এ বিষয়ে যত্ন ও মনোযোগ প্রদান আবশ্যক। ইতি : ৪ সাল জলুশ ১২ই রজব তারিখ।'

'যিনি রাজ্য ও রাজনীতির মহত্ব ও গৌরব অবগত আছেন, যিনি রাজধর্মের গূঢ় তত্ত্ব জানেন, যিনি রণস্থলে অগ্রগামী ও সৈন্যগণের পরিচালক, উপযুক্ত পরামর্শদাতা, যিনি সাম্রাজ্যের বিশ্বাসভাজন, সম্ভ্রান্ত বংশীয়, উচ্চপদস্থ, ক্ষমতাসম্পন্ন, যিনি রাজ্য ও ধনের সুবন্দোবস্তকারী, যিনি পতাকার উন্নয়নে সমর্থ সুবন্দোবস্তকারী নিরপেক্ষ উজীর, যিনি সাম্রাজ্যের দুরূহ ব্যাপারের অবলম্বনস্বরূপ, যিনি উজীরগণের মধ্যে বিশ্বাসী ও বন্ধু, সেই নিজাম উলমুলক ফতে জঙ্গ বাহাদুর সেপাহ-সালার সেনানিবেশ বরাবরেষু।

নিজাম উলমুল্ক।'

জগৎশেঠ উপাধি পাবার একটা গল্প চালু আছে। একবার নাকি সম্রাট মুহম্মদ শা' নবাব মুর্শিদকুলির ওপর খুব বিরক্ত হয়ে ওঠে। বাদশা নাকি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিল যে নবাবকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে সেই জায়গায় বসাতে হবে শেঠ ফতেচাঁদকে। বাদশা আরও একবার এই কথা পেড়েছিল ফতেচাঁদের সামনে। বিব্রত হয়ে ফতেচাঁদ বলেছিল : 'তা হতে পারে না। শেঠরা বহুদিন থেকে নবাবের অনুগ্রহ পেয়ে আসছে। নবাবের কৃপায় মানিকচাঁদ ভারতবিখ্যাত গদিয়ান। বাদশার দরবারে আজ যে সম্মান, খাতির যত্ন পাচ্ছে তার মূলে নবাবের স্নেহ ও অনুগ্রহ। শাহান শাহ বাদশার অনুগ্রহ পেয়ে কৃতার্থ। কিন্তু সে অনুগ্রহ নবাব মুর্শিদকুলি না থাকলে কোনদিন পেতাম না। তাকে সিংহাসনচ্যুত দেখা আমার পক্ষে মর্মান্তিক। মুর্শিদকুলির শূন্য সিংহাসনে বসা নিশ্চয়ই অপরাধ। জগতের সামনে অকৃতজ্ঞ ছাড়া আর কোন পরিচয় থাকবে না আমাদের। আপনি যদি অনুগ্রহ করেন, তবে অনুরোধ করি, নবাব মুর্শিদকুলি যদি কখনও কোনও অপরাধ করে থাকেন, তবে তাকে ক্ষমা করুন।'

ফতেচাঁদের মহত্বে নাকি অবাক হয়েছিল বাদশা। তাকে দিয়েছিল জগৎ শেঠ উপাধি। আর আদেশ করেছিল, নবাব যেন রাজত্বের প্রতিটি বিষয়ে ফতেচাঁদের পরামর্শ নেয়।

কিন্তু এ গল্প। প্রমান নেই। শেঠ বাড়ীর প্রচলিত প্রবাদ। প্রমান আছে শুধু এইটুকু যে বাদশা নবাবের ওপর রেগেছিল। রাগার কারণও

আছে। বাদশার টাকার অভাব। ভরসা তার বাংলার টাকা। টাকা পাঠাতে পারেনি নবাব। অন্যদিকে শত্রু উজীর নিজাম উলমুলক। বাদশা তাই ধৈর্য্য হারাল।

মুর্শিদাবাদ আর দিল্লীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দূর হয়েছে ফতেচাঁদের দক্ষতায়। দরবারে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হল জগৎশেঠ ফতেচাঁদের প্রতিপত্তি। মানিকচাঁদ হাতের মুঠোর মধ্যে এনেছিল শুধু বাংলা বিহার উড়িষ্যার বিধাতাকে। আর ফতেচাঁদের প্রভাবের ভেতর শুধু মাত্র সুবাদার নয়, দিল্লীশ্বর বা জগদীশ্বর।

দিল্লীর দরবার থেকে যত বার খেলাত এসেছে সুবা বাংলার নাজিমের জন্য, ঠিক সেই দামের সেই রকম খেলাত এসেছে মহিমাপুরের দ্বিতীয় নবাব জগৎশেঠ ফতেচাঁদের জন্য। 'জগৎশেঠ' নামাঙ্কিত সীল পাঠিয়েছিল বাদশা। সে সীল আগাগোড়া পান্না দিয়ে মোড়া। অনুরোধ করেছিল বাদশা, এ সীল যেন যত্ন করে রাখা হয়। বংশ পরম্পরাক্রমে অধিকার করতে থাকে সম্রাটের প্রীতি ও শুভেচ্ছার এই প্রতীক।

তেরো

১৭২৩ সালে ইংরেজরা আবার নবাবের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়ল। মালদায় কোম্পানীর কুঠিতে কাজের অভাব নেই। রেশমের কারবারে বেশ দু'পয়সা আয় হয় কোম্পানীর। কাশিমবাজার আর মালদার কুঠিতে রেশমের কাজ সব চেয়ে বেশী হত সে সময়।

এই কারবার থেকে আয় বেশী বলেই যত্নও বেশী। কোম্পানীর যত্ন মানেই তাঁতীদের প্রাণান্ত। জুলুম মাত্রা ছাড়িয়ে যায় মাঝেমাঝে। মাঝেমাঝে তাঁতীরা তাঁত ফেলে পালায়। আরম্ভ করে চাষ-বাস। কিন্তু ফিরে আসে আবার। তাঁত ছেড়ে থাকার উপায়ও নেই। ছড়ায় বলে:

চরকা মোর ভাতার পুত, চরকা মোর নাতি,
চরকার কল্যাণে মোর দুয়ারে বাঁধা হাতী।

কোন তাঁতির দোরে হাতী বাঁধা থাকেনি। থাকলেও জানা নেই। কিন্তু আশা ছিল থাকবে। আশায় মরে চাষা। আশায় আশায় দাদন নিত চাষী। দাদন নিলেই মরণ। কোম্পানীর গোমস্তারা দাদন দেওয়ার জন্য সাধাসাধি করে। প্রয়োজন ছিলই এমনিতে। এখন টাকা সুলভ হওয়াতে এল প্রলোভন।

প্রলোভন দেখাতে কসুর করে না গোমস্তা। একবার যদি দাদন হাতে গুঁজে দিতে পারে, তবে আর যাবে কোথায়। নাকে দড়ি দিয়ে কাজ আদায় করবে। সুখ নেই, অসুখ নেই, রোগ নেই, শোক নেই, ঠিক সময়ের মধ্যে কাজ তুলে দিতেই হবে। দাদনের সুখ হাড়ে হাড়ে টের পায় তাঁতী।

প্রভুর দোসর নাই উপায় কে করে,
কাটনার কড়ি কত যোগাব ওঝারে।
দাদনি দেয় এবে মহাজন সবে,
টুটিল সুতার কড়ি উপায় কি হবে?
দু'পণ কড়ির সুতা, এক পণ বলে,
এত দুঃখ লিখেছিলা অভাগী কপালে।

মুকদুমপুরের কুঠি নিয়ে মালদার জমিদার গেল কোম্পানীর বিরুদ্ধে। বিবাদ ঘনিয়ে এল। ত্রাণ পায়নি প্রজারা। কোম্পানী সরিয়ে নিয়েছে কুঠি জমিদারের সীমানা থেকে। জমিদার ছাড়বার পাত্র নয়। দমবারও পাত্র নয় ইংরেজ। খবর পৌঁছাল নবাবের কানে, মালদা থেকে কুঠি সরিয়ে এনেছে কোম্পানী। রেগে উঠল নবাব। কাশিমবাজারের কুঠিয়াল ছুটে গেল ফতেচাঁদের কাছে। ফতেচাঁদ কয়েকবার ইংরেজদের হয়ে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু কোন ফল হয়নি। হবে না তা জানতো। ফতেচাঁদ জানিয়ে দিল যে তাকে আর এ ব্যাপারে টানাটানি না করাই ভাল। দরবারে কোম্পানীর হয়ে ওকালতি করা তার পক্ষে সব সময় শোভন নয়। কুঠিয়াল ঠিক এই কথাই জানালো কলকাতায়।

কুঠিয়ালের চিঠি পেয়ে কাউন্সিল প্রস্তাব পাশ করল। মালদায় সৈন্য পাঠানো হোক। নবাবের বিশেষ প্রিয়পাত্র ফতেচাঁদকে লেখা হোক যে কোম্পানী কিছুতেই এই অপমান মেনে নেবে না। জানিয়ে দেওয়া হোক যে জমিদারের কাজ বে-আইনী। নবাবের রায় অসঙ্গত। যদি কোন প্রতিকার না করা হয়, তবে কোম্পানীর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

প্রস্তাব শুনে ফতেচাঁদ বল্লে: 'ইংরেজদের হয়ে কথা বলে এসেছি। তবে নবাবের মেজাজ খুব খারাপ। তবু দেখবো আর একবার চেষ্টা করে।'

চেষ্টা আর একবার করেছিল ফতেচাঁদ। ফল হয়নি। নবাব বিরক্ত হয়ে ধমক দিয়েছিল। ইংরেজদের পক্ষ হয়ে এমন খোলাখুলি ওকালতি করার জন্য। একটু লজ্জিত হয়েছিল ফতেচাঁদ নিজেও।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ফতেচাঁদকে চাপ দিয়েছে কোম্পানী। দরজায় ধর্ণা দিয়েছে। কখনও চোখ রাঙিয়ে, কখনও হাত জোড় করে কাজ হাসিল করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে বহুবার। ফতেচাঁদ এ বিষয়ে আর কোন কথা বলেনি নবাবকে।

অক্টোবর মাসে মালদার জমিদার মারা গেল। কিন্তু মিটল না বিবাদের জের। রাজমহল থেকে পাঠানো হল পাঁচশ' অশ্বারোহী আর তিনশ' 'বন্দুকচী'। কোম্পানীর কুঠিয়াল আবার গিয়ে পড়েছে ফতেচাঁদের কাছে। অনুনয় বিনয় করেছে বহুবার। আবেদন করেছে, যেন কুঠির কর্মচারীদের ধর-পাকড় না করা হয়। কিন্তু ফতেচাঁদের কাছ থেকে আর কোন কথা আদায় করতে পারেনি। ২২শে তারিখে কাশিমবাজার থেকে এই কথা জানানো হল কলকাতায়।

নবাবের সৈন্য মালদার কুঠি দখল করে বন্দী করেছে কর্মচারীদের। নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধিতার কথা জেনেও যারা কাজ কারবার করে গেছে রীতিমত, তারাও বাদ যায়নি। কোম্পানীর কুঠিয়াল খবর পায় সবই। উপায় নেই। কুঠিয়াল আদেশ দিয়েছে উকিলকে, নবাবের দরবারে গিয়ে 'বিচার চাই' বলে ধ্বনি দিতে।

ফতেচাঁদ পেয়েছে কলকাতার চিঠি। কাউন্সিল আবার অনুরোধ করেছে ফতেচাঁদকে, সে যেন তার প্রভাব আর একবার ব্যবহার করে কোম্পানীর পক্ষে। শেষকালে লিখেছে কাউন্সিল, যদি অন্যায় ও অবিচার বন্ধ না হয়, যদি এইভাবে কোম্পানীর বিষয়-সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্থ হতেই থাকে, তবে যুদ্ধ ছাড়া আর কোন উপায় থাকবে না। কিন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহ এড়াতে চায় কোম্পানী। চিঠি ছাড়া নিজে আর একবার গিয়েছে কুঠিয়াল। কিন্তু কোন আগ্রহ দেখায়নি আর ফতেচাঁদ। ২৮শে নভেম্বর কুঠিয়াল কলকাতায় লিখলো: মুকদমপুরের ব্যাপারে ঘাড়ে জল পাততে চায় না শেঠ।

নবাব ইংরেজের ওপর বিরক্ত। নবাবের বিরক্তি এত স্পষ্ট যে, দরবারে অতি প্রিয়জনও কোম্পানীর হয়ে কথা বলার সাহস পায় না।

কোম্পানী এক ধাপ এগিয়ে গেল। ফোর্ট উইলিয়মের পাশ দিয়ে কোন মুসলমান বণিকের নৌকো যেতে দেয়নি। মালদার নবাবী সৈন্য চলে গিয়েছে। কিছুতেই কিছু হল না। আটক থাকলো কোম্পানীর নৌকো। দিনের পর দিন বন্দী থাকলো মুসলমান বণিকের জাহাজ। ভ্রূক্ষেপ

করেনি নবাব। শেষে বাধ্য হয়ে ১৭২৪ সালের ৩রা জানুয়ারী মালদা থেকে কারবার গুটিয়ে আনতে বাধ্য হল কোম্পানী।

কারবার গুটিয়ে আনা বিবাদের নিষ্পত্তি নয়। লাভের কারবার বন্ধ করতে আসেনি ইংরেজ। অন্য পথ দেখে তারা। নবাবের কাছে আর এক বার আবেদন করে। বলে, তারা আসবে, নিজের মুখে বলবে তাদের অভিযোগ। বিচার প্রার্থনা করবে।

প্রস্তাব এল জুন মাসে। নবাব জবাব পাঠালো জগৎশেঠ ফতেচাঁদের মারফৎ। স্থিরভাবে জগৎশেঠ সেদিন কাশিমবাজারের কুঠিয়ালের কাছে খুলে বলেছিল নবাবের বিরূপতার কারণ। দীর্ঘ দিনের জট পাকানো ইতিহাস, স্বার্থের সংঘাত আর ব্যক্তিগত ভুল বোঝাবুঝির ইতিবৃত্ত অনাবৃত করার চেষ্টা করেছিল ফতেচাঁদ। অতীতের ছায়া বর্ত্তমানে। অতীত বর্ত্তমানের সংঘাত সংকট থেকে ভবিষ্যতের ছায়াপথ। ফতেচাঁদ চেয়েছিল প্রায়ান্ধকারে আলো ফুটে উঠুক।

কথা শেষ হল। কুঠিয়াল শুধু এইটুকু বুঝে ফিরে গেল যে নবাব ইংরেজদের কথা শুনতে পারে নগদ পাঁচ হাজার টাকা নজরানা পাবার পর। কিন্তু মালদার কুঠি যে তারপর খুলবেই এমন সম্ভাবনা আদৌ নেই। কুঠি খুলতে হলে আরো কিছু ঢালতে হবে নবাবের দরবারে। তবে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ চেষ্টা করবে যত কমে হয়। সব চেয়ে কম অঙ্ক হল বিশ হাজার টাকা।

পরের বছরটা বেশ কাটলো। নবাবের সঙ্গে নতুন বিবাদ বাধেনি। কাশিমবাজারের কুঠিয়াল হেনরি ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড আসবে কলকাতায়। পদোন্নতি হয়েছে তার। সে হবে ফোর্ট উইলিয়মের গভর্ণর। যাবার আগে কুঠিয়াল চিঠি লিখে জানালো নবাবকে যে কাশিমবাজার ছাড়ার আগে নবাবকে একবার মুবারক জানাতে চায়। নবাবও উত্তর দিল তখুনি। শরীর খুব খারাপ বলে দেখা করতে পারবে না। তার জন্য দুঃখিত। জগৎশেঠ ফতেচাঁদের মারফৎ নবাব ইতিমধ্যে কুঠিয়ালের সঙ্গ বিলক্ষণ পরিচিত হয়েছে। যাই হোক, নবাব বরাবরই কোম্পানীর বন্ধু এবং বন্ধুই থাকতে চায়।

নবাবের সঙ্গে কোম্পানীর সম্পর্কের জটিলতা ঘটতে পারে। কিন্তু ফতেচাঁদের সঙ্গে ঘটেনি। ফতেচাঁদ নবাবের বন্ধু, ইংরেজেরও। ফতেচাঁদ ব্যবসাদার। রাজনীতি করতে আসেনি। রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়লেও পথ ও লক্ষ্যের বিভ্রম হয়নি কখনও।

১৭২৬ সালে ঢাকার কুঠিতে টাকার টানাটানি পড়লে ফতেচাঁদ জানিয়ে দিল, টাকার জন্য কোন ভাবনা নেই। যত টাকা দরকার নিতে পারে কোম্পানী। ঢাকার গদিতে সে নির্দেশ দিয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেবার জন্যে। টাকা ভাঙানো নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ল কোম্পানী। ফতেচাঁদ জানিয়ে দিল, তার গদি থেকে ইচ্ছামত টাকা ভাঙিয়ে নিয়ে যায় যেন।

১৭২৬ সালের ডিসেম্বর মাসে বিপদ আরও গভীর হয়ে এল।

মুর্শিদকুলি খাঁর জমিদারী কলকাতায়। আবদুল রহিম দেখাশুনো করত সেই জমিদারী। শুধু তাই নয়। রাজস্ব বিভাগে মোটা চাকরী তার। প্রজাদের কল্যাণকামী নবাবের নাম ছিল জমিদারদের শত্রু বলে। জমিদারদের শাসন করতে যে ক'জন কর্মচারী বিশেষভাবে সাহায্য করেছে, আবদুল রহিম তাদের একজন।

কলকাতায় কেল্লা আর কুঠি তৈরী করার জন্য রহিম দাবী করে বসল চুয়াল্লিশ হাজার টাকা। দাবীর বহর ও আকস্মিকতায় বিব্রত হল কোম্পানী। সময় অপচয় করার পাত্র নয় রহিম। মুশিদাবাদের উকিল বন্দী হল রহিমের হাতে। জানিয়ে দিল, যদি তাড়াতাড়ি টাকা মিটিয়ে দেওয়া না হয়, তবে কোম্পানীর সব উকিলের বরাতে জুঠবে হাজত বাস।

রহিমের অত্যাচার আর পীড়নের কথা জানে হুগলীর নায়েব গোমস্তা আর জমিদার। সেই রহিমের প্রকাশ্য হুমকিতে মুখ চূণ সব উকিলের।

এবারও কোম্পানী ধরলো জগৎশেঠ ফতেচাঁদকে। কলকাতা থেকে আসে চিঠির পর চিঠি। প্রতি চিঠিতে ঐ এক কথা। রহিমের দাবী অযৌক্তিক। কাজ গর্হিত। ফতেচাঁদ যেন নবাবকে বোঝাতে চেষ্টা করে। কোম্পানী কিছুতেই আর টাকা দিতে পারবে না। তাতে যা হবার হয় হোক। সব চিঠির সারমর্মই এক। শেষে থাকে প্রার্থনা, উকিলকে ছেড়ে দেওয়া হয় যেন।

কিন্তু এক পা যেতে পারে না ফতেচাঁদ। ব্যাপারটা জটিল। নবাব ইংরেজদের সইতে পারে না। এই নিয়ে অপ্রীতিকর অবস্থা যে ঘটেনি তাও নয়। বছর দু'য়েক আগেই ঘটেছে। মনে আছে ফতেচাঁদের। নবাব চায় না ইংরেজের হয়ে কেউ কথা বলুক।

তার ওপর কলকাতা নবাবের জমিদারী। নিজের জমিদারীতে যা ঘটছে তার জন্যে মাথা ব্যথা কেন অন্য লোকের? কোন মুখে ফতেচাঁদ কথা বলতে যাবে?

ফতেচাঁদ জানে রহিম যা কিছু করছে তার পিছনে নবাবের সম্মতি আছে। তা ছাড়া কিছুতেই রহিমের বুকের পাটা এত বড় হত না। টাকা চাই নবাবের। যে কোন প্রকারে টাকা তুলতে হবে। প্রজাদের দেবার ক্ষমতা নেই। তাদের ওপর আর জুলুম চালানো ঠিক নয়। তাই টাকা আদায় করতে হবে বিদেশী বণিকদের কাছ থেকে। বিদেশীদের ভেতর ইংরেজদের কারবার ভাল। হাতেও টাকা আছে প্রচুর। সুতরাং ইংরেজদের কাছ থেকে টাবা চাই-ই। তা সে কলকাতার জমিদারীর বাড়তি খাজনা হিসেবে হোক, কিম্বা অন্য যে কোন খাতে হোক। এ ক্ষেত্রে কোম্পানীর হয়ে নবাবের কাছে কথা বলার ফল হবে হিতে বিপরীত। চিঠি পেয়েও চুপ করে থাকে ফতেচাঁদ।

ছাড়বার পাত্র নয় রহিম। মুর্শিদাবাদের কুঠি থেকে কয়েকজন কর্মচারীকে পুরে রেখে দিল হাজতে। ভয় পেয়ে কান্তবাবু শরণ নিল কুটির ভিতরে। কাশিমবাজার ছেড়ে পালাল জন কতক ব্যবসায়ী। ইংরেজরা পাঠাল হুগলীর উকিলকে ওয়াকের দপ্তরখানায়। অভিযোগ লিখিয়ে এল উকিল। ওয়াককে অভিযোগ জানালে বাদশার নজরে আসবে নিশ্চয়ই। রহিমের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে হয়ত। ফোর্ট উইলিয়মের মুখে আটকাতে থাকলো সব ভারতীয় নৌকো।

কোম্পানী এক পা এগিয়ে আসে ত দশ পা আগে বাড়ে রহিম। কোম্পানীর সব জাহাজ আটকে দিল সে। যারাই কারবার করেছে কোম্পানীর সঙ্গে, তাদের নৌকোও বাদ গেল না।

হুগলীর ফৌজদারের কাছে আবেদন গেল বণিকদের। ইংরেজ তাদের মালপত্র আটক করেছে। ব্যবসা ডোবে ডোবে। অথচ নবাব তাদের কাছ থেকে শতকরা আড়াই টাকা হারে প্রাপ্য কর কড়ায় গণ্ডায় আদায় করতে কসুর করেনি। নবাব যদি তাদের মালপত্তর ছাড়ানোর ব্যবস্থা না করে, তবে ফেরত দিক তাদের টাকা। ব্যবসা বন্ধ করে দেবে তারা। ফৌজদার আবেদন পত্র পাঠিয়ে দিল নবাবের কাছে।

নবাব বুঝলো ব্যাপারটা গড়িয়ে গেছে বহুদূর। এবার ফেরা দরকার। ডাক পড়ল ফতেচাঁদের। মধ্যস্থতার কাজে ফতেচাঁদ ওস্তাদ। ইংরেজরা মানে তাকে। সমীহ করে নবাব। দু' পক্ষের কথা শুনে মাঝামাঝি রফা করতে পারবে নিশ্চয়ই। এ হল ১৭২৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের শেষের দিকের কথা।

তখন অনেক রাত। ফতেচাঁদ আসতেই নবাব বলে উঠল, 'কি ব্যাপার! তোমরা কি সব পাগল হয়ে উঠলে? আমার দু'লাখ টাকা যে হুগলীর জলে ডোবে।'

'কেন?'

'ইংরেজরা সব নৌকো আটকে লুটপাট আরম্ভ করেছে।'

'তবে বিহিত করা দরকার।'

'সেই জন্যেই ত ডাকা। কাশিমবাজারের কুঠি একেবারে বন্ধ হয়েছে? না সেখানে এখনো কেউ আছে?'

'সবাই যায়নি। আছে কেউ কেউ। কুটিয়াল এখানে নেই।'

'তবে?'

'যদি হুকুম করেন তবে ওদের চৌবেদারকে ডেকে পাঠাই।'

মৃদু হেসে নবাব উত্তর দিল, 'এখানে আসার সাহস নেই চৌবেদারের। তার চেয়ে বরং তোমার গোমস্তাকে ডেকে পাঠাও।'

মহিমাপুর থেকে ছুটে এল ফতেচাঁদের গোমস্তা। নবাব আর জগৎশেঠ তখনও পরামর্শ করছে। খবর এলো গোমস্তা এসেছে। ফতেচাঁদ গোমস্তাকে ডেকে বল্লে, 'এখুনি কাশিমবাজার যাও একবার। কুঠিতে সোজা চলে যাবে। কান্তবাবুকে বলবে, ফতেচাঁদ তার সঙ্গে কথা বলতে চায়।'

কান্তবাবু আসেনি। আসতে দেয়নি কুঠি থেকে। চিঠি এনেছে গোমস্তা। কুঠি থেকে জানিয়েছে যে কান্তবাবুকে তারা ছেড়ে দিতে পারবে না। কান্তবাবু একবার নবাবের হাতে পড়লে আর ফিরতে নাও পারে। তবে ফতেচাঁদ যদি জামীন হয়, তবে কান্তবাবুকে পাঠানো হবে।

উত্তরে ফতেচাঁদ লিখে পাঠাল, তার কোন দরকার নাই। কান্তবাবুকে চাই-ই এমন কথা নয়। তোমাদের যদি অন্য কোন নির্ভরযোগ্য গোমস্তা থাকে, তবে তাকেই পাঠিয়ে দাও। জরুরী বিষয়ের আলোচনা আছে। বিষয়টা যে কত গুরুতর তা তোমরা আন্দাজ করতে পারবে না।

জগৎশেঠ ফতেচাঁদ মধ্যস্থতার কাজে নেমেছে আবার। ২১শে তারিখে নিজের গোমস্তাকে দিয়ে চিঠি পাঠাল ফতেচাঁদ:

'তোমাদের কুঠিয়াল স্টিপেনসন ফিরে এলে নবাবকে কি নজরানা দেবে? তার প্রতিদানে নবাব তোমাদের উকিল এবং অন্যান্য বন্দীদের ছেড়ে দেবেন। কলকাতার খাজনা নিয়ে যে গোলমাল হচ্ছে তাও মকুব হতে পারে। তোমরা রাজী কিনা পত্র পাঠ মাত্র জানিয়ে দিয়ো।'

পত্রের উত্তর নিয়ে এল গোমস্তা। ইংরেজরা লিখেছে: 'কলকাতা থেকে হুকুম এসেছে টাকা দিয়ে কোন সর্ত্তে নবাবের সঙ্গে রফা করো না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই কথা বলা যায় যে নবাব যদি আমাদের লোকজনকে ছেড়ে দেন, তবে কাউন্সিল ও প্রেসিডেণ্ট হয়ত মীমাংসার জন্যে উদগ্রীব হতে পারেন। কিন্তু এখন আমরা এই কথা খুব জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে, যতদিন নবাবের বন্দীশালায় কোম্পানীর এক জনও দালাল, মার্চেণ্ট বা কর্মচারী থাকবে, ততদিন কলকাতার গভর্ণর কোন কথায় কান দেবে না।'

মীমাংসার কথা চলে। চুপ করে বসে থাকে না রহিম। বন্দীদের ওপর কোড়া চলে। খবর পায় কাশিমবাজার। বন্দীরাই খবর পাঠায় গোপনে। ষ্টিফেনসন খবর পাঠায় কলকাতায়।

অল্প কয়েকদিন পরেই হুকুম আসে কলকাতায়। স্টিফেনসন নবাবকে জানাতে পারে যে কোম্পানী উপযুক্ত নজরানা দিতেই রাজী। কিন্তু ছেড়ে দিতে হবে কোম্পানীর সমস্ত কর্মচারীকে। কলকাতার জন্যে বাড়াবাড়ি বন্ধ করতে হবে।

জগৎশেঠের গোমস্তার সঙ্গে ঘন ঘন কথাবর্ত্তা হয়েছে কুঠিয়াল স্টিফেনসনের। ব্যবসার বিপত্তির কথা জানিয়েছে বিনীতভাবে। দেখা করেছে ফতেচাঁদ। কোম্পানীর অসুবিধে বুঝেছে সেও। কিন্তু কোন উপায় নেই।

জুলুম করেছে নবাব। সম্প্রতি জুলুমের মাত্রা আরও বেড়ে গেছে। বাড়বার অবশ্য কারণও আছে। আর সব বণিক নিয়মমত কর দিয়ে ব্যবসা করে। শা সুজার ফর্মানের দোহাই পেড়ে আর দিল্লীর বাদশার অন্দর মহলে ফাঁদ পেতে, বছরে তিন হাজার টাকার নাম মাত্র পূজো দিয়ে, এত বড় ফলাও কারবার চালিয়ে যাবার কোন যুক্তি দেখতে পায় না নবাব। তার মতে এ অন্যায়, ঘোরতর অন্যায়। তাই আইনত যখন তিন হাজারের বেশী পাওয়ার কোন উপায় নেই, তখন বে-আইনী পথে বাকিটা উসুল করতে হবেই। তাই দিল্লীর দরবারের পর থেকেই নবাবের আক্রোশ অনির্বান।

কোম্পানীর অসুবিধে বোঝে ফতেচাঁদ। কারণ কোম্পানীর অসুবিধে হলে ধাক্কা খায় ফতেচাঁদের ব্যবসা। কাঁচা টাকার ব্যবসা। অল্প দিনের মেয়াদে ধার দেওয়ায় তার লাভ। টাকা পড়ে থাকলে অসুবিধে। বিলেত থেকে রূপো না এলে বাজার খারাপ হবে। তেমনি আরবী, পারসী বণিকরা ব্যবসা বন্ধ করলে তার বিপদ। বিপদ গ্রামের ভেতরের খুঁদে খুঁদে মহাজনের। দেশময় জাল ফেলা আছে যেন। কোথাও একটু টান পড়লে রেশ ছড়াবে সর্বত্র।

ফতেচাঁদ তাই বলেছিল যে বার বার এমন ধরণের বিপদে পড়ে নবাবকে তুষ্ট করার চেয়ে সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে মিটিয়ে নেওয়াই ভাল। কোম্পানী হাজার ত্রিশেক টাকা খরচ করে নবাবের কাছ থেকে পরোয়ানা নিতে পারে। তাহলে সব দিক থেকে সুবিধে হবে।

পরামর্শ মনে লেগেছিল স্টিফেনসনের। কলকাতায় জানিয়েও ছিল।

কলকাতা থেকে জানানো হল কাশিমবাজারে, 'নবাবকে টাকা দিতে পারো। কিন্তু পনেরো থেকে ত্রিশ হাজারের বেশী নয়। আর কতকগুলো সর্ত্ত পূরণ করতে হবে। যেমন, মুকড়ুমপুরের কুঠি আবার চালানো হবে। নবাবকে রাজী হতে হবে। হুগলীতে যে কুঠি বানানো হচ্ছে, তাতে বাধা দিতে পারবে না নবাব। ঢাকায় আর একটা কুঠিও তৈরী হবে। কোম্পানীর টাকা খরচ হবে, অথচ কোম্পানীর স্বার্থ সিদ্ধ হবে না—এতো হতে পারে না। খরচ করে কিছু সুযোগ সুবিধে অন্তত পাওয়া দরকার। আর এও হতে পারে না যে বার বার নবাব অন্যায় জুলুম করে যাবে আর কোম্পানী মুখ বুজে তা মেনে নেবে।'

কিন্তু ব্যাপারটা মিটে গেল। ১৪ই মার্চ স্টিফেনসন খবর পাঠালো কলকাতায় যে, একমাত্র ফতেচাঁদের কৌশলে এবং প্রভাবে কোম্পানীর সমস্ত কর্মচারী নবাবের হাজত থেকে ছাড়া পেয়েছে। ফতেচাঁদের কাছ থেকে জানা গেছে যে নবাব আর কোন বিরূপতা রাখবে না কোম্পানীর ওপর।

•

তারপর সত্যি সত্যি পরোয়ানা পেয়েছে বাদশার। বাংলা বিহার উড়িষ্যায় বাণিজ্য করতে পারে কোম্পানী। বাদশাহী কর ছাড়া নবাবকে দিতে হবে বিশ হাজার টাকা। তাহলে নবাব আর কোন জুলুম করবে না। যে মাসে কোম্পানী দিয়ে এল বিশ হাজার শিক্কা।

যে মাসেই বিশ হাজার টাকা দেবার পিছনে কোম্পানীর শুধু নবাব তুষ্টির অভিপ্রায় ছিল না। তার চেয়েও আরো গভীর কারণ ছিল।

১৭২৬ সালের এপ্রিল মাসে তিন জন বেলজিয়ান সাহেব নবাবকে কুড়ি হাজার টাকা নজরানা দিয়ে আর্জি পেশ করলো, তারাও ব্যবসা করতে চায় এ দেশে। ন্যায্য কর দিয়েই ব্যবসা করবে তারা। তাদের কোম্পানীর নাম অস্টেণ্ড কোম্পানী। অষ্ট্রীয়ান সম্রাটের সনদ আছে তাদের কাছে। এবার চাই নবাবের পরোয়ানা।

অবশ্য অস্টেণ্ড কোম্পানী তিন বছর আগেই হুগলীর বাঁকিবাজারে কুঠি

বানিয়ে ব্যবসা সুরু করে দিয়েছে। কম দামে জিনিষ কেনে। সোনার দেশে আর একজন প্রতিদ্বন্দ্বী দেখে ইংরেজ আর ওলন্দাজরা এক সঙ্গে লেগে গেল অষ্টেণ্ড কোম্পানীর বিরুদ্ধে। কিন্তু কুড়ি হাজার টাকা দরবারে ঢেলে নবাবের মন ভিজিয়েছে বেলজিয়ানরা। শঙ্কিত হল ইংরেজ। স্টিফেনসন গেল মহিমাপুরে।

আশ্বাস পেয়েছিল কুঠিয়াল। ৭ই মে কলকাতায় খবর গেল, অষ্টেণ্ড কোম্পানী নিয়ে বিব্রত হবার এমন কিছু নেই। দরবারে যত টাকাই ঢালুক, ফতেচাঁদ মত না দিলে নবাবের পরোয়ানা পাবে না। ফতেচাঁদ কথা দিয়েছে যে, জার্মান কোম্পানীর দিকে সে যাবে না।

১৭ই মে দরবারে আবার দর্শন দিল বেলজিয়ান সাহেব। আরো বেশী টাকার নজরানা এবার। মোট খরচ করেছে ত্রিশ হাজার। তার মধ্যে সতেরো হাজার খোদ বাদশার পেস্কস। টাকাটা জমা থাকল ফতেচাঁদের কাছে। সুযোগ মত সে পাঠিয়ে দেবে বাদশার চরণে। জার্মান কোম্পানীর প্রণামী। আর যদি তারা ফর্মান পায়, মনে ক্ষোভ থাকবে না কারো। আরো পঁচিশ হাজার টাকা দেবে নবাবকে, আর পঁচিশ হাজার দেবে নবাবের মন্ত্রীদের, কোম্পানীর বন্ধুদের। মুর্শিদাবাদের দরবারে প্রলোভন ছড়িয়ে এল অষ্টেণ্ড কোম্পানী।

টাকা দেদার। খরচ করতেও পিছ্‌পা নয় তারা। কিন্তু কাজ হয় না। নবাবকে দিতে, দরবারের কর্মচারীদের হাতে রাখতে, মন্ত্রীদের তুষ্ট করতে জার্মানরা ইতিমধ্যেই খরচ করেছে এক লাখ পঁচিশ হাজার। তবুও পরোয়ানা পায়নি। না সম্রাটের, না নবাবের। কেউ সহজ করে বলেও নি, হবে না। তা হলেও বোঝা যায়। হচ্ছে, হবে এই ভাব। গড়িমসি চাল। ঢিলে ঢালা দরবারী মেজাজ। এদেশের স্বভাবকে বুঝতে ভুল করে বেলজিয়ানরা ভাবল, এদের টাকা মেরে দেবার মতলব। কোন কাজ হবে না।

৩০শে তারিখে স্টিফেনসন জানালো, চলে গেছে অষ্টেণ্ড কোম্পানী। আর তারা আসবে না কোনদিন সৈদাবাদে। বেচারা অষ্টেণ্ড টাকা ঢালতে কসুর করেনি। হাতের শেষ কড়িটা অবধি খরচ করেছে। তাদের ভাগ্যে পরোয়ানা ত জুটলই না। নিদেনপক্ষে শিরোপা জুটলেও তবু সান্ত্বনা থাকতো। ফতেচাঁদের কাছ থেকে তিন বছর আগের সত্তর হাজার শিক্কা টাকার বিলের বরাত দিয়ে পালানোর কড়ি যোগাড় করেছে অষ্টেণ্ড।

বাঁকিবাজারে গিয়ে স্বরূপ ধরল অষ্টেণ্ড কোম্পানী। আবেদন নিবেদনে

হল না দেখে জোর জবরদস্তির পথ তাদের কাছে শ্রেয় মনে হোল। আটক পড়ল মুসলমানের নৌকো। মারা পড়ল কয়েকজন। লুটপাটও চললো কিছু কিছু। টনক নড়লো নবাবের। নবাব ভাবল ঠাণ্ডা করা দরকার। ব্যবসা করতে চায়, করুক। নতুন কোন সুযোগ সুবিধে ত তারা চাইছে না।

নবাবের পাইক গেল বাঁকিবাজারে। বল্লে, 'পরোয়ানা তাদের তৈরী। যে কোনদিন এসে নিয়ে যেতে পারে। কিন্তু বেয়াদপী বন্ধ করতে হবে এখুনি। তা ভিন্ন বিপদে পড়তে হবে।'

বিপদে তারা পড়েও ছিল। কিন্তু যখন পড়ে, নবাব তখন এ জগতে আর নেই।

যাবার জন্যেই যেন তৈরী হচ্ছিল মুর্শিদকুলি। মৃত্যুর পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছিল কয়েক বছর আগে থেকেই। তাই মুর্শিদাবাদের প্রাসাদ থেকে মাইল খানেক দূরে কাটরায় মসজিদ তৈরী করবার আদেশ পেয়েছিল মোরাদ ফরাস। ফরাস আদেশ পেয়েছিল, এক বছরের মধ্যে তৈরী করতে হবে মসজিদ। তৈরীও করেছিল ঠিক সেই সময়ের মধ্যেই। কিন্তু কলঙ্কের কালি মেখে। অনেকে বলে, ওই মসজিদের ভেতর আছে অনেক মন্দিরের ইঁট। থাকতেও পারে। কিন্তু মসজিদ উঠলো। সাতশ' কোরাণ পাঠার্থীর সকাল সন্ধ্যায় আজানের ধ্বনি ভেসে আসতো চেহল স্তুনে। মসজিদে ঢোকার পথে লেখা আছে: 'আরবের মহম্মদ উভয় জাতির গৌরব। যে ব্যক্তি তাঁহার দোরের ধুলো নয়, তার মাথায় ধুলো বৃষ্টি হোক।'

চোদ্দ

বাসনা নিয়ে মারা গেল নবাব মুর্শিদকুলি। সাধ ছিল, নাতি সরফরাজ খাঁকে বসিয়ে যাবে বাংলার মসনদে। জামাই সুজাউদ্দীন উড়িষ্যার শাসন কর্তা। শ্বশুর জামাই এর সম্পর্ক আদায় কাঁচকলায়। মুর্শিদকুলি খাঁর বিষয়বুদ্ধি প্রখর। ভয় ছিল, মসনদ নিয়ে গোলোযোগ বাঁধবে। তাই দিল্লী থেকে আগে ভাগে ফর্মান আনিয়ে সরফরাজের গদিকে পাকাপোক্ত করে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল নবাব। ভেবেছিল দিল্লীতে যখন তার এত খাতির প্রতিপত্তি, তখন সুযোগ্য নাতির জন্য ওকালতি করে ফর্মান নিয়ে আসা খুব কঠিন ব্যাপার হবে না। নবাব চেষ্টা করেছে বহুবার। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। কারণটা অবশ্য জানতো না। আন্দাজও করতে পারেনি। শুধু এইটুকু বুঝেছিল

সরফরাজের বিরুদ্ধে কোন গোপন হাত কাজ করছে। তাই অস্বস্তি আরো বেড়ে গেছে। কিন্তু চূড়ান্ত কিছু করার আগেই মৃত্যু হল।

উড়িষ্যায় থেকেও দরবারের খুঁটিনাটি খবর রাখতো সুজাউদ্দীন। সরফরাজের জন্য চেষ্টা করছে মুর্শিদকুলি খাঁ নিজে। পাল্লা ঝুঁকেছে ছেলের দিকে। সুজাউদ্দীন অন্য মাতব্বর যোগাড় করলো। দরবারে রাখলো নিজের লোক। ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সব ব্যবস্থা পাকা করে সুজাউদ্দীন। কটক থেকে দিল্লী, আর মুর্শিদাবাদ থেকে কটকের রাস্তায় ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তার লোক। দিল্লী থেকে ফর্মান আসতে যেন পথে কোন দেরী না হয়।

আবার মুর্শিদাবাদ থেকে প্রত্যেকটি খবরও তাকে পেতে হবে। নগরের দিকে পাঠিয়েছে নাগরিকের ছদ্মবেশে পদাতিক। ইঙ্গিতের জন্য তারা অপেক্ষমান। সুজা খাঁ জানতো ফর্মান তার নামে আসবেই। তার পিছনে যে দাঁড়িয়ে আছে, যাকে নবাব কোন মতে আন্দাজ করতে পারছে না, অথচ যার প্রমাণ না পেয়েও সন্দেহ করছে সরফরাজ, সে লোকটি কোন অংশে প্রভাব প্রতিপত্তির দিক থেকে নবাবের চেয়েও খাটো নয়। সুজা তাই উদ্বিগ্ন হলেও আশান্বিত।

বর্ষার দেরী নেই। বর্ষা আরম্ভ হলে পথঘাট দুর্গম হয়ে পড়বে। দুর্গম পথে সময় মেপে চলা কঠিন। অথচ চরম সার্থকতা নির্ভর করছে ঠিক সময়ে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কাজ করার ওপর। সুজা তাই নৌকো বায়না করে রেখে দিল। অনেক নৌকোর দরকার। সৈন্য সামন্ত নিয়ে যেতে গেলে দু'একখানা নৌকোয় কি হবে!

খবর এল, নবাবের অবস্থা খুব খারাপ। অল্প কয়েক দিনের ভেতরই বাতি নিভে যাবে। সুজা সঙ্গে সঙ্গে ছুটলো মুর্শিদাবাদে। যেতে যেতে মেদিনীপুরের কাছে দেখা পেল তার চরের। ফর্মান আসছে দিল্লী থেকে। তার নামেই জারী করেছে সম্রাট। সে এখন আর শুধু মাত্র উড়িষ্যার শাসনকর্তা নয়, সুবা বাংলার নবাব।

মুর্শিদাবাদে এসেই সুজা সোজা চলে গেল দরবারে। পাঠ করা হল সম্রাটের ফর্মান। নবাবী অনুষ্ঠানের পর গিয়ে বসল সিংহাসনে। উপহার ও অভিনন্দন দিয়ে আনুগত্য জানালো দরবারের প্রধান ব্যক্তিরা।

সরফরাজ খাঁ তখন রাজধানীর বাইরে, বাগান বাড়ীতে। কাড়া নাকাড়ার শব্দে চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার?'

এই নাকাড়ার শব্দ তার চেনা। দরবারী দস্তুর তার জানা। ব্যাপার বুঝতে দেরী হয়নি। কিন্তু ভাবতে পারেনি সরফরাজ। অসম্ভব সম্ভব হল কি ভাবে? মুর্শিদকুলি নিজে চেষ্টা করেছে তার জন্য। জগৎশেঠ ফতেচাঁদকে অনুরোধ করেছে, নবাবের ওপর সেও যেন নিজের প্রভাব ব্যবহার করে। মাথা নীচু করেছিল ফতেচাঁদ। স্পষ্ট কোন উত্তর দেয়নি। মনটা একবার দুলে উঠেছিল সরফরাজের। এখন সন্দেহ হয়ে গেছে বিশ্বাস।

মোসায়েব আমাত্য আর সৈন্যদের তলব পাঠালো তখুনি। তলোয়ার খুলে ঘোড়া ছুটিয়ে সোজা দরবারে গিয়ে থামলো সরফরাজ।

কিন্তু যুদ্ধ করেনি। বাবার বশ্যতা স্বীকার করেছে পায়ে চুমু খেয়ে। নবাব তাকে সম্মানিত করেছে দেওয়ানী দিয়ে।

কেউ কেউ অবশ্য অন্য কথা বলে থাকেন। তাঁদের মতে ঘটনাটা অন্য। সরফরাজ খাঁ জানতো যে তার বাবা সৈন্য সামন্ত আর পরোয়ানা নিয়ে আসছে মসনদ দখল করতে। উত্তর দিতে প্রস্তুত হচ্ছিল সরফরাজ।

কারো কথা শোনার পাত্র নয় সে। চিরকাল গোঁ ধরা আদুরে ছেলে। ছোট বেলায় বড় ভুগতে হয়েছে দিদিমাকে। আর যার কাছে যত দুর্বিনিত হোক না কেন সরফরাজ, দিদিমার কাছে নিতান্ত সুবোধ। বাধা দিয়েছিলো তখন দিদিমা। বলেছিল, 'বাবা বুড়ো হয়ে এসেছে। দিন ত শেষ হয়ে এল প্রায়। একটু ধৈর্য ধর। তারপর সুবাদারী, ধনরত্ন, সবই ত তোমার হবে। নিজের বাবার সঙ্গে যুদ্ধ করে ইহকাল পরকাল, দুই কাল কেন খোয়াবে? তার চেয়ে দেওয়ানীর পদ নিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে দাও।'

রাজী হয়েছিল সরফরাজ। কিন্তু প্রাসাদে থাকেনি। থাকতো দূরের একটা বাগান বাড়ীতে। রোজ আসতো একবার নবাবকে দর্শন দিতে।

মসনদে বসেই সুজাউদ্দীন যখন জগৎশেঠ ফতেচাঁদকে নিজের একান্ত বিশ্বস্ত মন্ত্রী হিসাবে প্রথমেই বেছে নিল, তখন আর একবার আঙুল কামড়ালো সরফরাজ খাঁ।

মুর্শিদকুলির সামনে কোন কথা বলতে পারেনি ফতেচাঁদ। বলার বিপদ খুব গভীর। অর্থাৎ প্রকাশ্যে সরফরাজের বিরোধিতা করা। এবং সেই বিরোধিতার পরিণাম নবাবকে আঘাত দেওয়া। শুধু তাই নয়,

সরফরাজের বন্ধুদের পক্ষ থেকে গুপ্ত হত্যার চক্রান্তও হতে পারে। সে সময় গুপ্ত হত্যা ও চক্রান্ত স্বীকৃত রাজনীতি। তাই চুপ করেছিল ফতেচাঁদ। মুর্শিদকুলি খাঁর আপ্রাণ চেষ্টার ব্যর্থতার কারণ হল এই।

কিন্তু নিজের মনোভাবকে বুদ্ধিমানের মত প্রকাশ করেছে ফতেচাঁদ। সে হাবে ভাবে, আকারে ইঙ্গিতে এই কথা বোঝাতে চেয়েছে, সুবা বাংলার নবাবী করতে গেলে যে পরিমাণ ধৈর্য আর সাহসের দরকার, তা নেই সরফরাজ খাঁর।

আর বোধ হয়, সরফরাজের ঠাকুরমার মত চিন্তা করে থাকবে ফতেচাঁদ। ভেবে থাকবে, বাবা হবে উড়িষ্যার সামান্য শাসনকর্তা, আর তারই ছেলে সুবা বাংলার নবাব। এ খুব দৃষ্টি কটু এবং অন্যায়। বাবা বুড়ো। বেশীদিন নেই আর। সিংহাসনের ওপর যদি তার লোভ হয়ে থাকে, তবে নিবৃত্তি দরকার। পরলোকে শান্তি পাবে না তাহলে। ছেলে কি বাপের পতনের কারণ হতে পারে?

ফতেচাঁদ এই কথাই ভেবে থাকবে। হাজার হোক ফতেচাঁদ হিন্দু, শ্বেতাম্বর জৈনদের প্রধান। ধর্মশাস্ত্রে জ্ঞান তার প্রখর। পণ্ডিত মহলে নাম আছে। তাই তার চোখে সরফরাজের ব্যবহার বিসদৃশ লেগে থাকবে। আজ যদি বাদশা মানিকচাঁদকে অগ্রাহ্য করে ফতেচাঁদকেই শেঠ খেতাব দিত, তবে কি সেই ফুলের মালা বিষের হার হয়ে ঝুলতো না গলায়? শান্তি পেত কি কোনদিন? তবু মানিকচাঁদ লোভ করেনি। লোভকে জয় করেছে। আর সুজাউদ্দীন লোভী। বাবাকে অগ্রাহ্য করে ছেলের সিংহাসনে বসা অন্যায়।

যত দৃঢ় যুক্তির ওপর দাঁড়াক না কেন ফতেচাঁদ, সে জানে সরফরাজ খাঁ তাকে বুঝতে পারবে না। সরফরাজ উদ্ধত, অবিনয়ী। ঠাকুর্দার কাছ থেকে ধর্মের অনুষ্ঠান গুলো ভাল করে শিখেছে, কিন্তু ধর্মের ভিতরে যেতে পারেনি।

ফতেচাঁদ বেশ ভাল করেই জানতো সরফরাজ তাকে বুঝতে পারবে না। কিন্তু সে না বুঝুক। ধর্মকে অস্বীকার করতে পারে না ফতেচাঁদ। সে রাজনীতির লোক নয়। ব্যবসাদার। ধর্মে ব্যবসা নিষিদ্ধ নয়। শ্বেতাম্বর জৈন সে। সে জানে, পতিতের উদ্ধার, অহিংসা, বিনয়, ইন্দ্রিয় সংযম, ন্যায়পূর্বক জীবিকা গ্রহণ, মৃদুতা,—এই গুণ পাপ নাশ করে।

দরবারে বসেই সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল সুজা। নবাবের জেলখানায় তখনও অনেক জমিদার বাকি খাজনার দায়ে ঘানি টানছে। সুজা প্রথমেই তাদের মুক্তি দিল। মুক্তির আগে জমিদারকে মুচলেখা দিতে হয়েছিল যে, তারা ইচ্ছা কিম্বা গাফিলতি করে খাজনা আটকে রাখবে না। তারপর জমিদারদের খেলাত দিয়ে পাঠিয়ে দিল তাদের জমিদারীতে।

জমিদারীর খাজনা, মুক্তির জন্য নজরানা, জায়গীরের উপসত্ব, সায়েরকর ইত্যাদি নিয়ে সে বছর রাজস্ব উঠলো এক কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা। এত টাকা কোনদিনই ওঠাতে পারেনি মুর্শিদকুলি।

জগৎশেঠের হুণ্ডী মারফৎ টাকা পাঠানো হল দিল্লীতে। মুর্শিদকুলির জিনিষ পত্র ও সম্পত্তি বিক্রি করে উঠলো ষাট লাখ টাকা। সে টাকা নিজে রাখেনি সুজা। দিল্লীতে পাঠিয়েছে। সঙ্গে গিয়েছে দামী দামী জিনিষ-পত্র।

খুশী হয়েছে বাদশা মুহম্মদ শা। উপাধি দিয়েছেন মোতামন্ উলমুলক সুজাউদ্দীন বাহাদুর আসাদজঙ্গ। হপ্ত হাজারী মনসবী আর সোনার ঝালর দেওয়া পালকী জুটে গেছে বরাতে।

মুর্শিদকুলি যে প্রাসাদটা তৈরী করেছিল তা মোটেই মনঃপুত হয়নি সুজার। নবাব কখন কুঁড়ে ঘরে থাকতে পারে না। কুলি খাঁ এত যত্ন করে যা তৈরী করেছে আর সাধ করে অত বড় নাম দিয়েছে—সেটা আদপে প্রাসাদই নয়। নবাব যখন দীন দরবেশ নয়, তখন নবাবী কায়দায় থাকতে ত হবেই।

বিরাট প্রাসাদ উঠলো। আরো উঠলো বিরাট তোরণ। তোরণের ওপর নহবৎ খানা। ওই নহবৎ খানায় কাকডাকাভোরে বাজবে যন্ত্র। ঘুম ভাঙবে নবাবের, বেগমের, আর শহরের। তোরণের ভিতর ছয় মহল। দেওয়ান খাসে বসবে দেওয়ান, আর তার কর্মচারী।

চেহলসুতনে বসবে নবাবের দরবার। খিলাৎখানা নবাবের নিজের ঘর। কাজের অবসরে নবাব ওখানে একটু গড়িয়ে নেবে। গোপন পরামর্শের দরকার হলে ওখানে বসলেই চলবে। তারপর জৌলুষখানা। ওটাই সব চেয়ে বড় আর সাজান প্রাসাদ। ওদিকে কাছারী। রাজস্ব নিয়ে কথাবার্ত্তা, দেনা পাওনার হিসেব হবে। তারপর ফর্মান বাড়ী—ওখানে বসে নবাব বিচার করবে।

সুজাউদ্দীন বড় চটপটে। খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে আসতে পারে।

সিদ্ধান্তে অটল থাকতেও পারে। অবশ্য উড়িষ্যা থেকে আসবার সময় কাজের লোক বেছে নিয়ে এসেছে সুজা। উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা হিসেবে যত সুনাম পেয়েছে সুজা, তার মূলে আছে হাজী আহম্মদ আর তার ভাই আলিবর্দি খাঁ।

তখন তার নাম ছিল না আলিবর্দী। লোকে তখন জানতো মির্জ্জা মহম্মদ আলি বলে। মির্জ্জা তুর্কী। মির্জ্জার বাবা কাজ করতো আজিমুখানের কাছে। তারপর বড় ছেলে হাজী আহম্মদকেও আজিমুখানের কাছে কাজ যোগাড় করে দেয়। বাপ ছেলের রোজগারে মোটামুটি চলে যাচ্ছিল।

কপালে সুখ বেশী দিন নেই। যুদ্ধে আজিমুখান মারা গেল। হাজী আহম্মদ মাকে নিয়ে এল উড়িষ্যায় সুজাউদ্দীনের কাছে। সুজার সঙ্গে তার মায়ের ছিল দূর সম্পর্ক। মির্জ্জা এসেছিল মুর্শিদাবাদে। তাকে ঠাঁই দেয়নি মুর্শিদকুলি। তাই মির্জ্জাও বাধ্য হয়ে এল উড়িষ্যায়।

সুজা কাজের লোক বলে পছন্দ করেছিল মির্জ্জাকে। সেই থেকে হাজী আর মির্জ্জা সুজার খুব অনুগত। সুজাও খুব বিশ্বাস করে দুই ভাইকে।

রায় রায়ান আলম চাঁদ সুজার পুরানো পরিচিত। উড়িষ্যায় সামান্য মোহরের কাজ দিয়েছিল সুজা। আলম চাঁদ সেই থেকে নিজের হাতে নিজের ভাগ্য গড়েছে। উড়িষ্যার দেওয়ানী পদও পেয়েছে কাজের জোরে। আসার সময় তাই সঙ্গে এসেছে আলম চাঁদ।

সরফরাজ খাঁ দেওয়ান। কিন্তু কাজ চালাবে আলম চাঁদ। তাকে করা হল খালসা দেওয়ান। বাদশার কাছ থেকে আনা হল রায় রায়ান উপাধি আর একহাজারী মনসবী। অন্য ছেলে তাকী খাঁ। তাকে বসানো হল উড়িষ্যার গদীতে।

আর আছে সুজার হিতাকাঙ্খী জগৎশেঠ ফতেচাঁদ। নবাব মুর্শিদকুলির সময়ে যে যে পদ অধিকার করেছিল মানিকচাঁদ আর ফতেচাঁদ, সেই সেই পদ এখনো থাকলো তাদের।

এখনো জমিদারকে টাকা জমা দিতে হবে তার গদীতে। নবাবের সমস্ত টাকা থাকবে তাদের কাছ জমা, ট্যাকশালের একছত্র অধিপতি এখন তারাই। তারাই টাকা পাঠাবে দিল্লীর দরবারে, বস্তাবন্দী করে বেঁধে

গোছ-গাছ করে রাখবে ঠিকমত। নবাবের পোদ্দারী আর তবিলদারীর কাজ চালিয়ে যাবে আগের মত।

মসনদে বসেই সুজাউদ্দীন এই চারজনকে নিয়ে মন্ত্রী সভা তৈরী করলো। বেশী দিন মুর্শিদাবাদে থাকতে পারেনি মির্জ্জা। রাজমহলের ফৌজদারের পদ যে সে লোককে দেওয়া যায় না। মির্জ্জা খুব পাকা লোক, ওস্তাদ লড়িয়ে। রাজমহলে পাঠানো হল তাকে।

রাজমহলের ফৌজদার হয়েও বেশী দিন ছিল না মির্জ্জা। বিহারের সুবাদারীর পদ খালি হল। সুজা পাঠাতে চেয়েছিল তার ছেলে সরফরাজকে।

কিন্তু বেঁকে বসল সুজার বেগম, সরফরাজের মা। অতদূরে একমাত্র ছেলেকে ফেলে শহরে সুখে শান্তিতে থাকতে পারবে না বেগম সাহেবা। বাধ্য হয়েই পাঠাতে হল মির্জ্জাকে।

পাটনায় গেল মির্জ্জা। দিল্লী থেকে সুজা আনিয়ে দিলো মির্জ্জার জন্যে মহবৎজঙ্গ উপাধি আর পাঁচ হাজারী মনসবদারী। এর কয়েক বছর আগে জন্ম হয়েছিল সিরাজদ্দৌলার।

আলিবর্দ্দী পাটনায় থাকলেও মুর্শিদাবাদের সঙ্গে যোগ তার ঘনিষ্ট। নবাবের একান্ত বিশ্বাসের পাত্র, মন্ত্রী। আবার মন্ত্রী হয়ে বসে আছে তারি আর এক ভাই। রায় রায়ান আলম চাঁদ, ফতেচাঁদ আর হাজি নবাবের সব কাজ দেখা শোনা করতে থাকলো।

পনেরো

কাজ কারবার ভাল ভাবেই চলছিল ফতেচাঁদের। ইতিমধ্যে কোম্পানীর সঙ্গে বিবাদ ঘনিয়ে এল শেঠ বাড়ীর।

কান্তবাবু কোম্পানীর দালাল, কাশীমবাজার কুঠির ডান হাত। তাকে ছাড়া কোম্পানীর চলে না এক লহমা। হিসেব পত্র, টাকা পয়সা, এদেশী মহাজনের সঙ্গে লেনদেন হয় কান্তবাবুর মধ্যস্থতায়।

কান্তবাবু কোম্পানীর দালাল। দস্তুরী দেয় মহাজন, কমিশন দেয় কোম্পানী। তাই কান্তর ব্যবসা মোটেই মন্দ নয়। বিনা পুঁজিতেও ফলাও ব্যবসা কান্তবাবুর। কান্তর ওপর কোম্পানীর খুব বিশ্বাস। আপদে বিপদে

সাহায্য করতে, দায় বিদায়ে পরামর্শ দিতে ডাক পড়ত কান্তর। এক কথায় কান্ত কাশীমবাজার কুঠির মন্ত্রী।

এ দেশের মহাজনরা কান্তকে সমীহ করে। কান্তর সঙ্গে কারবার করলে টাকার জন্যে ভুগতে হয় না কোন দিন। দেশীয় মহাজনদের ধারণা কান্ত মানেই কোম্পানী।

একদিন এই কান্ত গা ঢাকা দিল। কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যায় না তাকে। শহর তোলপাড় করেও কান্তর উদ্দেশ নেই। নবাবের পাইক বরকন্দাজ তাকে ধরেনি। কোন গুণ্ডা বদমায়েসের খপ্পরেও পড়েনি। বিপদ তার চেয়ে আরো গুরুতর। কান্ত পালিয়েছে।

১৭৩০ সালের ১৫ই এপ্রিল। কোম্পানীর কুঠিয়াল জন ষ্ট্যাকহাউস জানালো কলকাতায় এই খবর।

কান্তর অভাবে কুঠি প্রায় অচল। কেউ জানে না কোথায় কার সঙ্গে কি মালপত্রের কি ব্যবস্থা করেছে। হিসেব পত্রে গোলমাল। কোম্পানী যে নতুন ভাবে কাজ আরম্ভ করবে—কান্তর অবর্তমানে তারও উপায় নেই।

জগৎশেঠ ফতেচাঁদের কাছে কান্তর ধার অনেক। মহাজনরা জগৎশেঠের হাত ধরা। জগৎশেঠ নিষেধ করে দিয়েছে, কেউ যেন কোম্পানীর সঙ্গে কোন ব্যবসা পাতি না করে। আগে জগৎশেঠের দেনা শোধ করে দাও, তবে তোমাদের কুঠিতে মাল দেবো—কথা পাড়লেই এই হল তাদের সোজা জবাব।

বিপদ তাই আরো গভীর। কান্ত যদি এখন ফিরেও আসে, কোম্পানীর হাল ফিরবে না। আগে শোধ করতে হবে জগৎশেঠের টাকা।

দেনার পরিমানও কম নয়। একা জগৎশেঠই পাবে দু'লাখ পনেরো হাজার টাকা। কোম্পানীর হিসেব মত কান্তর কাছে প্রাপ্য তাদের এক লাখ তেত্রিশ হাজার। তা ছাড়া আছে খুচরো পাওনাদার। তাদের পাওনার পরিমান ত্রিশ হাজার। পাওনাদার কেউ ছাড়বার পাত্র নয়। বিশেষ করে জগৎশেঠ ত ছাড়বেই না।

জগৎশেঠ সোজা জবাব দেয়, কান্তবাবুকে জানিনে। জানি কোম্পানীকে। কান্ত কোম্পানীর কর্মচারী। যখনই দরকার পড়েছে, তখুনি টাকা

দিয়েছি। জানি, কান্তকে দিচ্ছিনে, দিচ্ছি কোম্পানীকে। কোম্পানীর হয়ে কান্ত টাকা নিচ্ছে। তা ভিন্ন কে কান্তকে এত টাকা দিতে যেত? জানি না কান্তর কি অবস্থা? তার হাঁড়ি হেঁসেলের খবর অবধি জানা। এত টাকা নিয়ে শোধ দেবার ক্ষমতা তার নেই। তবু টাকা দিয়েছি। কান্তকে নয়, কোম্পানীকে। ধার শোধ দিতে হবে কোম্পানীকেই। আর বলুক ত কোম্পানী এই টাকা নিয়ে কান্ত একমাত্র তার নিজের ব্যবসায় খাটিয়েছে। হলপ করে বলুক কোম্পানী।

ফিরে যায় কোম্পানীর গোমস্তা।

নিজে থেকেই ধরা দিল কান্ত। গা ঢাকা দিয়ে কতদিনই বা থাকবে। কপালের লিখন খণ্ডাবার সাধ্য কারো নেই। কপাল মেনে একদিন কান্ত নিজেই দেখা দিল কাশীমবাজার কুঠিতে।

কান্ত দেউলে হয়ে গেছে। বাজারে কারো কাছে আর অজানা নেই।

অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কুঠিয়াল। জগৎশেঠের দাবী মানতে চায় না কোম্পানী। কান্ত যেন এমন কথা না বলে যাতে জগৎশেঠের দাবী আরো জোরদার হয়। কোম্পানীর কথা হল, ধার করেছে কান্ত। শোধ দেবে কান্ত। তার জন্যে কোন দায়িত্ব নেই কোম্পানীর।

কান্ত টাকা ধার করেছে নিজের জন্যে। কোম্পানীর যখনই টাকার দরকার হয়েছে, যখন টাকা দিয়েছে শেঠের গদী থেকে, তখনি কোম্পানী লিখে দিয়েছে। কান্ত যদি কোম্পানীর জন্যেই জগৎশেঠের গদী থেকে টাকা নিয়ে থাকবে, তবে দেখাক জগৎশেঠ কোম্পানীর দস্তখত।

জবানবন্দীতে কান্ত স্বীকার করলো, 'জগৎশেঠের কথাই ঠিক। এ বছর মাল কেনার সময় কোম্পানীর টাকা ছিল মাত্র বাহাত্তর হাজার। কিন্তু মাল কেনা হয়েছে বাহাত্তর হাজারের অনেক বেশী। সব টাকাই দিয়েছে জগৎশেঠ। যখনি টাকা চেয়েছি, তখনি জগৎশেঠের গদী থেকে টাকা পেতে কোন অসুবিধে হয়নি আমার।

কান্তবাবু এমন ভাবে পথে বসাবে বুঝতে পারেনি কুঠিয়াল। কিন্তু কথার নড়চড় নেই। যা বলার বলুক কান্ত, টাকা দেবে না তারা।

কোম্পানী জানিয়ে দিল জগৎশেঠকে, কান্তবাবুর দেনার জন্যে কোন অংশে দায়ী নয় কোম্পানী।

অগত্যা ফতেচাঁদ লিখলো কলকাতায়। আর কুঠিতে জানালো টাকা তার চাই-ই। কোম্পানীকেই দিতে হবে। যদি কোম্পানীর খুব অসুবিধে হয়, তবে কান্তবাবুর যে টাকা গচ্ছিত আছে কোম্পানীর কাছে, তাই-ই জগৎশেঠকে দিয়ে দিক প্রথমে। তারপর কান্তবাবুর হয়ে জগৎশেঠ সব দেনা শোধ করে দেবে।

তাতে অবশ্য প্রথম চোটে জগৎশেঠদের লোকসান হবে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা। এই টাকা জগৎশেঠ কান্তবাবুর কাছ থেকেই উসুল করে নেবে আস্তে আস্তে। কোম্পানীর কাজে যদি বহাল থাকে কান্তবাবু, তবে শোধ সে দিয়ে দিতে পারবে।

কুঠিয়াল ষ্ট্যাকহাউস বললে, 'আমাদের পক্ষে এ জটিল ব্যাপারে কোন কথা বলা ঠিক নয়। আর কান্তবাবুর খাতাপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কলকাতায়। কলকাতা থেকে যা হুকুম হয়, তাই হবে।'

কলকাতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। ফতেচাঁদ নালিশ করলো নবাবের কাছে।

ইংরেজদের বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ গিয়েছে নবাবের কাছে। অনেকবার দণ্ড দিতে হয়েছে তার জন্য। কিন্তু প্রতিবারই তাদের সহায় ছিল জগৎশেঠ। গুরু দণ্ড হয়নি তাই। আজ ফতেচাঁদ নিজেই নালিশ করেছে ইংরেজদের বিরুদ্ধে। ব্যাপারটা গুরুতর।

নবাব হুকুম দিল হাজি আহম্মদকে, 'ফতেচাঁদের টাকা আদায় করার ব্যবস্থা করো।'

চুপ করে বসে থাকবার লোক নয় হাজি। সে শুধু মাত্র নবাবের একান্ত প্রিয় মন্ত্রী নয়। তার চেয়ে আরো গূঢ় আশা মনের রাখ কোণে। কেউ জানে না, বুঝতেও পারে না কেউ। কিন্তু হাজি অতি ধীরে নিজের পথ তৈরী করে। সে জানে ফতেচাঁদ জগৎশেঠকে। ভারতবর্ষে অতুলনীয় তার ধন দৌলত। তার কাছে টাকা এ ক্ষেত্রে বড় ব্যাপার নয়। বড় ব্যাপার তার সম্মান। ইংরেজরা তার সম্মানে ঘা দিয়েছে। তাই একদা বন্ধু আজ শত্রু।

হাজি বেঁধে আনলো কোম্পানীর উকিলকে। কড়া ভাষায় জানালো, জগৎশেঠের টাকা মানে নবাবের টাকা। এর মধ্যে কোন তফাৎ নেই। নবাব হুকুম দিয়েছে টাকা আদায় করে দিতে। ফলে যত দেরী করবে বিপদ ততই বাড়বে। তাই তাড়াতাড়ি মিটমাট করে নেবার চেষ্টা করো।'

উকিল ফিরে গেল কুঠিতে।

এক সপ্তাহ পার হয়ে যায় যায়। কোম্পানী চুপ চাপ। দরবারে উকিল আসে, তদবির তাগাদা করে।

একদিন দরবার থেকে নামার পথে কোমরে দড়ি পড়লো তার। না প'ড়ে উপায় নেই। নবাব নিজেই চটে গেছে হাজির ওপর। এই সামান্য কাজটা করতে এত দেরী হয় তার। আগে ত এমন হতো না।

আগে অবশ্য হাজিকে এত শক্তিমান ও সংগঠিত প্রতিপক্ষ নিয়ে কাজ করতেও হয়নি। যাই হোক, আবার জানিয়ে দিল হাজি,—'কান্তর যে টাকা গচ্ছিত আছে কোম্পানীর কাছে, তার থেকে যেন অবিলম্বে ফতেচাঁদের দেনা মিটিয়ে দেওয়া হয়।'

কুঠির পক্ষ থেকে আবার যুক্তি দেখাতে গেল উকিল।

হেঁকে উঠলো হাজী, 'কোন কথা শুনতে চাইনে। কান্ত কোম্পানীর কর্মচারী। কোম্পানীর হয়ে কোম্পানীর কাজের জন্যে দেনা করেছে। দেনা শোধ করতে হবে কোম্পানীকেই।'

হাজির মেজাজের সামনে দাঁড়াতে পারেনি উকিল। কিইবা বলার থাকতে পারে? বেশী দিনের কথা নয়। মুর্শিদকুলির সময়ে এই কান্তবাবুকে কিংবা আগের উকিলকে নিয়ে যখন অতবড় কাণ্ডটা ঘটে, তখন ত ইংরেজদের এই যুক্তিই ছিল যে, যেহেতু কান্তবাবু অথবা সেই উকিল কোম্পানীর কর্মচারী, তখন তার ওপর আক্রমণ মানে খোদ কোম্পানীর ওপরই আক্রমণ। আজ তবে কোন যুক্তির জোরে ঠিক তার উল্টো সাফাই গাইবে উকিল?

বুদ্ধি বোধহীন অস্ত্র নয়। সত্য মিথ্যায় নির্বিকার নয়। বুদ্ধি ও বিবেক পার্বতী পরমেশ্বর। উকিল বুদ্ধিমান, এবং বিবেকবানও। তাই বুদ্ধির জোরে বেশী সাফাই গাইতে সে পারেনি।

কলকাতায় যথা সময়ে খবর এল।

ফতেচাঁদের প্রস্তাব তারা পড়েছে। হাজির হুমকি তারা শুনেছে। এবার কথা বলা দরকার। ওদিকে ফতেচাঁদের ইঙ্গিতে কাজ কারবার বন্ধ করেছে মহাজন। বেশ ফাঁপরে পড়ল কাউন্সিল।

৯ই জুন। কাউন্সিল ষ্ট্যাকহাউসকে জানালো, যদি ফতেচাঁদ কোম্পানীর

প্রাপ্য মিটিয়ে দেয়, কিংবা মিটিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয় তবে কান্তবাবুর সমস্ত গচ্ছিত ধন তার হাতে তুলে দেওয়া যেতে পারে।

কিন্তু ফতেচাঁদ প্রস্তাব করেছে যে কান্ত কোম্পানীর দালাল হয়ে কাজ করতে থাক। এ প্রস্তাব কিছুতেই মানা যেতে পারে না। কান্ত প্রমাণিত বিশ্বাসঘাতক। জেনে শুনে তাকে যদি কাজে বহাল করি, তবে আমরা আমাদের কোম্পানীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাই করবো।

যাই হোক, আমাদের আর্জি ভালভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে নবাবের দরবারে পেশ করো। আর ফতেচাঁদকে চিঠি লেখো, সে যেন আর আমাদের কাজকর্মে বিঘ্ন সৃষ্টি না করে।

কলকাতার প্রস্তাব মেনে কাজ করেনি ষ্ট্যাকহাউস। তার ধারণা এই ধরণের কোন আর্জি পেশ করতে যাওয়ার ফলে সব আলাপ আলোচনার পথ বন্ধ হয়ে যাবে। তার চেয়ে আরো কিছুদিন চুপ করে থাকা ভাল। ওদিকে কান্তর বদলে আর কাউকে কাজে নেওয়া যায় কি না সেটাও দেখতে হবে।

ষ্ট্যাকহাউস ঠিক করেছে এবার এক সঙ্গতিসম্পন্ন লোককেই দালাল করতে হবে। কান্তর মত সেও যদি কখন কোন দিন বিপদে ফেলে দেয়, তবে তার স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি থেকে যেন টাকাটা তুলে আনা যায়। কাশীমবাজারে লোক খুঁজতে থাকে ষ্ট্যাকহাউস।

খুঁজেও পায়। একজন নয়, দু'জন। কথাবার্ত্তা মোটামুটি পাকাও হয়ে যায়। ষ্ট্যাকহাউস ভাবে, এ কাজ আবার সুরু করা যাবে।

কিন্তু যায় না। যার আসার কথা সে আসে না। অন্যজনকে খবর দেয় ষ্ট্যাকহাউস। সেও কাজ করতে নারাজ। অনেক পীড়াপীড়ির পর জানতে পারে কুঠিয়াল, ফতেচাঁদের দেনা না মেটান অবধি তারা কাজ করতে পারবে না।

ওদিকে নবাব শাসিয়েছে আর একবার। বড় দেরী হয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি বিহিত করো। তা ভিন্ন তোমাদের কুঠি বন্ধ করে দেবো।

ঢাকা থেকে জোর তাগিদ আসে। এখানে কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হবার যো হয়েছে। শেঠদের গদী থেকে টাকা পাওয়া যাচ্ছে না।

লোক পাঠালো কোম্পানী ফতেচাঁদের বাড়ী।

গোমস্তা জানালো 'কান্তবাবুকে কাজে বহাল না রাখলে বাকি টাকা উশুল করার কোন পথ নেই। যদি কান্তবাবু কাজে বহাল না থাকে, তবে কান্তবাবুর

দেনা শোধ হবার কোন উপায় নেই। শেঠরা কোন সাধে সুখে এত টাকা লোকসান দিতে যাবে? কান্তবাবুকে তোমরা নাও রাখতে পারো। সে তোমাদের ব্যাপার। শেঠদের টাকাটা দিয়ে দাও। আর ফেলে রেখো না।'

ষ্ট্যাকহাউস এবার দরবার করে নবাবের কাছে। সাজিয়ে গুছিয়ে আবেদন পেশ করে। কোন ফল হয় না তার।

আবেদন পাওয়া মাত্র জবাব দেয় নবাব, কোম্পানীর কাজের নিয়ম হচ্ছে যে তাদের টাকার দরকার হলে তাদেরই বিশ্বস্ত কর্মচারী সই করে টাকা নিয়ে আসে। চোদ্দ বছর ধরে এইভাবে কোম্পানীর সঙ্গে জগৎশেঠের কারবার চলে আসছে। কান্ত যখন জগৎশেঠের গদী থেকে ধার নিয়েছে, তখন সে তোমাদেরই কর্মচারী হিসেবেই নিয়েছে। সুতরাং ধার তোমাদের। শোধ দিতে হবে তোমাদেরই। শোধ না দেওয়া অবধি তোমাদের উকিল হাজতে থাকবে।

হুমকি দেয় কোম্পানী। লড়াই যদি একান্তই প্রয়োজন হয়, তবে লড়াই তারা করবে। কিন্তু তা বলে জগৎশেঠের প্রস্তাব মেনে নিতে পারবে না।

কান্তর গচ্ছিত টাকার পরিমান সামান্য। সব দিয়েও পাওনাদার থামানো যাবে না। তাই যদি যেত তবে এত হাঙ্গামা করার দরকার হত না। আর, একজন প্রমাণিত বিশ্বাঘাতককে কাজে বহাল রাখা চলবে না। কিছুতেই না।

হুমকি দেয় চিঠি পত্রে। তলে তলে অন্য পথ দেখে। মোগল রাজনীতির ভেতরে বাস। জানে শঠতা, ষড়যন্ত্র ও কৃতঘ্নতা সার্থকতার নির্ভরযোগ্য পথ। আমীর ওমরাহ থেকে শাহানশা অবধিকে উচ্চাকাঙ্খা নাকে দড়ি দিয়ে টানে। কে না চায় বড় হতে? কার লোভ নেই ক্ষমতার ওপর? মসনদের গায় বিঁধে আছে অনেকগুলো লুব্ধ চোখ। অনেক মনসবদার পাঁজরের ভেতরে পালন করে একটা কাঙাল ভিক্ষুককে। এ কথা ভাল করে জানতো কুটিয়াল।

হাতের কাছে আছে সরফরাজ খাঁ—বাংলার দেওয়ান। কুঠিয়াল জানে তার ভিতরের তুষের আগুন অনির্বাণ। সামান্য ফুঁ দিলেই হবে। পিতৃভক্তি তার নিরুপায় ছলনা।

প্রখর বাস্তব বুদ্ধি। সরফরাজ এতদিনে নির্ভুল বুঝতে পেরেছে যে

দিল্লী থেকে তার নামে ফর্মান না আসার মূলে আছে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ। ফতেচাঁদকে ক্ষমা করতে পারবে না সরফরাজ।

তাল বুঝে ষ্ট্যাকহাউস দেখা করে দেওয়ানের সঙ্গে। ইংরেজদের প্রতি সরফরাজের আগ্রহ ক্রমবর্দ্ধমান। একদিন সরফরাজ নিজের মুখে চেয়েছিল একটা ঘোড়া। কোম্পানী ঘোড়া দিতে পারেনি। তার বদলে দিয়েছে নগদ ন'শ' টাকা। তারপর থেকে কখনও বনিবনার অভাব হয়নি। সরফরাজকে ধরে ষ্ট্যাকহাউস। দেওয়ান যেন একবার সুবিধা মত নবাবের কাছে তাদের হয়ে কথাটা পাড়ে।

একদিন হাজি আহম্মদ আর রায় রায়ান কথা দিয়েছিল ইংরেজকে, তারা থাকবে কোম্পানীর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। কথাটা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিলো ষ্ট্যাকহাউস। বললে, 'নবাবের খোদ মন্ত্রী কোম্পানীর এমন বন্ধু। তবু কিনা তাদের এমন দুর্ভাগ্য।'

কিন্তু কোন আশা নিয়ে ফিরতে পারেনি ষ্ট্যাকহাউস। অন্য বিষয় কিম্বা অন্য লোকও যদি হতো, কথা থাকতো। এ ফতেচাঁদ। নবাবকে বশ করে রেখেছে সে। বশ করেছে তামাম ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের বাইরেও তার হুণ্ডি চলে।

ফতেচাঁদ মানেই শক্তি। ফতেচাঁদের বিরুদ্ধে কোন কথা নবাবের কানে তোলা তাদের পক্ষেও একেবারে অসম্ভব। তবু তাদের সহানুভূতি আছে। কোম্পানী যেন ভুল না বোঝে তাদের। হাজী আর রায় রায়ান বিদায় করে কুঠিয়ালকে।

বসে নেই কেউ। কোম্পানীর কারবার বন্ধ হলে লোকসান ত শুধু মাত্র কোম্পানীর নয়, আরো বহু নামজাদা মহাজনের ভাগ্য কুঠির সঙ্গে বাঁধা। সবাই চায় ব্যাপারটা তাড়াতাড়ি মিটে যাক।

আবার নতুন প্রস্তাব এল। প্রস্তাবক বাইরের লোক। বলে কান্তবাবুর বিষয় সম্পত্তি আর নগদ টাকা মিলিয়ে হবে প্রায় দু'লাখ বাহাত্তর হাজার টাকা। কান্তবাবুর হিসেব মত কোম্পানী পাবে আশী হাজার টাকা। কোম্পানী ওই টাকা থেকে তার প্রাপ্য আশী হাজার টাকা কেটে নিয়ে নতুন দালাল লাগাক। বাকি থাকলো এক লাখ বিরেনব্বুই হাজার। এই টাকা নতুন দালালের হাতে দিক। কিন্তু একটা সর্তে। ফতেচাঁদ

এবং কান্তবাবুর অন্যান্য পাওনাদারের টাকা মিটিয়ে দেবার ভার নিতে হবে নতুন দালালের।

প্রস্তাব পাঠানো হল কলকাতায়। প্রস্তাবের সঙ্গে লিখে পাঠালো কুঠিয়াল, কান্তবাবু একটা চিঠি লিখেছে। সেই চিঠি যদি দরবারে গিয়ে পৌঁছায়, তবে অবস্থা খুব খারাপ হয়ে উঠবে। বিবাদ মিটিয়ে নেওয়াই ভাল।

হঠাৎ কান্তবাবু দেউলে হয়ে গেল। বহু লোকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করেছে। এমন কি কোম্পানীও। কিন্তু সেদিন সোজা উত্তর দেয়নি কান্ত। ভেবে থাকবে ব্যাপারটা মিটে যাবে।

কোম্পানী তাকে বিশ্বাস করে। আবার যদি কুঠির দালাল হতে পারে, তবে এই অপ্রীতিকর কথা বলার দরকার হবে না কোনদিন। জাত ভাইদের ওপর ওদের টান খুব বেশী। তাই তার সত্যি কথা হয়ে দাঁড়াতে পারে অভিযোগ। তাহলে কোম্পানীর দোর তার কাছে চিরদিনের মত বন্ধ হয়ে যাবে। তার চেয়ে সহ্য করা ভাল। দেখা যাক কি হয়।

এখন বুঝতে পেরেছে কান্ত, কোম্পানী আর তাকে কোনদিন কাজ দেবে না। কোম্পানীর চোখে সে আজ বিশ্বাসঘাতক।

ঠিক, সে বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু কেন সে বিশ্বাসঘাতক হতে বাধ্য হল? এ কথা কেউ জানবে না কোন দিন?

সব কথা জানিয়ে চিঠি লিখলো কান্ত। ষ্ট্যাকহাউসের আগের কুঠিয়াল ষ্টিপেনসন তার কাছ থেকে জোর করে আদায় করে নিয়েছে এক লাখ পঁচাত্তর হাজার টাকা। তারই বেনিয়ান মেরে দিয়েছে আরো সাত হাজার। এর পরও যদি কান্ত দেউলে না হয়, তবে কে হবে? এর পরও সে বিশ্বাসঘাতক?

'আমি আপনাদের কর্মচারী। আপনারা আমার অন্নদাতা। আপনাদের কাছে আমি মিথ্যে বলব না। তবু আমার কথা যদি আপনারা বিশ্বাস করতে না পারেন, তবে ডাকুন ষ্টিপেনসন সাহেবের বেনিয়ান হরিকিষন আর সদানন্দকে। তাদের সাক্ষ্য প্রমাণ নিন। খাতা পত্র পরীক্ষা করে দেখুন আমি মিথ্যাবাদী কি না।'—আবেদন জানাল কান্ত।

জাঁক জমক করে কাউন্সিল তদন্ত কমিটি বসিয়েছিল। হৈ চৈ করে কাজ করতে করতে অকস্মাৎ সেই কমিটি একেবারে চুপ করে গেল। কান্তবাবুর অভিযোগের বিরুদ্ধে আর একটা কথা না বলে সাহেবেরা অন্য কাজে ভীষণ মনোযোগী হয়ে উঠল তারপর থেকে।

রূপো দিয়ে মাল কেনার চেষ্টা করতে লাগলো। পারলো না। ঢাকার গদীতে টাকার জন্য আবার গেলো। পেলো না।

উল্টে ফতেচাঁদ তাগাদা দিতে থাকলো দেনা শোধ করার জন্য। ইতিমধ্যে লোক পাঠিয়ে এবং ষ্ট্যাকহাউস নিজেও দেখা করতে চেয়েছে ফতেচাঁদের সঙ্গে। দেখা হয়নি।

কয়েকদিন হল ঘর থেকে বার হচ্ছে না ফতেচাঁদ। তার এক ছেলে মারা গিয়েছে হঠাৎ। তাই নিজে এখন কাজ কারবার দেখে না। একটু ভেঙে পড়েছে সে। হাজার হোক বয়েস হয়েছে।

অস্টেণ্ড কোম্পানী হুগলীতে জমিয়ে বসেছে। তাদের বিরুদ্ধে এখুনি কিছু করা দরকার। কিন্তু দরবারে একজনও বন্ধু নেই কুঠির। থাকলেও জগৎশেঠকে চটিয়ে ইংরেজদের পক্ষে খোলাখুলি ভাবে কথা বলার সাহস নেই। সাবের সরফরাজও কিছু করতে পারেনি। কুঠিয়াল বুঝেছে সরফরাজ পারবে না।

কলকাতা তবু অটল। বাইরে থেকে যে প্রস্তাব গিয়েছিল তা মনঃপুত নয়। নবাবের চিঠির জবাব দিয়েছে। উত্তরে নবাব বলেছে, 'মনে রেখো', ফতেচাঁদের টাকা মানে নবাবের নিজের টাকা। যদি দিতে দেরী করো, পাটনার নৌকো আটকাবো।'

কুঠিয়াল তার মহাজনদের পাঠিয়েছে শেঠের কাছে। তারা শেঠকে বোঝাবার চেষ্টা করেছে। শেঠ বুঝিয়ে দিয়েছে যে, সে ত-সব সময় মিটমাট করার জন্যে তৈরী। কিন্তু কুঠিয়াল চায় আমার এতগুলো টাকা জলে পড়ুক। তোমরা বল আমার জেদ কোথায়। কোথায় আমার অন্যায়।

মহাজনরা বুঝে ফিরে আসে। শেঠের কথাই ঠিক। আপদে বিপদে শেঠদের কাছে যেতেই হবে।

ইংরেজদের সঙ্গে শেঠের ঝগড়া এখন আর শুধু টাকা কড়ির নয়। এ এখন ইজ্জতের ব্যাপার। শেঠকে চটাতে পারবে না তারা কিছুতেই। অপেক্ষা করে, কুঠির ছায়ার কাছেও ঘেঁসে না কেউ।

এক চুল নড়বে না কলকাতা। কাশীমবাজার কুঠি যদি উঠে যায়, যাক। কুঠি বন্ধ করার ব্যবস্থা করে ষ্ট্যাকহাউস। কাজ কারবার ত এপ্রিল মাস

থেকেই বন্ধ। থাক বন্ধ। ষ্ট্যাকহাউস ঠিকই করেছে। কুঠিতে থাকবে একা হরিকিষণ, তাদের বেনিয়ান।

কথাটা পৌছালো নবাবের কানে। তলব পড়লো কোম্পানীর উকিলের। উকিল আসতেই নবাব বললে, 'ফতেচাঁদের দেনা দিতেই হবে। যদি না দাও, তবে চলে যাও কাশীমবাজার ছেড়ে। সঙ্গে তুমিও যেতে পারো।'

তবু একবার আরমানির বুদ্ধির শরণ নেয় ষ্ট্যাকহাউস। মরণাপন্ন রোগীর মুখে মৃগনাভি যেন। ওয়াদ ওস্তাদ লোক। সে সব ব্যাপারটাই জানে। নিরুপায় হয়ে ষ্ট্যাকহাউস বললে, 'একটা পথ বাৎলে দাও।'

ওয়াদ বললে, 'রসো। এখন ব্যাপার বড় জটিল হয়ে গেছে।'

'সেই জন্যেই তো তোমার কাছে আসা।'

'কুঠি ছেড়ে চলে যাবে?'

'কাজ কারবার নেই। বরং উৎপাত দিনের পর দিন বাড়ছে। কুঠি খুলে রেখে লাভ?'

'কুঠি বন্ধ করলে উৎপাত কমবে ভেবেছো? কুঠি ছেড়ে গেলে নবাবের রাগ আরো বাড়বে। তার মানে হবে লড়াই করে ব্যাপারটার ফয়সালা করা। পারবে? তখন আর মিটমাটের কোন কথা কেউ শুনবে না। বলতেও যাবে না কেউ। এত সাহস কারো হবে না। ও পথ নিয়ো না।'

ষ্ট্যাকহাউস আরো কয়েকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে। সবাই এক পরামর্শ দেয়। কুঠি বন্ধ করা মানে নিজের হাতে নিজের গলা কাটা।

কুঠি খোলা রেখে এই কথা জানায় কলকাতায়। ষ্ট্যাকহাউসের কথা ঠিক। কুঠি বন্ধ করলে বাংলা থেকে কারবার বন্ধ করতে হবে ইংরেজকে।

মুর্শিদকুলির সময় কুঠি বন্ধের হুমকি দিয়েছে তারা। সে ক্ষেত্র ছিল ভিন্ন। এত জটিল হয়নি কখনো। দরবারে বন্ধু ছিল তাদের। কাজ হয়েছে। এখন আর কোন উপায় নেই।

কোম্পানীর ক্ষতি হবে বলে জগৎশেঠের প্রস্তাবে রাজী হতে পারেনি কাউন্সিল। এপ্রিল মাস থেকে সেপ্টেম্বর মাস এক কাড়ির মাল সওদা করতে পারেনি কুঠিয়াল। ক্ষতির পরিমান হিসেব করে অবাক হল কাউন্সিল। তারাও অসম্ভব জিদের বশে নিজেদের কবর খুঁড়ছে।

অভিজ্ঞতা থেকে বুঝেছে কাউন্সিল যে দরবারে ফতেচাঁদ তাদের একনিষ্ঠ বন্ধু। আর কোন নির্ভরযোগ্য বন্ধু নেই। সেই ফতেচাঁদকে অপমান করে নিজের সর্বনাশ ডাকছে কোম্পানী।

কাউন্সিল ঠিক করলো, দাবী মিটিয়ে দিতে হবে ফতেচাঁদের। কিন্তু কান্তকে কাজে রাখা যাবে না কিছুতেই। বিশেষ করে ষ্টিপেনসনের ব্যাপারটা জানাজানি হবার পর আর তাকে কাজে রাখা যায় না। কান্তর জায়গায় বুড়ো দত্তকে বহাল করো।

ফতেচাঁদ কুঠির নামগন্ধও করে না। কথা উঠলে বিদ্রূপের হাসি ফুটে ওঠে মুখে। করুক বিদ্রূপ। স্পর্শ কাতর হলে কি আর ব্যবসা করা যায়। যাই হোক, আগে ত কাজ চালু করা যাক। বুড়ো দত্তকে আগে বসিয়ে দিতে হবে।

ষ্ট্যাকহাউস ডেকে পাঠায় বুড়ো দত্তকে।

'কাজ করতে পারবো না।' সাফ জবাব দেয় বুড়ো দত্ত।

অষ্টেও কোম্পানার সঙ্গে শেষ বোঝাপড়ার দরকার। উকিল যায় দরবারে।

হাজি জবাব দেয়, 'ফতেচাঁদের ব্যাপার না মিটলে একটা কথাও শুনবো না। বেরিয়ে যাও।'

বেরিয়ে আসে উকিল। পাকা উকিল। কিন্তু এমন অপমান হতে হয়নি কখনো।

ষ্ট্যাকহাউস বোঝে যে কোন রকমে হোক ফিরতে হবে।

অক্টোবর মাসে আবার আলাপ আলোচনা সুরু করে ষ্ট্যাকহাউস। ফতেচাঁদ জানায়, 'মিটমাট করতে তার কোনদিন আপত্তি ছিল না। আজও নেই। জিদ ধরেছে কোম্পানী। আমার টাকা দেবে না। আমিও চাইনি আর। দেখবো কতদিন না দিয়ে পারে। তারপর, কাজকর্ম ভাল চলছে তো?'

খোঁচাটা হাসিমুখে হজম করে ষ্ট্যাকহাউস। বলে, 'জিদ নয়। শেঠরা আমাদের পুরানো বন্ধু। তাদের সঙ্গে সামান্য ব্যাপার নিয়ে মনকষাকষির জন্য খুবই দুঃখিত কাউন্সিল।'

'আমিও দুঃখিত।'

'কাউন্সিল আপনার ওপর কিন্তু এখনো নির্ভর করে।'

'আমিও সাধ্যমত সাহায্য করতে কুণ্ঠিত হবো না।' জবাব দেয় জগৎশেঠ।

ষ্ট্যাকহাউস বোঝে শেঠ ভদ্রতা করছে। তবু বশে আনতে হবে জগৎশেঠকে।

আবার আরম্ভ করে ষ্ট্যাকহাউস।

'এত দিনেও নবাবের সঙ্গে পরিচয় হয়নি আমার। অথচ আপনিই নবাবের সঙ্গে নতুন কুঠিয়ালের পরিচয় করে দিয়ে থাকেন।'

'তাই নাকি? এখনো নবাবের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হয়নি নাকি?'

'আপনি না নিয়ে গেলে কি করে হবে?'

'বেশ নিয়ে যাবো।'

'কবে?'

'সুবিধে মত একদিন আসবেন।'

৬ই অক্টোবর। ষ্ট্যাকহাউস আর রাসেলকে ফতেচাঁদ নিয়ে গেল নবাবের কাছে। ভদ্রতার সঙ্গেই তাদের সঙ্গে কথা বলেছিল নবাব।

ষ্ট্যাকহাউস বোঝে গরম হাওয়া কমেছে। এইবারই উপযুক্ত সময়। একদিন মহিমাপুরে গিয়ে এক লাখ তিরিশ হাজার টাকা জগৎশেঠ ফতেচাঁদকে দিয়ে রফা করে আসে।

বিশে অক্টোবর জগৎশেঠ লিখে দেয় কোম্পানীর কাছে কান্তবাবুর দেনা বাবদ আর কোন পাওনা নেই তার।

বিবাদ মিটলো কোম্পানীর সাথে। বাজারে খবর ছড়াতে দেরী হয় না। কিন্তু বাজারের খবরে বিশ্বাস রাখা ঠিক নয়। মহাজনরাও চঞ্চল। কিন্তু এগিয়ে আসতে সাহস করে না কেউ। বহুদিন কাজ কারবার বন্ধ। এখন পুরোদমে কাজ না করতে পারলে ভাহা লোকসান হবে কোম্পানীর।

কুঠিয়াল অবস্থা বুঝিয়ে বলে জগৎশেঠকে। বলে, 'ফতেচাঁদ যদি একদিন কুঠিতে পায়ের ধূলো দেয়।'

ফতেচাঁদ বলে, 'বেশ একদিন যাব কুঠিতে। কাজের চাপ একটু কমুক।'

কিন্তু যাওয়া হয়ে ওঠে না।

ষোলো

বিচক্ষণ নবাব হয়েও সুজাউদ্দীন শেষ অবাধ বিলাসের শিকার। সুজা মোগল না হয়েও মোগল কায়দায় পোক্ত। খরচ বাড়ে ক্রমাগত। আয় ব্যয়ের সমতা রাখতে প্রবীণ দেওয়ান আলম চাঁদও নাজেহাল। মুর্শিদকুলির সময় থেকে প্রজাদের ওপর :কর বেড়ে গেছে। মাঝে মাঝে নতুন নতুন সাময়িক কর, নজরানা, দক্ষিণা দিতে হয়েছে। প্রজারা সহ্য করেছে বোঝার ওপর শাকের আঁটি ভেবে। মুর্শিদকুলির কাছ থেকে তারা উপকার পেয়েছে তার বদলে।

কিন্তু সুজাউদ্দীন কোন কথা বুঝতে চায় না। প্রয়োজন তার টাকার। সুতরাং দেওয়ানকে যোগান দিতেই হবে। কোথা থেকে দেবে, সে চিন্তা করার ভার নবাবের নয়। দেওয়ানের চিন্তা দেওয়ানই করুক।

নাচ গান হোলির উৎসবে কেটে যায় বাকি কটা দিন। আবার কুমকুমের ভেতর আনন্দের বসন্ত নামুক। জীবন ভোগের জন্য। আজকাল নবাব থাকে ফর্রাবাগে। নানা দেশের সুন্দরী বেগমদের নিয়ে জীবনটাকে তুড়ি মেরে কাটিয়ে দেয় সুজা। অর্থের চিন্তা করতে সে রাজী নয়। সে এসেছে খরচ করতে। জন্মদিনে দান করতে, খুশী হলে উপহার দিতে। দিল তার দরিয়া।

নিরুপায় দেওয়ান কর চাপায়। নতুন কর। মুর্শিদকুলি কর চাপিয়ে যত টাকা তুলে নিয়েছে প্রজাদের ওপর দিয়ে, তার চেয়ে অনেক বেশী তোলে রায় রায়ান। প্রায় শতকরা আঠারো ভাগ বেশী। তবু কূল কিনারা নেই। ফর্রাবাগে তাল কাটে না যেন।

দস্তক নিয়ে চোরা কারবার চলছে অনেকদিন থেকে। সবাই জানে। সায়ের চৌকিদার থেকে রায় রায়ান আলম চাঁদ অবধি।

কিন্তু বন্ধ করতে পারেনি। নুন সুপারি নিয়ে কারবার করত এ দেশের মহাজন। কোম্পানী ওই কারবারেও হাত দিতে চেয়েছে। মুর্শিদকুলির জন্যে পেরে ওঠেনি। ওই কারবার থেকে দেশের লোক যদি উৎখাত হয়ে যায়, তবে তারা বাঁচবে কি করে। আর নুন সুপারি ইত্যাদি নিয়ে কারবার

করার অধিকার দেওয়া নেই ফর্মানে। ফর্মান অনুসারে ওই ব্যবসায় হাত দিতে পারে না কোম্পানী।

এখন তারা নিষিদ্ধ কারবার চালিয়েছে পুরো মাত্রায়। পেটে হাত পড়তে টনক নড়েছে এ দেশের কারবারীদের।

১৭৩১ সালের সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে এক কাণ্ড ঘটে গেল। বুড়ীগঙ্গা দিয়ে কোম্পানীর নৌকা আসছিল। সায়ের চৌকীদার আগেই খবর পেয়েছে নৌকোতে বে-আইনী মালপত্র আছে। দস্তক নিয়ে ঝামেলা করে লাভ নেই। বাদশার ফর্মানই সেই পথ বন্ধ করে দিয়েছে। কার মাল পরীক্ষা করে দেখবার উপায় রাখেনি সম্রাট। কোম্পানীর কথাই মেনে নিতে হবে। কিন্তু উপায় এখনো আছে। দেখতে হবে নৌকোয় যদি নুন সুপারি থাকে।

নৌকো আটক করেছে সায়ের চৌকী। নৌকোয় ছিল সাহেব মার্চেন্ট। অপমান হয়েছে তার। চৌকীদারকে ধরে মারপিট করতে থাকে সাহেবরা। একজন চৌকীদার মারা যায়, আহত হয় তিনজন।

মৃত চৌকীদারের দেহ কাঁধে করে নিয়ে এসেছে দরবারে। নবাবের যাতায়াতের পথের ধারে শুইয়ে রেখেছে তাকে।

নবাব দেখেই আগুন।

ডাক পড়ে কোম্পানীর উকিলের। চিৎকার করে নবাব। যদি ইংরেজরা এমনভাবে দিনের পর দিন স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে, যদি বাদশার প্রজাদের কথায় কথায় জান দিতে হয়, তবে নবাব হয়ে চোখ বুজিয়ে থাকা অসম্ভব।

হাজি আহম্মদ আর রায় রায়ান থামাতে চেষ্টা করে নবাবকে। নবাব নিজেকে সংযত করতে পারে না। কাশীমবাজারময় রাষ্ট্র হয়ে পড়ে কি আছে ইংরেজের কপালে, কে জানে!

কয়েকদিন না যেতেই ডাক পড়লো রায় রায়ানের। দরবারে নয়, খাস কামরায়। নবাব জিজ্ঞাসা করলে, 'নতুন বাদশার কাছ থেকে ব্যবসা বাণিজ্যের জন্যে নতুনভাবে ফর্মান আনতে হয়? এইতো নিয়ম।'

রায় রায়ান বলে, 'তাই হুজুর।'

'ইংরেজরা কি মুহম্মদশার কাছ থেকে নতুন ফর্মান পেয়েছে?'

'পায়নি।'

'বাদশাকে নজরানাও পাঠায়নি বোধ হয়?'

'আজ্ঞে, হুজুর।'

'এখুনি কুঠিতে বলে পাঠাও সম্রাট মুহম্মদশার আমল থেকে আজ অবধি যত টাকার কাজ কারবার হয়েছে, তার ওপর চলতি হার অনুসারে কর দিতে হবে। কোম্পানীর পুরানো ফর্মান নতুন বাদশার আমলে অচল। বলে দেবে, নবাব বাদশার হুকুমেই এই হুকমত নামা জারী করা হল।'

সরফরাজের কাছে গিয়ে পড়লো ইংরেজরা। সরফরাজ কথা দিয়েছে, বাবাকে সে শান্ত করবে। কিন্তু কতদূর কি করতে পারতো সরফরাজ বোঝা মুসকিল। কথাটা পড়ার আগেই আর এক বিপদ।

আগের মত ঘটনা। নৌকা আটকে চৌকীদারের বিপত্তি। চৌকীদারের মাথা কেটে ফেলেছে কোম্পানীর সাহেব। কাটা মুণ্ড নিয়ে লোকজন হাজির হয়েছে নবাবের দরবারে। এর পর কথা পাড়তে পারেনি সরফরাজ। সাহস হয়নি তার।

নবাব বললেন, 'ইংরেজ কোম্পানী তাগদ যদি খুব বেড়ে থাকে, তবে তার পরীক্ষা হোক একবার। হাজি আহম্মদ।'

হাজি কোষ থেকে তলোয়ার খুলে অভিবাদন জানালো নবাবকে।

হাজির কাছে গিয়ে পড়ল ষ্ট্যাকহাউস। 'নবাবকে নজ্‌রানা দিলে কি বিবাদ মিটতে পারে হাজি সাহেব?'

'নবাবের হুকুম খেলার জিনিষ নয়। এ কথা ভুলে গেলে বিপদ বাড়বে।' হাজি কথা বাড়াতে চায় না।

কিন্তু বিপদ বাড়ছে প্রতিদিন। দরবারে ঢুকতে পারে না উকিল। বাজারে অপমান করে মাঝে মাঝে নবাবের লোকজন। প্রতিদিন নতুন নতুন ছুতোয় উপদ্রব হয়। বিপদ বোঝাতে চেষ্টা করে ষ্ট্যাকহাউস। কিন্তু কলকাতার কাউন্সিল সব সময় বুঝতে পারে না। অবুঝকে কি করে বোঝাবে ষ্ট্যাকহাউস। বিপদ তার ঘরে বাইরে।

পরামর্শ দেয় হিতাকাঙ্ক্ষীরা। বলে, 'ফতেচাঁদকে চটিয়ে সর্বনাশ করেছ সাহেব। এ সব ব্যাপারে কলকাঠি শেঠজীর হাতে। তারি আক্রোশে তোমরা ডুববে।'

ষ্ট্যাকহাউস চিঠি পাঠায় জগৎশেঠ ফতেচাঁদকে। অনুনয় বিনয় করে চিঠি

লিখেছে সাহেব। 'শেঠরা তাদের পুরানো বন্ধু। এই সময়ে বন্ধুকে কি করে ত্যাগ করতে পারে ফতেচাঁদ।'

জবাবে জানায় ফতেচাঁদ, 'ত্যাগ ত করিনি। আমি ইংরেজদের শত্রু নই। কিন্তু এ অবস্থায় তাদের হয়ে কোন কথা বলতে অপারগ। তবু যদি চাও তবে তাদের একজন কর্মচারীকে দেওয়ান আর মুৎসুদ্দির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি।'

হিতাকাঙ্ক্ষীরা পরামর্শ দেয়, 'যত টাকাই ঢাল দরবারে, ইঁদুরের গর্ত্ত দিয়ে তা বাইরে যাবে। কোন কাজ হবে না। বাঁচতে যদি চাও, ফতেচাঁদকে হাত করো। তা ভিন্ন নবাবের সঙ্গে তোমাদের বিরোধ অনিবার্য।'

ষ্ট্যাকহাউস রিপোর্ট পাঠালো কলকাতায়। কাশীমবাজার কুঠির অবস্থা বুঝতে পারে কাউন্সিল। তারাও বুঝতে পারে ফতেচাঁদকে হাত করা দরকার। কি করে হাত করা যাবে?

ধাক্কা পেয়েছে ফতেচাঁদ। এত বড় ধাক্কা হয়ত আশা করেনি। কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে। কোম্পানী ত সব ভুলে যেতে চায়। ভুলতে পারবে কি ফতেচাঁদ?

কাশীমবাজারে ষ্ট্যাকহাউস খোঁজ নেয়। গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে। সবার মুখে এক কথা। কলকাটি নাড়ে ফতেচাঁদ। ও গভীর জলের মাছ। বোঝা বড় দায়। কারণে অকারণে ঘাই দিয়ে বেড়ান স্বভাব নয়। সে কথা ষ্ট্যাকহাউসও জানে। এখন কথা হল ফতেচাঁদের মন পাওয়া যাবে কিসে!

কান্তবাবুর কারবারে কোম্পানীর সঙ্গে মিটমাট হয়ে গেলেও সত্যিই লোকসান হয়েছে তার। বাদশার দরবারে ঘুস দিতে হয়। ঘুস দেওয়া অন্যায় নয়, নেওয়াও অন্যায় নয়। ওটা রীতি। নবাবের দরবারেও সেই দস্তুর। নবাবের মন্ত্রী রাজস্ব বিভাগের কর্তা হয়েও এখন অবধি এক কড়িও নেয়নি ফতেচাঁদ। দেবার সাহসও হয়নি। তাই বলে ব্যবসার টাকা লোকসান দিতে হবে? তার পরেও বন্ধু থাকতে হবে? এত বড় বন্ধু-প্রীতি কল্পনাও করতে পারে না ষ্ট্যাকহাউস।

বরং দরবারে একা ফতেচাঁদ বহুবার কোম্পানীর পক্ষে দাঁড়িয়েছে। স্বয়ং মুর্শিদকুলি তিরস্কারও করেছে তার জন্যে। তারই কৃতজ্ঞতায় ফতেচাঁদকে সন্তুষ্ট করা কি কোম্পানীর পক্ষে অন্যায় হতো? সেটাই কি বন্ধুত্বের বিনিময়

হতো না? কিন্তু ষ্ট্যাকহাউস সামান্য কুঠিয়াল। হুকুম তামিল করতে হবে। করেও ষ্ট্যাকহাউস বাজার থেকে বুঝতে চায়, কি করলে ফতেচাঁদ আবার প্রসন্ন হবে।

ষ্ট্যাকহাউস বড় চিঠি লেখে কলকাতায়। জবাব আসে,—কান্তবাবুর ব্যাপারে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ সত্যি যদি এত দুঃখ পেয়ে থাকে তবে দ্যাখো কি করে তার দুঃখ ঘোচাতে পার। কিন্তু টাকা কড়ি দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ো না। আমাদের জানিয়ো। তারপর ব্যবস্থা করা যাবে।

ষ্ট্যাকহাউস বুকে বল পেল। উৎসাহ করে কাজে নামবার আগেই এক খবর পেয়ে হাত পা হিম হবার উপক্রম। বাদশাকে নজরানা দিতে হবে এক লাখ। নবাবের জন্যেও কিছু চাই।

দাবীর বহর দেখে চটে যায় কোম্পানী। বলে, 'এক কানা কড়িও দেবো না।' রাগে, কিন্তু রাগের মাথায় কাজ করে না। হুকুম দেয়, 'নবাবকে চল্লিশ হাজার আর দেওয়ানকে পাঁচ হাজার দিয়ে কাজ হাসিল করো। তাতেও যদি একান্ত না হয়, তবে আরো দশ হাজার বাড়াতে পারো। তার বেশী নয়।'

রোজই ষ্ট্যাকহাউস আসে মহিমাপুরে। কখনো ঘোড়ায় চড়ে কখনো পালকিতে। আসার কামাই নেই। রোজই কথা বলতে সময় পায় না জগৎশেঠ। কথা বল্লেও খুব সাধারণ মামুলি কথার পর বিদায় দেয়। বিফল ষ্ট্যাকহাউস কুঠিতে ফিরে এসে ভাবে, চারের ধার দিয়েও মাছ যাচ্ছে না। কিসে গাঁথা যাবে বঁড়শিতে?

এতদিন বাজারের কথা শুনেছে কুটিয়াল, পাকা খবর পায়নি। আজকে পেয়েছে। এ খবর অবিশ্বাস করা যায় না। জগৎশেঠ তখন ছিল না। কথা হচ্ছিল জগৎশেঠের গোমস্তা রূপচাঁদের সঙ্গে। গোমস্তা জানায়, কান্তবাবুর কারবারে তাদের খোয়া গেছে পঞ্চাশ হাজার টাকা। কোম্পানীর উপকার করতে ত এই লোকসান। এইবার চোখ খুলেছে ফতেচাঁদের।

সাহস করে বলে ষ্ট্যাকহাউস, 'কোম্পানী যদি এই টাকাটা মিটিয়ে দেয়।'

'কি হবে বলা যায় না। তবে সম্পর্ক আগের মত ভাল না হলেও একটু ভাল হবে।'

'নবাব বলেছে, বাদশা হুকুম দিয়েছে নতুন ফর্মান চাই। ওটা বোধ হয় নবাবের চালাকি। দিল্লী থেকে এমন কোন হুকুম আসেনি। তাই না?'

'মোটেই না। দিল্লী থেকে সত্যিই হুকুম এসেছে।'

আরো কিছুক্ষণ মহিমাপুরে কাটিয়ে কুঠিতে ফিরে আসে ষ্ট্যাকহাউস। নভেম্বর মাসে আবার চিঠি লিখলো ষ্ট্যাকহাউস। মিছেমিছি ফতেচাঁদের সঙ্গে দেখা করে লাভ নেই।

ফতেচাঁদ রেগে যায়। বলে, 'আমার সঙ্গে দেখা করে সময় নষ্ট করছো। তোমাদের বিপদ খুব সামান্য নয়। তাচ্ছিল্য করলে বিপদে পড়বে। ফর্মানের সুযোগ হারাতে খুব বেশী দেরী নেই আর। তখন হাত কামড়ে লাভ হবে না। সময় থাকতে বিহিত করো। দূরে থেকে অবস্থা সব সময় বোঝা যায় না। তাই বিবাদ মেটানোর জন্য অতিরিক্ত ক্ষমতা চাই। কোলকাতার হুকুমের অপেক্ষা করে থাকলে কাজ হবে না।'

রাজী হয় কাউন্সিল। জানায়, 'ফতেচাঁদকে টাকা দিতে পারো। তবে কান্তবাবুর হিসেবের জন্য নয়। আমাদের হিতাকাঙ্খী বন্ধুকে উপহার দিচ্ছি এই ভেবে।'

হুকুম পেয়েছে ষ্ট্যাকহাউস। হিসেবের জন্য মাথা ঘামায় না। সব নির্ভর করবে কথা বলার কায়দার ওপর। ষ্ট্যাকহাউস বাক্‌পটু। সুতরাং লাঠি অক্ষত রেখেই সাপ মারতে পারবে।

কয়েকদিনের ভেতর ভাব হয় ফতেচাঁদের সঙ্গে। ফতেচাঁদ ঘুরে যায় কাশীমবাজার কুটিতে। খবরটা বাজারে ছড়িয়ে পড়ে হাওয়ার মত। ভরসা পায় মহাজন।

ইংরেজদের অবস্থা একটু ভাল এখন। আগে লোকে গ্রাহ্য করতো না, এখন সমীহ করে। ফতেচাঁদের এক সফরে এতখানি সুফল আশা করেনি ষ্ট্যাকহাউস। মনে মনে মুণ্ডপাত করে কাউন্সিলের।

তাদেরই জিদ আর অবিবেচনার জন্য এতখানি ক্ষতি হয়েছে কুঠির। কুঠিতে ডেকে এনে আদর আপ্যায়নের পর টাকার তোড়া এমনভাবে উপহার দিয়েছে ষ্ট্যাকহাউস যে ফতেচাঁদ না বলতে পারেনি। কুঠিতে হাসি ফুটেছে।

খবর দিয়েছে ফতেচাঁদ, খবরটা ভাল নয়। তবে পাকা। ফতেচাঁদ নিজে পাঠাচ্ছে। বাদশা ফর্মানের জন্য পরোয়ানা পাঠিয়েছে। নবাবের হুকুম একেবারে হুমকি নয়। তবে সে জানতে পেরেছে যে বাদশাকে

এক লাখ আর নবাবকে এক লাখ টাকা দিলে কোম্পানী আগের মত অগাধ ব্যবসা করতে পারবে। নবাব সুপারিশ করলে 'না' বলতে পারবে না মুহম্মদ শা।

এই পাকা খবরটাও কেউ দিতে পারেনি। সরফরাজের ওপর বিশ্বাস করে কাজ পায়নি কোম্পানী। বাবা না থাকলে অনেক লম্বা চওড়া কথা বলে সরফরাজ। কিন্তু বাপের সামনে কেঁচো হয়ে যায় একেবারে। রায় রায়ান তাগাদা দিয়েছে কেবল। হাজি আহম্মদ দিয়েছে ধমক।

এক কথায় রাজী এখন কোম্পানী। নবাবের সঙ্গে লড়াই এড়াতে হবেই। যুদ্ধের জয় পরাজয়ের কথা বাদ দিলেও থাকে ব্যবসার কথা। পরাজয় হবেই। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই তাদের। তারপর কারবার গোটাতে হবে। দুকুল হারাতে রাজী নয় কোম্পানী।

মিটমাট হতে আর দেরী নেই। কুঠি পরিষ্কার। নৌকো সংস্কার করতে সবাই ব্যস্ত। খবর পাঠালো আলম চাঁদ, 'দরবারে এস।'

দরবারে গেল ষ্ট্যাকহাউস। আলম চাঁদ একটা কাগজ দিয়ে বললেন, 'সই করো।'

না পড়ে সই করবে না ষ্ট্যাকহাউস। পড়ে দিল উকিল। শুনে ষ্ট্যাক-হাউস থ'। লেখা আছে যে কোম্পানী আর জাহাজ বাড়াতে পারবে না। এখন যে ক'খানা জাহাজ আছে, সেই ক'খানাই থাকবে।

রাজী নয় ষ্ট্যাকহাউস। রায় রায়ানের কথার নড়চড় নেই। আবার গিয়ে পড়লো শেঠের বাড়ী ষ্ট্যাকহাউস। বিবর্ণ বিব্রত কুঠিয়ালকে দেখে হেসেছিল ফতেচাঁদ। কোন আশ্বাস-অভয় দেয়নি। শুধু বলেছিল, 'এখন ফিরে যাও। পরে দেখা যাবে।'

দু' একদিন পরে নবাবের হুকুমে পরোয়ানা নিয়ে কুঠিতে এল জগৎশেঠ ফতেচাঁদ। নবাব আদেশ দিয়েছে চৌকিতে নৌকো ছেড়ে দেবার জন্য। আগের মতই ব্যবসা করতে পারবে। কিন্তু নুন সুপারি ইত্যাদি জিনিষে হাত দেওয়া চলবে না।

জগৎশেঠ বললে, 'ও সব জিনিষ বিক্রি করে এদেশের ছোট ছোট মহাজনরা কোনক্রমে বেঁচে থাকে। কোম্পানী যদি তাদের মুখের ভাত কেড়ে নেয়, তবে ওদের কি হবে। ওই কটা জিনিষ বাদ দিয়ে কারবার করো। আগের মত আমাকে পাবে। কোন ভাবনা নেই। পরোয়ানা আর ফর্মানের জন্যে দু'লাখ টাকা দিতে হবে না। দরবারের সব খরচ খরচা

নিয়ে এক লাখ আশী হাজার দিতে হবে।' দরবারে এমনি প্রায় হাজার ত্রিশ টাকা খরচা করতে হত।

কলকাতায় চিঠি লিখলো ষ্ট্যাকহাউস, 'ফতেচাঁদের জন্য এ যাত্রায় রক্ষা পেলাম। পঞ্চাশ হাজার টাকাও বাঁচলো।'

সতেরো

শেঠদের সঙ্গে কোম্পানীর বিবাদ ছিল জটিল। নবাবের শক্তি জগৎ-শেঠের পক্ষে। কোম্পানী ভীত না হলেও বিব্রত হয়েছিল। কিন্তু বিবাদের পরিধি সীমাবদ্ধ। পিছনে কোন রাজনৈতিক প্রেরণা ছিল না।

তাই টাকার হিসেব মিটে গেলেই ব্যবসা আগের মতই জাঁকিয়ে আরম্ভ হল। লাখ লাখ টাকার হুণ্ডী দর্শনী জগৎশেঠরা পায়। কোম্পানীর অভাব মেটে, কাজ বন্ধ থাকে না। পাটনার গদীতে টাকা না থাকলে, ঢাকার গদী কোম্পানীকে ঠিক সময়ে হুণ্ডী না ভাঙিয়ে দিতে পারলে, মহিমাপুরকে সব ঝক্কি সামলাতে হয়।

সুরম্যান দিল্লীতে সম্রাট ফাররুকশেরের দরবারে হত্যা দিয়ে পড়েছিল ফর্মানের জন্য। জলের মত টাকাও খরচ হয়ে যাচ্ছিল। খাজা সরহাদ তখনই বায়না ধরেছিল তার পাওনা মেটানোর জন্য। খাজাকে হাতে রাখতে সুরম্যান খুব ব্যগ্র। অসুবিধের সময় মোচড় দিয়ে বেশী আদায় করার মতলব খাজার। সুরম্যান বুঝতে পেরেছিল। পেরেও নাচার। খাজাকে চটাতে চায়নি।

শেঠদের দিল্লীর গদীতে বসতো তখন ফতেচাঁদ ও সদানন্দ। সদানন্দের কাছে জামীনদার থাকলো কোম্পানী। আর গদী থেকে টাকা নিতে থাকলো সরহাদ। কথা ছিল কাজ মিটে গেলে সরহাদের টাকা মিটিয়ে দেবে কোম্পানী।

কথামত কাজ করেছে সদানন্দ। ফর্মান নিয়ে ফিরে গেছে সুরম্যান। কিন্তু ধার শোধ করা হয়ে ওঠেনি। তাগাদা দিয়েছে কয়েকবার। গ্রাহ্য করেনি কোম্পানী।

সরহাদ মারা গিয়েছে—মারা গিয়েছে সদানন্দ। সদানন্দের ছেলে

লালজী এখন গদী দেখাশোনা করে। বাবার আমলের অত গুলো টাকা মিছেমিছি পড়ে আছে। ওই টাকা থেকে আরো অনেক টাকা উপায় করতে পারত এতদিনে। গা জ্বালা করে ওঠে লালজীর।

বাদশার কাছে নালিশ করে। নালিশ করার আগে ভয় ছিল লালজীর। ফতেচাঁদ বুঝি এই কাজের জন্য ধমকাবে। কিন্তু হল ঠিক উল্টো। ফতেচাঁদ ভাইপোর হয়ে দাঁড়াল দরবারে। অবাক হল লালজী। বাদশা হুকুম দিল, 'কাশীমবাজার কুঠি থেকে টাকা উশুল করে নাও।'

কোম্পানী বিনা কথায় টাকা দেবার জন্য তৈরী নয়। অনেক টালবাহানা করেছে। কিন্তু ধার তাদের। এই সত্যকে একেবারে চেপে যেতে পারেনি। টাকা তাই দিতেই হবে। হাতে কাজ পেয়েছে হাজী। কোম্পানীর কাছ থেকে তাড়াতাড়ি আদায় করে দিতে পারলে খুশী হবে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ। হাজী দূরদর্শী। হাজীর পাঁজরের তলায় গুপ্ত আশা। প্রচণ্ড উৎসাহে আদায় করার জন্যে কোমর বাঁধে হাজী।

কুঠিয়াল এল ফতেচাঁদের কাছে। বলে, 'বাঁচাও। টাকা দিতে ত অস্বীকার করিনি। তবে চোখ রাঙানি কেন?'

জগৎশেঠ বলে, 'লালজীকে ভালবাসে হাজী। গদী ছেড়ে এখানে আছে। ক্ষতি হচ্ছে। তাই হাজীর এত তাড়া।'

এরপর টাকার অঙ্ক কমানোর জন্য অনুরোধ করেছে কুঠিয়াল। লালজী তখন ছিল। ঝানু ব্যবসাদারের মত কথা বলে লালজী। নামতে চায় না। ফতেচাঁদও হাজির ছিল তখন। লালজী খুব সামান্য টাকা ছেড়ে দিতে চায়। কোম্পানী চায় আরো বেশী ছাড়ুক লালজী।

কথার মাঝখানে ফতেচাঁদ বলে, 'অত সামান্য টাকার জন্য কোম্পানীর সঙ্গে এত কথা বল কেন? যদি ছাড়তে চাও, আরো বেশী কিছু ছাড়।'

লালজী কথার ওপর কথা বলতে পারেনি। ঘর থেকে বার হয়ে গিয়েছিল শুধু। ফতেচাঁদ হেসে বলেছিল কুঠিয়ালকে, 'দু'একদিন পরে এস।'

দু'দিন পরে কুঠিয়াল দেখা দিল মহিমাপুরের গদীতে। লালজী অনেক খানি ছেড়ে দিতে তৈরী। দেনার পরিমান কম নয়। পুরাণো দেনা। সুদও প্রচুর। তা সত্ত্বেও খুব সামান্য টাকা নিয়ে ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলতে চায়। প্রস্তাবে কুঠিয়াল খুশী হয়, কিন্তু অবাকও হয়ে পড়ে।

লালজীও যে অবাক হয়নি তা নয়। কিন্তু কথা বলে না। কাজ কারবার শিখতে চায়। দু'এক পাই নিয়ে দিনের পর দিন দর কষাকষি করছে ফতেচাঁদ। ছাড়তে চায়নি এক কাণা কড়ি। অথচ অকস্মাৎ এত টাকা ছেড়ে বদান্যতা দেখানোর পিছনে নিশ্চয়ই কোন গূঢ় কারণ আছে। লালজী লক্ষ্য করে।

কারণটা সত্যিই ছিল। কয়েক বছর ধরে কোম্পানী নবাবের কাছে নালিশ করে আসছে যে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ রূপোর দাম দেয় খুব কম। বাজারে সেই একমাত্র রূপোর ক্রেতা। অন্য গদীয়ানরা ইচ্ছে করলে রূপো কিনতে পারে কোম্পানীর কাছ থেকে। আইনত কোন বাধা নেই। তবু তারা কেনে না।

কোম্পানী চেষ্টার ত্রুটি করেনি অন্য গদীতে রূপো বেচতে। কিন্তু কোন গদীয়ান কেনেনি। রূপো কিনলে ফতেচাঁদ বেঁকে বসবে। ফতেচাঁদ অপ্রসন্ন হলে তাদের ব্যবসা বন্ধ হতে বেশী দেরী হবে না। লোভ থাকলেও বাধ্য হয়ে সংযত হয় তারা। তাই বাজারে একমাত্র ক্রেতা ফতেচাঁদ যে দর দেবে, সেই দরই মানতে বাধ্য হবে কুঠি। সুতরাং বাজার দর, টাকার দর নির্ভর করে ফতেচাঁদের ভাঁড়ারে সঞ্চিত রূপোর পরিমাণের ওপর।

ব্যক্তি বিশেষের খেয়াল খুশীতে বাঁধা আছে বাজার দর। কোম্পানী এই অসহ্য অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। তাই সুযোগ সুবিধে পেলেই নালিশ জানায়।

ঘষতে ঘষতে শিলও ক্ষুটো হয়। লাগতে লাগতে নবাবের মন ভাঙতে কতক্ষণ। একটু সাবধান হয় ফতেচাঁদ। দেওয়ান রায় রায়ান আলম চাঁদ সামনা সামনি শত্রুতা করেনি কোন দিন। কিন্তু দেওয়ান বড় ধূর্ত্ত। নবাবী খরচা যোগান দিতে হিমসিম খায় দেওয়ান।

নজর তার সব সময় টাকার দিকে। রাজস্ব না বাড়াতে পারলে উপায় নেই। প্রজাদের ওপর নতুন কর চাপানোও চলে না। রায় রায়ান তাই মতলব ভাঁজে আয় বাড়বে কিসে। এই সময় ট্যাঁকশালের আয় পড়ে গেছে। মুর্শিদকুলির সময়ে ট্যাঁকশাল থেকে যত টাকা রাজস্ব হিসাবে আসত নবাবের তবিলে, তার চেয়ে অনেক কম আসে এখন। রায় রায়াণ বিচলিত। আজকাল তার হাবভাবও খুব ভাল লাগে না ফতেচাঁদের।

রায় রায়ান কয়েকবার কারণ জিজ্ঞাসা করেছে নবাবের সামনে। ট্যাঁকশালের রাজস্ব পড়তির খবর শুনে নবাবও থমকে যায়। কারণ জানে ফতেচাঁদ। ভালভাবে জানে। ট্যাঁকশালের আয় নির্ভর করবে টাকা তৈরীর পরিমানের ওপর। আজকাল ইংরেজ ফরাসী ওলন্দাজরা খুব কম রূপোই আনছে ট্যাঁকশালে। একেইত আগের তুলনায় কম রূপো আসছে বাজারে। সেই কম রূপোর আবার কম অংশ আসছে টাকা হবার জন্য ট্যাঁকশালে। তারা রূপো পাঠাচ্ছে পাটনায়।

রূপোর আমদানি কম হচ্ছে। কি করা যাবে? আমদানি করার ভার ত শেঠদের ওপর নয়। নিজের ঘরের রূপো দিয়ে ট্যাঁকশালের কাজ বজায় রাখা যায়। কিন্তু তাতে আরো বেশী করে লোকসান নিজের। বাজারে টাকার ঘাটতি পড়েনি। এই রূপোয় ট্যাঁকশালের আয় বাড়ানো যায় রূপোর দাম বাড়িয়ে। টাকা করতে ট্যাঁকশালের প্রাপ্য কড়ি বাড়িয়ে দিয়ে। কিন্তু তাতে ক্ষতি হবে প্রজার।

প্রতিপক্ষের যুক্তিকে খণ্ডন করে ফতেচাঁদ। বলে, 'দাম বাড়ান ছাড়াও পথ আছে। রূপোর বাজার দর বাড়ালে বাজারে জিনিষের দরও চড়ে যাবে। ওতে হিতে বিপরীত। সহজ পথ খোলা আছে।'

'কি পথ?'

'বাজারে বিদেশী টাকাও চলে। দেশী টাকাও চলে। বিদেশীরা মহাজনদের কাছ থেকে মাল কিনে আজকাল বিদেশী টাকায় দাম দেয়। তাতে এই দেশে মহাজনদের লোকসান। বাঁটা দিয়ে শিক্কা করে নিতে হয়। যদি বাজারে বিদেশী টাকার চলন একেবারে বন্ধ করে দেওয়া যায়, অন্তত চলনের হার কমানো যায় যদি, তবে মহাজনদের পাওনা মেটানোর জন্য বিদেশীরা আরো বেশী রূপো আমদানি করতে বাধ্য হবে। রূপো বেশী এলে ট্যাঁকশালের আয় বাড়বে। এ দেশের মহাজনরা বাঁটা দেবার দণ্ড থেকে মুক্তি পাবে।'

ফতেচাঁদ ভেবেছিল ব্যাপারটা এখানেই বোধ হয় মিটে গেল। নবাব হুকুম দেবে যে কোনদিন। আর ফতেচাঁদ চায় শুধু শিক্কা টাকাই চলুক। যতই বিভিন্ন ধরণের টাকা চলবে বাজারে, ততই লাভ হবে তার। তবু ফতেচাঁদ চায় এক ধরণের টাকা চলুক। সাময়িক লোকসান হলেও পরিণামে লাভ। দেশের ব্যবসা বেড়ে গেছে। বাড়তির ঝোঁক অপ্রতিহত থাকবে অটুট,

নির্দ্দিষ্ট, ও নির্ভরযোগ্য মুদ্রা ব্যবস্থায়। মোগলেরা বুঝতে পারেনি। যুগের নতুন দাবী বুঝতে পেরেছে ফতেচাঁদ।

তবু নিশ্চিন্ত হতে পারে না ফতেচাঁদ। রায় রায়ানকে বিশ্বাস নেই। বিশ্বাস করা ঠিকও নয়। এই রায় রায়ানই তাকে পথে বসাবার ফিকির করেছে। সামান্য পঞ্চাশ হাজার টাকার বদলে ট্যাঁকশাল ব্যবহার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ফরাসীদের।

ফরাসীরা বানিজ্য করে এসেছে এতকাল। কিন্তু মাথা তুলতে পারেনি। ব্যবসার চেয়ে অন্য দিকে নজর তাদের বেশী। টাকার ঝংকারের চেয়ে পিয়ানোর সুর তাদের আগে টানে। চক্রবৃদ্ধি সুদ কষার চেয়ে বাঁকা-চোরা ছন্দের কৌশলে বরং মুগ্ধ তারা।

ডুবে আসার পর ফরাসীদের ভোল বদলালো রাতারাতি। চন্দননগরে ঢেউ জাগলে সাড়া পড়লো ফরাসডাঙায়। ডুপ্লের বুদ্ধিতে জমে উঠেছিল দাক্ষিণাত্যের দাবা-বড়ের ছক। এখানে এসেও এক চালে মাৎ করেছে কিস্তি। রায় রায়ান কথা দিয়েছে ফরাসীরা নবাবের ট্যাঁকশাল ব্যবহার করতে পারবে। অথচ এই ট্যাঁকশালের একক অধিকার বজায় রাখার জন্য কত কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল মানিকচাঁদকে। রায় রায়ানকে বিশ্বাস করতে পারে না ফতেচাঁদ। ফন্দি আঁটে। বুদ্ধির যুদ্ধে কাৎ হবে না সে। দেখুক ডুপ্লে তার সমকক্ষ আছে কেউ? সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি হোক এবার। তৈরী হয় জগৎশেঠ ফতেচাঁদ। একটু সতর্ক হয়ে চলে।

ইংরেজদের ওপর বরাবরই সে প্রসন্ন। এখন আরো বেশী। অত বড় ঘটনার পরও হাসিমুখে কথা বলে তাদের সঙ্গে। আপ্যায়নের ক্রুটি নেই। কথায় কথায় টাকা ছাড়ে, সুদের হার কমায়।

ইংরেজকে হাতে রাখতে চায় ফতেচাঁদ। ভাবে পিছনে সর্বদা কার ছায়া ঘুরছে। কোথাও চক্রান্ত আছে যেন। দিল্লীর অশুভ ছায়াকে কিছুদিন মুর্শিদাবাদের মসনদের চারপাশে জাগ্রত থাকতে দেখেছে। সেই ছায়া কি আজকে তার পিছনে? কেন? রাজনীতিতে যেতে চায় না ফতেচাঁদ। ফতেচাঁদ মাড়োয়ারী। ব্যবসা তার ধর্ম। শান্তি শৃঙ্খলায় ব্যবসা খোলে। যে শান্তি দিতে পারবে, তার দিকে যাবে ফতেচাঁদ।

রায় রায়ান যখন নবাবের নামে হুকুম বার করলো, তখন আরও বিচলিত হল ফতেচাঁদ। মাদ্রাজ আর আর্কট টাকার দাম কমে গেল নবাবের হুকুমে।

মহাজনদের পাওনা মেটাতো কোম্পানী আর্কট টাকা দিয়ে। নতুন হুকুমে অসুবিধে হল কোম্পানীর।

গদীতে ফতেচাঁদ হুকুম দিল যে, এবার থেকে পাওনা মেটাতে হবে মুর্শিদাবাদ টাকায়। যদি কেউ অন্য টাকায় ধার শোধ দিতে চায়, তবে বাড়তি হারে বাঁটা দিতে হবে।

একদিকে মাদ্রাজে আর্কট টাকার দাম পড়ে গেল। অন্যদিকে সেই মাদ্রাজ আর্কট টাকাকে মুর্শিদাবাদের টাকা করতে চড়া হারে বাঁটা দিতে হবে। কোম্পানীর লোকসান ত হবেই। তার চেয়ে মারা পড়বে এ দেশের মহাজন। বোঝে ফতেচাঁদ। তবু নিরুপায়। দেখা যাক এবার কি চাল দেয় রায় রায়ান।

ফতেচাঁদ ভাবে, এর চেয়ে নতুন কর চাপানো অনেক ভাল। কিন্তু কথা বলে না। ইংরেজরা এলে জবাব দেয়, 'কি করা যাবে, নবাবের হুকুম।'

রায় রায়ান ভাবেনি এই ধরণের জবাব দেবে ফতেচাঁদ। ক্ষতি করতে গিয়ে ক্ষতি করেছে নিজের। বাঁটা থেকে জগৎশেঠ যত টাকা উপায় করবে তার এক কড়িও পাবে না নবাব। ফতেচাঁদের বুদ্ধির কাছে হেরে গেছে রায় রায়ান। আয় বাড়লো জগৎশেঠের। অন্য চাল দেয় সে। গোপনে ডেকে পাঠায় কোম্পানীর গোমস্তাকে।

হক চকিয়ে যায় গোমস্তা। আসে, বিনীতভাবে দাঁড়ায়। রায় রায়ান বলে, 'তোমাদের রূপো আমদানির হিসেবটা দিতে হবে যে।'

ব্যাপার বুঝতে না পেরে বোকার মত তাকায় চতুর গোমস্তা। খুলে বলে রায় রায়ান। 'নবাব মুর্শিদকুলির সময়ে কত রূপো এসেছে বাংলায়? আর ১৭৩৩ থেকে ১৭৩৬ সালের ভেতর কত এসেছে? গত নবাবের সময় কত রূপো যেত পাটনায় আর এখন কত যায়—তার হিসেব দিতে হবে।'

মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে গোমস্তার। নানা কথায় চাপা দিতে চায় প্রসঙ্গ। রায় রায়ান নাছোড়বান্দা। হিসেব তার চাই-ই।

নিরূপায় হয়ে বলে, 'ব্যবসার নিয়মের বাইরে এ সব।'

'নবাবের হুকুম, দিতেই হবে।'

'ফতেচাঁদ যদি ঘুর্ণাক্ষরে টের পায়, তবে রক্ষা থাকবে না। কোম্পানীর ক্ষতি হবে।'

কথা দিচ্ছি, হিসেব দিলে কোম্পানীর গায় আঁচড় লাগবে না।'

'ফতেচাঁদ যদি জানতে পারে।'

'ফতেচাঁদকে বোঝাবার দায়িত্ব আমার। আমি ফতেচাঁদকে বলব, তোমার কাছ থেকে জোর করে হিসেব আদায় করে নিয়েছি। তাতে হবে ত?'

মন খুঁত খুঁত করে গোমস্তার। আগুন নিয়ে খেলা এর চেয়ে অনেক সহজ।

যত গোপনে কাজ হাসিলের চেষ্টা করুক রায় রায়ান, ফতেচাঁদ সব জানতে পারে। জানতে পেরেছে এ কথাও গোপন রাখতে চায় না সে। কোম্পানীর উকিল গোমস্তাকে ডেকে বলে, 'দেওয়ান বাহাদুর যে হিসেবের জন্য এত চাপ দিচ্ছে, সেটা দিয়েই দাও না। না দিলে সব রাগ গিয়ে পড়বে তোমাদের ওপর। কি দরকার। রায় রায়ান দেখুক, জগৎশেঠ ফতেচাঁদ মিথ্যেবাদী নয়। নবাবও জানুক খবরটা।'

প্রকাশ্যেই হিসেব পাঠায় উকিল। রায় রায়ান দেখে। ফতেচাঁদ দেখে রায় রায়ানকে। দিল্লীর অশুভ ছায়া আবার ঘুরছে মসনদের চারপাশে। শঙ্কিত হয় ধনকুবের।

এক বিরাট ভাগাড়ে মরা জন্তু দেখে এক পাল শকুন নেমেছে সবুজ মাঠ কালো করে দিয়ে। তাদের ক্ষুধার্ত্ত চিৎকার কানে আসছে শুধু। কোথায় যে ভাগাড় জানে না ফতেচাঁদ। তবে তীব্র চিৎকার শুনছে। আর ঘৃণায় তার গা ঘুলিয়ে আসছে। এই প্রথম ফতেচাঁদ যেন অনুভব করলো সে এদের থেকে স্বতন্ত্র। এই বিরাট নবাবী প্রাসাদ আমীর ওমরাহদের মধ্যে একজন হয়েও সে এদের কেউ নয়। এদের জাত চরিত্র বুদ্ধি বিবেক অন্য জগতের। সে প্রায় অপরিচিত। মুখ ঘুরিয়ে নিল ফতেচাঁদ।

কাদের দিকে মুখ ফেরাবে এবার? ক্ষয়, চক্রান্ত, অক্ষম, ঈর্ষ্যা থেকে কোন প্রাণবন্ত পরিমণ্ডল আছে কি কোথাও? যেখানে গিয়ে ফতেচাঁদ বলতে পারে, আমি তোমাদের মতই বাঁচতে চাই। আমি ব্যবসা করতে চাই আত্ম-শক্তির জোরে। তালুকের ওপর সত্ব ভোগ করে নয়, রক্ত সূত্রে গাঁথা সম্বন্ধ সম্পর্ক এবং সংঘর্ষকে উপজীব্য করে নয়, স্বাধীন জীবন যাত্রার রোমাঞ্চকর উন্মাদনায় মুগ্ধ হবে না কেউ?

মহিমাপুরের সীমান্ত পার হলে গ্রাম। গ্রামের পর গ্রাম। জীবন সেখানে শান্ত। ঘটনার ঢেউ বিচলিত করে না তাদের। গোবর নিকানো কুঁড়ে ঘরে কুঁকড়ে থাকে মানুষ। জীবনকে দুর্বহ মনে হয় না। রাজা

জমিদার নবাব মহাজন গোমস্তা অত্যাচার করে। অতিষ্ঠ হলে প্রজারা পালিয়ে যায়। রাগ চিরদিন থাকে না। রাগ পড়লে আবার ফিরে আসে। আবার সেই পরিচিত জীবনযাত্রার অক্লান্ত পুনরাবৃত্তি।

বিত্তবান থাকে দান ধ্যান অতিথি সৎকারের অহমিকায়। নিম্ন বিত্ত আন্তরিকতার সঙ্গে পেতে দেয় গাম্ভারীর পীঁড়া। আহারের পর মুখশুদ্ধি। মুখশুদ্ধির পর হুঁকো। হুঁকোর পর ঘুম। বিত্তবানের বৌ যায় শোবার ঘরে অঙ্গদ, কঙ্কন, কর্ণপুর পরে। লোটন, কানাড়ি কিম্বা তবল্লকী ছাঁদে বাঁধা খোঁপা। চুলে আমলকি তেলের গন্ধ। নিতম্বমণ্ডলে ঘাঘর কিঙ্কিনী। গলায় গজমতি সাতনরী হার। আলতা পায়ে চরণচুর বাজিয়ে যায় শোবার ঘরে।

গরীবের বৌ যায় সস্তা পট্টবাস পরে। ঢেউ কোথায়? পূজা পার্বণে সারারাত হৈচৈ করে সকালে ক্লান্ত হবে সবাই। কিন্তু ধ্যান নেই ত। নেই জ্ঞান ও বুদ্ধিকে একটা উজ্জ্বল বিন্দুতে বিধৃত করে উপলব্ধির অনন্য তীব্রতা। উপজীব্য শুধু অনুষ্ঠান আর আনুষ্ঠানিক উত্তেজনা।

মহাজনেরা আসে। ধার চায়। কম সুদেই ধার দেয় সে। ভাবে, হয়ত দাঁড়াতে পারবে। কিন্তু কে দাঁড়াতে পারলো এতদিনে? কার মুখের দিকে চেয়ে ভরসা করা যায়? যতদূর দেখে, কেউ নেই। কোথাও উদ্যম নেই, স্বপ্ন নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই। জীবন মানে, আহার বিহার মৈথুন ও ঘুম।

আর এদিকে, নবাবের প্রাসাদের চৌহদ্দীতে, শহরের মাঝখানে, চক বাজারের বুকে অস্বাস্থ্যকর ঈর্ষ্যা। লোলুপতার পাশবিক উন্মাদনা। নদীর এক কূল ভাঙছে, কিন্তু অন্য কূল কি গড়ছে কোথাও? ফতেচাঁদের কানে একপাল অদৃশ্য শকুনের উৎসবের চিৎকার।

ফিরতে হবে প্রাসাদেই। থাকতে হবে প্রাসাদের চারপাশে। মুর্শিদকুলির মত পোষাকের তলায় বর্ম পরতে হবে সারাক্ষণ। ফতেচাঁদ ফিরে দেখে রায় রায়ানের দিকে। রায় রায়ান চেয়ে আছে ফতেচাঁদের দিকে। দু'জনেই অল্প হাসে।

রায় রায়ান বলে, 'হিসেব ত ঠিকই। রুপো কম আসছে। কি করা যায়?'

উত্তর দেয়নি ফতেচাঁদ। হয়ত তাকিয়েছিল ভাগীরথীর দিকে। কি নির্বিকার হয়ে বয়ে যাচ্ছে ভাগীরথী। একটা পাখী ডেকে ডেকে চক্কর দিচ্ছে আকাশে।

আঠারো

সাধের ফার্রাবাগ বেশী দিন থাকেনি সুজাউদ্দীনের। নবাব খবর পেয়েছে স্বর্গ থেকে হুরীরা নেমে আসে সেখানে। বিকালের গোধূলিতে বাগান মাতিয়ে রাখে তারা। এত রূপ কখনো মাটির পৃথিবীর বাগানে হয়? ভুল করে হুরীরা। ভাবে, এ বুঝি স্বর্গের নতুন বাগান। মোল্লাদের পরামর্শ নিয়ে বাগান নষ্ট করে ফেলে সুজা।

বাগান নষ্ট হবার পর নিজেও নষ্ট হয়। হারেমের অজস্র সুন্দরী রমনীদের দিকে নজর দিয়ে বৃদ্ধ সুজা বুঝতে পারে, জীবন আরম্ভ হয়েছে বড় দেরীতে। সাধ অপূর্ণ রেখেই চলে যেতে হবে।

ছেলেকে ডেকে পাঠায় এবার। চোদ্দ বছর পরে বাবা-ছেলের স্বাভাবিক সাক্ষাৎ। সুজাউদ্দীন দিয়ে যাবে মুর্শিদাবাদের সিংহাসন। সিংহাসনের ওপর বড় আকর্ষণ সরফরাজের। আজ তার আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতা। খুশী হবে না সরফরাজ?

'শুধু সিংহাসন নয়। তার সঙ্গে দিলাম আমার সব ধনদৌলত। তুমিই আমার একমাত্র উত্তরাধিকারী। নবাবী করা বড় কঠিন। হাজি আহম্মদ, হাজি মির্জ্জা, রায় রায়ান, জগৎশেঠ আমার প্রিয় বন্ধু। আপদে বিপদে আমি তাদের ওপর নির্ভর করেছি। তুমিও নির্ভর কর।' সুজাউদ্দীন শেষ কথা বলে সরফরাজকে।

এরই কিছুদিন পরে সাধের ফর্রাবাগের কবরে বাবাকে মাটি দিয়ে মসনদে বসলো সরফরাজ ১৭৩৯ সালে।

বাবার কথা অমান্য করেনি সরফরাজ। মির্জ্জা বিহারে। রায় রায়ান, জগৎশেঠ আর হাজি আহম্মদ তার মন্ত্রী।

মুর্শিদকুলির শেষ ইচ্ছাকে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ সম্মান দিতে পারেনি। সরফরাজের বিরুদ্ধে নিজের প্রভাবকে ব্যবহারও করেছে ফতেচাঁদ। ফর্মান এসেছিল সুজাউদ্দীনের পক্ষে। মর্মাহত সরফরাজ তাই বৃদ্ধ ফতেচাঁদকে ক্ষমা করতে পারেনি। এখনো কি সরফরাজ মনে মনে সেই কালসাপকে পুষে

রাখবে? ফতেচাঁদ অপেক্ষা করতে থাকে। আগে ভাগে কোন মত তৈরী করতে চায় না সে।

মা মাণিকদেবী জিদ ধরেছে তীর্থে যাবে। রাজীও হয়েছে ফতেচাঁদ। মাণিকচাঁদের মৃত্যুর পর থেকেই মাণিকদেবী সংসার থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। মন ফতেচাঁদেরও ভাল নয়। যেতে পারলে ভাল হত। কিন্তু এ সময় গদী ছেড়ে যাওয়া যায় না। ছেলেরা কেউ যাবে মায়ের সঙ্গে।

তিন ছেলে ফতেচাঁদের। আনন্দচাঁদ দয়াচাঁদ আর মহাচাঁদ। আনন্দচাঁদই বড়। সে এখন শুধু আনন্দচাঁদ নয়। শেঠ আনন্দচাঁদ। এই তার বাদশাহী খেতাব।

মায়ের সঙ্গে তীর্থে গেল আনন্দ।

জগৎশেঠের মা যাবে পরেশনাথে তীর্থ করতে। সাধারণ ব্যাপার নয়। এলাহি কাণ্ড। জৈন সম্প্রদায়ের প্রত্যেক বাড়ীতে নিমন্ত্রণ গেল আনন্দ-চাঁদের। টাকা কড়ি খাওয়া দাওয়ার কোন ভাবনা নেই। মহাজনী টোলা দিনের পর দিন লোকারণ্য হয়ে ওঠে। হেঁটে যেতে হবে না। রথ, ঘোড়া, হাতী, উট, পালকীতে ছয়লাপ। গণৎকার ব্যস্ত লগ্ন নিয়ে। মহিমাপুর থেকে পরেশনাথ অবধি পথ পরিষ্কার করে মান্‌দার।

যাত্রার গুরু আনন্দ। তার জন্যে সোনার কাজ করা ভেলভেটের তাঁবু। হাতীর ওপর বহুমূল্য হাওদা। হাওদার মাথায় মণিমুক্তো বসানো ছাতা। কম্বোজ থেকে এসেছে দ্রুতগামী ঘোড়া। লাগামের আগাগোড়া সোনার পাত দিয়ে মোড়া। মহিমাপুর থেকে পরেশনাথের মন্দির অবধি ধনদৌলতের শোভাযাত্রা। এত প্রাচুর্য কেউ দেখেনি কোন দিন। কতবার নবাব গিয়েছে। গিয়েছে মর্ত্তের জগদ্দীশ্বর দিল্লীশ্বর। ধুমধাম তখনও হয়েছিল। কিন্তু শেঠদের তুলনায় তা যেন নিতান্ত নিষ্প্রভ।

রাস্তার দু'পাশে কাতারে কাতারে সৈন্য পাহারা দেয়। আপদ বিপদ, চোর, ডাকাত, ঠগের কথা বলা যায় না। পিছনে হাতীতে চড়ে বাজাতে বাজাতে আসছে বাজন্‌দার। আর দু'হাতে দান করতে করতে যাচ্ছে মাণিকদেবী পরেশনাথে তীর্থ করতে।

তীর্থ থেকে ফিরে এসে মাণিকদেবী মন্দির তৈরী করেছে মুর্শিদাবাদে। প্রতিষ্ঠা করেছে রূপোর বেদীর ওপর সোনার ঠাকুর। ঠাকুরের গায়ে মণি-

মুক্তো হীরে পান্নার গয়না। কাকভোরে উঠে তিন ঘণ্টা পূজা করে মাণিক-দেবী। পূজার পর দান। দানের পর জপ। জল খেতে খেতে চৌপর বেলা। সংসার থেকে সরে যাচ্ছে মাণিকদেবী।

বৃদ্ধ হয়েছে ফতেচাঁদ। চোখের সামনে পতন দেখছে দিল্লীর বিধাতার। অযোধ্যার সাদাৎ খাঁ স্বাধীন। রোহিলাখণ্ডে আফগানরা পরোয়া করে না বাদশার। গুজরাট আর মালবে মারাঠারা বিদ্রোহী। বাংলার দিকে তাদের লুব্ধ দৃষ্টি। আরঙ্গজেবের 'জাতির স্বর্গ' এতদিন অসুরদের লুণ্ঠন ও প্রতাপকে জানতো না। অশান্তি ও যুদ্ধের বিভীষিকা স্পর্শ করেনি গ্রামের জীবন। আজ বুঝি তাও বিপর্যস্ত হবে। গজনী কাবুল লাহোর বিনা বাধায় জয় করে এসেছে পারস্যের রাজা নাদির শাহ। দিল্লীতে বাধা দিতে গিয়েছিল মুহম্মদ শাহ। কর্ণালের যুদ্ধে হার হয়েছে বাদশার। বন্দী বাদশা সন্ধি করতে চেয়েছে।

খবর এসেছে বাংলায়। নবাব অভিভূত। পরামর্শের জন্য ডাকলো তিন মন্ত্রীকে। দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে বিপদে পড়েছিল মুর্শিদকুলি। শেঠরাই বাঁচিয়ে দিয়েছিল তখন। কিন্তু আজকের বিপদ আরো ভীষণ। মন্ত্রীরা পরামর্শ দেয় নাদির শাহকে স্বীকার করে নিতে।

নাদির শাহের নামে টাকা তৈরী হল মুর্শিদাবাদের ট্যাঁকশাল থেকে। মসজিদ থেকে করা হল নাদির শার মঙ্গলের জন্য নামাজ।

সরফরাজ মসনদে বসতে বিব্রত হয়েছিল হাজি। চোদ্দ বছর বাপ ছেলের বিবাদ। সরফরাজের নিজের বন্ধু বান্ধব প্রিয়জন আছে। এই ত্রয়ী তাদের চক্ষুশূল।

সুজাউদ্দীনের সময় থেকে ক্ষমতা আর প্রতিপত্তি ভোগ করে আসছে জগৎশেঠ, হাজি আর রায় রায়ান। তারা দেখে ঈর্ষ্যান্বিত হয়েছে। সর্বদা পরমর্শ দেয় সরফরাজকে সাবধানে থাকতে।

কিন্তু বিপদের সময় সরফরাজ পরামর্শ চেয়েছে তার। মনে হয় নবাবকে হাতে রাখতে পারবে সে।

হাজি পরোয়ানা পাঠায় বিদেশী কুঠিতে। নতুন নবাবকে নজরানা পাঠাতে হবে এখুনি। দেরী হলে নবাবী রীতি ভঙ্গ করার দায়ে অভিযুক্ত হতে হবে।

ইংরেজরা বলে পাঠালো যে, তারা সুজাউদ্দীনের সময় যেমন নজরানা

পাঠিয়েছিল, এবারও ঠিক সে রকম পাঠাবে। উৎসাহী হাজি জানালো, 'তা হবে না। দেশে শান্তি বজায় রাখতে নবাবকে অনেক সৈন্য রাখতে হয়েছে। খরচা বেড়েছে বহু গুণ। দেশে শান্তি বজায় থাকার দরুণ লাভ হয়েছে কোম্পানীর। সুতরাং তাদের দিতে হবে নগদ দশ হাজার টাকা, আর সেই উপযোগী জিনিষপত্র। তা ছাড়া দেওয়ান মুৎসুদ্দিনের দেওয়ার রেওয়াজ মেনে চলতে হবে বৈকি। স্থির ও নিশ্চিন্তভাবে হাজি চক্রান্তের জাল বুনতে থাকে। কুঠি থেকে আয়ার সাহেব ভেট নিয়ে সেলাম জানায় নবাবকে।

নাদির শাহের নামে টাকা বাজারে ছাড়া হল। কিন্তু কাটতি হয় না। রীতি অনুসারে এই নতুন শিক্কার দাম সব চেয়ে বেশী হওয়া উচিত। বাজারে দেখা গেল, নতুন টাকার দাম ত বেশী নয়ই, বরং আর্কট ও মান্দ্রাজের টাকার চেয়ে কম। কেউ নিতে চায় না নতুন টাকা। পাওয়া মাত্রই ফিকির খোঁজে কি ভাবে অন্যকে গছিয়ে দিতে পারবে। কারো বিশ্বাস নেই। নাদির শাহ কতদিনইবা বাদশা থাকবে। একদিন যাবেই। হয়ত খুব তাড়াতাড়িই যাবে। তখন এই টাকার জন্যে ডাহা লোকসান দিতে হবে তাদের। কোম্পানীও বলেছে তারা নেবে না নাদির শাহী শিক্কা।

নাদির শাহ দিল্লী ছাড়ার পর জগৎশেঠকে খুব মুসকিলে পড়তে হয়েছিল এই টাকার জন্য। ফতেচাঁদ বুদ্ধি করে আস্তে আস্তে সব টাকা ছেড়ে দেয় বাজারে। বাঁটার নানান পথ ঘুরে ট্যাকশালে তারা ফিরে আসে। লোকসানের দায় এড়ায় শেষ অবধি।

কারও সঙ্গে বিবাদ বাধাতে চায় না জগৎশেঠ। সরফরাজকে বিশ্বাস করে না, রায় রায়ানকে সন্দেহ করে, হাজিকে দূরে রাখে। কারবার বাঁচাতে হবে তাকে। হাজি যখন অকস্মাৎ ইংরেজদের কাছ থেকে নতুন নজরানা দাবী করে বসলো, ইংরেজদের হয়েই সে হাজিকে দাবীর পরিমান কমিয়ে দেবার জন্য অনুরোধ করেছে। আবার ইংরেজদেরও বলেছে, তাড়াতাড়ি টাকাটা দিয়ে দেবার জন্য। তা ভিন্ন হাজি রেগে যাবেন হাজিকে রাগাতে চায় না সে। আবার বশে রাখতে চায় ইংরেজকেও। কথায় কথায় ঈঙ্গিত করে। কোম্পানীর সঙ্গে লেনদেন বেশী। সুদও বেশী করে নেয়। শতকরা বারো টাকা। ষ্ট্যাকহাউসের সময় বাঁটা আর সুদের হার বাড়িয়ে করেছিল সাড়ে চোদ্দ। ওটা আর কিছুই নয়, জব্দ করার ফন্দী মাত্র।

ঠিক টোপ ধরে কুঠিয়াল। প্রস্তাব আসে ফতেচাঁদের কাছে, সুদের হার

কমিয়ে শতকরা ন' টাকা করতে। রাজী হয় ফতেচাঁদ। কৃতজ্ঞ থাকে কুঠি। ইংরেজদের কুঠি হাতে রাখতেই হবে। ওদের ওপর ভরসা করে ফতেচাঁদ। ওরা কর্মঠ, ব্যবসাদার।

এত সাবধানে থেকেও শেষ পর্যন্ত চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়ে ফতেচাঁদ। হাজি কূট-কৌশলী। রায় রায়ান চতুর। হাজির চোখ মসনদে। বরাবর থেকেই তাই। এদের হাড়ে হাড়ে চিনতো মুর্শিদকুলি। সে যুগের এক বিশেষ প্রতিনিধি এরা। বহিরাগত, যাযাবর। সুযোগ সন্ধানী এবং উচ্চাকাঙ্খী। ওরা বিন্দুমাত্র ফাঁক পেলে বিষ ঢালবে। সাবধানী মুর্শিদকুলি তাই ঠাঁই দেয়নি এদের।

হাজি তাই স্থিরভাবেই জাল বোনে। রায় রায়ান হঠাৎ গজিয়ে উঠেছে। বংশের সংস্কার এবং ঐতিহ্য তার কিছুই নেই। মুর্শিদকুলির জমিদার উচ্ছেদ নীতির জন্যে অনেক প্রতিষ্ঠিত এবং প্রসিদ্ধ বংশ নেমে গেছে হীনতায়। তারা বিস্মৃত। তাদের জায়গা নিয়েছে আর এক স্তরের লোক। সদ্য-হওয়া মধ্যবিত্ত তারা। তাদের হাতে আছে কিছু পয়সা। তারপর পেয়েছে জমিদারীর স্বাদ। সুজা মুর্শিদকুলির নীতিকেই অনুসরণ করেছে। রায় রায়ান আলম চাঁদ তার হাতের তৈরী। রায় রায়ানের তাই অতীত নেই। আছে শুধু বর্ত্তমান।

বর্ত্তমান বড়ই অস্থির, চঞ্চল। শুধুমাত্র চলতি মুহূর্ত্তে জীবন্ত এবং চূড়ান্তভাবে বাঁচার ভেতরে আশ্বস্ত হতে পারেনি রায় রায়ান। অনিশ্চিত থেকে সে চেয়েছে নিশ্চয়তা। রায় রায়ান জানে সুজার ওপর বিরূপ ছিল সরফরাজ। জানে ত্রয়ীর বিরুদ্ধে অসন্তোষ আছে সরফরাজের ঘনিষ্ট মহলে। আর তাদের প্রতি সরফরাজের টানও আন্তরিক। তাই রায় রায়ান সর্বদা শঙ্কিত। ভবিষ্যত তাকে টানে। ভবিষ্যতের ভেতর সে বাঁচে। রায় রায়ান দেখে হাজির সঙ্গে তার ভবিষ্যত গাঁথা। হাজির পাশে এসে দাঁড়ায় রায় রায়ান আলম চাঁদ।

জগৎশেঠ ফতেচাঁদ কিন্তু স্বতন্ত্র। সে ব্যবসাদার। সে জানে তার ভাগ্য ব্যবসার সঙ্গে বাঁধা। জমিদারী, জায়গীরদারী তার জন্য নয়। ইচ্ছে করলে প্রকাণ্ড জমিদারী করতে পারতো ফতেচাঁদ। পারতো মাণিকচাঁদ। সে দিকে নজর নেই তাদের। তারা চায় ব্যবসা। আকবর বাদশার আমল থেকে যে নতুন স্রোত বইতে আরম্ভ করেছে, তারা চায় সেখানে ঢেউ তুলতে। চায় তাদের হুণ্ডি আরো চলুক। চলুক তামাম ভারতবর্ষ জুড়ে। চলুক

এশিয়ার বিভিন্ন দেশে, সীমান্ত পার হয়ে। ফতেচাঁদের স্বার্থ হাজি কিম্বা নবাবের স্বার্থের মত এক নয়। রায় রায়ানের মত স্বার্থও নয় তার। বরং ফতেচাঁদ জানে, এরা তার স্বার্থের বিরুদ্ধেই যাবে। গিয়েছেও। টাকার ব্যাপারে রায় রায়ানের শত্রুতা ভুলতে পারেনি ফতেচাঁদ। কোম্পানীর গোমস্তার কাছে ফতেচাঁদ বলেছে সেই কথাই।

কারণও অবশ্য আছে। নবাব মুর্শিদকুলি জমিদারদের দাবিয়ে রাখার জন্য কত অত্যাচার করেছে। কয়েকজন জমিদার অবশ্য মাথা নামায়নি। কিন্তু মোগল সাম্রাজ্যের গোড়া থেকেই জমিদারেরা যেমন উদ্ধত হয়ে থাকতো, কুলিখাঁর আমলে তাদের অনেকের দর্প চূর্ণ হয়েছে।

তবু নবাব যা চেয়েছিল, ঠিক তা হল না। নবাবের বশ্যতা স্বীকার করলেও কার্যত তারা শেঠবাড়ীর অনুগত। কারণ শেঠবাড়ীর টাকা। খাজনা দিতে হয় টাকায়। শেঠরাই তাদের বাঁচায়। জমিদাররা তাই শেঠবাড়ীর প্রজা। মুর্শিদকুলি অবশ্য শঙ্কিত হয়নি। শঙ্কিত হয়েছে সুজা। শঙ্কিত হয়েও কিছু করতে পারেনি। বরং আরো ঠেলে দিয়েছে মহিমাপুরের দিকে। কর চাপিয়েছে বেশী করে। টাকার বিশেষ দরকার তার। বেশী টাকা দিতে গিয়ে জমিদাররা হয়েছে মহিমাপুরের প্রার্থী।

শঙ্কিত হয়েছে সুজা। ব্যবসাকে ভাল চোখে দেখতে পারেনি। ব্যবসা পাতি কিম্বা মুদ্রা অর্থনীতি স্থায়ী হলেই যে সামন্ততন্ত্রের পতন অনিবার্য হবে, এমন কোন ধ্রুব সত্য নেই। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছে সুজা যে ব্যবসায় এদের টাকা অনেক। অনেক টাকা থাকা এক কথা, আর অনেক শক্তি থাকা আর এক কথা। সুতরাং ওদের চাপ দেওয়াই ভাল। চাপ দিতে গিয়ে সায়ের চৌকীর ছড়াছড়ি করেছে নবাব। ভুগতে হয়েছে স্বদেশী ও বিদেশী বণিককে।

রায় রায়ান সুজার মন্ত্রী। স্বার্থের দিক থেকে ফতেচাঁদ তাই স্বতন্ত্র। তবু ফতেচাঁদ চক্রান্তে জড়িয়ে পড়ল।

কারণ নিয়ে মতভেদ আছে।

জগৎশেঠের নাতি, অর্থাৎ মহাতপচাঁদের এগারো বছর বয়সের বৌ নাকি অপরূপ সুন্দরী। এত সুন্দরী মেয়ে নাকি ভু-ভারতে কেউ কোথাও দেখেনি। বড় ঘটা করে বিয়ে দিয়েছিল ফতেচাঁদ। মুখে মুখে কথাটা একদিন পৌছালো নবাব সরফরাজের কানে। নবাবের হারেমে পনেরো শ' দেশ

বিদেশের নানারকমের সুন্দরী আছে। তাদেরও নাক হার মানায় জগৎশেঠের নাতবৌ। তাক লেগে গেল নবাবের। হুকুম হল, চাই। শুধু নাকি দেখতে চেয়েছিল রূপ-পাগল সরফরাজ।

প্রস্তাব শুনে মাথায় বাজ পড়লো আশী বছরের বুড়ো জগৎশেঠের। এতবড় অপমানের কথা কেউ কখন ভাবতেও পারেনি। জাতি ধর্ম বিপন্ন। অনেক কাকুতি মিনতি করেছিল ফতেচাঁদ। কিন্তু সরফরাজ অটল।

নিরুপায় জগৎশেঠ ভাবলো, পাঠাতে হবেই। না পাঠালে পল্টন আসবে। বাড়ী ঘেরাও করবে। জোর করে তুলে নিয়ে যাবে। লোক জানাজানি হবে। ঢি ঢি পড়ে যাবে 'তামাম' ভারত জুড়ে। তাই রাতের অন্ধকারে পাঠানোই ভাল। কাক-পক্ষীও যেন টের না পায়। রাতের অন্ধকারে সবার অজান্তেই পাঠানো হল মহাতপের বৌকে সরফরাজের হারেমে।

প্রাণ ভরে দেখে নবাব ফেরৎ পাঠিয়েছিল বৌকে মহিমাপুরে। তারপর নাকি বৌকে ঘরে নিতে রাজী হয়নি মহাতপ।

গল্পটা অবশ্য হলওয়েল সাহেবের। সায় দিয়েছে অমি। ইতিহাস লিখতে বসে উপন্যাসের মৌতাত দিতে হলওয়েল বিশেষ পটু। সরফরাজ ইন্দ্রিয় বিলাসী। সরফরাজের চরিত্র নিয়ে যত মতভেদই থাক না কেন, কেউই সরফরাজকে এই দোষ থেকে মুক্তি দেয়নি। তবুও বাদশাহী এবং নবাবী রীতিতে ইন্দ্রিয় বিলাস ত বড় মর্যাদা। কিন্তু সমসাময়িক কোন ঐতিহাসিক হলওয়েলের এই অপূর্ব সমাচার কখনো জানান নি।

তাই প্রশ্ন থাকে। অন্য মতও আছে আবার। নবাব মুর্শিদকুলি ব্যক্তিগত ধনরত্ন রাখতো শেঠবাড়ীতে একথা জানা ছিল সরফরাজের। নবাব আসলে বাদশার কর্মচারী। বাদশাহী আইনে ব্যক্তিগত মালিকানা বলে কিছু নেই, থাকতে পারে না।

মুর্শিদকুলি তীক্ষ্ণ বিষয়ী। শাজাহানের প্রধান ওমরাহ নায়েব নামখাঁর কাহিনী তার জানা। মৃত্যুর পর বাদশা পাছে সব কেড়ে নেয়, এই ভেবে সব ধনরত্ন সরিয়ে ফেলেছিল নামখাঁ। তার বদলে সিন্দুকে ভরে রেখেছিল হাড়ের টুকরো আর চামড়া।

ওমরাহ মারা যাবার পরই সিন্দুক তলব করলো শাহানশা। দরবারে খোলা হল সিন্দুক। গচ্ছিত ধনরত্ন দেখে অপমানিত বাদশা দরবার ছেড়ে চলে গিয়েছিল সেদিন।

বিচক্ষণ কুলি খাঁ তাই বিপদের দিনের সঙ্গী ভেবে গচ্ছিত রেখেছিল সাত কোটি টাকা। এই টাকার জন্য তাগাদা দিত সরফরাজ। গচ্ছিত রাখার কথা অস্বীকার করেনি ফতেচাঁদ। তবে ফেরৎ দেবার জন্য সময় চেয়েছিল। ইতিমধ্যে পাকিয়ে উঠলো চক্রান্ত।

এ আবার শেঠ বাড়ীর প্রচলিত গল্প। সামান্য হের ফের আছে কোথাও কোথাও। কিংবদন্তীর স্বগোত্র। কিন্তু হাণ্টার সাহেব মেনে নিয়েছেন এই কথা।

রিয়াজুস-সালাতিন প্রায় এই গল্পই শোনায়। সালাতিনের মতে সরফরাজ জানতে পেরেছিল ত্রয়ী তার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত। বন্ধু বান্ধবের কথা শুনে নবাব এদের বরখাস্ত করেনি। হিসেব চেয়েছিল শুধু।

প্রচলিত গল্প যাই হোক না কেন, সালাতিনের মতও যাই হোক, ব্যাপারটা রহস্যময় থেকেই যায়। এ কথা কে বলবে যে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ সাত কোটি টাকা দিতে পারতো না! শেঠবাড়ীর মূলধনের সঠিক পরিমান পাওয়া যায় না। তবে একথা প্রমান হয়েছে যে প্রতিদিন মহিমাপুরের গদীতে কারবার হত এক কোটি টাকা। গচ্ছিত থাকতো আরো বেশী। কারণ তাদের অল্প মেয়াদী ঋণের ব্যবসা।

কয়েক বছর পরে, বর্গীর হাঙ্গামার সময় মীর হাবিব যখন শেঠবাড়ীর গদী থেকে খোদ দু' কোটি আর্কট টাকা আর মণিমুক্তো নিয়ে পালিয়ে যায়, তখনও তারা কোটি টাকার দর্শনী ভাঙাতে পারতো। দর্শনী যে-সে হুণ্ডি নয়। সে Bill at sight, পাওয়া মাত্রই টাকা দিতে হবে। সুতরাং এ কথা বিশ্বাস করা শক্ত যে ধনকুবেরের সাত কোটি টাকা দেবার সঙ্গতি তখন ছিল না। টাকা দিতে অস্বীকারও করেনি জগৎশেঠ। তাই রহস্য থেকে যায়।

তবু চক্রান্তের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো ফতেচাঁদ। দাঁড়ালো আত্মরক্ষা আর বিস্তারের প্রবৃত্তির টানে। মুতাক্ষরীন আর রিয়াজুস সালাতিন যাই বলুক, যাই বলুক অর্মি আর ষ্ট্যাফটন—সবাই এক কথায় রায় দিয়েছে সরফরাজ অপদার্থ।

দিল্লীর সে প্রতাপ আর নেই। নাদির শা চলে গিয়েছে। সঙ্গে যায়নি শুধুমাত্র ময়ূর সিংহাসন। গিয়েছে মোগল বাদশার প্রাণসত্বা, আর তাদের গৌরব। মারাঠাদের দমন করতে পারেনি আরঙ্গজেব। মারাঠারাই দমন করেছে তামাম ভারতবর্ষ। লুণ্ঠন আর অরাজকতা তখন প্রচলিত সামাজিক

বিধি। চক্রান্ত, হত্যা ও শঠতা সে ত রাজনৈতিক সিদ্ধি ও সাধনা। ব্যবসাদার হিসেবে, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ব্যাঙ্কার হিসেবে, ফতেচাঁদ বিশ্বাস করতে পারেনি সরফরাজকে।

সরফরাজ আসক্ত, উদ্যমহীন, বিলাসী। আসন্ন দুর্যোগে কুটোর মত উড়ে যাবে সরফরাজ। চুরমার হয়ে যাবে দেশ জোড়া ব্যাঙ্ক। ওদিকে আলিবর্দী কর্মঠ, কৃতকর্মা পুরুষ। জমিদারদের বেশীর ভাগই হিন্দু। মুর্শিদকুলির অত্যাচারে তারা কেউ কথা বলতে পারেনি। এখন তারা প্রকাশ্যেই নবাবের প্রতি বিরূপ। চতুর আলিবর্দী হাত করেছে তাদের। রাজমহলের ফৌজদার এই আলিবর্দী নাম করা যোদ্ধা। বিকল্প হিসাবে আলিবর্দী-ই গ্রহণযোগ্য। নিরাপত্তা দিতে পারে সে-ই। ফতেচাঁদ চায় শান্তি। চায় নিরাপত্তা। তবেই হবে আত্মবিস্তার।

মুর্শিদকুলির টাকার হিসেব নিয়ে যাই হোক না কেন, সরফরাজ জানে মসনদে বসতে দেয়নি জগৎশেঠ। অপ্রসন্নতা গোপন করেনি তাই। শত্রু আছে তার। ত্রয়ীর বিরুদ্ধে চক্রান্ত সজাগ। শঙ্কিত জগৎশেঠ আত্মরক্ষা করতে চায়।

তাই হাজির স্বগোত্র না হয়েও, রায় রায়ান আলম চাঁদের ভিন্নধর্মী হয়েও জগৎশেঠ ফতেচাঁদ দাঁড়ালো চক্রান্তের মাঝখানে। হাজি কূট-কৌশলী। চায় মসনদ। রায় রায়ান সুযোগ সন্ধানী, চায় উন্নতি। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ ব্যবসাদার, চায় নিরাপত্তা। এদের ভিন্ন স্বার্থ, কিন্তু লক্ষ্যের দিকে এরা এক— সরফরাজকে নামাতে হবে।

নামলোও সরফরাজ।

উনিশ

লোক চিনতে ভুল করেনি মুর্শিদকুলি। হাজি মির্জাকে কোন রকম আশ্রয় দিতে নবাব অসমর্থ। নবাব জানতো এদের ওপর ভরসা করা কঠিন। এদের চাল-চুলোর ঠিক নেই। আনুগত্যের পাট-বালাই নেই। এরা বহিরাগত। সামান্য সুযোগ সুবিধা পেলেই মাথায় চড়ে বসবে। এরা ভুঁইফোঁড় উচ্চাকাঙ্ক্ষীর দল। তুর্কী মির্জাকে তাই তাড়িয়ে দিয়েছিল মুর্শিদকুলি।

বাধ্য হয়ে হাজি মির্জাকে ফিরতে হয়েছিল উড়িষ্যায়, সুজার কাছে। সুজার কাছে কাজ করছিল মির্জার ভাই হাজি আহম্মদ আর তার বাবা। আশ্রয় দিয়ে, সম্মান দিয়ে, সামান্য কর্মচারীকে মন্ত্রীর মর্যাদাও দিয়েছিল সুজা। কিন্তু এরাই আশ্রয়দাতার ছেলে নবাব সরফরাজকে সিংহাসন থেকে টেনে নামানোর জন্য মরীয়া হয়ে উঠলো।

নাদির শাহের ভারত আক্রমণের সময় সরফরাজ যে দুর্বলতা প্রকাশ করেছে তার ক্ষমা নেই মুহম্মদ শাহর কাছে। বাদশা নবাবের ওপর অসন্তুষ্ট। বিশ্বাস করতে পারে না। এমনিতেই মুহম্মদ একটু কান-পাতলা মানুষ। এই সুযোগ নষ্ট করেনি ত্রয়ী। হাজার বার করে লাগিয়েছে নবাবের নামে বাদশার কানে।

অন্যদিকে, নবাবকে অসহায় করার কাজে তলে তলে অনেকখানি এগিয়ে গেছে তারা। আয় ব্যয়ের হিসেব দিয়ে নবাবকে বোঝাতে কসুর করেনি যে আয়ের চেয়ে ব্যয়ের পরিমান দিনের পর দিন বেশী হয়ে উঠছে। সুতরাং খরচ কমাতেই হবে। নবাবের নিজের খরচ কমানো যায় না কিছুতেই। যদি কমাতেই হয়, তবে সেনাবাহিনীর খরচ কমানো ভাল। বেশি সৈন্যের প্রয়োজন নেই। এখন রাজ্যে শান্তি আছে। বিরাট বাহিনী পোষা তাই বাহুল্য।

সেনাবাহিনী ক্ষীণ হতে থাকে দিন দিন। শেষ অবধি নবাবের থাকে মাত্র তিন হাজার ঘোড়সোয়ার সৈন্য। ছাঁটাই সৈন্যকে হাজি পাঠায় পাটনায়—আলিবর্দীর কাছে। বাড়তি সেনাদের মাইনে দিতে আলিবর্দীর অসুবিধে হবে ভেবে নিজের আর ছেলের সব ধন দৌলত পাচার করেছে ভাইএর কাছে। হাজি তলে তলে তৈরী হতে থাকে।

ওদিকে নবাবের তরুণ বন্ধুরা ত্রয়ীর ওপর বিরূপ। সুজার সময় থেকে দরবারে ত্রয়ীর প্রতিপত্তি তারা দেখে আসছে।

ভেবেছিল সরফরাজের সময় এদের ওপর ধাক্কা আসবে। কিন্তু সুজার কথামত সরফরাজ এই 'ত্রয়ী'কে মন্ত্রী করে রেখেছে। নবাবের মন পাবার জন্য ত্রয়ীর বিরুদ্ধে এই তরুণ গোষ্টি সক্রিয়। হাজির প্রতিটি কাজের খবর তাদের নখদর্পণে। সে খবর তারা নবাবকে জানায়। নবাব যে খুব গ্রাহ্য করে তাও নয়। কিন্তু তবু তারা হাল ছাড়ে না। ঘসতে ঘসতে শিলও ফুটো হয়।

হল-ও। শেষকালে নবাব রেগে যায়। মন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেয় হাজিকে। প্রকাশ্যে কোন কথা বলে না হাজি। বরং হেসে বলে, 'বুড়ো বয়সে এত দায়িত্ব আর সহ্যও হতো না।'

মুখে যাই বলুক, কাজে কোন গরমিল হয় না হাজির। সত্য মিথ্যা নানান কথা বলে সে আলিবর্দীকে উত্তেজিত করতে থাকে। বিপদ হতে পারে ভেবে পাটনার শাসনকর্তার পদে পাকা হয়ে বসবার জন্য বাদশার কাছে ওকালতি করতে বলে যুগোলকিশোরকে। বাদশার দরবারে যুগোল কিশোর নবাবের ও আলিবর্দীর উভয়েরই উকিল। যুগোল কিন্তু সরফরাজকে বেশী পছন্দ করতো। আলিবর্দীর অভিপ্রায় সে ফাঁস করে দিল নবাবের কাছে। শুনে নবাব বিচলিত হয়। বিহারের রাজস্বের অনুসন্ধান করতে হুকুম পাঠালো নবাব। মতলব হল, কোন অজুহাত বার করা, আর সেই অজুহাতে আলিবর্দীকে সরানো।

হাজির দৌহিত্রির সঙ্গে আলিবর্দীর প্রিয় নাতি সিরাজের বিয়ের কথা একরকম পাকা। মেয়েটি বড় সুন্দরী। কিন্তু মেয়েটিকে নবাবের খুব পছন্দ। নিজের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া তার ইচ্ছা। কিন্তু হাজি রাজী নয় এতে। ভয় দেখাতে পিছপা হয় না নবাব। পত্র লিখে সব ঘটনা হাজি জানায় আলিবর্দীকে।

এবার আলিবর্দী উঠে পড়ে লাগে। বাংলার সুবাদারী পেতে হবে। বাদশার কাছে মহম্মদ ইশাক খাঁর খুব খাতির। আলিবর্দী ইশাক খাঁকে ধরে পথ পরিষ্কার করতে ব্যগ্র। বাদশার টাকার প্রয়োজন। সময় বুঝে দর হাঁকে আলিবর্দী। ইশাককে জানায় যে, যদি তাকে বাংলার সুবাদার করে ফর্মান দেয় বাদশা, তবে বাংলার রাজস্ব ছাড়া সরফরাজ খাঁর সমস্ত ধনদৌলত ও নিজের এক কোটি টাকা সে বাদশাকে উপহার দিতে রাজী।

টাকার কথায় গা ঝাড়া দিল মুহম্মদ শাহ্। তবু দেরী হয়। অধৈর্য হয়ে আলিবর্দী আবার লিখে পাঠায়: যদি সুবাদারীর ফর্মান দিতে খুব দেরী থাকে, তবে অন্তত তাকে সরফরাজ খাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ যেন দেওয়া হয়।

হুকুম আসতেই আলিবর্দী ঘোড়া ছোটালো মুর্শিদাবাদের দিকে। যাওয়ার সময় ফতেচাঁদকে খবর দিতে ভোলেনি। চিঠিতে তার সমস্ত উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম বুঝিয়ে সাহায্য প্রার্থনা করেছে জগৎশেঠের। অন্য আর একটা

চিঠি লিখেছে নবাবকে। অনুরোধ করেছে যে তার সৈন্য রাজমহলে পৌঁছালে জগৎশেঠ যেন নবাবকে লেখা চিঠি খোদ নবাবের হাতেই তুলে দেয়। চিঠির বিষয় বিশেষ গোপনীয়। একমাত্র জগৎশেঠ ছাড়া আর কেউ জানে না। হাজির জামাই রাজমহলের ফৌজদার আতাউল্লা খাঁকে নির্দেশ দেওয়া আছে, কেউ যেন সকড়িগলি পার না হতে পারে।

হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যদের কাছ থেকে আনুগত্যের শপথ নিয়েছে আলিবর্দী। সেনাদের ঠিকমত মাইনের ব্যবস্থা করেছে সে পাটনার এক শেঠের গদীতে।

বাংলার দিকে এগোতে থাকে সেনাবাহিনী। ফতেচাঁদ হিসেব করে দেখে যে আলিবর্দীর এতদিনে মুর্শিদাবাদের খুব নিকটে এসে যাওয়া উচিত। নবাবকে চিঠি দেবার এটা-ই উপযুক্ত সময়। তাই নবাবকে উদ্দেশ্য করে লেখা আলিবর্দীর চিঠি হাতে করে ফতেচাঁদ দরবারে হাজির হলো নবাবের কাছে।

আলিবর্দী লিখেছে: আমার বংশ মর্যাদা হানি হবার উপক্রম হয়েছে। নবাব যদি তার স্ববংশীয় আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে দেন, তবে আমি ফিরে যাবো। আমার আর কোন উদ্দেশ্য নেই। আমি নবাবের চাকর মাত্র।

চমকে উঠলো নবাব। কাল-গোখরোর মাথায় পা পড়েছে যেন। কি করবে স্থির করতে পারে না। কেউ কেউ বলে হাজিকে শাস্তি দাও। তর্কে সময় নষ্ট হয়। মহম্মদ গাউস খাঁ বলে, 'এই সব তর্ক অর্থহীন। একা হাজিকে বন্দী করে অথবা তাকে খুন করে খুব বেশী লাভ করতে পারবে না নবাব। বড় জোর আলিবর্দী তার একজন বিচক্ষণ অনুচর হারাবে। হাজি যদি রাজধানীতে থাকে তবে ক্ষতি হবে আরও বেশী। রাজধানীর বিশ্বাসঘাতকদের সঙ্গে সে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখবে। আর হাজির যদি ধর্মজ্ঞান থাকে, তবে আলিবর্দীকে ফিরিয়েও নিয়ে যেতে পারে।'

গাউস খাঁর কথামত ছাড়া পেল হাজি। সরফরাজ এগিয়ে গেল আলিবর্দীর গতিরোধ করতে। সন্ধির ব্যর্থ চেষ্টার পর দু'পক্ষের কামান গর্জন করে উঠলো গিরিয়ার মাঠে।

'আলিবর্দীকে ধরে সরফরাজের কাছে যে এনে দিতে পারবে তাকে উপহার দেওয়া হবে'—এই বলে ফতেচাঁদ নাকি টিপ পাঠিয়েছিল তার সৈন্যদের মধ্যে। টিপ এক ধরণের হুণ্ডী। কার্যসিদ্ধির পর তা ভাঙানো যায়। একখানা টিপ পেয়েছিল আলিবর্দীর সেনাপতি। আর কালহরণ করা অনুচিত

ভেবে আক্রমণ সুরু করেছিল নবাবের ওপর। গোলাম হোসেনের মতে নবাব সরফরাজ জগৎশেঠের সাহায্যে এই টিপ পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন।

এর আবার বিরুদ্ধ বিবৃতিও আছে। এই বিবৃতি দিয়েছিলেন গোলাম হোসেন, অনুবাদক মুস্তাফা। এর মতে আলিবর্দী বিরুদ্ধ ফতেচাঁদের সাহায্যে টিপ পাঠিয়েছিল নবাবের সেনাদের মধ্যে। আলিবর্দীর শিবিরে নয়। ওই টিপ পেয়ে নবাবের সেনাপতি গোলাবারুদের বদলে ধুলো বালিতে কামান ভর্তি করে রাখে। আলিবর্দীর কামান থেকে যখন আগুন বৃষ্টি হচ্ছে, নবাবের তোপ তখন শান্ত। কারণ খুঁজতে গিয়ে আসল জিনিষ ফাঁস হয়ে পড়ে। তোপখানার দারোগা সারিয়াকে তখুনি হটিয়ে দিয়ে বসানো হল এ্যাণ্টনী ফিরিঙ্গীর ছেলে পাঁচুকে।

বিশ্বাসঘাতকতায় দমবার পাত্র নয় গিরিয়া যুদ্ধের বীর গাউস খাঁ। গাউস খাঁ ছড়ার নায়ক। গ্রাম্য কবির ভাষায় জীবন্ত গাউস খাঁ অধীর হয়ে যেন নবাবকে বলছে :

গাউস খাঁ বলিল তখন শুন নবাব তুমি
আলিবর্দীর শির এনে দিব আমি।

সরফরাজ তখন উত্তর দিচ্ছে :

শুন শুন গোয়াস খাঁ তুমি পাঠানের জাতি
ময়দানে পড়িল যেন মার আর কাটি।

দেরী করতে পারে না গাউস খাঁ। সারি সারি তাঁবু পড়েছে আলিবর্দীর সৈন্যের। গিরিয়া নালার ধার বরাবর সৈন্য সাজিয়েছে গাউস খাঁ। অধীরভাবে নবাবের অনুমতি প্রার্থনা করে বলে :

জলদী করে হুকুম দেরে নবাব জলদী করে
ঘোড়ায় চড়ে যাবো আমি সুতীর দরগাতে।

বেশীদূর যেতেও হয়নি। ঝাঁপিয়ে পড়েছে আলিবর্দী।

মার মার করে গাউস লড়াই করিল
কলার বাগানে যেন ঝুড়িতে লাগিল।
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে রহে
একলা করিল লড়াই, গাউস, চাল মুড়ি দিয়ে।

ভাল ভাল কামান সাজায়ে, কামান করিল বিলি
নবাবের কামানে ভরে ইঁট আর বালি।
কালিয়া মেঘের আড়ে যেন মেঘ চিকচিকে,
গাউস খাঁর তরবার যেন বিজলী ছিটকে।

হার হয়েছে গাউস খাঁর। যুদ্ধ করে প্রাণ দিয়েছে গিরিয়ায়। লোকে ভুলতে পারেনি গাউসকে। তার মৃত্যুর পর তৈরী করেছে দরগা। সেখানে তারা প্রার্থনা করে, মানত করে।

ওদিকে হাতীর পিঠে চড়ে লড়াই করতে করতে প্রাণ দিয়েছে নবাব। সরফরাজই একমাত্র নবাব যার মৃত্যু হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্রে। জয়ী হয়েছে আলিবর্দী। জয়ের খবর নিয়ে আগেভাগে মুর্শিদাবাদে এসেছে হাজি। অভয় দিয়েছে শহরের বাসিন্দাকে। করায়ত্ত করেছে সরফরাজের ধনদৌলত, মণিমাণিক্য, মুর্শিদকুলি আর সুজাউদ্দীনের সঞ্চয়।

তিনদিন পরে ১৭৪০ এর মাঝামাঝি মসনদে বসলো হাসামুদ্দৌলা আলিবর্দী খাঁ মহবৎ জঙ্গবাহাদুর।

কুড়ি

গিরিয়ার যুদ্ধে সরফরাজ যে তাড়নায় বিক্রম দেখালো, সেই তাড়নায় জগৎশেঠ ফতেচাঁদ নেমেছিল চক্রান্তের জটিল অন্ধকারে। :জ্ঞান বুদ্ধি বিবেকের সংহত সঙ্গতিতে বীরত্বের প্রকাশ। সরফরাজ হাতীর পিঠে চড়ে তোপের আঘাতে প্রাণ দিল প্রাণ রক্ষার আদিম তাগিদে। বীরত্বের উত্তাল প্রেরণা ছিল না। আত্মরক্ষার আদিম সহজ শীকার হল নবাব সরফরাজ।

জগৎশেঠ ফতেচাঁদও কুটিল চক্রান্তের কেন্দ্র বিন্দুতে দাঁড়িয়েছিল সেই প্রাণরক্ষার প্রবৃত্তিতেই। ফতেচাঁদের সামনে আর কোন অবলম্বন ছিল না। অন্ধ ভয় অলক্ষ থেকে পীড়ন করছিল তাকে। তাকে বিব্রত করে তুলেছিল অনিশ্চয়তা। চারপাশে তার ভাঙার শব্দ।

বিরাট মোগল সাম্রাজ্যের ‘চিরস্থায়ী’ স্থাপত্য ভাঙছে। ওদিকে মারাঠাদের ঘোড়ার খুরের শব্দ ক্রমশই স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হচ্ছে। আরঙ্গজেবের ‘জাতির

স্বর্গ' আজ বিপন্ন। সেই সঙ্গে বিপন্ন হয়েছে শেঠদের গদী। চার পাশ থেকে আদিম অন্ধ ভয় ও অনিশ্চয়তা গ্রাস করে ফেলবে যেন।

জগৎশেঠ ফতেচাঁদ হাত বাড়ালো আলিবর্দীর দিকে। তখনও বুঝতে পারেনি ফতেচাঁদ মাণিকচাঁদের নির্দেশ থেকে কতদূরে সরে এসেছে সে। তখনও সে কল্পনা করতে পারেনি চক্রান্তের তীব্র স্রোত নিজের গতিপথে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সব। একবিন্দু বিষের ক্রিয়া পঙ্গু করে দেবে সর্বাঙ্গ। হয়ত অগোচরে, আস্তে আস্তে। একদিন তবু স্বাভাবিক পথে বিকাশ হবে তার। সেদিন ফতেচাঁদ বুঝতে পারেনি যে অস্ত্র তার প্রাণ বাঁচালো, একদিন সেই অস্ত্রেই সে বিপন্ন হবে।

বুঝতে পারেনি আলিবর্দীও। তাকে টেনেছে প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি। সামান্য ভবঘুরে তুর্কী। বাংলার মসনদ তার কাছে চরম পুরুষার্থ। ন্যায় অন্যায় পাপ পুণ্য আনুগত্য ও বিশ্বাস ইত্যাদি মূল্যবোধ মোগল যুগের রাজনৈতিক জীবনে অবহেলিত ও অজ্ঞাত। লক্ষ্য তার ক্ষমতা। ক্ষমতার প্রতীক মসনদ। আলিবর্দী ছুটেছে মসনদের দিকে। একবার বিবেচনা করার সময় হয়নি যে আগুন সে জ্বেলেছে গিরিয়ার মাঠে, সেই আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে তার প্রিয়তম সুকুমার আকাঙ্ক্ষা।

প্রবৃত্তি অসংযত, অন্ধ। বাংলার রাজনীতি তখন প্রবৃত্তির জলসা। আর দিল্লীশ্বর মুহম্মদ শাকে ত কিনতে পারা যায় টাকা দিয়ে। মোগলের চিরস্থায়ী স্থাপত্য ভেঙে যাচ্ছে। অথচ সিংহাসনের জন্যে এত চড়া দাম দিয়েও এক মুহূর্ত শান্তি পায়নি আলিবর্দী। অজস্র অর্থমূল্য দিয়ে আজীবন দুর্ভাগ্য কিনেছে সে।

১৭৪০ সালের এপ্রিল মাসের দিকে কোম্পানীর কাছে মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে নতুন নবাব বাদশার ফর্মান পাক বা না পাক, সিংহাসন তার প্রতিষ্ঠিত। আগে থাকতেই কোম্পানী জানতো আলিবর্দীকে। জানতো বাংলার মানুষ। এই কঠোর ও দক্ষ মানুষটীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কর্মশক্তি কারো অজানা নয়।

কিন্তু ফর্মান তখনও আসেনি। প্রচারের অভাব ছিল না। চক বাজারে বলাবলি হত, ফর্মান এসেছে বহুদিন। কোম্পানী কোন কথা বলেনি। কথা বলেনি কেউই। আলিবর্দী ভদ্র ব্যবহার করেছে সকলের সঙ্গে। সরফরাজের বেগমদের সসম্মানে পাঠিয়ে দিয়েছে ঢাকায়। রায় রায়ান আলম চাঁদ নাকি গিরিয়ার যুদ্ধে আহত হয়। যুদ্ধের ঠিক পরেই আত্মহত্যা করে সে। তাও নাকি

গৃহিনীর গঞ্জনায়। হলওয়েল বলেছে, বিশ্বাসঘাতকার জন্ত গঞ্জনা দিতেন আলম চাঁদ গৃহিনী।

চিন্ময় রায় এখন নতুন নায়েব-দেওয়ান। মীরজাফর খাঁ প্রধান সেনাপতি। আগের কর্মচারীরা কাজে বহাল আছে। কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ আনেনি আলিবর্দী। তাই কোনদিক থেকে কোনরকম প্রতিবাদও ওঠেনি। চুপচাপ আছে সবাই।

২৯শে মে দিল্লী থেকে খবর পেল কোম্পানী, বাদশা আলিবর্দীকে নবাব বলে স্বীকার করেছে। ১০ই জুন খবর এল, বাদশাহী ফর্মান জারী করা হয়েছে। আর ১৯শে অক্টোবর তারিখে উকিল ফর্মানের এক কপি নিয়ে হাজির হল কাশীমবাজার কুঠিতে। বাদশা দিয়েছে নতুন খেতাব,—মাহী।

রায় রায়ান আলম চাঁদ মারা যাবার পর হাজি আর জগৎশেঠই দরবারের মাথা। চিন্ময় রায় বয়সে ছোট হলেও খুব দক্ষ।

কোম্পানীর সঙ্গে আগের মতই ব্যবসা করে জগৎশেঠ। ৭ই জুলাই তারিখে দেড় লাখ টাকা ধার নিয়েছে কোম্পানী। সুদের হার কমে হয়েছে বারো থেকে নয়। দরবারে কোম্পানীর হয়ে ওকালতি করে ফতেচাঁদ। গদীয়ান হিসাবে ফতেচাঁদের কোন অসুবিধে নেই এখন। নবাব তার ওপর প্রসন্ন। কারবারীদের সে আস্থাভাজন। ইংরেজরা তার ওপর নির্ভরশীল। হাত পেতে থাকে ডাচ আর ফরাসীরা। জমিদাররা বন্ধু। সুতরাং বাজার তার পক্ষে। সার্থক ব্যাঙ্কারের সব চেয়ে আগে দরকার প্রতিষ্ঠা। এমন অবস্থায় যেতে হবে যাতে লোকে যেন চোখ বুঁজে বিশ্বাস করতে পারে। শেঠবাড়ীর ওপর সকলের অগাদ বিশ্বাস। সুতরাং অবাধে ধনরত্ন কুড়িয়ে আনে জগৎশেঠ।

ট্যাঁকশালের শোক ভুলতে পারেনি কোম্পানী। ফাররুকশেরের ফর্মানের আজ্ঞা কোন নবাব পালন করেনি। কোম্পানীও জানতো যে যতদিন জগৎশেঠ আছে, ততদিন ট্যাঁকশাল ব্যবহার করার আশা তাদের নেই।

ফতেচাঁদ বুড়ো হয়ে এসেছে। কলকাতার বড় সাহেবরা ভেবেছিল আর একবার চেষ্টা করা ভাল। কিন্তু সায় দিতে পারেনি কাশীমবাজারের কুঠিয়াল। এই সব অরাজকতার জন্যে ট্যাঁকশাল কিছুদিন বন্ধ আছে। কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আবার কাজ আরম্ভ করবে ফতেচাঁদ। সে কথা

দিয়েছে যে, টাকার জন্মে কোন ভাবনা হবে না কোম্পানীর। এ ক্ষেত্রে ফতেচাঁদকে রাগিয়ে দিলে ক্ষতি হবে তাদের।

এক বছর পার হয়ে গিয়েছে। উড়িষ্যার নায়েব রস্তমজঙ্গ আলিবর্দীর বশ্যতা তখনও স্বীকার করেনি। আপোষের কথা পাকা, কিন্তু রস্তমের বেগমের ঘোর আপত্তি। সরফরাজ খাঁর মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে স্বামীকে যুদ্ধে পাঠালো বেগম। ১৭৪১ থেকে ১৭৪২ সালের মাঝামাঝি আলিবর্দীকে তাই থাকতে হয়েছিল কটকে।

আলিবর্দীর বেগম ইতিহাসের প্রসিদ্ধ মহিলা। আলিবর্দীর অতুলনীয় কর্মদক্ষতার উৎস বেগমসাহেবার স্থির শুভবুদ্ধি ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়। যুদ্ধে হোক, শান্তিতে হোক, আলিবর্দীকে ছেড়ে কখনও থাকেননি বেগমসাহেবা। হাতীর পিঠে চড়ে যুদ্ধ দেখতেন, পরামর্শ দিতেন। কতবার প্রাণ সংশয় হয়েছে তাঁর। আলিবর্দীর রাজত্ব ত যুদ্ধের ইতিহাস। যাই হোক, নবাবের অবর্তমানে হাজি নবাবের কাজ চালায়।

হাজির সঙ্গে বহুবার বিবাদ হয়েছে কোম্পানীর। হাজি তখন মন্ত্রী, পদস্থ কর্মচারী। এখন সে নবাব না হলেও, নবাবের বড় ভাই। আর হাজি না থাকলে কোনদিন কি আলিবর্দী সিংহাসনে বসতে পারতো? বলতে গেলে হাজিই চক্রান্তের নায়ক। যদিও আলিবর্দী একেবারে জিতেন্দ্রিয় নয়। যাই হোক হাজির সঙ্গে বিবাদ পাকিয়ে উঠলো নুনের কারবার নিয়ে।

বাংলা দেশে নুনের অভাব নেই। সমস্ত উপকূল জুড়ে নুনের এলাকা। নুনের গঞ্জ হিসেবে বালেশ্বর, হিজলি, তমলুক, চব্বিশ পরগণা, নোয়াখালী চট্টগ্রাম খুব নাম করা। বছরে প্রায় আঠাশ লাখ মণ নুন হত বাংলায়। দামও খুব বেশী নয়। একশ' মণের দাম চল্লিশ থেকে ষাট টাকার ভেতর থাকতো। অবশ্য বর্গীর হাঙ্গামার সময় দর বেড়ে যায় দেড়শ টাকায়।

নুনের কারবার নবাবের নিজস্ব। নবাব বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনকে মাঝে মাঝে কারবার দেখাশোনা করার ভার দিত। কখনও বা দর ডেকে ইজারা দিয়ে দিত। সব নির্ভর করতো নবাবের খুশীর ওপর।

কিন্তু এই কারবারে বহু বাধা বিঘ্ন। অনধিকার প্রবেশ লেগেই থাকতো। চোরাকারবারীর অন্ত নেই। ইজারাদার অক্ষম। হাজির কাছে নালিশ এসেছে যে ইংরেজরা অবাধে নুনের বে-আইনী ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

দরবারে ডাক পড়লো উকিলের। চোখ রাঙিয়ে হাজি বললে, 'আর

সব বিদেশী কোম্পানী যত সুযোগ সুবিধা পায়, তার চেয়ে অনেক বেশী সুবিধা ভোগ করে তোমাদের কোম্পানী। তবু লোভ গেল না? এ দেশের মহাজনরা যেই দুটো একটা জিনিষের ব্যবসা করে একটু রোজগার-পাতি করে, ওমনি তাদের মুখের ভাত কাড়তে লেগেছো? তা ছাড়া নুনের কারবার নবাবের নিজের জিনিষ। এর আগে একবার এই নিয়ে তোমাদের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয়েছে। তোমরা কথা দিয়েছিলে এ সব কাজ আর করবে না। আবার আরম্ভ করেছো কেন?'

উকিল বললে, 'যদি এমন কারবার হয়েই থাকে, তবে তা হয়েছে কোম্পানীর অগোচরে। হয়ত কোম্পানীর কোন কর্মচারী এমন বে-আইনী কাজ করে থাকতে পারে।'

কোন কথা কানেই তুলতে চায়নি হাজি। রাগের মাথায় কড়া কড়া কথা বলেছিল। উকিল কুঠিতে ফিরে গিয়ে সব কথা জানালো কুঠিয়ালকে।

কলকাতায় খবর গেল। অন্য নবাব হলে এত সহজে নড়তো না কলকাতার সাহেব। কিন্তু আলিবর্দীকে ভয় করে কোম্পানী। খবর পাওয়া মাত্র ফতেচাঁদের কাছে আবেদন এল কলকাতার। 'বড় ভরসা করি আপনার ওপর। কোনক্রমে যদি হাজিকে শান্ত করতে পারেন তবে বাধিত হবো।'

শান্ত করতে বেগ পেতে হয়নি ফতেচাঁদের। হাজিকে বারো হাজার আর দরবারের কর্মচারীদের প্রায় দু'হাজার টাকা নজরানা দিয়ে অব্যাহতি পেয়েছে কোম্পানী। স্বীকার করেছে, ব্যাপারটা এত চট করে মিটে যাবে ভাবা যায়নি। শুধুমাত্র ফতেচাঁদের জন্য এত তাড়াতাড়ি আর এত অল্পের ওপর দিয়ে নিষ্কৃতি পেলাম।

একুশ

উড়িষ্যায় রুস্তমজঙ্গকে হারিয়ে আলিবর্দী নিরাপদ। বাংলা বিহার উড়িষ্যায় সে এখন অপ্রতিহত। ১৭৪১ সালের মার্চ মাসে নবাব ফিরছে মুর্শিদাবাদের দিকে। যুদ্ধ জয়ের ক্লান্তি মিটেছে মৃগয়ায়।

মেদিনীপুরের জয়গড়ের কাছে থানাদারের মুখে খবর পেল নবাব যে রঘুজী ভোঁসলার সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনে চল্লিশ হাজার মারাঠা বর্গী এসে গেছে। চারদিকে অবাধ লুটতরাজ করে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে

দিচ্ছে তারা। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেনি নবাব। বাইরে থেকে যদি আক্রমণ করতেই আসে, তবে তারা আসবে চিরকালের পথ ধরে, রাজমহল হয়ে। নবাব তাই নবাবীচালেই ফিরছিল। কিন্তু মোবারক মঞ্জিলের কাছে এসে খবর শুনে চক্ষুস্থির। হানাদাররা পরিচিত পথ দিয়ে আসেনি। তারা এসেছে পঞ্চকোটের পার্বত্যপথে। মারাঠারা বর্ধমানের ধারে এখন।

দিনরাত বিশ্রাম নেই। এগিয়ে যাচ্ছে সৈন্য নিয়ে আলিবর্দি। সঙ্গে বেশী সৈন্যও নেই। উড়িষ্যা জয়ের পর তারা চলে গেছে রাজধানীতে। নবাবের পৌছোনোর আগে বর্গীরা তছনছ করে দিয়েছে বর্ধমান। আলিবর্দীর চারদিকে বর্গী। রসদ পাওয়া দায়। নবাব বিপন্ন। প্রস্তাব পাঠালো ভাস্কর পণ্ডিত—নবাব যদি মারাঠাদের দশ লাখ টাকা দিতে রাজী থাকে, তবে তারা ফিরে যাবে।

রাজী হয়নি নবাব। এ প্রস্তাব অপমানকর। যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। কিন্তু ওদিকে মারাঠারা তীব্র ও ক্ষিপ্র আক্রমণে রীতিমত বিব্রত করে তুলছে নবাবকে। রসদ নেই। সৈন্যরা অনাহারে। আফগান সৈন্যরা যুদ্ধ করছে না। এই আফগানদের ওপর নবাবের খুব ভরসা। নিরুপায় নবাব শেষে দশ লাখ টাকাতেই রাজী হল। রাজী নয় এখন ভাস্কর পণ্ডিত। এখন তার দাবী এক কোটি টাকা।

ওদিকে দেশ যায় যায়। নাদির শাহের অত্যাচার সইতে হয়নি বাংলাকে। শোনা গিয়েছে সে অত্যাচার ছিল নাকি অকথ্য। মগ হার্মদের কোপে পড়ে নাস্তানাবুদ হতে অভ্যস্ত বাংলার গৃহস্থ। কিন্তু এদের অত্যাচার আরো বীভৎস। গঙ্গারাম মহারাষ্ট্র পুরাণে সেই সব কথা কিছু বলেছেন। গ্রাম শ্মশান। যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে সবাই পালিয়েছে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে। ঘর বাড়ী জ্বলছে, খেত মাঠ খাঁ খাঁ করছে। যার যা কিছু আছে সব লুটে পুটে নিয়েও শান্ত হয়নি তারা। জীবন্ত মানুষকে চুবিয়ে মেরেছে পুকুরের জলে।

টাকা কড়ি না আইলে তারে প্রাণে মারে
যার টাকা কড়ি আছে সেই দেয় বরগিরে
যার টাকা কড়ি নাই সেই প্রাণে মরে।

অত্যাচারের বন্যা চলেছে। অনাহারে রয়েছে গ্রামের মানুষ। বনে জঙ্গলে

পালিয়ে, ফলমূল খেয়ে, বন্য জন্তুর মাংসে কোনক্রমে প্রাণ বাঁচায় বাংলার চাষা তাঁতী কুমোর জেলে, ভদ্র অভদ্র সকলে। সৈন্যদের অবস্থা আরো খারাপ। সারাদিন যুদ্ধ ও অনাহার। রাত্রে খোলা আকাশের নীচে বসে ভিজতে হয় বর্ষায়। গাছের পাতা খেয়ে পেটের জ্বালা মেটাতে হয়। প্রচুর অর্থের বিনিময়ে খাদ্য মেলা অসম্ভব। মরা জীবজন্তু, কলার এঁটে তখন রাজভোগের সামিল।

তারিখ-ই-ইউসুফীর রচয়িতা ইউসুফ আলী খাঁ তখন ছিলেন নবাবের সঙ্গে। তিনি লিখেছেন: বর্ধমান থেকে কাটোয়া পৌছবার তিন দিনের মধ্যে আমরা পেয়েছিলাম তিন পোয়া খিচুড়ী। নানাবিধ উপাদেয় খাদ্যে অভ্যস্ত আমরা সাতজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সেইটুকু ভাগ করে খেয়েছিলাম। তৃতীয় দিনে পেয়েছিলাম সাতটি মিঠাই ও মরা জন্তুর আধ সের মাংস। রান্নাও হয়েছিল। কিন্তু খেতে পারিনি। কয়েকজন এসে সেই খাদ্য প্রার্থনা করেছিল আমাদের কাছে।

জানকীরাম থাকতে না পেরে নবাবকে বলেছিল, মারাঠাদের দাবী মিটিয়ে দিতে। সৈন্যদের ডেকে নবাব বললে, 'অত টাকা যদি দিতেই হয়, বর্গীদের দেব কেন? দেব তোমাদের। তাড়াও বর্গী।'

আফগান সৈন্যদের সেনাপতি মুস্তাফা। রাতের অন্ধকারে নবাব সিরাজের হাত ধরে এলো মুস্তাফার শিবিরে। বিছানা ছেড়ে ধড়ফর করে উঠলো মুস্তাফা। নবাব বললে, 'আমার ওপর যদি তোমার কোন আক্রোশ থাকে, তবে তার প্রতিশোধ এখুনি নাও মুস্তাফা, আমি এসেছি। সঙ্গে আমার সিরাজ—যাকে আমি সব চেয়ে বেশী ভালবাসি। এইবার এক কোপে তোমার প্রতিহিংসা চরিতার্থ কর। কিন্তু যদি এখনো পুরানো বন্ধুত্বের স্মৃতি বিন্দুমাত্র মনে থাকে তোমার, যদি আমার দোষ ত্রুটি ক্ষমা করার মত ঔদার্য এখনো তোমার থাকে মুস্তাফা, তবে বলি, আমাকে এই বিপদের মধ্যে রেখে পালিয়ে যেও না। আমাকে কথা দাও। কথা দিতে হবে তোমাকে।'

মুস্তাফা কথা দিয়েছে তার আফগান সৈন্য যুদ্ধ করবে আপ্রাণ। নবাব তৈরী হয়।

তৈরী হয় মুর্শিদাবাদ। হাজি আহম্মদ আর জগৎশেঠ খুব ব্যস্ত। হাজি শহর রক্ষা করার জন্য কেল্লা সংস্কারে করে। ওদিকে জগৎশেঠ তার ধনরত্ন করে বস্তাবন্দী। তাদের দেখাদেখি আরো বিব্রত বোধ করে মাঝারী

গদীয়ান। চক বাজার ভীত হয়ে পড়ে। ১৭৪০ সালের মার্চ মাসে একজন জমিদারের চিঠি পেল ফতেচাঁদ। আশী হাজার মারাঠা তার জমিদারী আক্রমণ করেছে। প্রাণ বাঁচাতে সে গিয়েছে বীরভূমের দিকে। জগৎশেঠ যেন সাবধানে থাকে।

বর্গীরা মুর্শিদাবাদের দিকে পা বাড়িয়েছে। দিনের পর দিন আরো ভয়াবহ রোমাঞ্চকর খবর রাজধানীকে রোমাঞ্চিত করে। সবাই আত্মরক্ষার ভাবনায় মারা যাবার উপক্রম। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি দেখা গেল মুর্শিদাবাদে আর একটিও ব্যবসাদার নেই, গদীয়ানরাও পালিয়েছে। যাদের ভাগ্য মসনদের পায়ার সঙ্গে বাঁধা, একমাত্র তারাই আছে। 'লণ্ডনের মত ব্যস্তমুখর মুর্শিদাবাদ' ভয়ে সিঁটিয়ে আছে কোন মতে।

জগৎশেঠ আর দরবারের বড় বড় চাঁইরা রাজধানী তখনও ছাড়েনি। কিন্তু তাদের বাড়ীর লোকজন সবাইকে পাঠিয়ে দিয়েছে বাইরে। মহিমাপুরের ভাঁড়ার খালি করতে চায় জগৎশেঠ। কখন কি হয় বলা যায় না। ধনরত্নের কিছু যায় ঢাকায় কিছু কলকাতায়। অন্তত মার্চ মাসে কলকাতায় কম পক্ষে পনেরো বস্তা ধনরত্ন পাচার করতে পেরেছিল ফতেচাঁদ।

খবর চাপা থাকে না। কোম্পানী কলকাতায় জানায়, অবস্থা আদৌ ভাল নয়। রাজধানী থেকে হাজি নবাবকে সাহায্য করার জন্য তিন হাজার সৈন্য নিয়ে গিয়েছিল বর্ধমানের দিকে। পৌছুতে পারেনি। ফিরতে হয়েছে কাটোয়া থেকেই। এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব। মারাঠারা দুর্ভেদ্য। কাটোয়ায় থাকতে থাকতে নবাবের কাছ থেকে মাত্র একটা চিঠি পেয়েছে হাজি। নবাব লিখেছে : 'মারাঠারা আমার কাছ থেকে এক কোটি টাকা চায়। আমি জবাব দিয়েছি এক কড়িও দেবো না।'

কড়ি দেয়নি নবাব। বর্ধমান থেকে কাটোয়ার পথে নবাব। চার পাশে মারাঠা ব্যূহ। নবাবী কামান মারাঠাদের হাতে। বন্দুকের আওতার বাইরে থেকে তারা আক্রমণ চালায়। তবু অতুলনীয় সাহসে নবাব ঝাঁপিয়ে প'ড়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, নবাব যে ভাবে মারাঠা ব্যূহ ভেদ করেছে, তা একমাত্র নেপোলিয়নের পক্ষেই করা সম্ভব ছিল। আর কেউ পারতো না।

কাটোয়া থেকে নবাবের চিঠি পেয়েছে হাজি। পাওয়া মাত্র-ডাক পড়েছে মন্ত্রী ফতেচাঁদের। চিন্ময় রায়ও পরে এসেছিল। তিনজনে মিলে অনেক পরামর্শ করেছে। আর কেউ ঢুকতে পারেনি সেখানে। পরামর্শের ফলাফল

জানতে পারেনি কোম্পানীর উকিল। কিন্তু নবাবের চিঠির সারমর্ম যোগাড় করতে পেরেছিল। সে জানিয়েছে, অবস্থা এখন একটু ভাল।

বর্ষা নামতে দেরী নেই। বর্ষাকালে বাংলায় থাকবে না বর্গীরা। ফিরে যাবে। যতটা সুবিধা করতে পারবে বলে ভেবেছিল ভাস্কর পণ্ডিত, তা পারেনি। মারাঠারাও ফিরতেই চায়। মীর হাবিব বিভীষণ। বড় বিচিত্র জীবন মীর হাবিবের। নিরক্ষর হয়েও জলের মত বলতে পারতো আরবি ফারসি। নজরে ধরে গিয়েছিল হুগলীর ফৌজদারের। তারপর থেকে দেখ্‌ দেখ্‌ করে উন্নতি হয়েছে তার। নবাবী রাজনীতিতে বিশেষ স্থান ছিল মীরের। সে এখন মারাঠাদের পক্ষে। তাদের সাহায্য করে, পরামর্শ দেয়, রাস্তা ঘাট চেনায়।

নবাব তখন কাটোয়ায়। কয়েক শ' মারাঠা সৈন্য নিয়ে মীর হাবিব ভাগীরথীর পশ্চিম পাড় ধরে সকলের সতর্ক চোখে ধুলো দিয়ে মুর্শিদাবাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ল। শহরের সম্ভ্রান্ত অঞ্চলে আগুন জ্বালিয়ে বিহ্বল করে তুলেছিল অবশিষ্ট ভয়ার্ত মানুষকে। মীরের দরকার টাকার। জানতো টাকা কোথায় আছে। সোজা জগৎশেঠের গদী থেকে ছোঁ মেরে দু কোটি আর্কট টাকা আর বহু মণিমুক্তো নিয়ে ভাগীরথী পার হয়ে মিলিয়ে গেল মীর। ব্যাপারটা ঘটে গেল চোখের পলকে। ফতেচাঁদ ভাবতেও পারেনি। কল্পনা করতে পারেনি হাজি। মহিমাপুর নির্বাক। শহরে আতঙ্ক।

এত দ্রুত ও অপ্রত্যাশিত আক্রমণ কেউ দেখেনি। এই দুর্বিপাক ভাবিয়ে তুলেছে কোম্পানীকেও। ভাগীরথীর পশ্চিম পারের লোক আশ্রয়ের জন্য যায় কলকাতার দিকে। ইংরেজরা কলকাতায় গড় তৈরী করেছে নবাবের অনুমতি নিয়ে। এখনকার সার্কুলার রোড সেই মারাঠা খাত। কাশীমবাজার কুঠির চারপাশে উঠেছে ইটের দেওয়াল। চার কোণে চারটে সুদৃঢ় বুরুজ। কলকাতার ফিরিঙ্গী আর্মানী আর ইয়োরোপীয় বণিকরা মিলে তৈরী করেছে বিনা মাইনের সেনাবাহিনী। যোগ দিয়েছে তাদের লোক-লস্কর। তৈরী সবাই। কখন কি হয় বলা যায় না।

মীর হাবিব গদী থেকে উঠিয়ে নিয়ে গেছে দু কোটি আর্কট টাকা। তা ছাড়া আরো অনেক মণিমুক্তা। কিন্তু তাতেও খুব বেশী ঘা পায়নি জগৎশেঠ। এই দারুণ ক্ষতি ইয়োরোপের যে কোন ব্যাঙ্কারকে পথে বসাতো। কিন্তু এই ক্ষতিতেও জগৎশেঠের গায় কোন আঁচড় লাগেনি। তারপরও শেঠদের গদী থেকে এক কোটি টাকার 'দর্শনী' ভাঙানো যেত যে কোন সময়।

মীর হাবিব যা করতে পারেনি তাই করলো নবাবী সৈন্তরা। মারাঠাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। তারা এসেছে লুট করতে। লুট তারা করবেই। সাবধানে থাকলে, সতর্ক হয়ে পাহারার ব্যবস্থা করলে মারাঠাদের হাত থেকে বাঁচা যাবে। তাই মীর হাবিবের লুটতরাজে জগৎশেঠ চঞ্চল হলেও ভীত হয়নি। কিন্তু যখন হাজির ভাড়াটে সৈন্তরা মহিমাপুরের গদীর ওপর ঝাপিয়ে পড়ে অবাধে লুটতরাজ চালালো, এবং প্রায় ধুয়ে মুছে নেবার যোগাড় করলো কুবেরের ভাণ্ডার, আর এক মিনিটও রাজধানীতে থাকা নিরাপদ মনে করলো না ফতেচাঁদ। রক্ষকই যদি ভক্ষক হয়, তখন কি করা যাবে। ফতেচাঁদ প্রাণ বাঁচায়।

বর্ষা আরম্ভ হয়েছে। মারাঠাদের হাত থেকে অন্তত মাস চারেক কোন ভয় ভাবনা নেই। ভয় ত আর শুধু মারাঠাদের নয়। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ দুই নাতি মহাতপ রায় আর স্বরূপচাঁদকে নিয়ে ঢাকার দিকে রওনা হল।

শেঠ আনন্দচাঁদের ছেলে মহাতপ রায় আর দয়াচাঁদের ছেলে স্বরূপচাঁদ। তিন ছেলে ফতেচাঁদের। তিনজনের মৃত্যু দেখেছে সে। নাতিরাই সম্বল। ফতেচাঁদ যাবে ঢাকায়। ঢাকা এখনো নিরাপদ।

আলিবর্দী বহু অনুরোধ করেছে ফতেচাঁদকে। অনুনয় বিনয় করেছে কর্মচারীরা। কিন্তু কোন কথা শোনেনি ফতেচাঁদ। নবাবের অনুরোধের উত্তরে সে শুধু এই জবাব দিয়েছে, যেখানে মানুষের ধনপ্রাণ নিরাপদ রাখার মত কোন সংগঠন নেই, সেখানে আমি কি করে বাঁচতে পারি, বলুন?

২৯শে মে ফতেচাঁদ পৌছালো ঢাকায়। ফতেচাঁদের আসার সঙ্গে সঙ্গে শহরময় ত্রাস ছড়িয়ে পড়ে। দলে দলে শহর ছাড়ে বিত্তমান। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ যখন প্রাণ বাঁচাতে আসতে পারে ঢাকায়, তখন মুর্শিদাবাদ ত আর নিরাপদ নয়। মুর্শিদাবাদ যদি নিরাপদ না হয়, তবে ঢাকাইবা কিসে ভাল?

শহর প্রায় ফাঁকা। অতি কষ্টে দেওয়ান ফিরিয়ে নিয়ে আসে কয়েকজনকে।

ওদিকে ফতেচাঁদের ঢাকা যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুর্শিদাবাদের অবশিষ্ট ব্যবসাও যায় যায়। ৭ই জুন তারিখে অবস্থা জানিয়ে কাশীমবাজার থেকে চিঠি গেল কলকাতায়। ব্যবসা প্রায় বন্ধ। বর্গীদের অত্যাচারে তাঁতীরা ঘর ছাড়া। শহরে আর কোন গদীয়ান নেই। দালালরা কাজ করছে না। তারা মনে করছে এই অবস্থায় কাজ করা অন্যায় হবে। ওরা সবাই

জগৎশেঠকে আদর্শ ধরে কাজ কর্ম করে। জগৎশেঠ যদি কাজ বন্ধ করে থাকে, তবে তাদেরও কাজ বন্ধ করা দরকার।

জগৎশেঠ যে কবে আসবে তার কোন ঠিক নেই। প্রায় হপ্তা খানেক হাজির সঙ্গে নবাবের মুখ দেখাদেখি নেই। দু'জনেই প্রাণপণে চেষ্টা করছে জগৎশেঠকে ফিরিয়ে আনার জন্যে। দু'জনেই বহু মূল্য উপহার পাঠিয়েছে। কিন্তু কারো উপহার নেয়নি ফতেচাঁদ। ফেরৎ দিয়েছে। নবাব মুর্শিদাবাদ থেকে কাজীকে পাঠিয়েছিল। কিন্তু কাজীর সঙ্গেও দেখা করেনি জগৎশেঠ। বলে পাঠিয়েছে, অসুখ করেছে বলে দেখা করতে পারলাম না।

কেউ কেউ বলে জগৎশেঠ শুধু টাকার শোকেই এ রকম ব্যবহার করেনি। আরো অন্য কারণও আছে। জগৎশেঠ যখন নাকি তার ক্ষতির পরিমান বোঝাচ্ছিল নবাবকে, তখন নবাব নাকি উত্তর দিয়েছিল যে তার নিজের যা ক্ষতি হয়েছে তা প্রায় জগৎশেঠের দ্বিগুণ। এই কথায় আহত হয়েছে জগৎশেঠ। আবার অন্যেরা বলে, এ ব্যাপারটা একেবারে রাজনৈতিক। তা যে কারণই হোক না কেন, নবাব আর জগৎশেঠের স্বার্থ এত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে একজন অন্যজনকে ছেড়ে বেশী দিন থাকতে পারবে না।

এই বলে চিঠি শেষ করেছে কুঠিয়াল।

সত্যিই থাকতে পারেওনি। জুন মাসের মাঝামাঝি ফতেচাঁদ ফিরে এল মুর্শিদাবাদে। সঙ্গে সঙ্গে এলো আরো বহু মহাজন। কিন্তু মহাতপ রায় আর স্বরূপচাঁদ থাকলো ঢাকায়।

ফিরে এসে খুব অসুস্থ বোধ করেনি ফতেচাঁদ। মুর্শিদাবাদের অবস্থা ভাল নয়। কখন যে কি হয় বলা যায় না। জগৎশেঠ ফতেচাঁদ যেন নিজের গদী থেকে টাকা ছাড়তে পারলে বাঁচে। কাশীমবাজার কুঠিতে বারবার লোক পাঠিয়ে জানতে চেয়েছে তাদের কোন টাকা কড়ির দরকার আছে কিনা? কাশীমবাজারের যদি দরকার না থাকে তবে ঢাকা কিংবা পাটনায় দরকার থাকতে পারে ত। টাকা দিতে ফতেচাঁদের আপত্তি নেই। যত খুশি টাকা নিতে পারে কোম্পানী।

বাজারে এক রতি রূপো বিক্রী হয়নি। ফলে কোম্পানী খুব বিপদে পড়েছে। কোম্পানীর লোক গিয়েছে মহিমাপুরে। জগৎশেঠ জবাব দিয়েছে, 'ট্যাঁকশাল বন্ধ। কাজকর্ম নেই। এ অবস্থায় মিছিমিছি রূপো কিনে কি করবো? কবে যে কাজ আরম্ভ হবে তারও কোন ঠিক নেই। বরং হাতে যা আছে তাই পাচার করতে পারলে বাঁচি।'

কলকাতায় জগৎশেঠের গোমস্তা গিয়েছিল। কোম্পানী তখন তাকে আর একবার ধরে রূপো কেনার জন্য। কিন্তু কিছুতেই রাজী হয়নি গোমস্তা। 'রূপো কিনতে বারণ আছে কর্ত্তার'—গোমস্তার সেই এক উত্তর।

বর্গীরা দেশ ছেড়ে যায়নি। বর্ষা একটু কমে আসার সঙ্গে সঙ্গেই আবার বিব্রত করতে থাকলো। বর্ষার সময়টা পেয়ে নবাবও অনেকটা গুছিয়ে নিয়েছে। সৈন্যরা বিশ্রাম পেয়েছে। দশ লক্ষ টাকা তাদের মধ্যে বিতরণ করেছে নবাব। বিহার থেকে জামাই জইনউদ্দীন সৈন্য নিয়ে হাজির হল রাজধানীতে। কামান, তোপ সব ঠিকঠাক। যুদ্ধের জন্য হাতীকে শেখানো পড়ানোর অন্ত নেই।

জইনউদ্দীনের জোর জবরদস্তিতে বর্ষা হবার বেশ একটু আগেই আক্রমণ আরম্ভ করেছে নবাব। মাঝ রাতে নৌকোর পুল তৈরী করে উদ্ধারণপুরের ঘাট থেকে ভাগীরথী পার হয়েছে। মাঝ পথে পুল ভেঙে মারা গেল দেড় হাজার সৈন্য। তা সত্বেও কাকভোরে তিন হাজার নবাবী সৈন্য অজয় নদের দক্ষিণ পারে হাজির হল। তারপর আক্রান্ত হয়েছে মারাঠা।

মারাঠারা বুঝতে পারেনি এমন হতে পারে। পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে তারা। পিছু নিয়েছে নবাবী সৈন্য। মীর হাবিব পথ দেখিয়ে তাদের নিয়ে এসেছিল চন্দ্রকোনায়। একদল বর্গী হারিয়ে দিয়ে এসেছে উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তাকে। আলিবর্দী তাড়াতাড়ি এসেছে মেদিনীপুরে। তাড়া করে পার করে দিয়ে এসেছে চিল্কার ওপারে। তখন ১৭৪২ সালের ডিসেম্বর মাস।

মারাঠারা অত্যাচার করেছে ঠিকই। কিন্তু নবাবের সৈন্যরাও কম যায় না। কাশীমবাজার কুঠির আশেপাশে খুনখারাপি হামেসাই লেগে থাকতো। কোম্পানী নালিশ করেছিল যে ও সব নবাবী সৈন্যের কাজ। আলিবর্দী লজ্জিত হয়ে কথাটা ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করেছিল তখন। আসলে নবাব তখন সৈন্যদের সঙ্গে কঠোর ব্যবহার করতে নারাজ।

ফিরে এসে জগৎশেঠ বেশী দিন থাকেনি মুর্শিদাবাদে। ৮ই জুলাই রাত্রে আবার ঢাকা রওনা হয়ে গেল। তার দেখাদেখি শহর-ছাড়া হল আরো মহাজন আর গদীয়ান।

জগৎশেঠ এখন অল্প টাকা ধার দিতে চায় না। লাখ টাকার কম কথা বলে না। শতকরা ন'টাকা সুদে এক লাখ টাকা আবার ধার নিয়েছে কোম্পানী। আগষ্ট মাসে আবার টাকার দরকার। ফতেচাঁদ এক পায়

খাড়া। কোম্পানী বুঝেছে ফতেচাঁদ নিরুপায়। এই অবস্থাকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করতে চাইলো ইংরেজ। বললে, 'বাজার ভীষণ খারাপ। এখন শতকরা ন'টাকা সুদ খুব চড়া। কমাতে হবে।'

গরজ দেখায় না আর ফতেচাঁদ। ন'টাকার এক পয়সা সুদ কমাবে না সে। বাজার থেকে ওঠাবে না এক রতি রূপো।

ভাস্কর পণ্ডিত হেরে গেলেও, হারেনি নাগপুরের মারাঠারা। ফেব্রুয়ারী মাসে রঘুজী ভোঁসলে প্রকাণ্ড এক বাহিনী নিয়ে আবার বাংলায় এলো। চৌথ তাদের আদায় করতেই হবে। এবার দুদিক থেকে মারাঠাদের দুই দল।

মুহম্মদ শাহ তখন শক্তিহীন। নিজে কিছু করতে পারে না। ভেবেছিল বুদ্ধি করে বাংলাকে বাঁচাবে। উদ্দেশ্য মুহম্মদ শাহের সাধু। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে ফল বিপরীত হল। রঘুজীর প্রতিদ্বন্দী পেশোয়া বালাজী রাওকে ডেকে পাঠালো বাদশা। দুজনের সর্ত হল যে পেশোয়া রঘুজীকে বাংলা থেকে তাড়িয়ে দেবে। তার বদলে বাদশা তাকে দেবে মালোয়া রাজ্য এবং বিহারের চৌথের অনাদায়ী অংশ।

নবাব এবার দুই দিক থেকে আক্রান্ত। রঘুজী যখন বর্ধমানে, বালাজী তখন ভাগলপুর পার হয়ে মুর্শিদাবাদের নিকটে। ত্রাণ কর্তা বালাজী বাংলাকে রীতিমত শোষণ করতে আরম্ভ করেছে। আলিবর্দী প্রথমেই বালাজীকে বিহারের চৌথ উপহার দিয়ে হাত করলো। তারপর দু'জনে মিলে রঘুজীকে তাড়িয়ে দিল বাংলার বাইরে।

ফতেচাঁদ বুড়ো হয়ে গেলেও বিক্রম নেই। বিশ্রাম নেবারও উপায় নেই। বিপদ যে গভীর হয়ে দেখা দেবে, তা আগে থাকতে আন্দাজ করতে পেরেছিল ফতেচাঁদ। কিন্তু তার পরিণাম যে এত ভয়াবহ হতে পারে, বুঝতে পারেনি।

মহাতপ রায় আর স্বরূপচাঁদ থাকে ঢাকায়। তারা বড় হয়েছে। কাজকর্ম দেখাশোনা করে। মাণিকচাঁদ যেমন নিজে চোদ্দ বছর হাতে কলমে কাজ শিখিয়েছে ফতেচাঁদকে, ফতেচাঁদও তার উত্তরাধিকারী তৈরী করতে থাকে। কিন্তু হালচাল ক্রমাগত জটিল হয়ে উঠছে। ব্যবসার রীতির খুব অদল বদল হয়নি। যে কটি কাজ করে যে মুনাফা হত, এখনও তাই-ই হয়। তবে তার ভেতর জটিলতা এসে গেছে।

আগে প্রতি বছর রাজস্ব যেত দিল্লীতে। পাঠানো হত হুণ্ডীতে। অত টাকার হুণ্ডী থেকে বেশ মোটা রকম থাকতো তাদের। কিন্তু আলিবর্দি নবাব হবার পর থেকে রাজস্ব দিল্লীতে গিয়েছে মাত্র একবার। সে রাজস্ব আবার যায়নি হুণ্ডীতে। আলিবর্দী যে আর কোনদিন কর পাঠাবে দিল্লীতে, এমন মনেও হয় না।

পোদ্দারী এখনও তারা করে। কিন্তু টাকার পরিমান কমে এসেছে। যে আমানত তাদের একদিন ছিল লাভের প্রধান সহায়, সেই আমানতের পরিমান ক্রমশ সংক্ষিপ্ত হয়ে আসছে। কখন কি দরকার হবে বলা যায় না। এই টাকা বাজারে খাটানো খুব বিপদের।

তার ওপর ইংরেজ কোম্পানী। এদের সঙ্গে কাজ করে ফতেচাঁদ খুশী। কিন্তু চোখ কান খোলা রেখে কাজ করতে হয়।

এই সব অভিজ্ঞতা দিয়ে শিখবে মহাতপ আর স্বরূপচাঁদ। কিন্তু যে চিন্তা তাকে সর্বদা বিব্রত করে, তার কোন উত্তর নেই। আলিবর্দী কি আবার শান্তি ফিরিয়ে আনতে পারবে?

ফতেচাঁদ ব্যাঙ্কার, কিন্তু মন্ত্রী। মন্ত্রী হিসাবে এবং ব্যাঙ্কার হিসাবে সে চায় দেশে শান্তি ফিরে আসুক। তাই রাজধানীতে তার উপস্থিতির অন্য দাম, অন্য অর্থ। মানুষ বুকে অনেকটা বল ভরসা পায়। বল, ভরসা না থাকলে ব্যবসা হয় না। তাই রাজধানী ছাড়া যায় না। ওদিকে ঢাকায় যেতেই হচ্ছে। বুড়ো বয়সে দৌড়ো-দৌড়ি করে বেড়ায় ফতেচাঁদ।

ইংরেজদের সঙ্গে কাজ করে সুখ আছে সত্যি। কিন্তু ভুগতেও হয়। কান্তবাবুর সঙ্গে কারবার করে একবার ভুগেছে ফতেচাঁদ। ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়েছে অনেক জল ঘোলা করে। আবার একটা বিরোধ বেঁধেছে কোম্পানীর সঙ্গে।

ফ্যান্সিস রাসেল তখন কাশীমবাজারের কুঠিয়াল। রাসেল টাকা ধার নেয়। টাকা দিতে কৃপণতা নেই ফতেচাঁদের। রাসেল একদিন হঠাৎ মারা গেল। মারা যাওয়ার কিছুদিন পরে টাকা আদায় করতে গিয়ে বিপদে পড়লো ফতেচাঁদ।

ফতেচাঁদ টাকা চেয়েছিল কাশীমবাজারের নতুন কুঠিয়ালের কাছে। রাসেল যখন টাকা নিয়েছে, রসিদ দিয়েছে, তখন সে নিশ্চয়ই কোম্পানীর জন্য নিয়েছে। অন্তত এই বিশ্বাসে টাকা দিয়েছে ফতেচাঁদ। কান্তবাবুর পর আর ভুগতে রাজী নয় সে।

কোম্পানী ধার সরাসরি অস্বীকার করলো। বললে, 'রাসেল শেঠদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে তার নিজের ব্যবসার জন্য। সুতরাং তার ধারের জন্য মোটেই দায়ী নয় কোম্পানী।'

এমনভাবে সোজা অস্বীকার করে আরো বিপদে জড়িয়ে পড়লো কোম্পানী। রাসেলের অন্য পাওনাদার নালিশ করলো নবাবের কাছে। নবাব ফতেচাঁদ আর চিন্ময় রায়কে ব্যাপারটা দেখার জন্য আদেশ দিল।

আগে বহুবার নালিশ এসেছে দরবারে যে কোম্পানী বে-আইনী ব্যবসা করে। ফাররুকশেরের ফর্মানের অবাধ বাণিজ্যের সর্তের সুযোগ নিয়ে নবাবের কর ফাঁকি দেয়। তারা শুধু মাত্র কোম্পানীর কাজ করতে করতে নিজের ব্যবসা চালায় না। নিজেদের মালকে কোম্পানীর মাল বলে সায়ের দারোগার কাছে জবান দিয়ে পথে বসায় নবাবকে। তাদের নিজেদের মালপত্র না থাকলে কোম্পানীর দালাল বেনিয়ানদের কাছে দস্তক বিক্রি করে লাভের বখরা দেয়।

অভিযোগের পর অভিযোগ জমে। কিন্তু প্রমাণ করা দায়। প্রতিবারই কোম্পানীর উকিল জবানী দেয় যে কারবার কোম্পানী করে। কোম্পানীর কর্মচারীদের নিজস্ব ব্যবসা নেই। সুতরাং কর ফাঁকি দেবার কোন কথাই উঠতে পারে না।

ফতেচাঁদ আর চিন্ময় রায় খোঁজ খবর করবার ভার পেয়েছে শুনে কুঠিয়াল চিন্তিত হল। কলকাতায় চিঠি লিখে জানালো যে এইবার প্রমাণ হয়ে যাবে যে কোম্পানী এতকাল নবাবের দরবারে মিথ্যে কথা বলে এসেছে। এতকাল নবাবকে প্রাপ্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে। কারণ কোম্পানীর ব্যবসার রীতি-নীতি ফতেচাঁদের অজানা নয়।

আলিবর্দী বড় কঠোর নবাব। দক্ষ ও নিরপেক্ষ বলে খ্যাতি আছে তার। মারাঠারা তাকে বিব্রত করতে থাকলেও এত বর ব্যাপারটা একেবারে মেনে নিতে পারবে না। বিশেষতঃ এখন নবাবের টাকার দরকার ভয়ানক।

আর রাসেলের পাওনা না পেয়ে ফতেচাঁদ যদি আবার বিগড়ে যায়, তাহলে কোম্পানী দাঁড়াবে কোথায়? অনেক ভাবে কাউন্সিল।

ফতেচাঁদকে হাতে রাখা সব চেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। তখন নবাবের কাছে দরবার করার সুবিধে হবে। ফতেচাঁদকে সন্তুষ্ট করতে পারলে অন্য মহাজনদের মামলা নিয়ে ভাবতে হবে না।

কলকাতা থেকে নির্দেশ এল, ফতেচাঁদের সঙ্গে ব্যাপারটা ভালোয় ভালোয় নিষ্পত্তি করার চেষ্টা করো।

রাসেলের কাছে ধারের পরিমান খুব কম নয়। সুদে আসলে ষাট হাজার টাকা। আসল পঁচিশ। সুদ হয়েছে তার পঁয়ত্রিশ। কোম্পানী চেয়েছিল পনেরো হাজারে ব্যাপারটা চুকিয়ে ফেলতে। ফতেচাঁদ অন্ততঃ আসল টাকা আদায় করবেই। আদায় করেও ছাড়লো।

মারাঠাদের বিরুদ্ধে নবাব আলিবর্দী যুদ্ধ করছে। বহু বিপদের ভিতর দিয়ে অজেয় স্পর্ধাকে ঘোষণা করেছে বারবার। বাংলার পলাতক ভীত অনাহারী মানুষকে সাহস দেবার জন্য প্রাণ বিপন্ন করেছে বহুবার। আলিবর্দী নবাব। সিংহাসন তাকে রাখতে হবে নিষ্কণ্টক করে সিরাজের জন্য।

বাংলার দ্বিতীয় নবাব জগৎশেঠ ফতেচাঁদ তখন অর্থ যুগিয়েছে সেনাবাহিনীকে অনুগত রাখতে। যুদ্ধের বিরাট ব্যয়ভার অনেকখানি নির্ভর করছে মহিমাপুরের গদীর উপর। নিজের অংশ ছাড়াও, যোগাড় করে দিয়েছে বিভিন্ন কৌশলে। দেশী বিদেশী বণিক মহাজনের দক্ষিণা আদায় করা ছাড়াও সব চেয়ে গুরুতর কাজ ফতেচাঁদ ভিন্ন কেউ করতে পারে না। সে কাজটি হল, দেশের লোকের মনোবল অটুট রাখা। ফতেচাঁদ রাজধানীতে থাকলে লোকে জানে, সব ঠিক আছে। ফতেচাঁদ তাই যুদ্ধ চালায়।

বর্গীরা আবার এল ১৭৪৪ সালে। বছরের পর বছর আক্রমণ চালিয়ে দেশকে ধ্বংস করে ফেলছে বর্গীরা। উপায় নেই। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয় নবাব। শরীর ভেঙে পড়ছে দিনদিন। বেগমসাহেবার অক্লান্ত সেবা যত্নও বিফল হয় মাঝেমাঝে।

বৃদ্ধ হয়েছে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ। রোগ ধরেছে শরীরে। তার ওপর এই বয়সে পুত্রশোক। হাঙ্গামার সময় মারা যায় এক ছেলে। আর এক ছেলে মারা যায় কিছুদিন আগে—কান্তবাবুর সঙ্গে মামলার সময়। একজনের নাম শেঠ আনন্দচাঁদ, আর একজনের নাম শেঠ দয়াচাঁদ। এখন নাতিরা তার উত্তরাধিকারী। দুই নাতি—মহাতপ আর স্বরূপচাঁদ।

যে বিপদ থেকে মুক্তি পাবার জন্য সরফরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করতে হয়েছিল, এখন ফতেচাঁদ সেই বিপদের মাঝখানে। দেহ মনের ক্লান্তি জয় করতে হবে তাকে।

আলিবর্দীর ওপর বিশ্বাস রেখে ভুল হয়নি তার। আলিবর্দী যোগ্য

নবাব। কিন্তু হাঙ্গামা যদি কোন উপায়ে মিটিয়ে ফেলতে পারত, তবে খুব ভাল হত। মেটানোর কোন উপায়ও নেই।

এতদিনকার অর্থনীতি ক্রমশ ভেঙে পড়ছে। সব চেয়ে ভাল করে বুঝতে পারে ফতেচাঁদ। ইংরেজরাও বোঝে। ওদের কাজ বন্ধ। কুঠি অচল। দাদন দেওয়া তাঁতি পলাতক। রেশমের গুটি খেয়ে মোটা হয় বর্গীদের ঘোড়া। কিন্তু এর চেয়ে আর বেশী কিছু জানে না ইংরেজ।

ফতেচাঁদ জানে আরো গভীরভাবে। প্রায় নিজের মুখের মত পরিচিত খেত থেকে কামারশালার আঁতি-পাঁতি। প্রতি বছর আসছে বর্গী। প্রতি বছর খেত বাড়ী ছেড়ে পালাচ্ছে কৃষক। চাষ আবাদ বন্ধ। বাজারে অগ্নিমূল্য জিনিষ। ভারতচন্দ্রের মালিনী সুন্দরের জন্য বাজার করতে গিয়ে টের পেয়েছিল, কী ভীষণ দর বেড়ে গেছে। দর বেড়েছে, অথচ জিনিষ নেই। উপার্জনও নেই।

যে কুঠির শিল্প নিয়ে এত বাড়-বাড়ন্ত, সেই শিল্পও প্রচণ্ড ধাকায় মুহ্যমান। রেশম শিল্প বিপন্ন। প্রতি বছর পার্শি, আরবী, তুর্কী, জর্জিয়ান, আরমানি বণিকরা আসত এদেশে। জাহাজ বোঝাই করে বাংলার পণ্য ও শস্য নিয়ে ফিরে যেত বছরের শেষে। এদেশে ব্যবসা চলত মালদ্বীপ থেকে পারস্য অবধি। হিসেব নিকেশে পাওনা হতো বাংলার। সোনা আসত ঘরে। বর্গীর হাঙ্গামায় সেই বাণিজ্য যে আঘাত পায়নি, তাও নয়। কিন্তু সব চেয়ে বড় ধাক্কা দিচ্ছে ইয়োরোপের সংগঠিত বণিকরা,—ইংরেজ ডাচ আর ফরাসী। ব্যাঙ্কার ফতেচাঁদ বেশ বুঝতে পারে এই ধাক্কার পরিণাম কি। কিন্তু উপায় নেই। যত দক্ষ ও বিচক্ষণ হোক আলিবর্দী, যত তীক্ষ্ণ ও বিত্তবান হোক জগৎশেঠ, ঘটনার লাগাম তাদের হাত থেকে ছুটে গেছে। তাই তারা আজ চালক নয়, চালিত।

কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। হাল ছেড়ে দেয়নি আলিবর্দী। বলে পারেনি, ছলে জব্দ করেছে মারাঠা দস্যু ভাস্কর পণ্ডিতকে। জানকীরাম আর মুস্তাফা খাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে দূত পাঠিয়েছিল আলিবর্দী ভাস্করের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করে। ডেকে এনেছে মারাঠা সেনাপতিকে মন করায়, নবাবের শিবিরে। ডেকে এনে হত্যা করেছে ভাস্করকে। পালিয়ে গেছে মারাঠারা। অন্ততঃ কয়েকমাস অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচা গেছে।

কিন্তু সৈন্যকে অনুগত রাখতে হবে। বিশেষ করে মুস্তাফা খাঁকে। মুস্তাফা ক্রমাগত পরাক্রান্ত হয়ে উঠছে। তার মুখের কথায় ওঠে বসে

আফগান সেনারা। ওদের বিশ্বাস করে না ফতেচাঁদ। মহিমাপুরের গদী লুট হবার পর থেকে ফতেচাঁদের সন্দেহ আরো বেড়ে গেছে। ওদের লক্ষ্য একমাত্র টাকা। ওরা সৈন্য নয়, ভাড়া করা গুণ্ডা। এ সময় ওদের হাতে রাখতে হবে। অনেক টাকার দরকার। প্রত্যেককে ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। হাসিমুখে যদি কেউ না ছাড়তে চায়, তবে জোর করে কেড়ে নিতে হবে। আদেশ দিয়েছে নবাব, প্রত্যেক ইউরোপীয় বণিককে নবাবী সৈন্যের ছ'মাসের মাইনে দিতে হবে। টাকার হিসেবে দাঁড়ায় নব্বুই লাখ। দিতে অস্বীকার করলে কুঠি বন্ধ করে দেওয়া হবে।

ইংরেজ কুঠিয়াল গিয়ে পড়লো মহিমাপুরে।

'নবাব আমাদের ওপর এত বিরূপ কেন?'

'বিরূপ নয় তো।'

'তবে এত টাকার দাবী? কি করে মেটাবো?'

'জানি না। তবে মেটাতেই হবে। তা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এখন ধর্ম নেই, ভগবান নেই, নীতি নেই। মাথা খারাপ হয়ে গেছে প্রায়। শুধু টাকা চাই। তা সে যেখান থেকে হোক, আর যেমন করেই হোক। আমিও কি কম দিয়েছি! তবু নিষ্কৃতি নেই।'

'কি করতে বলেন?'

'আমার কথা যদি মান, তবে এখুনি কলকাতায় লোক পাঠাও। যত তাড়াতাড়ি হয়, ততই ভাল। নবাবকে মোটা টাকা দেবার ব্যবস্থা করুক কাউন্সিল। দেরী করলে চলবে না। যত দেরী হবে, ততই বিপদ বাড়বে।'

দরবারে ডাক পড়লো ইংরেজ উকিলের।

নবাব বললে, 'বাদশা ফাররুকশের যখন বাণিজ্য করার ফর্মান দেয়, তখন কোম্পানীর জাহাজ বেড়ে গেছে। ব্যবসাও আগের তুলনায় অনেক ভাল। ফলে ফাররুকশেরের সময়ের পর আজ অবধি বাড়তি হারে কর দিতে হবে।'

এখানেও থামেনি নবাব। প্রস্তাব শুনে কিছু বলতে পারেনি উকিল। কিন্তু তখুনি ক্ষিপ্ত হয়ে নবাব আবার আরম্ভ করলে, 'আমি আগে থেকে জানতাম, ইংরেজরা বর্গীদের পক্ষে যাবে। আমি খবর পেয়েছি, ইংরেজরা বর্গীদের সাহায্য করছে। আমি কোন কথা বলিনি। আমি বুঝতে চেষ্টা করছিলাম, কোম্পানী যখন নবাবের শত্রুকে সাহায্য করতে এগিয়ে গেছে,

তখন নবাবকে কতটা সাহায্য করে দেখা যাক। এখন দেখছি ঘোড়ার এক গাছি বালাঞ্চিও দিতে হাত সরছে না। যাও, তিন দিন, সময় দিলাম। এর মধ্যে কলকাতা থেকে যদি কোন উত্তর না পাই, তবে বলে দিও, কলকাতা আর কাশীমবাজারের কুঠি বন্ধ হবে। আর তোমাদের মাথা নীচু করাবারও ব্যবস্থা করবো।'

খবর আসতে তিন দিনের বেশী লাগলো। কিন্তু নবাব আর কোন কথা বলেনি। কলকাতা থেকে নির্দেশ এসেছে যে, কুঠিয়াল চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ হাজারের ভেতর নবাবের সঙ্গে রফা করতে পারে।

প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছে উকিল শেঠবাড়ী। চিন্ময় রায়ও ছিল সেখানে। উকিল বলতে চাইলো যে নবাবের দাবীটা একেবারে অসঙ্গত। ক্ষতি শুধু মাত্র নবাবের হয়নি। তাদেরও হয়েছে। হাঙ্গামার জন্য কাজ কারবার বন্ধ।

ফতেচাঁদ বলেছে, 'অন্য সময় হলে কথা হতো। কিন্তু এখন কোন কথা চলতে পারে না। টাকার দরকার এবং তা যোগাড় করতেই হবে। নবাব শুধু মাত্র ইংরেজ কোম্পানীর কাছ থেকে টাকা নিচ্ছে না। বড়লোক, গরীব লোক, স্বদেশী বিদেশী সবাইকে টাকা দিতে হচ্ছে, হবে।'

তার পরে উকিল যখন অন্য প্রস্তাব নিয়ে আসে, ফতেচাঁদ জানিয়ে দেয় যে কোম্পানী খুব ভুল করেছে। পঞ্চাশ হাজার টাকার কথা নবাবের কাছে তোলা যায় না। আগের কয়েক ক্ষেত্রে যেমন দর দস্তুর করে টাকার অঙ্ক কমানো গিয়েছে, কোম্পানী যদি এবারও সেই আগের পথে যায়, তবে মারা পড়বে। এ নবাবের জাত আলাদা। আগের নবাবদের সঙ্গে এর রুচি প্রকৃতিতে কোন মিল নেই। এ ক্ষেত্রও আলাদা। ক্ষেত্র অনুযায়ী কাজ করতে হবে। আর সুজাউদ্দৌলার সময় তারই হাত দিয়ে কোম্পানী প্রায় দেড় লক্ষ টাকা উপহার দিয়েছে।

পঞ্চাশ থেকে বেড়ে যখন একলাখে পৌঁছালো কোম্পানী, তখনও ফতেচাঁদ ও চিন্ময় রায়ের সাহস হয়নি প্রস্তাবটা নবাবের কাছে নিয়ে যেতে। অন্যদিকে ডাচ ফরাসীরা বলেছে যে ইংরেজ কোম্পানী যত টাকা দেবে তারা ঠিক তত টাকাই দেবে নবাবকে। সুতরাং কম টাকায় রফা করা যায় না কিছুতেই।

নবাবের সঙ্গে কথা হয়েছে ফতেচাঁদের। অনেক কথাবার্তার পর নবাব ঠিক করেছে পঁচিশ লাখ টাকা নিতে হবে কোম্পানীর কাছ থেকে।

ওদিকে খবর নিয়েছে কোম্পানী যে নবাবের মন্ত্রীসভায় গোলমাল

বেধেছে। নরমপন্থীদের মত, টাকা যদি তুলতেই হয়, তবে একটু রয়ে সয়ে তোলা ভাল। চরমপন্থীদের মত একেবারে আলাদা। তারা চায়, যে কোন উপায়ে হোক টাকা ছিনিয়ে আনতে হবে। কোম্পানীর ভরসা মন্ত্রীসভার মতভেদ থেকে তারা বাঁচবার পথ খুঁজে পাবে।

কোম্পানী আর্জি পেশ করেছে নবাবের কাছে। নবাব পাঠিয়ে দিয়েছে ফতেচাঁদের কাছে। ফতেচাঁদ বলেছে যে সে নাচার। এত কম টাকায় কিছুতেই রফা হতে পারে না। এমন ঘোর দুঃসময় নবাবী আমলে কখনও আসেনি। কোম্পানী যদি টাকা দিতে টালবাহানা করে তবে রক্তারক্তি হবেই। কিছুতেই এড়ানো যাবে না। এমন কোন কথা নেই যে, সব টাকা কোম্পানীকেই দিতে হবে। হাঙ্গামার সময় অনেক বিত্তবান লোক উঠে গেছে কলকাতায়। সেখানে আরো অনেক ব্যবসাদার আছে। তাদের কাছ থেকে কোম্পানী তুলে দিক এই টাকা। কিন্তু অল্প টাকা নিয়ে বারবার তার কাছে এসে কোন লাভ হবে না কোম্পানীর।

পরের দিন সকালে নবাব ফতেচাঁদ আর চিন্ময়কে ডেকে পাঠালো। নবাব জিজ্ঞাসা করলে, 'ইংরেজদের সঙ্গে কোন বোঝাপড়া হয়েছে?'

উত্তরে ফতেচাঁদ জানালো, 'মিটমাট হবার কোন সম্ভাবনা দেখছি না। নবাব পঁচিশ লাখ টাকার নীচে নামবেন না। ওদিকে ইংরেজরা এক লাখের ওপরে কিছুতেই উঠবে না। এত তফাৎ মিলবে কি করে?'

কিছুক্ষণ নীরব থেকে নবাব বললে, 'ইংরেজরা যদি আমার কথা মেনে না নেয়, তবে আমি তাদের সমস্ত কুঠিগুলো ছারখার করে ফেলবো। আমার দরকারের সময় যদি এই সামান্য টাকা দিয়ে তারা সাহায্য না করে, তবে আমিই বা কেন তাদের সাহায্য করতে যাবো।'

ফতেচাঁদ তখুনি কুঠিতে খবর পাঠালো। 'তোমরা খুব ভুল করছো। এই টাকা নবাব নিজের জন্য চাইছে না। এই টাকা দিয়ে সৈন্যদের মাইনে মেটাতে হবে। তাদের ভেতর চাঞ্চল্য এসেছে। নবাব সে কথা ভাল করে জানে। তাই তাদের মাইনে যে কোন প্রকারে হোক মিটিয়ে দিতে হবেই। তোমরা যদি ভাল চাও, এমন কি নিজেদের প্রাণের ওপর কোন মমতা থাকে, তবে নবাবকে রাগিয়ো না।'

ইংরেজরা আর একটু এগিয়ে যেতে রাজী। চিন্ময় খবর পাঠালো কুঠিতে, নবাব আর একটা নতুন প্রস্তাব করেছে ফতেচাঁদের কাছে। সে ছাড়া আর কেউ জানে না। তার কাছে যাও একবার। তোমরা একটা কথা

বারবার ভুল করছো। এ ক্ষেত্র আলাদা, সময়ও আলাদা। আজ যুক্তি তর্কের কোন সুযোগ নেই। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, দেশে শাসন বলে কিছু নেই। মন্ত্রীসভা আছে নামেমাত্র। সেখানে কোন নীতি বা পথ আলোচনা হয় না। একমাত্র আলোচ্য বিষয় সেখানে, সৈন্যবাহিনীকে কি করে সন্তুষ্ট রাখা যায়। তাদের তোয়াজে রাখার জন্য আমরা যে কোন কাজ করতে রাজী।

চিন্ময় খুব সত্যি কথা বলেছে। হাজির সৈন্যরা যেদিন মহিমাপুরের গদী লুঠ করলো, সেদিন থেকে অনুভব করে আসছে জগৎশেঠ। আফগান সেনাপতি চোখ খুলে দিয়েছে নবাবের। নবাব বুঝতে আরম্ভ করছে যে তার মসনদ নির্ভর করছে সেনাপতিদের খেয়াল খুশির ওপর। ফতেচাঁদ বুঝেছে, এ ছাড়া কোন উপায় নেই। সেনাপতিদের রাখতে হবে হাতের মুঠোয়। অর্থ আর সম্মানের কাঙাল এরা। টাকা দিয়ে কিনে রাখা ছাড়া আর কোন পথ নেই। কিন্তু টাকা দিয়ে তোয়াজ করে সব সময় তাদের কিনে রাখা যায় না।

প্রমাণ তার মুস্তাফা খাঁ। মুস্তাফা শক্তি অর্জন করেছে। নবাবকে সে টলাতে পারে। মুস্তাফাকে ভয় করে সবাই। মুস্তাফা দাবী করেছে সতেরো লাখ টাকার। যে করেই হোক, মুস্তাফার সঙ্গে বিরোধ এড়িয়ে যেতে হবে এ সময়। মুস্তাফা ত এখুনি মহিমাপুরের গদী থেকে তার দাবী উশুল করে নিতে পারে। কি করতে পারে ফতেচাঁদ? বড় ঘোর দুঃসময়। মাণিকচাঁদ এমন অবস্থা কল্পনা করতে পারেনি। এমন দুর্বিপাকের ভেতর কখনও পড়েনি বাংলা দেশ, বাংলার মহিমাপুরের শেঠবাড়ী। ফতেচাঁদ অনুভব করে, রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে গিয়েও সে আজ রাজনীতির আবর্তে। আবর্তে পড়েও ভেবেছে বাঁচাবে শেঠ বাড়ী। ভারতজোড়া অসংখ্য গদী তার। এই তার লক্ষ্য। সেই লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য এই একমাত্র পথ। কোম্পানীর কাছ থেকে টাকা আদায় করতেই হবে। থামাতে হবে সৈন্যদের।

কোম্পানীও বোঝে এই কথা। মারাঠার আক্রমণে প্রত্যক্ষ ক্ষতি তাদের হয়নি এখনো। হবার সম্ভাবনা কম। মারাঠারা তাদের গায়ে হাত তুলতে সাহস পাবে না। ক্ষতি হয়েছে তাদের অন্যভাবে। সে ক্ষতি অপ্রত্যক্ষ। দেশের অর্থনীতির বিপর্যয় থেকে ক্ষতি হচ্ছে তাদের। এই সময় নবাবকে অকারণে উত্তেজিত করে ভয়াবহ ক্ষতি ডেকে আনা ঠিক নয়। কাশীমবাজারের

কুঠি স্থির করে, তারা নবাবকে দেবে তিন লাখ টাকা। কলকাতার অনুমতির অপেক্ষায় থাকলে হবে না। পরে অনুমোদন করে নিলেই চলবে।

বেশী দেরী করেনি কলকাতার কাউন্সিল। কুঠিয়াল জন ফষ্টরকে চার লাখ টাকা অবধি খরচ করার অধিকার দিয়েছে। ফষ্টর সাড়ে তিন লাখ টাকায় নবাবকে সন্তুষ্ট করেছে। পরোয়ানা নিয়ে ফতেচাঁদ এসেছে কুঠিতে। নবাবের দরবারে গিয়েছে ফষ্টর। অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেছে কুঠিয়াল। আর কোন আক্রোশ নেই নবাবের। বিপদ থেকে কোম্পানীকে বাঁচাতে পেরে খুশি হয়েছে ফতেচাঁদ নিজেও।

লিখে পাঠিয়েছে ফষ্টর: দরবারে বসে কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলার পর নবাব হঠাৎ ফতেচাঁদ আর চিন্ময় রায়কে ডেকে পাঠালো নিজের খাস কামরায়। বহু-ক্ষণ পরে তিন জনে আবার এলো দরবারে। নবাব বললে, 'আমার চর খবর পাঠিয়েছে এ বছর বর্ষার শেষেই মারাঠারা আরো বেশী সৈন্য নিয়ে বাংলা আক্রমণ করবে। আমি খুব তাড়াতাড়ি রাজধানীর বাইরে যাবো। কিন্তু আমার সৈন্যরা তোমাদের মত গোলাবারুদের ভাল ব্যবহার জানে না। তাই তোমরা যদি ত্রিশ কি চল্লিশ জন গোরা সৈন্য আর একজন সেনাপতি পাঠাও আমার কাছে, তবে বড় উপকার হয়। এদের সব খরচ খরচা আমার। তুমি যত মাইনে ঠিক করে দেবে, ততই দেবো। আর একটা কথা, আমার একটা আরবী ঘোড়ার দরকার।'

কোম্পানী নবাবকে আরবী ঘোড়া দিয়েছিল। কিন্তু সৈন্য দেয়নি। ১৬ই নভেম্বর, ১৭৪৪ সালে এই কথা হয়। ২৮শে ডিসেম্বর কাশীমবাজার কুঠি জানাচ্ছে কলকাতায়: ২৬শে সকালে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ মারা গিয়েছে। মহাতপ রায় এবং স্বরূপচাঁদ এখন জগৎশেঠের অগাধ সম্পত্তির অধিকারী। মহিমাপুরের গদীতে বসবে এরা। আমার মনে হয়, প্রেসিডেণ্টের কাছ থেকে একখানা পত্র মহিমাপুরে যাওয়া ভাল।

ফতেচাঁদের সমাধি দেওয়া হয়েছিল 'জগৎবিশ্রামে'। আজ আর সেই জগৎ বিশ্রামের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। লোকের মুখেও জানা যায় না, ঠিক কোথায় ছিল এই জগৎবিশ্রাম।

বাইশ

ফতেচাঁদের পর গদীতে বসলো মহাতপ রায় আর স্বরূপচাঁদ। ফতেচাঁদ নিজের চোখেই দুই ছেলের মৃত্যু দেখেছে। দুই নাতিকে দিয়ে গিয়েছে গদী। আনন্দচাঁদের ছেলের নাম মহাতপ রায়। দয়াচাঁদের ছেলে স্বরূপচাঁদ। আর ছিল দুই মেয়ে। দুজনেই দেখা শোনা করবে, মিলেমিশে থাকবে। সত্যিই ওরা এমন মিলেমিশে ছিল যে, লোকে জানতো মহাতপ রায়ই সর্বেসর্বা। স্বরূপচাঁদ সাহায্য করে মাত্র। কোম্পানীর কাগজপত্রে এবং চিঠিপত্রে মহাতপের নাম। মাঝে মাঝে স্বরূপচাঁদের নামও দেখা যায়। বড় দুঃসময়ে তারা গদী পেয়েছে। তাদের কাছে শেঠবাড়ীর দাবী খুব বেশী। বিবেচনার সঙ্গে কাজ করতে হবে। একটু ভুল হলে চোরা ঘূর্ণিতে চুরমার হয়ে যাবে নৌকো। দু ভাই তাই হুঁসিয়ার।

শেঠবাড়ীর অর্থ প্রচুর। এত অর্থ কল্পনা করা যায় না। প্রতিদিন কোটি টাকার লেনদেন হয় শুধুমাত্র মহিমাপুরের গদীতে। তা ছাড়া আরো কত গদী আছে তামাম ভারতবর্ষে। আরো কত গদীয়ান গ্রামে গঞ্জে ওদের টাকা নিয়ে কাজ কারবার করে। এ টাকার উৎস অনেক। এ শুধু প্রাক-ধনতান্ত্রিক লুণ্ঠন-জাত রত্নসম্ভার নয়। লুণ্ঠন যে ছিল না, তা নয়। টাকা ভাঙানোর কারবার অপ্রত্যক্ষ লুণ্ঠন ছাড়া আর কি? কিন্তু এই শেষ নয়। ব্যাঙ্কারের সত্যিকারের কাজ ক্রেডিট সৃষ্টি। সেই ক্রেডিট তারা তৈরী করেছে। অত বড় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যটা দাঁড়িয়েছিল শুধুমাত্র শেঠবাড়ীর ওপর ভর করে।

মহাতপ রায় আর স্বরূপচাঁদ মহিমাপুরের গদীর মালিক। কলকাতা থেকে কোম্পানীর প্রেসিডেণ্ট অভিনন্দন জানিয়ে পত্র লিখলো মহিমাপুরে। বাদশার দরবার থেকে স্বীকৃতি এল। পুরুষানুক্রমিক অধিকার থাকলো নবাবের দরবারে। নবাবের নতুন মন্ত্রী এরা। ফতেচাঁদের উত্তরাধিকারী।

ওদিকে অতৃপ্ত মারাঠা। বছরে বছরে আসে, আবার ফিরে যায়। আসা যেন নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। খোকা ঘুমোয়, পাড়া জুড়োয়, বর্গীরা আসে। এলে সেই পুরানো প্রশ্ন: কিসে খাজনা দেবে? দেবার কিছু নেই যে। বাংলার এক পাশে হাহাকার। অন্য পাশে নিষ্ফলা মাঠ।

ভাস্কর পণ্ডিত মারা গিয়েছে। বেঁচে আছে রঘুজী। বিদ্রোহ করে মুস্তাফা আমন্ত্রণ জানিয়েছে রঘুজীকে। সাড়া দিল রঘুজী। উড়িষ্যার নায়েব দুর্লভরাম নিজের দোষে বন্দী হয়েছে রঘুজীর হাতে। উড়িষ্যা মারাঠাদের। আলিবর্দী পাটনায়। সেখানে আফগান বিদ্রোহ চলছে। আলিবর্দী রঘুজীকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য সন্ধির প্রস্তাব পাঠালো। রঘুজী ঠকবে না। দাবী করলো, এক কোটি টাকার। দর করে নবাব। কথাবার্তা চলতে থাকে। নবাব সময় চায়। পাটনায় হেরে গিয়েছে মুস্তাফা। জগদীশপুরের যুদ্ধে মারা গিয়েছে। মৃতদেহ পাটনার তোরণে টাঙিয়ে রেখেছে সিরাজের বাবা, জইনুদ্দীন।

সময় পেয়েছে আলিবর্দী। শান্ত এখন পাটনা। বর্ষা প্রায় নামবো নামবো করছে। রঘুজী বর্ধমান বীরভূম দখল করে বসে আছে। আক্রমণ করলো আলিবর্দী। ভুল হয়েছে নবাবের। ভেবেছিল মুস্তাফার মৃত্যুর পর শান্ত হবে আফগান। কিন্তু হয়নি। নবাবের আফগান সেনাপতি সামসের বর্গীদের সঙ্গে চক্রান্তে জড়িত। থেমে যায় নবাব। আবার সন্ধির প্রস্তাব আসতেই বাতিল করে রঘুজী। মীর হাবিব বলে, 'চল সোজা মুর্শিদাবাদ।' মারাঠার গতি আন্দাজ করে নবাবের সৈন্যরা মুখ ঘোরায় রাজধানীর দিকে। কাটোয়ায় আবার নবাবের সঙ্গে বর্গীদের দেখা। কিন্তু খবর আসে, নাগপুরে বিদ্রোহ। বাংলা থেকে সরে যায় রঘুজী। তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে হবে নাগপুরে।

রঘুজী শান্ত। কিন্তু অশান্ত আফগান। বৃদ্ধ নবাব ক্লান্ত। যুদ্ধ করতে করতে বুঝি দেহ রাখতে হবে। বেগমসাহেবার সেবা ব্যর্থ হয়। শক্ত হাতে হাল ধরে থাকে মহাতপ রায়, আর স্বরূপচাঁদ। ফতেচাঁদের মৃত্যুর পর ভয় হয়েছিল নবাবের। নবাব এখন আশ্বস্ত। দেশের যা স্বাভাবিক রাজস্ব তা দিয়ে এতদিন এই দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালানো সম্ভব নয়। অস্বাভাবিক পথ তাকে নিতেই হয়েছে। নিজের সব কিছু গিয়েছে। স্বাভাবিক সময়ে সোনা রূপো মাটির তলায় পুঁতে রাখা রীতি। ওটা নাকি সঞ্চয়। অসময়ে কাজে লাগবে। অন্ততঃ এই বিশ্বাস দেশের মানুষের। ও সঞ্চয়ে কার লাভ? এই অসামাজিক ও তাৎপর্যহীন সঞ্চয় প্রথা বহুদিন ধরে চলে আসছিল বাংলা দেশে।

নবাবের অভাবের তাড়নায় সোনা রূপো ক্রমেই অদৃশ্য হয়েছে। গদী ছেড়ে অনেকে পালায়। এতদিনে কেউ হয়ত থাকতো না। কিন্তু ফতেচাঁদ সহায়।

আবার ফিরে এসেছে তারা। ফতেচাঁদের পর মহাতপ রায়। তারা বিশ্বাস করে। বিশ্বাস অবশ্য মহাতপকে নয়। বিশ্বাস তাদের মহিমাপুরের গদীকে। টাকা আসে।

অভাব হয়েছে নবাবের। কিন্তু অভাবের জন্য অভিযান ব্যর্থ হয়নি। টাকা যোগাড় করে মহাতপ। নবাব বলে, 'ভেল্কি। টাকার ভেল্কি ভাল করে শিখে নিয়েছে মহাতপ।'

শেঠবাড়ী নবাবের সৈন্যের টাকা যোগায়। বাজারে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনে। বাট্টা আর ধার দিয়ে জিইয়ে রাখে কারবার। আলিবর্দী যখন তলোয়ার খুলে ঘোড়া ছুটিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে শত্রুর ব্যূহে, মহাতপ আর স্বরূপ তখন ধীরভাবে হিসেব করে। অটুট রাখতে চেষ্টা করে বাংলার বিপর্যস্ত অর্থনীতি। যুদ্ধ করে দু'জনেই।

টঁ্যাকশাল আবার খোলা হয়েছে। টঁ্যাকশাল থেকে আয় প্রচুর। এতদিন খোলা হয়নি। ভয় ছিল। মুস্তাফার মৃত্যুর পর ভয় কিছু কমে গিয়েছে। ওদিকে কোম্পানী বহু অনুরোধ করেছে রূপো কেনার জন্য। ফতেচাঁদ রূপো কেনেনি। নবাবকে ধরে পড়েছিল ইংরেজরা। নবাবের অনুরোধে, কিনবে বলে কথা দিয়েছিল ফতেচাঁদ। কিন্তু কথা রাখতে পারেনি। বোধ হয়, জীবনে সেই প্রথম একবার কথার খেলাপ হয়েছিল ফতেচাঁদের। কোম্পানীর ধারণা তাই।

ওদিকে কোম্পানীরও টানাটানি। ক্রমাগত শেঠদের কাছে আসে, ধার নেয়। হাঙ্গামার পর থেকে নির্ভরতা যেন বেড়ে গিয়েছে। এখন ব্যবসার প্রায় অর্ধেক মূলধন যোগাতে হয় শেঠদেরকে। যোগাতে তাদের লোকসান নেই। বরং লাভ। কিন্তু এ সময় দু'দিকের খরচ চালানো সমস্যা।

রূপোর দর বাড়াতে অনুরোধ করেছে কোম্পানী। রাজী হয়নি মহাতপ। জগৎশেঠ ফতেচাঁদের বাঁধা দরে রূপো তুলে দিয়ে দেনার পরিমান একটু হালকা করেছে তারা। ঢাকায় শিক্কা টাকা নেই, আর্কট টাকা নেই। কোন গদীয়ানের সাধ্য নেই কোম্পানীর খাকতি মেটায়। তারা ধরে মহাতপকে। ঢাকায় টাকা যায়। কাজ চলতে থাকে।

কিন্তু কতদিনইবা। আবার ধারের জন্য আসে কোম্পানী। এক লাখ শিক্কা টাকা চাই। মহাতপ বলে, 'এ সময়ে অত শিক্কা টাকা এক সঙ্গে দেওয়া যাবে না বোধ হয়। যাই হোক, দেখি ঢাকার গদী থেকে কি করা যায়।'

কয়েকদিন পরে খবর পায় কাশীমবাজার, শেঠদের গদী থেকে সব শিক্কা টাকাই পাওয়া গিয়েছে।

শুধু একদিকের দাবী নয়। কাশীমবাজার পাটনা এবং ঢাকার কুঠির সব দাবী মেটাতে হত মহাতপকে। সব সময় দিতে পারেনি। দেরী হয়েছে মাঝে মাঝে। একবার মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা চাইলে মহাতপ জানালো যে, টাকা ছড়িয়ে আছে। দিতে মাস খানেক দেরী হবে। মাস যেতে না যেতেই অবশ্য কোম্পানী টাকা পেয়ে গিয়েছে।

কোম্পানী ক্রমাগত শেঠদের ওপর নির্ভর করছে। শুধু মাত্র এক বিলের ধার গিয়ে দাঁড়ালো সাড়ে তিন লাখ টাকায়। আদায় করার জন্য মহাতপের গোমস্তা কাশীমবাজারে গেলে কোম্পানী আরো পঞ্চাশ হাজার টাকা সুদ দেবে বলে কিছুদিনের সময় নিলে।

সময় নিলে আগে সুবিধে হত শেঠেদের অনেক বেশী। এখন টাকার একটু টানাটানি। বেশী দিন ফেলে রাখতে অসুবিধা হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে টাকার জন্য আসে বিল, হুণ্ডী, দর্শনী, নোট এবং টিপ। দিতে না পারলে বদনাম। মহাজনী কারবারে একবার বদনাম হলে রক্ষে নেই। তাই শেঠরা এবার আদায় করার জন্য একটু কড়া হয়। সুদ আর বাট্টায় তাদের লাভ। কোম্পানীর কাছে শতকরা ন'টাকা হারে সুদ নেয় আর বাট্টা নেয় শতকরা সাড়ে পনেরো টাকা হিসাবে।

ধারের অঙ্ক ক্রমশ বাড়ে। মাস খানেক যেতে না যেতে এক লাখ টাকা নিতে হল কাশীমবাজার কুঠিকে। আরো এক লাখ দরকার। কুঠিয়াল জানায়, কিন্তু মহাতপ টাকা দিতে দ্বিধান্বিত। টাকা যে তার নেই, তা নয়। টাকা আছে। তবে দিতে কুণ্ঠিত। এত টাকার কারবার হচ্ছে দেখে নবাবের দাবী আরো বেড়ে যাবে। বোধ হয় এইজন্যই মহাতপের ভয়।

এই সময় সত্তর বাক্স রূপো পৌঁছায় কলকাতায়। দাম হবে প্রায় পাঁচ লাখ টাকা। কলকাতা থেকে অনুরোধ আসে মহিমাপুরে। মহাতপ রায় যেন সমস্ত রূপোটাই কিনে নেয়, আর দু'লাখ টাকা আগাম দেয়। এক লাখ পাঠাতে হবে ঢাকায় আর এক লাখ কলকাতায়। দেশের অবস্থা খুব খারাপ। এ সময় মুর্শিদাবাদে এত রূপো পাঠানো নিরাপদ নয়। তাই কিনতে হবে কলকাতা থেকেই।

নিরাপদ নয় জেনেই মহাতপ জবাব দেয় যে, দু'লাখ টাকা পাঠাতে কোন আপত্তি নেই। তবে ঢাকার বিলে শতকরা এক টাকা মজুরী দিতে

আর রূপোর দর হবে মুর্শিদাবাদের দরে। রূপো আনতে প্রায় মাস খানেক সময় লাগবে। সুতরাং বিল করা হবে রূপো কাশীমবাজার ঘাটে পৌঁছানোর পরের দিন থেকে।

চিঠি পড়ে কলকাতার কাউন্সিল অবাক। আগে ঢাকার বিলে শতকরা এক টাকা বাট্টা কখনো নেওয়া হয়নি। ঢাকার গদী আর মহিমাপুরের গদী এক। সুতরাং দু জায়গার বাট্টা নিত না ফতেচাঁদ। কাউন্সিল জানালো, 'মহাতপকে বলে দিও, এমন ব্যবহার আমরা আসা করিনি। তা সত্বেও সে যদি এক টাকা হারে বাট্টা চায়, দিতেই হবে। কিন্তু রূপো কেনার পরে যদি এক মাস সময় চায়, তাহলে আমরা দিতে পারবো না।'

বর্গীর বার্ষিক হাঙ্গামা গা সওয়া হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে। ক্ষতি ও অত্যাচারের অন্ত নেই। কিন্তু ভয়টা কমে এসেছে। এখন প্রায় মেনে নিয়েছে প্রজারা যে বছরে বছরে বর্গী আসবেই। বছর বছর তাদের পালিয়ে থাকতে হবে বনে জঙ্গলে। যে তিন চার মাস সময় হাতে পাওয়া যায়, তারি মধ্যে খেতখামার গুছিয়ে রাখতে হবে। জমিদারের কড়ি মেটাতে হবে। ধরা পড়লে যথাসর্বস্ব দিয়ে বর্গীকে শান্ত করতে হবে। নিরুপায় হয়ে ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে প্রজারা। শহরের অবস্থা এখন অনেক শান্ত। পরিমিত কাজ কারবার। ধার বাকি রাখতে চায় না কেউ। নগদ বিদায় চায় সবাই। এমন কি শেঠরাও।

১৭৪৮ সালে আফগানরা যখন বিহারের শাসনকর্তা জইনুদ্দীনকে খুন করে হাজি আহম্মদকে বন্দী করলো, তখন পরিমিত কারবারও উঠে গেল প্রায়। উত্তেজনা কমতে না কমতে খবর এল, আফগানরা মারাঠাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে মুর্শিদাবাদের দিকে আসছে।

শহর ছেড়ে লোক পালায় উর্দ্ধশ্বাসে। পুরানো ভয় দ্বিগুণ হয়ে চেপে ধরে। ন্যাড়া মাথা দূর থেকে দেখলেই হাত পা হিম হয়ে আসে মেয়েদের। শহরের ভয় গ্রামে আসে চতুর্গুণ হয়ে। শহর গ্রাম সবই খালি।

গঙ্গারাম লিখছে :

> চাইর দিগে লোক পালাএ এত ঠাঞি ঠাঞি।
> ছত্রিশ বর্ণের লোক পালাএ তার অন্ত নাই॥
> এই মতে সব লোক পলাইয়া যাইতে।
> আচম্বিতে বরগী ঘেরিল আইসা সাথে॥

মাঠে ঘেরিয়া বরগী দেয় তবে সাড়া।
সোনা রূপা লুটে নে এ আর সব ছাড়া॥
কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
একি চোটে কারু বধ এ পরাণ॥
ভাল ২ স্ত্রীলোক যত ধইরা লইয়া যাএ।
আঙ্গুষ্টে দড়ি বাঁধি দেয় তার গলাএ॥
একজনে ছাড়ে তারে আর জনা ধরে।
রমনের ভরে ত্রাহি শব্দ করে॥
এই মতে বরগী কত পাপ কর্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রীলোক যত দেয় সব ছাইড়া॥
তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাধাএ।
বড় ২ ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ॥
বাঙ্গলা চেউ আরি যত বিষ্ণু মোণ্ডব।
ছোট বড় ঘর আদি পোড়াইল সব॥
এই মতে যত সব গ্রাম পোড়াইয়া।
চতুর্দ্দিগে বরগী বেড়াএ লুটিয়া॥

এ ত এক বছরেই শান্ত হবার নয়। বছরের পর বছর একই ইতিহাস। বছরের পর বছর হয়ত একই কথা লিখতো গঙ্গারাম। বর্গীর নাম শুনলে তাই চমকে উঠতো বাংলার লোক।

জইনুদ্দীনের মৃত্যুর সঠিক খবর আমানীগঞ্জের সেনানিবাসে পেয়ে নবাব কথা বলতে পারেনি। এর চেয়ে আর কত জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা থাকতে পারে? ভাবছিল একদা-বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দী।

মারাঠাদের সঙ্গে চক্রান্ত করার পরই নবাব আফগান সেনাপতি সামসের ও সরদার খাঁকে তাড়িয়ে দিয়েছিল সেনাবাহিনী থেকে। আফগান সেনাপতিরা বিহারে গিয়ে বাস করতে আরম্ভ করলো। বিহারে এতগুলো সুশিক্ষিত আফগান সেনার আবির্ভাবে জইনুদ্দীন একটু ভীত। আফগানরা সেনাপতির খুব ভক্ত। সেনাপতির নির্দেশে প্রাণ দিতে পারে তারা। জইনুদ্দীন বিহার থেকে তাদের তাড়িয়ে দিতে পারে না। তাড়িয়ে দিতে গেলে যুদ্ধের বিপদ আসতে পারে। জইনুদ্দীন তাই নবাবকে লিখেছিল যে, সে এই আফগানদের চাকরী দিতে চায়। তাহলে তারা বাধ্য থাকতে পারে।

কিন্তু বিহারে এমনিতে চার হাজার সেপাই আছে। তাদের মাইনে দিতে রাজস্ব ফুরিয়ে যায়। তার ওপর এত আফগান সেনার মাইনে দেওয়া অসম্ভব। তাই নবাব যদি বাংলা থেকে এদের মাইনের টাকা পাঠিয়ে দেন তবে ভাল হয়।

নবাব সন্দেহ করেছিল আগে থাকতে। কিন্তু আফগানদের চটাতে চায়নি। রাজী হয়েছিল।

নবাবের সম্মতি পেয়ে কাজে হাত দিয়েছে জইন্‌উদ্দীন। সামান্য আপত্তির পর রাজী হয়েছে আফগানরা। ওদের মনে যাতে কোন সন্দেহ না থাকে, সেজন্য জইন্‌উদ্দীন নিজে গিয়ে গঙ্গার ওপার থেকে এপারে এনেছে। কথা হল, পরের দিন দরবারে দেখা হবে।

সময় মত হাজির হল আফগানরা। দরবারের উঠোনে দাঁড়ালো বন্দুকধারী আফগান। সামসের খাঁও হাজির। নবাব উঠে পান বিতরণ করে আপ্যায়ন করতে যাবে, এমন সময় এসে পড়লো আফগানের তলোয়ার। সরে গিয়ে আঘাত বাঁচালো জইন্‌উদ্দীন। কিন্তু নিজের তলোয়ার খোলার আগেই তার মাথা খসে পড়লো মাটীতে।

প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে আফগান সৈন্য। নবাবী সৈন্যরা হেরে গিয়েছে। হাজি আহম্মদ বন্দী। গুপ্ত অর্থ বার করে দেবার জন্য তার ওপর অত্যাচার করেছে সামসের। সতেরো দিন কথা বলেনি হাজি। আঠারো দিনের দিন বলেছিল কোথায় আছে গুপ্তধনের ঘর। প্রচুর অর্থ পেয়েছে আফগানরা। অত্যাচারের পর আর বাঁচেনি হাজি।

অত্যাচারের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য পাটনার লোকজন চাঁদা করে টাকা তুলে সন্তুষ্ট করেছে আফগানদের।

বর্গীরা তখন বর্ধমানে। বিহার এখন আফগানদের। একাত্তর বছরের বুড়ো নবাব আবার ঘোড়ায় জিন চড়ালো। কোরাণ হাতে করে শপথ করলো নবাবী সৈন্যরা। তারা নবাবের জন্য প্রাণ দেবে।

নবাব এগিয়ে গিয়েছে সৈন্য নিয়ে। রাজধানী থেকে পঁচিশ মাইল যেতে না যেতে বেঁকে বসলো সৈন্যরা। মাইনে দিতে হবে এখনই। তাছাড়া এক পাও চলবে না তারা। চুপ করে থাকলো নবাব। ডাক পড়লো মহাতপের।

ওদিকে ইংরেজ কোম্পানী টাকার জন্য বড়ই তাগিদ দিচ্ছে। ঢাকার কুঠি বন্ধ হবার উপক্রম। কিন্তু ধার শোধ করার ব্যাকুলতা খুব কম। আগে

রীতি ছিল যে বছরের শেষে সব হিসেব নিকেশ হবে। বছরের স্থদ যোগ করা হত না আসলের সঙ্গে। আসলটা হয়ত পড়ে থাকতো। কিন্তু স্থদ আদায় হত বছর বছর। আজকাল কোম্পানী বছরের শেষে স্থদ মিটিয়ে দেয় না। স্থদটা আসলের সঙ্গে যোগ করে নতুন কর্মের খত দেয়।

যা রূপো আছে তাই দিয়ে ধার মিটিয়ে দেওয়া যেত। তাহলে ব্যবসা হয় না। বাধ্য হয়েই রূপো বিক্রী করতে হয় কোম্পানীকে। কেনে শেঠেরা। এই সময় কয়েক বাক্স রূপো এল কলকাতায়। খবর এল মহিমাপুরে। মহাতপ পুরাণো দরে রূপো কিনতে রাজী হল।

কিন্তু এরপরই পাটনার ঘটনা। ভীত হয়ে পড়লো শেঠেরা। চিঠি লিখে কলকাতায় জানালো যে, তারা কোম্পানীর শুভ কামনা করে। ব্যবসা যাতে বন্ধ না হয়, সে দিকেও আমাদের নজর আছে। রূপো কেনার পাকা কথা তারা দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু কথা এবারের মত রাখা গেল না। পাটনার ঘটনার পর আর সাহস হচ্ছে না। শহর প্রায় জনশূন্য। যে যেদিকে পারে পালাচ্ছে। আমিও ভাবছি দরবার থেকে ছুটি নিয়ে অন্য কোথাও যাবো। নবাবকেও জানিয়ে দিয়েছি। ট্যাঁকশাল এখন বন্ধ। মজুত টাকার পরিমান কম। অবস্থা একটু পরিষ্কার না হলে কিছু করতে পারবো না।

নবাব মুর্শিদাবাদ থেকে চলে গিয়েছে। টাকা নেই। সকলের কাছ থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে সামান্য টাকায় সৈন্যদের কোনক্রমে বোঝানো গিয়েছে মাত্র। এবার অনেক টাকা দিয়েছে ঘসেটি বেগম। মোতিঝিলের ধনদৌলত তাতে কমেনি একটুও। মহাতপ ভেবেছিল আপাততঃ ওতেই চলে যাবে। কিন্তু পঁচিশ মাইল যেতে না যেতেই বিপদ ফুঁসিয়ে উঠলো। মাইনে না পেলে এক পাও নড়বে না সৈন্যরা।

বিপদে পড়ে নবাব এল শেঠদের কাছে। শেঠদের সাড়া দিতে হবেই। এ প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। চরম বিপদের সময় মহাতপ গদী থেকে এক কথায় পাঠালো ত্রিশলাখ টাকা। সৈন্যরা শান্ত হয়ে ছুটলো পাটনার দিকে। ডিসেম্বরের মধ্যে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে নবাব ফিরে এল রাজধানীতে।

তেইশ

একটু বিশ্রাম পেয়েছিল আলিবর্দী। দিল্লীর বাদশা মুহম্মদ শাহের মৃত্যু হয়েছে। সিংহাসনে বসেছেন আহম্মদ শাহ।

১৭৪৮ সাল। বাদশার ফর্মানে মহাতপ রায় জগৎশেঠ আর স্বরূপচাঁদ মহারাজ। আনুষ্ঠানিক সমারোহ হয়েছিল। দিল্লী থেকে এসেছিল বাদশাহী খেলাৎ। কিন্তু সমস্ত অনুষ্ঠানই নিষ্প্রাণ। বাংলার অবস্থা সংকটজনক। দেশে অশান্তি। প্রজারা ভীত, সন্ত্রস্ত। নবাব বিপদাপন্ন, ঋণী।

দিল্লীর অবস্থা আরো খারাপ। ফাররুকশের এমন কি মুহম্মদ শার রাজত্বের প্রথম দিকে যে গৌরব ও আড়ম্বর দিল্লীর জীবনকে জৌলুষ যোগাত, আজ ভীষণ ফ্যাকাসে। নাদির শাহের আক্রমণের পর হৃত-গৌরব সিংহাসন স্মৃতিজীবি। অতীতের ছায়ার নীচে অসহায় বাদশা সময়ের চরম আঘাতের জন্য অপেক্ষা করছে। শাহানশাহ নামমাত্র ফর্মান দিল। গ্রহণ করেছিল মহাতপ রায় আর স্বরূপচাঁদ। আনন্দিত হয়েছিল নবাব, বেগমসাহেবাও। যারা অর্থ ফেলে সুতীর মুখের ভাগীরথী বুঁজিয়ে দিতে পারে, তাদের জগৎশেঠ উপাধি ত প্রাপ্য। মহিমাপুরে এই উপলক্ষ্যে তবু উৎসবের ত্রুটি হয়নি।

উৎসবের আয়ু অল্প। খুব তাড়াতাড়ি আলো নিভে গেল। বর্গীর হাঙ্গামা মেটেনি। আফগানরা উপস্থিত শান্ত। কিন্তু অশান্ত নবাবের পরিবার। মহিমাপুরের সঙ্গে ইংরেজদের বন্ধুত্বের মাঝখানে সন্দেহের ছায়া। ব্যবসাদারের বন্ধুত্ব স্বার্থের বনিয়াদের ওপর দাঁড়ায়। পরস্পরকে চেনে স্বার্থের আলোয়। শেঠদের সঙ্গে ইংরেজদের সম্পর্ক ব্যবসায়ী স্বাভাবিকতার ব্যতিক্রম নয়।

নবাব বিপর্যস্ত হলেও বুদ্ধিতে তীক্ষ্ম। দাক্ষিণাত্যে ইংরেজদের কীর্তিকলাপ তার জানা। চারদিকে শিক্ষিত গুপ্তচর। দক্ষিণ ভারতের ঝড়ের গতি বুঝতে দেরী হয়নি। বিদেশী কোম্পানীর ওপর নজর ছিল সব সময়েই। করোমণ্ডল উপকূলের কাহিনী তাকে বিরক্ত করত। নবাব জানতো, ওদের ওপর থেকে নজর সরিয়ে নিলে বাংলাদেশেও একই অবস্থার সৃষ্টি হবে।

নবাবের কানে এল যে ইংরেজ আর ফরাসীরা কলকাতা আর চন্দননগরের

দুর্গ সংস্কার করতে আরম্ভ করেছে। তখুনি হুকুম দিল নবাব, 'কাজ বন্ধ কর। তোমরা ব্যবসাদার। দুর্গ তৈরী করে কি করবে? আমি তোমাদের নবাব। আমার অধীনে তোমরা আছ। তোমাদের রক্ষে করব আমি নিজে।'

ক্ষমতার ওপর নবাবের আসক্তি একটু প্রবল। ইয়োরোপীয় বণিকদের বেলায় ক্ষমতার প্রকাশ মাঝে মাঝে নিরপেক্ষভাবেই প্রখর হয়ে পড়ত। বাদশাহী ফর্মানের দোহাই পাড়লে রাগের মাত্রা চড়ত শুধু। ইংরেজ ফরাসীরা তখন হয় আরবী ঘোড়া দিয়ে, নয় পারস্যের বেড়াল দিয়ে তোয়াজ করত নবাবকে।

কিন্তু নিরপেক্ষ ও কঠোর থাকার জন্যই করোমণ্ডল হয়ে ওঠেনি ভাগীরথীর দুই পাড়। নবাব জানতো যে, দেশের স্বার্থের জন্যেই ইয়োরোপীয় বেনেদের থাকা দরকার। যদিও ফর্মানের দৌলতে নবাব লোকসানের পরিমান সম্পর্কে একেবারে অনবহিত নয়। তবু তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে চায়নি। নবাব ইয়োরোপীয় বেনেদের বলত, মৌচাক। বলত, মধুর দরকার হলে বার করে নাও। কিন্তু খবরদার, অকারণে খুঁচিয়ো না।

অকারণে খোঁচাতে চায়নি নবাব। কিন্তু ১৭৪৮ সালে ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠলো।

১৭৪৮ সালে ক্যমেণ্ডার গ্রিফিন বঙ্গোপসাগরে আরমানি আর মোগল বণিকদের জাহাজ লুটপাট করে। তারা নবাবের কাছে বিচার প্রার্থনা করে। নবাব তখুনি কলকাতার কাউন্সিলের বড় সাহেব বারওয়েলকে পরোয়ানা পাঠায়।

নবাব লিখেছে: হুগলীর সৈয়দ, মোগল আর আরমানি বণিকরা অভিযোগ করেছে যে, তোমরা তাদের জাহাজ লুটপাট করেছ। তোমরা নাকি বলেছ যে ফরাসীদের সঙ্গে তোমাদের লড়াই চলছে। তাদের জাহাজকে তোমরা নাকি ফরাসীদের জাহাজ বলে ভুল করেছিলে। অ্যন্টনী নামে এক মহাজন আমার জন্য নিয়ে আসছিল বহুমূল্য উপহার। তোমরা তাও কেড়ে নিয়েছ। এই বণিকরা আমার রাজত্বের কল্যাণকামী বন্ধু। এদের গুরুতর অভিযোগ উপেক্ষনীয় নয়।

কোম্পানীকে ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছি। দস্যুবৃত্তি করার অধিকার তাদের দিইনি। সুতরাং আমার এই আদেশ পাওয়া মাত্র বণিকদের জিনিষপত্র ফিরিয়ে দেবে। আমার উপহার আমাকে পৌঁছে দিতে হবে।

আদেশ অমান্য করলে আমি এমন শাস্তির ব্যবস্থা করবো যা কোনদিন তোমরা কল্পনাও করতে পারো না।

বিলেতের আদেশেই কোম্পানী গ্রাহ্য করেনি নবাবের এই আদেশ। নানা অজুহাত দেখিয়েছে। তৃপ্ত হয়নি নবাব।

নবাবের আদেশে দেশের প্রায় সব কুঠিতেই সেপাই গিয়েছে। বাইরে পাহারা বসেছে। যেখানে কুঠির ক্ষমতা বেশী, সেখানে অবরোধ অবধি হয়েছে। ঢাকা এবং মালদার অবস্থা আরো খারাপ। গোমস্তা দালাল এমন কি মুদিখানার দোকানদারদের মুচলেকা দিতে হয়েছে যে, তারা ইংরেজদের কাছে এক কড়ির জিনিষ বিক্রী করবে না। অনাহারে থেকে কুঠির মধ্যে বিদ্রোহ হবার উপক্রম। কুঠি থেকে শাসানো হল, যদি তাদের মরতেই হয়, তবে অনাহারের চেয়ে যুদ্ধ করতে করতে মরবে তারা।

বর্গীর হাঙ্গামা, আফগান বিদ্রোহ, পারিবারিক অশান্তি নিয়ে বৃদ্ধ বিব্রত নবাব যে এতদূর এগোতে সাহস করবে, তা কল্পনাও করতে পারেনি বারওয়েল সাহেব। ভেবেছিল, আরমানিদের সান্ত্বনা দেবার জন্য নবাবের এই চোখ রাঙানি। আগের মত আরবী ঘোড়া দিলেই চলে যাবে। ঘোড়া এল আস্তাবলে। হয়ত সেই ঘোড়ায় নবাব চড়েও ছিল। কিন্তু রাগ পড়েনি।

কোম্পানী আরো অবাক হল। এই বিবাদ নিষ্পত্তি করার ভার এবার জগৎশেঠের ওপর পড়েনি। হুকুম বেগ আর কুলি বেগ দায়িত্ব নিয়েছে।

ব্যাপারটা বোঝার জন্য কুঠিয়াল এসেছে মহিমাপুরে। প্রথমে দেখা করতে চায়নি মহাতপ। শেষে দেখা অবশ্য করেছিল। কিন্তু কোন ভনিতা না করে জানিয়ে দিয়েছে যে, এ ব্যাপারে কোম্পানীর হয়ে কোন কথা নবাবের কাছে বলতে তারা অপারগ। হুকুম বেগ আর কুলি বেগ হয়ত কিছু করতে পারে।

শেঠবাড়ীর সঙ্গে এতদিনের কারবার ইংরেজদের। লাখ লাখ টাকার লেনদেন। দরবারে ইংরেজদের পক্ষে কথা বলা তাদের যেন অধিকার। তাই এই আকস্মিক রূঢ় ব্যবহারে বিচলিত হল কুঠিয়াল। কাশীমবাজার কুঠির সামনে সেপাই। যে কোন সময়ে লুট হতে পারে নবাবের আদেশে। বিপদে পড়লো কুঠিয়াল।

পরের দিন শেঠবাড়ীর বড় গোমস্তা রুইদাস হাজির হল কুঠিতে।

তাগাদা দিতে এসেছে। ধার হয়েছে প্রচুর। টাকা এই বাজারে আর ফেলে রাখা সঙ্গত নয়। এক ঢাকার কুঠির জন্য ধার পড়েছে ছ'লাখ টাকা, আর কাশীমবাজার কুঠির ধার সাড়ে পাঁচ লাখ। টাকা তাদের মেটাতেই হবে।

ব্যবসাদারের মত কথা বলে শেঠরা। ব্যবসার নীতি থেকে তারা তিন পুরুষের কেউ একচুল নড়েনি। ইংরেজ ফরাসীর ঝগড়া। ধার দু'জনের। ফরাসীদের ধার আরো বেশী। পঞ্চাশ লাখ ছাড়িয়ে গিয়েছে প্রায়। যুদ্ধে কে হারে কে জেতে তার ঠিক নেই। টাকা মারা যাবার সমূহ সম্ভাবনা। সুতরাং কড়া তাগাদা দিতেই হবে।

দেশ জুড়ে টাকার টানাটানি। ছোট মাঝারি গদীয়ানরা সমস্ত দাবীর মোটামুটি একটা অংশ মেটাত। অল্প টাকার জন্য কেউ আসত না মহিমাপুরে। গ্রামে গঞ্জে তাদের দালালরা কাজ কারবার বন্ধ করে দিয়েছে ভয়ে। ভয় ঘরে বাইরে। ঘরে নবাবী সৈন্য, পেয়াদা। বাইরে বর্গী। টাকা কড়ি পুঁটলি বেঁধে তাই তারা বসে আছে গঙ্গার ওপারে, ঢাকায়। চাপ এখন তাই খুব বেশী।

আয় অবশ্য কমেনি। কিন্তু ট্যাকশাল খোলা থাকলে আয় আরো হতে পারতো। সুযোগ থাকতেও সুযোগের ব্যবহার করতে পারেনি শেঠেরা। ক্ষোভ তাই মাঝে মাঝে পাকিয়ে ওঠে। ট্যাকশাল থেকে আয়ের পরিমান কম নয়। বছরে খুব কম টাকার কারবার হলেও ফেলে ছড়িয়ে পঞ্চাশ লাখ উঠে আসে। অন্তত স্ক্রাফটন সাহেবের এই মত। নবাবকে করও দিতে হয় নামমাত্র। শতকরা আট আনা। একেবারে নতুন শিক্কা টাকা তৈরী করার চেয়ে বরং পুরানো শিক্কাকে নতুন শিক্কা করায় লাভ বেশী। রূপো খুব কম যায়। কাজের মধ্যে কাজ টাকার ওপর নতুন শিক্কার মোহর মারা। মোনায়াৎ থেকে শিককায় আয় তাই প্রচুর। দেশের লোকের কাছ থেকে এই অপ্রত্যক্ষ কর আদায় করা আদপে বন্ধ হয়নি। কিন্তু বারো মাস ত আর ট্যাকশাল খোলা রাখা যায়নি। শেঠরা তাই একটু চঞ্চল।

তার ওপর যুদ্ধ আছেই। মারাঠাদের সঙ্গে লড়াই করতে করতে শুধু মাত্র নবাব আলিবর্দী নাজেহাল হয়নি, হয়েছে শেঠরাও। বহু টাকা দিতে হয়েছে তাদের। আরো দিতে হবে। না দিয়ে উপায়ও নেই। চিন্ময় রায় কোম্পানীর উকিলকে ঠিক কথাই বলেছিল। 'অন্য সব নবাবদের চেয়ে এদের

জাত আলাদা। না দিলে কেড়ে নেবে। নবাবের সঙ্গে বিশ্বাস এবং বন্ধুত্বের সম্পর্ক থাকলেও মোগল যুগের মনোবৃত্তি থেকে মুক্তি পায়নি এরা। পোষাকের তলায় বর্ম থাকবেই।'

যদিও নবাবকে ধার দিয়ে তাদের লাভ। তবু লোকসানেরও ভয় আছে। নবাব নিজের খাতে প্রচুর ধার করেছে। অকাতরে ধার দিয়েছে শেঠরা। কেননা তারা জানে, হাঙ্গামা মিটলেই শোধ দিতে নবাবের খুব অসুবিধে হবে না। সুদে আসলে উঠে আসবে।

জমিদাররা তাদের সেরেস্তায় টাকা জমা দেয়। খাজনার টাকা। খাজনার পরিমান বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু হাঙ্গামার জন্যে সবাই আদায় করতে পারে না প্রজাদের কাছ থেকে। শুধুমাত্র খাজনা নয়। আরো কর চাপানো হয়েছে, নতুন আবোয়াব। নাম তার চৌথ মারাঠা। এ টাকার পরিমানও কম নয়। বছরে সাড়ে পনেরো লাখ টাকা। সাড়ে পনেরো লাখ টাকার আবোয়াব আর তার ওপর স্বাভাবিক রাজস্ব নবাবের খাতে জমা পড়ে শতকরা দশ টাকা কাটার পর। ওটা শেঠদের মজুরী। রেওয়াজ এই যে নবাবকে যা-ই দেওয়া হবে তা যদি শেঠদের গদীর মারফৎ যায়, তবে মজুরী দিতে হবে শতকরা দশ টাকা।

ইতিমধ্যে লুটও হয়ে গিয়েছে। মীর হাবিব নিয়েছে, নিয়েছে হাজির সৈন্যরা। তার জন্যে কম নত হতে হয়নি এমন আত্মম্ভরী নবাবকে। হিসেবে দেখা যায় যে, ফতেচাঁদের সময়ের তুলনায় আয় তাদের কম নয়, বরং বেশী। ফতেচাঁদের ঐশ্বর্য লোককে মুগ্ধ করেছিল, মহাতপের ঐশ্বর্য চোখ ধাঁধায়। যুদ্ধ মানে ব্যবসা। আয় বৃদ্ধি যুদ্ধের জন্যও কিছুটা হয়েছিল বৈকি।

কিন্তু আয় ব্যয়ের হিসেব রাখতে হবে। সে সময় ব্যবসা বলতে বোঝাত, কম দামে কেনো, চড়া দামে বেচো। ব্যবসার এই সহজ আদিম রীতি বেশ দীর্ঘদিন ছিল কোম্পানীর মন্ত্র। শেঠরা তখন বলত, টাকা নাও, সুদ দাও। আসল থাক, সুদ চাই, বাট্টা চাই।

ইংরেজরা সুদও দিতে চায় না এখন। অথচ প্রতিদিন টাকা ধার করতে আসে। ওদের ব্যবসা আবার একটু রহস্যজনক। কে যে কখন কোম্পানীর হয়ে ধার নেয়, আর কখন যে নিজের ব্যবসার জন্যে নেয়, তা বোঝা বেশ দুষ্কর। ফতেচাঁদ দুবার এই বিপদে পড়েছে।

সম্প্রতি এই বিপদে পড়েছে আবার মহাতপ। ঢাকার কুঠিয়াল ধার করেছিল। মারা গিয়েছে এখন। কোম্পানী তার ঋণ ঘাড়ে পাততে চায় না।

বলে, 'ও টাকা কুঠিয়াল নিয়েছিল তার নিজের ব্যবসার জন্যে। সুতরাং তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। কোম্পানী ওই ধার শোধ দেবে না।'

গোমস্তা দাবী করলো যে, কলকাতার কুঠিতে নতুন রূপো এসেছে। টাকা না থাকলে, রূপো বিক্রী করে শোধ করতে হবে।

রূপো এসেছিল। অস্বীকার করতে পারেনি কুঠিয়াল। কলকাতায় তাই চিঠি লিখলো যে রূপোর বেশ মোটা অংশ আশা করে শেঠরা। তা ছাড়া, ওরা খুশি না হলে নবাবের সঙ্গে ঝগড়ায় কিছুতেই আমাদের পক্ষে আসবে না। শেঠদের হাতে রাখতেই হবে। ব্যবহার করতে হবে ওদের প্রভাব প্রতিপত্তি। হুকুম বেগ তাগাদা দেয় প্রায়ই।

কলকাতা থেকে জবাব এল, সামান্য রূপো এসেছে। শেঠদের দিয়ে দিলে কোম্পানীর ব্যবসা একেবারে বন্ধ হবে। আশা করা যায়, খুব তাড়াতাড়ি আরো রূপো আসবে। তখন শেঠদের দিতে কোন অসুবিধে হবে না। মহাতপ যেন ভুল না বোঝে।

কলকাতার উত্তরে খুশি হতে পারেনি শেঠরা। কোম্পানীর অনুরোধে সাড়া দেয়নি। কথা উঠলে বলে, 'এ ব্যাপারে হাত দিতে অক্ষম।' নবাবের কাছে উকিল গেল, সাহেব গেল। কোন সুরাহা হয়নি। হুকুম বেগ আর কুলি বেগ বাগে পেয়েছে কোম্পানীকে। সহজে ছাড়বার পাত্র নয় তারা।

মাসখানেক পরে নতুন জাহাজ এলো। কুঠি থেকে চিঠি গেল জগৎশেঠের দেনার কিছু দিয়ে দেবার জন্য। কুঠিয়াল আশা করেছিল যে টাকা পেলে জগৎশেঠ আগের মতই তাদের ব্যাপারটা মিটিয়ে দিতে চেষ্টা করবে।

সতেরো বাক্স রূপো উঠলো মহিমাপুরের গদীতে। তবু নতুন কথা বলেনি মহাতপ। আগের মত জবাব দিল এবারও। 'এ ব্যাপারে কোন কথা বলতে আমরা অক্ষম।'

অক্ষমতার কোন কারণ দেখায়নি মহাতপ। হয়ত আলিবর্দীকে ভালভাবে চিনতো বলেই কথা বলেনি। হয়ত বুঝেছিল নবাব শুধুমাত্র টাকার জন্য ইংরেজদের জব্দ করতে এতদুর এগিয়ে যায়নি। আরো গভীর কারণ আছে। কারণটা সন্দেহ। যে সন্দেহ করত মুর্শিদকুলি খাঁ। যে সন্দেহের জন্য কলকাতার আশেপাশের আশী খানা গ্রাম কিনতে দেয়নি তাদের। এখানেও সেই সন্দেহ। দাক্ষিণাত্যে ইংরেজদের ব্যবহার নবাবকে বিচলিত করেছে। ব্যবসা করতে এসে দুর্গে কামানের কি প্রয়োজন?

কথা বলতে অস্বীকার করেছে মহাতপ। কুঠিয়াল নিজে মহিমাপুরে শেষবারের মত অনুরোধ করতে এলে, মহাতপ বলেছিল, 'আগে নবাবকে ঠাণ্ডা করো। নবাব শান্ত হলে আরমানিদের নিয়ে ভাবতে হবে না।'

নবাবকে শান্ত করতে লাগবে এক লাখ টাকা। হুকুম বেগ আর কুলি বেগকে দিতে হবে কুড়ি হাজার। আরমানিদের সঙ্গে ঘন ঘন পরামর্শ হয়েছে। হাজার হলেও তারা আরমানি। কোম্পানীর কূটবুদ্ধির মন্ত্রী। থাকে কলকাতায়। কলকাতা মানেই কোম্পানী। কাউন্সিলের এক সাহেব ত সোজা প্রস্তাব করেছিল ওদের তাড়িয়ে দিতে। প্রস্তাব পাশ হয়নি। হলে··হয়ত নবাবের সঙ্গে কোম্পানীর যুদ্ধ বেধে যেত। যুদ্ধে আরমানিদের কোন লাভ হত না। ক্ষতি হত। নিজেদের স্বার্থেই বিবাদটাকে জিইয়ে রাখতে চায়নি আরমানিরা। তাই দরখাস্ত পাঠিয়েছে, ইংরেজদের সঙ্গে তাদের মিটমাট হয়ে গিয়েছে।

রোগ থেকে সেরে উঠে নবাব দরবারে এলেন ১৭৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর। দরখাস্ত দেখে বললে, 'বিবাদ খালাস।'

কিন্তু এই এক লাখ টাকা দিতে কোম্পানীকে আবার আসতে হল মহিমাপুরে। টাকা দিতে অস্বীকার করেছে শেঠরা। তাদের পাওনা অনেক। কোম্পানী দেনা মেটানোর কোন চেষ্টাই করছে না। জাহাজ যে তাদের আসেনি তাও নয়। আরো খবর পাওয়া গিয়েছে যে তাদের না জানিয়ে কলকাতার বাজারে রূপো বিক্রী করাও হয়েছে। এ ক্ষেত্রে নতুন ধার দেওয়া অসম্ভব।

টাকা :দেয়নি মহাতপ। কাশীমবাজার কুঠিতে ছিল চার বাক্স রূপো। সেই রূপো বিক্রী হল শেঠদের ঘরে। আর দু'লাখ টাকার হুণ্ডী কাটা হল কলকাতার গদীতে। সর্ত হল যে, পাওয়া মাত্রই এক লাখ পঞ্চাশ হাজার শিক্কা টাকা দেবে কোম্পানী।

চব্বিশ

শেষকালে বাধ্য হয়েই সন্ধি করতে হয়েছে নবাবকে। বারবার মারাঠা আক্রমণে দেশের আর কিছু নেই। নিজের শরীর যায় যায়। বছরে বারো লাখ দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে নবাব। মীরজাফর নবাবের হয়ে কথা বলেছে মারাঠাদের সঙ্গে। মারাঠাদের প্রতিভূ মীর হাবিব।

আহত মীর হাবিবের জয় হল শেষ পর্যন্ত। নবাবকে স্বীকার করতে হল যে মীর হাবিব নবাবের কর্মচারী এবং উড়িষ্যার সহকারী দেওয়ান। বছরে বারো লাখ টাকা দিতে হবে দু'কিস্তিতে। মারাঠারা সুবর্ণরেখার এ পারে আসবে না। উড়িষ্যা হাত ছাড়া হয়ে গেল।

পারিবারিক দ্বন্দ্ব চরমে উঠেছে। উৎস সিরাজ, নবাবের ভাবী উত্তরাধিকারী। নবাব মনে করত, সিরাজের জন্ম হয়েছে শুভলগ্নে। আলিবর্দী তখন বিহারের শাসনকর্তা হল। মনে করার কারণ অবশ্য এই। সিরাজ তখন থেকে নবাবের প্রিয়, মনোনীত উত্তরাধিকারী। বড় হলে বাদশার কাছ থেকে মনসবদারীও এনেছে নবাব। সিরাজ নিজেও বিশ্বাস করত তার ভাগ্যটা খুবই ভাল। এটা তার গভীর বিশ্বাস। কয়েকবার অকস্মাৎ সফল হওয়ায় বিশ্বাসটা তার চরিত্রের অসুর প্রবৃত্তিকে আশ্রয় দিয়েছে। যাই হোক, সিরাজ নবাবের বড় প্রিয়। তার জন্য একটা প্রাসাদ চাই-ই।

ছোট থেকেই সিরাজ বাকপটু। আদুরে হবার স্বাভাবিক দোষগুণ বর্তমান। মোগল যুগের অন্তিমকালের পঙ্ককুণ্ডের মধ্যে মানুষ হয়েছে সে। সুতরাং সংযম জিনিষটা একবারে অজানা। আর যাই হোক, সিরাজ আলিবর্দী নয়। বাংলার নবাবীতে একটা মাত্র আলিবর্দী-ই এসেছিল।

সিরাজ খুব কায়দা করে কথাটা পেড়েছিল নবাবের কাছে। একদিন বললে, 'একটা পুরানো কম্বলে দশজন দরবেশ কাটাতে পারে। কিন্তু একটা প্রাসাদে বুড়ো ও যোয়ান দু'জন নবাব বাস করলে লোকে হাসে।'

লোকের হাসির ভয়ে না হোক, সিরাজের আবদারের জন্য প্রাসাদ উঠলো ভাগীরথীর ওপারে। নাম তার হীরাঝিল। অপূর্ব প্রাসাদ এই হীরাঝিল।

গৌড় থেকে আনানো হয়েছিল হীরাঝিলের ইট। মোগল ভাস্কর্যের রীতিতে আগাগোড়া তৈরী হল সিরাজের সাধের প্রাসাদ।

প্রাসাদ তৈরী হলে নবাবকে নিয়ে এল সিরাজ। দেখুক বৃদ্ধ আলিবর্দী। তার ওই বেঢপ কেল্লার মত বাড়ীটাকে কি প্রাসাদ বলা যায় কখনও? ঘরের পর ঘর পার করে এমন ধাঁধায় ফেলে দিল নবাবকে যে নেপোলিয়নের মত বীর বুড়ো আলিবর্দী বাইরে আসার পথ না পেয়ে অসহায়। হাসতে লাগলো সিরাজ। বন্দী নবাবের সঙ্গে এসেছিল জমিদার আর রাজারা। তারাও বন্দী হলেন। মুক্তির সর্ত টাকা দিতে হবে। যা কিছু তাদের কাছে তখন ছিল, সব দিয়ে বুড়ো নবাবকে হীরাঝিলের রহস্য প্রাসাদ থেকে ছাড়িয়ে আনতে হল।

মুক্তিপণে তখুনি সিরাজের পাওনা হল সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা। শুধু তাই নয়। মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ উঠলে কর দিতে হয়েছিল জমিদারদেরও নতুন আবোয়ার। নাম তার নজরাণা মনসুরগঞ্জ। আবোয়ারের পরিমান পাঁচ লাখের উপর। এ টাকা রাজস্বে জমা হত না। এ টাকা বরাদ্দ ছিল ভাবী নবাব সিরাজের বিলাসের জন্য।

কিন্তু এই সিরাজ যেদিন তীব্র আঘাত দিল, সেদিনও মর্মাহত নবাব হাসি মুখে নীরবে সহ্য করেছিল সব কিছু।

পাটনার আফগান বিদ্রোহ স্তব্ধ করে নবাব তখন উড়িষ্যার পথে। সিরাজ ঘোড়ার গাড়ীতে করে পাটনার দিকে রওনা হল বাবার সিংহাসন অধিকার করতে। সিরাজের ধারণা নবাব তাকে সিংহাসন থেকে বঞ্চিত করতে চায়।

জইন্‌উদ্দীনের মৃত্যুর পর সিরাজ পাটনার নামমাত্র শাসনকর্তা। শাসনের ভার অবশ্য নবাব দিয়েছিল জানকীরামের হাতে। সিরাজ পাটনা আক্রমণ করলো। খবর গেল নবাবের কাছে। বুকে শেল পড়ল তার। এদিকে সিরাজ, ওদিকে মারাঠা। আসতেও পারে না নবাব। ফিরে আসার জন্য সিরাজকে চিঠি লিখলো আলিবর্দী। অপমান করে উত্তরও দিয়েছিল সিরাজ।

এমন দাম্ভিক নবাব কিন্তু খুব নম্র উত্তর পাঠিয়েছিল পারসী বয়াৎ তুলে :

গাজীকে পায় সাহাদাৎ অন্দর তা গা পোস্ত।
গাকেলকে সাহীদে এশক ফাজেল তার্ আর্ দোস্ত॥
ফারদায় কেয়ামৎ ই বা আঁ কায়মানাৎ।
ই কোস্তা দুষমানাস্ত ওয়া কো স্তায়ে দোস্ত॥

'গাজীরা ধর্মের জন্য যুদ্ধ করে প্রাণ দেয়। তাঁরা জানেন না সংসার সংগ্রামে স্নেহের সঙ্গে যুদ্ধ করে যারা প্রাণ দেয় তারা শ্রেষ্ঠ বীর। শেষ বিচারের দিনে দুজনের সঙ্গে তুলনা হয় না। একজন নিহত হয় শত্রুর হাতে, অন্যজন প্রাণ-প্রতিম বন্ধুর হাতে।'

সিরাজ অবশ্য পাটনার দূর্গ অধিকার করতে পারেনি। নবাব নিজে গিয়ে ফিরিয়ে এনেছিল তাকে।

সিরাজকে শিক্ষিত করতে পারেনি নবাব। এমন কি বেগমসাহেবাও। নিজের পরিবারের মধ্যে ভাঙন ধরেছে। সিরাজের মা আমিনা বেগম আর মাসী ঘসেটি বেগমের সঙ্গে হোসেন কুলি খাঁর নাম জড়িত করে নানা রকম কথা বলাবলি করতো লোকে। ঘসেটির স্বামী নাওয়াজেস মহম্মদ খাঁ বেঁচে থাকতে থাকতেই কথাটা ওঠে। হোসেন কুলি নাওয়াজেসের অধীনে তখন ঢাকার সহকারী শাসনকর্তা। রাস্তার মাঝখানে সিরাজ হোসেন কুলিকে খুন করেছিল,—নবাব, বেগমসাহেবা, এমন কি ঘসেটি বেগমের সম্মতি নিয়েই। ঘসেটি মত দিয়েছিল পরাজিত প্রেমের জ্বালায়। হোসেন কুলির মন টেনেছে তখন সিরাজের মা আমিনা বেগমের অপরূপ রূপে।

সিরাজ এমন এক পঙ্কিল আবহাওয়ার ভেতর বড় হয়ে উঠেছে যে, তার পক্ষে ভদ্র সংযত রুচিসম্মত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হওয়া কঠিন। চরিত্রকে আমূল পরিবর্তন করতে যে পরিমান যুক্তি, বোধ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের প্রয়োজন, সিরাজের পক্ষে তা পাওয়া অসম্ভব। সিরাজ সময়ের শিকার। সে বাদশাহী আমলের ভোগপঙ্গু বুদ্ধিমান যুবক। আলিবর্দীর সংযম ও বিচক্ষণতা পায়নি সে। পেয়েছে উদ্ধত অহমিকা।

রোগজীর্ণ আলিবর্দী শাসনভার তুলে দিয়েছে সিরাজের হাতে। মহাতপ আর স্বরূপ চাঁদের আধিপত্য দরবারে অক্ষুন্ন। কোম্পানী কলকাতায় শেঠদের না জানিয়ে রূপো বিক্রী করেছিল। সেদিন থেকে শেঠরা অনুভব করলো, সোনা রূপো কেনার একচ্ছত্র অধিকার বজায় রাখার জন্য আইনগত সম্মতি দরকার। যে গর্বীয়ান মহাজন তার ভয়ে হোক, সম্মানের জন্য হোক, বাজার থেকে কড়ি ও রূপো কেনে না, তারা যে চিরকাল এই পারিবারিক অধিকারকে মান্য করে চলবে, এমন কোন স্থিরতা নেই।

পারিবারিক প্রতিপত্তি চিরকাল থাকে না। ভেঙ্গে যায়। টাকাকে মানুষ

যতই পুরুষার্থ বলে ভাবতে থাকবে, ততই সংস্কার-জাত সম্মানবোধ ক্ষয়ে যাবে। প্রতিযোগীতার বাজারে সবাই সমান। একে অন্যকে ছাড়িয়ে যাবে। কুল মর্য্যাদার দোহাই দিয়ে, প্রচলিত প্রথার মানত করে, অন্যদের আত্মপ্রসারকে আটকানো যাবে না। তারা মাথা তুলবেই। মাথা তুলেছে কলকাতায়। শেঠদের অনুমতি না নিয়ে রূপো কিনেছে। কলকাতা পূর্বাভাষ মাত্র। সুতরাং নবাবের কাছ থেকে পরোয়ানা পাওয়া দরকার।

১৭৫০ সালের ৯ই জানুয়ারী কাশীমবাজার থেকে চিঠি গেল কলকাতায় যে, নবাবের পরোয়ানা বলে এখন থেকে শেঠরা ছাড়া আর কেউ রূপো কিনতে পারবে না। আর্কট টাকা ভাঙানি দেবে একমাত্র জগৎশেঠের গদী।

ট্যাঁকশালের ওপর কোম্পানীর লোভ অনেকদিনের। কতবার কত চেষ্টা করেছে কোম্পানী মুর্শিদাবাদের ট্যাঁকশাল ব্যবহার করার জন্য। কিন্তু প্রতিবারই ব্যর্থ হয়েছে। সুরম্যানরা অকাতরে টাকা খরচ করেছে ফর্মান আনতে। ফর্মান এনেও ফল হয়নি। বর্গীর হাঙ্গামার সময় টাকার অসুবিধের জন্যে কোম্পানীর ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ট্যাঁকশাল থাকলে এতটা ভুগতে হত না। জগৎশেঠ টাকা দেয়। কিন্তু তাতে শেঠদের লাভই হয় বেশী। ট্যাঁকশাল থাকলে ওই লাভটা থাকতো কোম্পানীর।

বিলেত থেকে হুকুম আসে, নিজেদের ট্যাঁকশাল বসাতে হবে। উপায় বার করবার ভার ওয়াটস সাহেবের ওপর। কিন্তু ওয়াটস্ নিরুপায়। যতদিন আলিবর্দী জীবিত থাকবে ততদিন কিছু হবে না। মোগল বাদশা আজ নাম মাত্র সম্রাট। নামমাত্র বলেই শেঠবাড়ীর ওপর নির্ভরতা তাদের আরো বেশী। বিপদের সময় তারাই বন্ধু যে। জগৎশেঠ বিত্তবান। তাদের ধন দৌলত হিন্দুস্থানের প্রবাদ। এমন বিত্তবান বন্ধুকে বাদশা বিরক্ত ও বিব্রত করতে পারে না।

ওয়াটস লিখলো বিলেতে: কলকাতায় ট্যাঁকশাল বসানোর কথা লিখেছেন মহামান্য ডিরেক্টর। আপনারা সেই ইচ্ছা আমাকে জানিয়েছেন। কলকাতায় ট্যাঁকশাল বসানোর কাজ খুব গোপনে হওয়া দরকার। আমি এ বিষয়ে খুব সতর্ক। নানা জায়গা থেকে খোঁজ খবর নিয়েছি। আমার ধারণা হয়েছে যে এই নবাবের আমলে ট্যাঁকশাল বসানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব। কেন না, এই প্রস্তাব জগৎশেঠ জানতে পারবেই, এবং তা সরাসরি বাতিল হয়ে যাবে। মহামান্য কোম্পানী ট্যাঁকশাল বসানোর জন্য যত

টাকা খরচ করতে রাজী, তার চেয়ে অনেক বেশী টাকা যদি আমরা খরচও করি, তবু কোন সুফল হবে না। এ দেশে যত রূপো আসে তার একমাত্র ক্রেতা এরাই। এই রূপো কিনে জগৎশেঠদের বার্ষিক লাভ হয় প্রচুর।

যাই হোক মহামান্য কোম্পানীর সুবিধার জন্যে যে কোন সম্ভাব্য উপায় গ্রহণীয়, বিবেচনা করে আমি আমাদের উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করেছি। সেও আমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে বর্তমান অবস্থায় ট্যাঁকশাল বসানো অসম্ভব। তবু উকিল আমাকে পরামর্শ দিয়েছে, হুকুম বেগের এক ছেলে থাকে দিল্লীতে। দরবারে তার খুব প্রতিপত্তি। সে হয়ত চেষ্টা করলে বাদশার কাছ থেকে ফর্মান আদায় করতে পারে।

কিন্তু সেই ফর্মান পেতে দিল্লীতে খরচ হবে প্রায় এক কোটি টাকা। সেই ফর্মানকে কাজে পরিণত করার জন্য মুর্শিদাবাদে নবাব দেওয়ান ইত্যাদিকে উপহার দিতে লাগবে আরো এক কোটি। কিন্তু এই কাজ ভীষণ গোপনে করা দরকার। জগৎশেঠরা কোন প্রকারে যদি একবার সন্দেহ করে, তবে এত অর্থ ব্যয় করেও কাজ উদ্ধার করা সম্ভব হবে না। যাই হোক, এখন মহামান্য কোম্পানীর বিবেচ্য যে, এই অবস্থায় এবং এত অর্থ ব্যয় করে ট্যাঁকশাল বসানো আদৌ যুক্তিসঙ্গত হবে কি না?

ওয়াটসের উত্তর যথা সময়ে কলকাতা ঘুরে বিলেতে গিয়ে পৌঁছলো। বিলেত থেকে এ বিষয়ে আর কোন নির্দেশ আসেনি। শেঠেরা জানতেও পারেনি তাদের অগোচরে কোম্পানী তাদেরই সর্বনাশ করার জন্য আর একবার উদ্যত হয়েছিল।

আলিবর্দীর দিন যতই আসন্ন হতে থাকে, নিজেদের সংগঠিত করতে থাকে শেঠরা। আলিবর্দীর ওপর তাদের অগাধ বিশ্বাস। আলিবর্দীও বিশ্বাস করে তাদের। আজীবন তলোয়ার খুলে ঘোড়ায় চড়ে যুদ্ধ করলেও আলিবর্দী মিতাচারী, প্রণম্য। মোগল যুগের শেষ অঙ্কে দাঁড়িয়ে একাধিক স্ত্রীর প্রতি অনুরক্ত এবং পানাসক্ত না হওয়া কঠিন দৃঢ়তার পরিচায়ক। স্রোতের বিরুদ্ধে গিয়েছে নবাব। কাজের জন্য সময় তার বাঁধা। ভোর হবার দু'ঘণ্টা আগে থেকে কাজ আরম্ভ করে নবাব সেটা শেষ করে গভীর রাত্রে। এই নৈমিত্তিক কাজের ভেতর একটা কাজ জগৎশেঠের সঙ্গে পরামর্শ করা।

সন্ধ্যার নামাজ সেরে ঠাণ্ডা সরবৎ পান করবে নবাব। সেই সময় আসবে

নায়করা মৌলবী মোল্লা। তাদের সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব আলোচনা হবে পুরো একঘণ্টা। তার পরে বিদায় নেবে মৌলবীর দল।

এর পরেই আসবে জগৎশেঠ। জগৎশেঠ এলে তার ঘরে অন্য কেউ ঢুকতে পারবে না নবাবের অনুমতি না নিয়ে। প্রয়োজন হলে নবাব একান্ত প্রয়োজনীয় আমীরকে ডেকে পাঠাবে। জগৎশেঠ তাকে দিল্লীর সব চেয়ে নতুন খবর, ভারতবর্ষে বিভিন্ন প্রদেশের হালচাল এবং এই দেশের গ্রাম-গ্রামান্তরের অবস্থা জানাবে। এই খবর একমাত্র জগৎশেঠের পক্ষে জানাই সম্ভব। বাজার এবং রাজস্বনীতি নিয়ে খুঁটিনাটি আলোচনার পর প্রয়োজনীয় আদেশপত্র জারী করে নবাব।

নবাব যেমন বিশ্বাস করত মহাতপ রায়কে, মহাতপও ফতেচাঁদের মতই বিশ্বাস করে এসেছে নবাবকে। সরফরাজের বিরুদ্ধে গিয়ে ঠকেনি শেঠবাড়ী। বেঁচে গিয়েছে তারা। বর্গীর হাঙ্গামার সময় যদি নবাব থাকতো সরফরাজ, তাহলে কি যে অবস্থা হত মহিমাপুরের কে জানে?

তবু আঘাত পেতে হয়েছে ওদের। খুব সামান্য আঘাত অবশ্য। কিন্তু সামান্য বড় হতে কতক্ষণ। মহাতপ ব্যবসাদার। ভোর দেখে দিনের আন্দাজ তাকে করতে হয়। নিজেকে বাঁচিয়ে চলতে হয় সর্বদা। হিসেব করে, বিচার করে পা ফেলতে হয় টিপে টিপে। কোম্পানীর মত অমন দাপটে যদি যেতে পারতো সে, খুব ভাল হত বোধহয়। কিন্তু পারা যায় না। প্রাণ ধুক্‌ধুক্ করে। কোথায় যেন প্রচণ্ড অভাব আছে। তাই ভয় আরো বেশী।

গ্রামের কৃপণ যেমন মাটীর তলায় টাকা পুঁতে তার ওপর মাদুর বিছিয়ে জেগে রাত কাটায়, ঠিক তেমনি। ভয় চোখ থেকে ঘুম কাড়ে। অতটা ভয় অবশ্য জগৎশেঠের নেই। তবু ভয় আছে তাদেরও। তাই মহিমাপুরের বাড়ী চৌকি দিতে ফতেচাঁদের সময় থেকে ছিল দু'হাজার সেপাই।

মীর হাবিব তাদের মানেনি। হাবিবের সৈন্যরা হটিয়ে দিয়েছে তাদের। তাই আরো পাকা ব্যবস্থা করে মহাতপ। ব্যবস্থাটা খোদ নবাবের সেনাপতির সঙ্গে।

মারাঠা আর আফগান হাঙ্গামার সময় বোঝা গিয়েছে সৈন্যবাহিনীর দাম কত। পরাক্রান্ত নবাব কত দীনভাবে তাদের মন যুগিয়ে চলেছে। প্রমাণ হয়ে গিয়েছে নবাবের প্রতি অনুগত নয় সেনারা। আনুগত্য অর্থের প্রতি। বশ করতে হবে তাদের টাকা দিয়ে।

কোম্পানীর গোরা সৈন্য এরা নয়। এরা বিশৃঙ্খল, স্ববিরোধী, স্বার্থান্ধ পেশাদার গুণ্ডা। একদিন কৃষক ছিল। আজ গুণ্ডা হয়েছে। জীবনের কোন স্থির বিন্দুতে এরা আবদ্ধ নয়। তাই এদের মানসিকতা ছন্নছাড়া ও নিষ্ঠুর। কোন বিশেষ বোধ কিম্বা মূল্যের নিরিখে ন্যায় অন্যায় পাপ পুণ্যের ধ্যান ধারণা তাদের অনায়ত্ত।

জীবনের চরমতম সার্থকতা তাই অর্থ ও উত্তেজনা। গত কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা মহাতপকে এই শিক্ষাই দিয়েছে। ব্যবসা করেছে নবাবের সেনাপতির সঙ্গে। কথা হয়েছে শেঠবাড়ীর প্রয়োজনের সময় আসতে হবে। সে প্রয়োজনে নবাব যদি প্রতিবাদী হয়, তবে নবাবকে অস্বীকার করেই আসতে হবে মহিমাপুরের গদী বাঁচাতে। তার জন্যে দক্ষিণা পাবে। দক্ষিণা নিতে স্বীকৃত হয়েছে সেনাপতি ইয়ার লতিফ। শপথ করেছে সে।

শপথের প্রয়োজন আছে। নবাব আলিবর্দীর পরে কি হবে কে জানে? সিরাজ আর সরফরাজের ভেতরকার সাদৃশ্য নজর এড়ায় না। সিরাজ উদ্ধত, অবিবেচক। ভয় তার সিরাজকেও।

আরও একটা ভয় আছে মহাতপের। সে ভয়ের কোন শরীর নেই। কোন কারণ নেই। কোথায় তার উৎস তাও জানে না সে। কিন্তু ভয় তাকে আচ্ছন্ন করে। সে ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তা।

দেশের হালচাল, নাড়ি নক্ষত্র শেঠদের জানা। তাই আলিবর্দী প্রতিদিন এক ঘণ্টা করে আলোচনা করত তাদের সঙ্গে। তারা শুধুমাত্র নবাবের ব্যাঙ্কার নয়। দেশের বাণিজ্য তাদের হাতের মুঠোয়। বাজার দরের নামাওঠা, টাকার দরের হেরফের, বাট্টা সুদের চড়ামন্দা, ওঠা নামা তাদের মর্জি মাফিক। মুদ্রা অর্থনীতি পুরোপুরি চলতি। অজ পাড়াগাঁয়ে হয়ত জিনিষের সঙ্গে জিনিষের বিনিময় হয়। শহরে, গঞ্জে তা হয় না। হয় না সেখানেও, যেখানে গিয়ে পৌঁচেছে কোম্পানী, বণিকের গোমস্তা, পাইকের আর ফড়ে। মুদ্রা অর্থনীতি স্বাভাবিক বিকাশের পথে। ক্রমাগত জটিল হয়ে পড়ছে তার পদ্ধতি।

ব্যাঙ্কার হিসেবে শেঠেরা বুঝেছিল যে, ব্যবসার জন্যে যেমন রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা থাকা দরকার, ঠিক তেমনি দরকার টাকার বাজার সহজ করে রাখা। মোগল বাদশারা সে দিকে নজর দেয়নি। দেবার প্রয়োজন তেমনভাবে হয়নি আকবরের সময়। দেখা দিয়েছে সম্প্রতি। ফতেচাঁদ

ভেবেছিল প্রয়োজনটা বুঝবে রায় রায়ান আলম চাঁদ। তাই বলেছিল বাজারে চলুক একমাত্র মুর্শিদাবাদের টাকা।

টাকার ব্যাপার খুব ভাল ভাবে বুঝত ফতেচাঁদ। সে সময়ের বাংলা, ইয়োরোপের যে কোন শিল্পোন্নত দেশের সঙ্গে টেক্কা মারতে পারে। বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে তার বাণিজ্য। বাণিজ্যের এই উন্নত আস্তায় মুদ্রা অর্থনীতির পাকা বনিয়াদ সব চেয়ে বড় প্রয়োজন। কারণ মুদ্রা শুধুমাত্র বিনিময় আর সঞ্চয়ের পথ নয়। সে এখন আরো কিছু বড়, আরো গভীর তার তাৎপর্য

হরেক রকমের টাকা চলতি থাকায় লাভ তাদের হয় বেশী। কিন্তু শুধুমাত্র লাভ করতে চায়নি সে সময়ের জগৎশেঠ। আরো বড় ঐতিহাসিক দায়িত্ব এসে পড়েছিল তাদের ওপর। সেই দায়িত্বের জন্য তারা চেয়েছিল হরেক রকম টাকার চেয়ে চলুক এক রকমের টাকা। Multiple currencyর বদলে হোক Uniform curreney.

কিন্তু তা হয়নি। সেইজন্য ভুগতে হয়েছে বর্গীর হাঙ্গামায়। বাইরের টাকার সঞ্চয় সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য। হাঙ্গামার সময় বাণিজ্য যেই ওলট-পালট হল, ওমনি বাট্টা দিয়ে এক টাকার বদলে অন্য টাকা নেওয়া দেওয়া অসম্ভব হয়ে উঠতে থাকলো।

এর ফল ভুগেছে সবাই। শুধুমাত্র বাইরের টাকা নয়, খোদ মুর্শিদাবাদের টাকা দিয়ে বাণিজ্য বজায় রাখাই মুসকিল। দেশ থেকে বাইরে গিয়েছে টাকা। বাইরে গিয়েছে, ফিরবে না বলে। কোন অর্থনীতির দায় দায়িত্ব না নিয়ে। মীর হাবিব নিয়ে গিয়েছে। নিয়ে গিয়েছে হাজির সৈন্যরা। বাজার বন্ধ। টাকা দিয়ে প্রজারা বশ করেছে মারাঠাকে। বালাজী বাজীরাওকে দিতে হয়েছে এক কাঁড়ি। এ সব টাকা গিয়েছে বাইরে। পণ্য হয়ে ফেরেনি আর।

বাংলার অর্থনীতি লাভ করেনি। ক্ষতিগ্রস্তই হয়েছে। আর নবাবী সৈন্য। তাদের প্রায় সবাই বাইরের। বাংলা দেশের কেউ নয়। এত টাকা তাৎপর্যহীনভাবে বাইরে যাবার জন্য বাজার অচল। তার ওপর অল্প পুঁজির বাট্টাদার। তারা ভয়ে টাকা রেখে এসেছে ঢাকায়। ব্যবসা থেকে তুলে নিয়েছে। তাই ঘাটতি পড়েছে টাকার। প্রবল আঘাত এসেছে বাংলার সদ্যজাত মুদ্রা অর্থনীতির বনিয়াদে।

কোম্পানীর ব্যবসার সংগঠন ভাল বলে তারা সামলে নিয়েছে

অনেক ভুগে। কিন্তু বেসামাল হয়েছে ফরাসী আর ডাচ। তবু জগৎ-শেঠরাই বাঁচিয়ে দিয়েছে কোম্পানীকে। কিন্তু কুবেরের ধনেরও সীমা আছে। ধাক্কা খেয়েছে শেঠরা। তাগাদা দিয়েছে বাঁচবার জন্যে। ব্যাঙ্কার হিসেবে জগৎশেঠ জানে, বর্গীর হাঙ্গামায় শুধুমাত্র ধাক্কা খায়নি নবাব। দেশের অর্থনীতি মর মর।

বছরে বছরে আসত তুর্কী তাতার পার্শি বণিকেরা। জাহাজ বোঝাই করে তারা চলে যেত। রেখে যেত ধনদৌলত। বিদেশীরা তাই বলত, গহ্বর। টাকা একবার বাংলায় ঢুকলে আর বাইরে আসার পথ পাবে না। শুধুমাত্র আমদানি রপ্তানির কারবার হত বছরে 'two millions sterling'। আসত চীন, ফিলিপিন, পেগু এবং মালয়ের ব্যবসাদারেরা। আফ্রিকার উপকূল জুড়ে থাকতো বাংলার বাজার।

হাঙ্গামার পর থিতু হয়ে বসে দেখা গেল যে বাণিজ্য পড়তির মুখে। ত্রিশ বছর আগের পারস্য আজ আর নেই। তার চেহারা পালটে গিয়েছে। নাদির শাহী অত্যাচার তাকে জখম করেছে। ১৭৪৭ সালে নাদির শাহ খুন হল। খুন হবার পর অন্তহীন গৃহযুদ্ধ। জর্জিয়া আরমেনিয়া জড়িয়ে পড়েছে বিরোধে। পারস্যের সঙ্গে তাদেরও অবস্থা শোচনীয়। অত বড় বাজার যায় যায়।

তুর্কী সাম্রাজ্যের পতন ঘটেছে পূবে আর দক্ষিণে। বিদ্রোহ হয়েছে মিশরে আর ব্যাবিলনে। সিরিয়ার বাণিজ্য বিলুপ্ত প্রায়। মধ্য প্রাচ্যের ঝড়ের ধাক্কায় বুঝি উড়ে যাবে বাংলা দেশের খড়ো চাল।

ওদিকে কোম্পানী। ক্রমবর্ধমান তাদের চাপ। নবাবের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ আছে, থাক। তবু বাংলা বড় ভাল। 'most benificial' বলত ফরাসীরা। বলত, ভারতবর্ষে ব্যবসা করতে হলে বাংলাকে চাই—the part of India most necessary to the company. সেই কথাই বলত ডাচ। তাই দেশ জোড়া তাদের ঘাঁটি, আড়ৎ। ঢাকা, কাশীমবাজার আর পাটনায় বড় ঘাঁটি।

কান্তবাবুর বিপদের পর থেকে কোম্পানী সতর্ক। যদিও দোষ কান্তবাবুর নয়। তবু ১৭৪৬ সাল থেকে তারা নিয়ম করেছে যে, কাশীমবাজার, পাটনা আর ঢাকার কুঠিয়ালগিরি করতে হলে টাকা জমা রাখতে হবে পঞ্চাশ হাজার। এ দেশের গোমস্তা নিযুক্ত হলে তাকেও জমা দিতে হবে।

জমার টাকা তুলতে হবে। ভাল করে কাজ করত তারা। ভাল কাজ করার মানে চাপ। বাংলার তাঁতী জোলা সারা বছর খাটে। মেয়েরা চরকা ঘুরিয়ে, আর চাষীরা অবসর সময়ে কুটির শিল্পে যা কিছু করত। কোম্পানীর অব্যর্থ হাত তাদের ওপর। এর ওপর আছে দাদন। কাজ আদায় করতেই হবে। কাজ দিতে না পারলে করতে হবে কোম্পানীর হাজতবাস। কোম্পানীর দালাল যারা, তাদের বড় বদনাম। কোম্পানী আর কৃষকের মাঝখানে যারা, তারা ফড়ে। তারা আগেভাগে দাম ঠিক করে রাখে। ১৭৫২ সালের দিকে তাদের পাকা ইউনিয়ন হয়েছিল। পরের বছর কোম্পানী ঠিক করলে দালালের হাত থেকে জিনিষ না কিনে কিনবে সোজা বাজার থেকে। গোমস্তা পাঠাবে তারা।

গোমস্তা পাঠিয়ে বাজার থেকে কিনেও সুবিধে হল না। দালালদের চেয়ে সহজে হয়ত মাল পেত, কিন্তু অত্যাচার কমলো না। অথচ রাজস্ব বাড়েনি এক পয়সা। বাদশা ফাররুকশের তার পথ বন্ধ করে দিয়েছে। তার ওপর কোম্পানীর কর্মচারীর বে-আইনী কারবার। নবাব এখন জিনিষপত্র পায় না সব সময়। তাকেই চিঠি লিখতে হয় কোম্পানীর কাছে।

ভারতবর্ষের ভেতরেই কম টাকার কারবার হত না। কাশ্মীরী, মুলতানী, পাঠান, শিখ, ভুটিয়া, মাড়োয়ারী ঘুরে বেড়াত গঞ্জে গঞ্জে। বাংলার জিনিষের সর্বত্র অবাধ গতি। কিন্তু তাও বন্ধ হবার উপক্রম। আকবর নেই, নেই আরঙ্গজেব। ভারতবর্ষের কেন্দ্রবিন্দু আর দিল্লী নয়। মুহম্মদশার পর থেকে ত নয়-ই। প্রদেশগুলো স্বাধীন হয়ে কেন্দ্র থেকে ছিটকে পড়েছে অনেক দূরে। তারা সবাই স্বতন্ত্র। বিভিন্ন তাদের শুল্করীতি ও হার। সব প্রদেশের কর্তাকে কড়ি গুণে দিতে হবে। ফলে জিনিষের দাম বেড়ে যায়। কেনার ক্ষমতা কম। শুধুমাত্র সাহের চৌকির জুলুম নয়। আছে পথে চোর ডাকাত। দেশময় অরাজকতা।

শিল্পের জগত তখন আলাদা নয়। কামারশালা কারখানা হয়ে উঠতে পারেনি। কৃষির সঙ্গে শিল্প জড়িয়ে আছে। শিল্প বলতে কুটির শিল্প। অষ্টাদশ শতকে ভারতবর্ষ যে এশিয়ার ধনভাণ্ডার হয়ে উঠেছিল, তার মূলে ছিল এই অদ্ভুত ঐক্য,—কৃষি এবং শিল্পের সমতা।

শিল্প বলতে কাপড়। রেশম আর তুলোর কারবার। তাঁত শিল্পই

বড় শিল্প। বাংলাময় ছড়িয়ে আছে। তারপর মসলিন। তুলো• আর রেশমের কথা বাদ দিলে :থাকে পাট আর চট। খরিদ্দার তার কোম্পানী, বাজার তার কলকাতা। চিনিরও বাজার খুব ভাল। এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যেত বাংলার চিনি। বছরে প্রায় ৫০ হাজার মন চিনি চালান যেত বাইরে। লাভও প্রচুর। প্রায় অর্ধেক। তা ছাড়া আছে বিহারের সোরা আর আফিম। সোরা ত পুরানো কারবার। বহু ঘুষ দিয়েও সোরায় লাভ অনেক। তবু বিলেতের খাঁই মেটেনি। ১৭৫৫ সালের ৫ই ডিসেম্বর কোম্পানী তাই জানালো বিলেতে, ওমিচাঁদ জানুয়ারীর শেষের দিকে আরো ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার মণ সোরা দেবে। দাম তার মণকরা পাঁচ টাকা বারো আনা। আফিম বিলেতে প্রথম যায় ১৬৮২ সালে। তার পরে আফিমের বাজার হয়েছে এশিয়ায়।

আরো একটা বড় শিল্প লোহা। কামারশালার যন্ত্র। বন্দুক তৈরী হত বাংলায়। কলকাতা আর কাশীমবাজার তার কেন্দ্র। কাশীম-বাজারের বন্দুক ভাল, দামও কম। আর বিখ্যাত ছিল মুঙ্গেরের বন্দুক। এই বন্দুক ব্যবহার করতো আলিবর্দী।

ঢাকায় তৈরী হয়েছিল ·জাহান কোষা। বারো হাত দীর্ঘ আর সাড়ে তিন হাত বেড়ের এই কামান তৈরী করেছিল জনার্দন কর্মকার, ১৬৩৭ সালে। ওজন তার ২১২ মণ, বারুদ লাগে ২৮ সের। জাহান কোষার চেয়েও বড় কামান ছিল। ওজন তার আটশ মণ। ছ'মণ গোলা চালাতে পারত। এটা ঢাকার তোপ। নদীর ভেতর পড়ে গিয়েছে এই তোপটি বহুদিন আগে। সাক্ষী আছে 'বাচ্ছাওয়ালী' কামান, নবাবের প্রাসাদের সামনে। নবাবের সেলখানায় নানান ধরণের অস্ত্র এই বাঙালী কামারের প্রতিভার মুক সাক্ষী।

বিশ্ববিখ্যাত তার তলোয়ারের পাত আর পিস্তল। কোম্পানী বহুবার স্বীকার করেছে এই কথা। বিলেতে এই পিস্তল নিয়ে গিয়েছে ইম্পে। লোহার কারবার ছাড়া বড় কারবার তার নৌকার। রেনেল সাহেবের মতে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক তৈরী করত নানান ধরণের নৌকা।

হাঙ্গামার পর দেখা গেল বাংলার শিল্পও মুমূর্ষু। কাপড় তুলো আর রেশমের বাজার পড়ে গিয়েছে। এ এক আশ্চর্য ব্যাপার। এই শিল্প একদিন হঠাৎ এসে হঠাৎ শেষ হয়নি। উদ্ভব এবং বিনাশ দুই-ই হয়েছে ধীরে ধীরে। নিরাপত্তার অভাব তাঁতীকে শেষ করেছে। ঘর বাড়ী ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে

জঙ্গলে। ১৭৫১ সালে কোম্পানী মাল পায়নি। তখন তারা জানিয়েছে বিস্তারিত কারণ।

এরপর থাকলো কৃষি। অবস্থা তারও ভাল নয়। হাঙ্গামার প্রথম ক' বছর চাষবাস হয়নি। তারপর চাষবাস হয়েছে নামমাত্র। শুধুমাত্র পেট চলে গিয়েছে। কর চাপানো হয়েছে বেশী। মুর্শিদকুলি চাপিয়েছিল একটা আবোয়ার, সুজা চাপালো আরো চারটে। মোট টাকার পরিমান গিয়ে দাঁড়ালো ২১, ৭২, ৯২৫ টাকা। আলিবর্দী তার ওপর যোগ করলো ২২, ২৫, ৫৫৫ শিক্কা টাকা। অগ্নিমূল্য জিনিষের। কলকাতার সাহেবরাও ঘোল খায়।

চাউল কলাই মটর মসুরি,
তেল ঘি আটা চিনি লবণ এক সের করি।
টাকা সের হইল আনাজ, কিন্তু নাই পাত্র ॥

চাপ পড়েছে সর্বত্র। পালিয়ে যায় কৃষক। কিন্তু কোথায় পালাবে ?
'নাড়া কেটে ভাড়া দেব থাকগে জমিদার বসে।'

মহাতপ প্রতিদিন আসে। প্রতিদিন শোনায় সর্বনাশের কাহিনী। নবাব ও মন্ত্রী দু'জনেই বুঝতে পারে চোরা ঘূর্ণির মধ্যে পড়েছে নৌকা। পলাশীর পরে কোম্পানীর অত্যাচারে ধ্বংস হয়নি বাংলার অর্থনীতি। রোগ ধরেছে আগে থাকতেই। বোল্টস ঠিকই বলেছে, কোম্পানীর গোমস্তার সর্বনাশা নীতি ও পদ্ধতি। কিন্তু তার আরম্ভ হয়েছে বর্গীর হাঙ্গামায়।

আলিবর্দী উদার, কঠোর। প্রখর তার বিষয় বুদ্ধি। অদ্ভুত তার দক্ষতা। ষড়যন্ত্রের কালি মেখেও নবাব উজ্জ্বল। নবাবী আমলে এবং মোগলদের শেষ যুগে কেউ যা কোনদিন করেনি আলিবর্দী তাই-ই করেছে। নতুন আবোয়ার বসেছে। কিন্তু হাঙ্গামা মিটে গেলে প্রজাদের ঘর করে দিয়েছে। টাকা দিয়েছে কৃষককে আবার, চাষবাস করার জন্য। খাজনার জন্য পীড়ন না করার হুকুম দিয়েছে নবাব। আলিবর্দী নিজের সুখ দেখেছে কিন্তু প্রজাদের সুখও ভোলেনি।

নবাব জানতো জমিদাররা বিরূপ। তারা অধিকাংশ হিন্দু। হিন্দুদের মান্য করত নবাব। দরবারে প্রতিপত্তি ছিল জানকীরাম, দুর্লভরাম, দর্পনারায়ণ, উমিদরাম আর বিরু দত্তের। সাত হাজারী মনসবদারী দিয়েছে

অনেক হিন্দুকে। হিন্দু জমিদারকেও কাছে টেনেছে নবাব। তবু তাদের মন থেকে বিদ্বেষ ঘোচেনি। কিন্তু নবাব সতর্ক। হাঙ্গামায় বাধ্য হয়ে চাপ দিয়েছে রাজশাহী আর দিনাজপুরের জমিদারদের। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এক লাখ টাকা নজরাণা দিতে না পারায় নজরবন্দী ছিল। একই অবস্থা হয়েছিল দক্ষিণ রাঢ়ীর দেওয়ান রঘুনন্দনের। কারণও অবশ্য আছে। এদের কারো জমিদারী ছারখার হয়নি।

নিয়ম মাফিক মালগুজারি দিয়ে যতই কুর্নিশ করুক জমিদার, জগৎশেঠ তাদের ভাল করেই চেনে। জানে, এ চতুরের সঙ্গে চতুরের সম্পর্ক। বুকের কালনাগ একদিন ফণা তুলে দাঁড়াবে। লক্ষ্য তার সিরাজ।

আত্মরক্ষার পথ খুঁজে দেয় জগৎশেঠ। আত্মরক্ষা এবং আত্মপ্রসার শ্রেষ্ঠ ধর্ম। এই শিক্ষাই দিয়েছে ফতেচাঁদ। এই কথাই বলেছে তাদের অভিজ্ঞতা। এই শিক্ষাই দিচ্ছে মহাতপ, তার ছেলে খোসাল চাঁদকে।

গ্রাম্যবুদ্ধি নিয়ে বড় হয় জগৎশেঠ। চরিত্রগত বিরোধিতা নিয়েও বন্ধুত্ব করে। একদিকে তার নবাব, অন্যদিকে জমিদার আর মীরজাফর। দু'জনেই এক শ্রেণীর। তাই পছন্দ করতে হবে ব্যক্তিকে। ভিন্ন সমাজ, সভ্যতা কিম্বা মানসিকতার কোন প্রতিভূকে নয়। দ্বন্দ্ব তাই স্বার্থের, লোভের ও প্রতিষ্ঠার।

জমিদারী চায় না জগৎশেঠ। কোনদিন জমিদারী করেনি। বুঝেছিল মহাতপ বণিকবৃত্তিই উন্নতির পথ। চেয়ে থাকত তাই কোম্পানীর দিকে। এই সময় ঠিক এমনিভাবে তাকিয়েছিল গুজরাটের অর্জুনজী নাথজী। ইতিহাসের একটি সংকেত বুঝেছিল, চিরস্থায়ী স্থাপত্য ভাঙছে।

ভাঙছে বলে বুঝেছিল আলিবর্দী। শুধুমাত্র মোগল স্থাপত্য নয়। তার পরিবারও। চরমতম অশান্তি বৃদ্ধকে অসমর্থ করে তুলেছে। তাই সিরাজকে ডেকে নবাব বলেছিল, 'যৌবন চলে গিয়েছে। বুড়ো হয়েছি। মৃত্যু খুব নিকটে। খোদার ফরজে তোমার জন্য বিরাট সাম্রাজ্য রেখে গেলাম। আমার শেষ কথা শোন। এই রাজ্যের শত্রুদের চরম শাস্তি দিও। বন্ধুদের সম্মান দিয়ো। দেশে অনেক অরাজকতা, অনেক দ্বন্দ্ব। তাই প্রজাদের উন্নতির জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করো। সুখ সমৃদ্ধির মূলে ঐক্য। বিভেদ আর অনৈক্যের পরিণাম দুঃখ। জনগণের শুভ চেতনার ওপর নির্ভর করলে তোমার রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী হবে। আমার মত থেকো। আমাকে অনুসরণ

করো। শত্রুরা তবে তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। ঈর্ষা আর বিরোধকে প্রশ্রয় দিলে সমৃদ্ধির উৎস বন্ধ হয়ে যাবে।'

বয়স তার আশী বছর। তবু দৃঢ়ভাবে কথা বলে। ১৭৫৬ সালের ১০ই এপ্রিল ভোর পাঁচটার সময় আজানের ডাক শুনতে শুনতে নবাব পৃথিবী থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

খোশবাগে দাদুকে কবর দিয়ে সিরাজ মসনদে বসলো।

পঁচিশ

আলিবর্দীর মত সিরাজের নিজেরও বিশ্বাস যে জন্ম তার মহেন্দ্রক্ষণে। মসনদের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারতো ঢাকার শাসনকর্তা নাওয়াজেস আর পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা সৈয়দ আহ্‌মদ। কিন্তু আলিবর্দীর আগেই তারা মারা গিয়েছে। এই আকস্মিক যোগাযোগকে সিরাজ অমোঘ বিধিলিপি ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেনি।

সিরাজের বিশ্বাস জন্ম তার শুভলগ্নে। দাদুর আদর না থাকলেও থাকবে ভাগ্যের আস্কারা। কিন্তু মুহূর্তেও বিস্মৃত হয়নি সে, যে শত্রুপুরিতে সে এসে বসেছে, তার প্রতিটি ছায়ায় চক্রান্তকারীরা চলাফেরা করছে। প্রতি থামের আড়ালে ঘাতকের প্রতিহিংসা। উগ্র বিলাসী দাম্ভিক তরুণ নবাব এক অদ্ভুত মন নিয়ে দরবারে আসে। প্রতি সিদ্ধান্তে তার সংশয়। পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে চিন্তা করার শক্তি থাকুক বা নাই থাকুক, অন্তত পরিবেশ ছিল না। দড়িকে সাপ ভেবে মরিয়া হয়ে ওঠে। উদ্বেগের মসনদে বসেছে সিরাজ।

সিরাজ প্রথমেই ভীমরুলের চাকে ঘা দিল। মতিঝিল অবরোধ করে ঘসেটি বেগমের সমস্ত ধনরত্ন নিয়ে তুললো নিজের প্রাসাদে। নজর বন্দী হল ঘসেটি।

ঘসেটির ভয় প্রথম থেকেই ছিল। নাওয়াজেসের মৃত্যুর পর ভয় আরো বেড়ে যায়। আত্মরক্ষার জন্য তৈরী হয় সে। এক লাখ টাকা দিয়ে সৈন্যবাহিনীকে তৈরী করেছে। হোসেন কুলির পর ঢাকার সহকারী শাসনকর্তা রাজবল্লভ গোপনে কাশীমবাজার কুঠির ওয়াটস সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলে মতিঝিল রক্ষা করার জন্য। বড় সাধের মতিঝিল। ওই ঝিলের মধ্যে

স্থক্তি পাওয়া যেত। সেই স্থক্তির ভেতরের মতি। সেই মতি গুঁড়ো করে তামাকের সঙ্গে মেশান হত। মতির গুঁড়োর তামাক খেতে খুব ভালবাসতো নবাব আলিবর্দী।

রাস্তার ওপর খুন হয়েছে হোসেন কুলি খাঁ। ভয় ধরেছে রাজবল্লভেরও মনে। সেও এমনিভাবে খুন হতে পারে। ঘসেটির বল্লভত্বের বদনাম আছে তারও। তাই কাশীমবাজার কুঠির সঙ্গে যোগাযোগ করে ছেলে কৃষ্ণবল্লভকে পাঠিয়ে দিয়েছে কলকাতায়। প্রচার করা হল যে, সে যাচ্ছে তীর্থে।

সিরাজের সন্দেহ যে, এর মূলে আছে ঘসেটি। তার ধারণা ঘসেটি চেষ্টা করছে সিরাজের ভাইপোকে মসনদে বসাতে। চক্রান্তে আছে রাজবল্লভ। আলিবর্দীর অস্থখের সময় কুঠির ডাক্তার ফোর্থ সাহেব দেখতে আসত রোজ। একদিন ঘসেটির সামনে নবাব ডাক্তার ফোর্থকে জিজ্ঞাসা করেছিল, সিরাজের অভিযোগ সত্যি কিনা। অস্বীকার করেছিল ডাক্তার।

হোসেন কুলি মারা যাবার পর নাজীর আলি ঘসেটির নাবালক প্রেমিক। ঘসেটি হয়ত যুদ্ধ না করেই প্রাসাদ ছেড়ে দিত সিরাজকে। কিন্তু প্রেমিকের পরামর্শ ঠেলতে পারেনি। সিরাজের সৈন্য এসে সত্যি যখন অবরোধ করলো মতিঝিল, ঘাবড়ে গেল তরুণ প্রেমিক। সিরাজের সেনাপতিকে ঘুষ দিয়ে নাজীর আলি পালিয়ে গেল। ঘসেটি বন্দী হল। ঘসেটির প্রেমের ভাগ্য বড়ই খারাপ।

ঘসেটির ঘটনা হয়ত অত মারাত্মক হয়ে উঠত না। হয়ত ওটা পারিবারিক ঝগড়ার রাজনৈতিক পরিণতি হিসাবে মেনে নেওয়া যেতো। কিন্তু সিরাজ যখন মন্ত্রীসভার রদবদল আরম্ভ করলো, তখন চাঞ্চল্যকে থামানো গেল না কিছুতেই।

সিরাজের প্রত্যেকটি সিদ্ধান্তের পিছনে তাড়িত জন্তুর হতাশ হিংস্রতা। স্থির ও অবিচলভাবে চক্রান্তের জটিল ব্যূহ থেকে বাইরে আসার জন্য উপায় ভাবতে শেখেনি সে।

মীরজাফর দীর্ঘদিন থেকে সিপাহসালার। বর্গীর হাঙ্গামার সময় দুঃসাহসিক যুদ্ধ পরিচালনা করেছে সে। আবার বিশ্বাসঘাতকতাও করেছে। আলিবর্দী তাকে শাস্তি দিয়েছে। মীরজাফরের জায়গায় এলো মীরমদন। নতুন দেওয়ান্ এবার মোহনলাল। মঞ্চসফল নাটকের দেশ ভক্ত এই চরিত্রটি ঐতিহাসিকের কাছে বিরূপ বিশেষণ পেয়ে থাকে। ল সাহেবের মতে, 'the greatest scoundrel the earth has ever brone'.

মোহনলাল শেঠদের চিরশত্রু। আর একবার বিপদে পড়লো মহাতপ। সিরাজ ভাবত, এই 'শূকর'দের আর দরকার নেই। দরকার শুধু শেঠদের টাকার। মহাতপ দেখলো, এবার টাকা ছিনিয়ে নেওয়া সহজ।

মোহনলাল দেওয়ান্ হবার সঙ্গে সঙ্গে সরে আসে শেঠরা। ফরাসী কুঠির ইংরেজ বিদ্বেষী ল সাহেব বলেছেন যে, এই পরম অবিবেচক অসহিষ্ণু নবাব ভেবেছিল, ব্যাঙ্কারকে তার প্রয়োজন নেই। আর শেঠদের ভয় করার কোন কারণ নেই। সুতরাং তাদের সঙ্গে ভদ্র ব্যবহারের প্রয়োজনও শেষ হয়ে গিয়েছে। নবাবের লক্ষ্য ওদের অর্থের ওপর। একদিন না একদিন ওই অর্থ আদায় করে নিতে হবে।

বছর ঘুরতে না ঘুরতে সিরাজ তার মারাত্মক ভুল বুঝতে পারে। কিন্তু ফিরতে পারেনি আর। অনেক দেরী হয়ে গিয়েছে। ট্রিগারে আঙুল চাপা হয়েছে অনেক আগেই।

মসনদে বসার একমাসের মধ্যে সিরাজ আমীর ওমরাহদের শত্রু করে তুললো। তারা তার চরিত্রকে ভয় করত। ভয় করত তার উগ্র অহমিকা আর একগুঁয়েমিকে। মুতাক্ষারীনকারের মতে আমীর ওমরাহরা তাই ছলে কিম্বা প্রকাশ্য বিদ্রোহে সিরাজের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে ব্যগ্র। ঢাকার কর্তা হবার আগে নাওয়াজেস ছিল সিরাজের মত অসভ্য। কিন্তু দানবও দেবতা হয়। নাওয়াজেস তার প্রমাণ। দরবারের ঘনিষ্ঠ লোকেরা ভাবত হয়ত সিরাজও হবে নাওয়াজেস। কিন্তু তা হয়নি।

সিরাজের চরিত্র উগ্র। যেমন উগ্র তার ভালবাসা, তেমনি উগ্র তার ঘৃণা। ফৈজীকে দেখে নেশা ধরেছিল সিরাজের। নাম তার ফয়জান। দিল্লীর বাইজী সে। ফৈজী আগুনের শিখার মত দীর্ঘ, কৃশ ও দৃপ্ত। কনক চাঁপার মত গায়ের রঙ। তার চলনের ভঙ্গিতে শিকারীর অব্যর্থ নৈপুণ্য। দেহের ওজন মাত্র বাইশ সের। মুতাক্ষারীনকারের মতে ফৈজী 'ভারতীয় সৌন্দর্যের নির্ভুল প্রতীক।'

হৃদয়ের সঙ্গে এক লাখ টাকা দিয়ে ফৈজীকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে এসেছিল সিরাজ। ফৈজীকে পেয়ে অধীর হয়েছিল সে। কিন্তু মন পায়নি। তাকে টেনেছিল সিরাজের ভগ্নিপতি সৈয়দ মহম্মদ খাঁ। মহম্মদ খাঁকে দেখতে ঠিক সাহেবের মত। দীর্ঘ বলিষ্ঠ আর চঞ্চল। সিরাজের চোখে ধুলো দিয়ে রাত্রে ফৈজী যেত মহম্মদের কাছে। বেশীদিন অবশ্য যেতে

পারেনি, চরের মুখে কথাটা শুনে ফেলেছিল নবাব। একদিন রাত্রে ধরেও ফেলেছিল। ভীষণ আক্রোশে বলেছিল ফৈজীকে, 'দেখছি তুমি সত্যিই বাইজী।'

সেদিন প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়েছিল ফৈজী। ফুঁসে উঠে বলেছিল, 'জাহাপনা, এত আমার ব্যবসা। কিন্তু এ কথা কি আপনার মাকে বললে ভাল হত না?'

চোরাকুঠুরীর ভেতর ফৈজীকে বন্দী করে দরজায় ইঁট দিয়ে গেঁথে দিয়েছিল সিরাজ। তিন মাস পরে দরজা ভেঙে পাওয়া গেল কৃশাঙ্গীর কয়েকটি মজবুত হাড়।

উগ্রতাই সিরাজের চরিত্র। যেমন তার ভালবাসা, তেমনই তার ঘৃণা।

ইংরেজদের ঘৃণা করত সিরাজ। মুখের বুলিই ছিল তার, শাসন করতে শুধু এক পাটি চটি জুতো হলেই হয়। ইংরেজ সম্পর্কে সিরাজের ধারণা কিঞ্চিৎ অদ্ভুত।

সিরাজ ভাবত, বিলেত দেশটাই যাযাবরের দেশ। সেখানে থাকে বড় জোর দশ বার হাজার লোক। দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায় তারা। এক তাড়া দিলেই মালপত্র ফেলে পালিয়ে যাবে। সেইজন্যই মারাঠাদের নিয়ে যখন আলিবর্দী বিপন্ন, তখন ভাবী নবাব নির্বিবাদে পরামর্শ দেয় ইংরেজদের আক্রমণ করতে। মাটীতে আগুন জ্বলছে। জলে আগুন জ্বললে নেভাবো কি করে?—নবাব শান্ত করেছিল সিরাজকে।

ইংরেজদের ওপর সিরাজের বিদ্বেষ তীব্র। অপরিণত বুদ্ধির বিদ্বেষ স্বভাবতই আত্মঘাতী। সভ্যতার এক বিশেষ বিন্দুতে এসে মানুষকে দুর্ভাগ্যের বোঝা বইতেই হয়। ইতিহাসের অভিশাপ এটা। শক্তি যখন একটা মানুষের চার পাশে স্তম্ভিত, অথবা শক্তির অর্থ যখন এক কিম্বা একদল মানুষ, তখন সেই মানুষটির খেয়াল খুসি ও স্বার্থের ওপর নির্ভর করে আরো অনেক মানুষের জীবন। অনন্তকাল যদি নাও হয়, তবে দীর্ঘ সময় অবধি ত নিশ্চয়ই। নবাবতন্ত্র গণতন্ত্র ও ব্যক্তিতন্ত্র অবধি একই শোকের কান্না।

বিচক্ষণ আলিবর্দী সিরাজকে খুব ভাল করে জানতো বলেই বোধহয় বলেছিল, 'আমার মৃত্যুর পর ওই টুপি পরা লোকগুলোই এ দেশ শাসন করবে।' তখন হয়ত নবাবের মনে করোমণ্ডলের ছবিই ভাসছিল। নবাব বলেছিল, 'সিরাজ যদি শিগগিরই ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, তা হলে সিরাজের রাজত্ব ইংরেজদের হাতে চলে যাবে।'

আলিবর্দীর কথা চিন্তা করার মত মানসিক পরিণতি ছিল না সিরাজের। যুক্তির চেয়ে আবেগ, সংযম ও শুদ্ধতার চেয়ে প্রবৃত্তি সিরাজকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়। সিরাজ সেইজন্য ইংরেজ বিদ্বেষী।

কেউ কেউ বলেছেন, ইংরেজরা দেশে যেভাবে অত্যাচার ও লুণ্ঠন করে যাচ্ছিল এবং ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করছিল, তা স্বদেশপ্রাণ তরুণ যুবক সহ্য করতে পারেনি। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়েই সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

অন্যদের মতে, সিরাজ দুর্বিণীত। ইংরেজরা তাকে এড়িয়ে যেত। দরবারে কোনদিনও অভিবাদন করেনি। কাশীমবাজার কুঠিতে ঢুকতে দেয়নি কয়েক বার। কেন না এই অসহিষ্ণু ভাবী নবাব জিনিষ পত্র ভেঙ্গে ফেলত। কোন জিনিষ নজরে ধরলে উঠিয়ে নিয়ে যেত। মান অপমানের জ্ঞান তার প্রখর। তা ছাড়া সিরাজের বদ্ধমূল ধারণা যে, ঘসেটি বেগম তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে, আর সেই ষড়যন্ত্রে ইংরেজরা জড়িত। ডাক্তার ফোর্থের সঙ্গে কথা বলার পর নবাব একদিন বলেছিল, সিরাজের অভিযোগ সত্য নয়। সিরাজ কিন্তু মানতে পারেনি সেই কথা। বলেছিল প্রমাণ দেব। প্রমাণ দেবার আগে মৃত্যু হল নবাবের। যাই হোক, এদের মতে সিরাজের ইংরেজ বিদ্বেষ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। দেশপ্রীতির নাম গন্ধ নেই।

কারণ যাই হোক, ফলটা পাওয়া গেল। সিরাজ কলকাতা আক্রমণ করলো।

কলকাতা আক্রমণের কারণ নিয়েও এক মত হতে পারেননি অনেকে। ইংরেজরা সিরাজের চক্ষুশূল। শুধুমাত্র অন্ধ বিদ্বেষ তাকে আক্রমণের পথে নিয়ে গিয়েছিল কি? অথবা অন্য কোন অভিপ্রায় ছিল তার? ইতিহাসে কাজ এবং কাজের ফল মূল্যবান। কিন্তু অভিপ্রায় একবারে মূল্যহীন নয়। ভাল উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করতে গিয়ে ফলটা মন্দ হতে পারে। তার ফল ভোগ করতে হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু সৎ উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হয় না চূড়ান্তভাবে। জীবনের জটিল পদ্ধতির ভেতর দিয়ে সেই আকাঙ্খা একদিন আত্মপ্রকাশ করে আর একবার। ধরায় ধুলো যত অবহেলাই হোক না কেন, জীবনের ধন কিছুই ফেলা যায় না।

সিরাজের কথায়ও কারণ আছে। কারণ আছে ইংরেজদেরও। প্রত্যেকে কোন না কোন কারণ খুঁজেও বার করে নেবে। কার্য কারণের সুষ্ঠু সম্পর্ক করতেই হবে। বুদ্ধির অগোচর কোন রহস্যকে মনে পুষে রাখতে আধুনিক মানুষ নারাজ। সুতরাং বহু কারণই থাকবে। তারা বিভিন্ন, স্বতন্ত্র।

তারা নিজের বোধ বুদ্ধি ও প্রবণতা অনুযায়ী গড়া। কিন্তু সময়ের সেই বিশেষ গ্রন্থিতে ওই বিশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পিছনে কোন্ সত্য যুক্তি, বুদ্ধি ও মানসিকতা ছিল তাদের? সেকথা কি নিশ্চিত করে জানা যায়?

নবাব মনের সত্যভাব গোপন করে আক্রমণের অন্য এক যুক্তি দিতে পারে। ঠিক তাই করতে পারে ইংরেজরাও। পরবর্তী কালের মানুষ দুটি মিথ্যা, কিম্বা অর্ধসত্য অথবা প্রচলিত প্রবাদের ওপর দাঁড়িয়ে তত্ত্ব রচনা করতে পারে। কিন্তু এতে সত্য কোথায়?

আরমানি বণিক বাজিদ আর মাদ্রাজের কুঠিয়াল পিগটকে দুটি চিঠি লিখে সিরাজ আক্রমণের কারণ জানিয়েছে।

বাজিদ নামকরা ব্যবসাদার। নুনের ব্যবসা তার একচেটে। বাদশা খুশি তার ওপর। পদবী দিয়েছিল, 'ফখর—অলতোজ্জার' বা 'বণিক গৌরব'। বাজিদের কাছে চিঠিতে সিরাজ বলেছিল যে, ইংরেজরা দুর্গ তৈরী করেছে। দেশের আইন ভেঙেছে তারা। দস্তক দেখালে নৌকা ছেড়ে দেয় সায়ের চৌকি। বাদশাহী পরোয়ানা অনুসারে শুধুমাত্র কোম্পানীর জিনিষ ঐভাবে যেতে পারে। কিন্তু ইংরেজরা দস্তকের সুযোগ নিয়ে ব্যক্তিগত ব্যবসা চালায় এবং কর ফাঁকি দেয়। নবাবের শত্রু কোম্পানীর পরম বন্ধু হয়ে ওঠে। নবাব যাকে অবাঞ্ছিত মনে করে অনুসন্ধান করতে লিপ্ত, ঠিক তাকেই আশ্রয় দেয় কোম্পানী। এই তিনটে কারণই কলকাতা আক্রমণের প্রধান কারণ।

পিগটকে চিঠিতে সিরাজ লিখেছে যে, কোম্পানীর ব্যবসা বাংলা সুবা থেকে তুলে দিতে নবাব অনিচ্ছুক। কিন্তু কোম্পানীর গোমস্তা রোজার ড্রেক বড়ই বর্বর। সে এমন এক ব্যক্তিকে আশ্রয় দিয়েছে, যার বিরুদ্ধে নবাব সন্দেহ পোষণ করেন। নবাবের তিরষ্কার অগ্রাহ্য করেও ড্রেক এখন লজ্জাকর কাজ করে যাচ্ছে।

বেকার ও ঢাকার কুঠির দৃঢ় ধারণা রাজবল্লভের ছেলে কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় না দিলে যুদ্ধ বাঁধতো না। ড্রেক ও হলওয়েল মনে করে যে, কৃষ্ণদাসের সঙ্গে যুদ্ধের কোন সম্পর্ক নেই। টুকের ধারণা কলকাতা সিরাজ আক্রমণ করতই। কৃষ্ণদাস উপলক্ষ্য মাত্র। কৃষ্ণদাসকে পাঠিয়েছে নবাব নিজে। ম্যানিংহাম কারণ অনুসন্ধান থেকে বিরত। তার ধারণা ব্যাপারটা রহস্যজনক। ক্লাইভের সঙ্গে সে যখন মুর্শিদাবাদে ছিল, তখন এই যুদ্ধের কারণ খোঁজ করবার অনেক চেষ্টাই করেছে। জগৎশেঠ বা অন্যান্য প্রধানেরা

কোন কারণ দেখাতে পারেনি। স্ক্রাফটনের মনে হয়েছে, এ খেয়ালী অত্যাচারীর আর একটা খেয়াল মাত্র। বেকার জানালো যে, মেজর কিলপেট্রিকের কাছে চিঠিতে জগৎশেঠ নাকি লিখেছিল যে, কৃষ্ণদাসকে আশ্রয় দেবার জন্যই সিরাজ রেগে আক্রমণ করেছে কলকাতা। এই চিঠি অবশ্য হারিয়ে গিয়েছে।

রাজবল্লভ বলেছিল যে, তার ছেলে আর বৌ যাচ্ছে জগন্নাথ মন্দিরে তীর্থ করতে। কৃষ্ণদাসের বৌ আসন্ন প্রসবা। কোম্পানীর কাছে আশ্রয় চায়। নাতি হবার পর বৌ শরীরে একটু বল পেলে, তারা জগন্নাথ ধামে চলে যাবে।

কৃষ্ণদাস আশ্রয় নিয়েছিল ১৬ই মার্চ। আলিবর্দী মারা গেল ৯ই এপ্রিল। ১৫ই এপ্রিল সিরাজ তার নাম করা চর নারায়ণ সিংকে পাঠালো কলকাতায়। নারায়ণের কাছে চিঠি ছিল সিরাজের। সিরাজ বলেছিল, পত্রপাঠ মাত্র কৃষ্ণদাসকে মুর্শিদাবাদে পাঠাতে। কিন্তু ড্রেক নারায়ণ সিংকে স্বীকার করতে চায়নি। অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছিল। কাজটা ভাল হয়নি ভেবে ড্রেক চিঠি লেখে কাশীমবাজার কুঠির ওয়াটস্‌কে। ওয়াটস্‌ উজীর ওমরাহকে হাত করে ব্যাপারটা ধামা চাপা দিয়েছিল।

কিন্তু ইতিমধ্যে খবর এলো যে, ইংরেজ আর ফরাসীরা তাদের দুর্গ সংস্কার, তোপ পরিষ্কার ইত্যাদি করে যুদ্ধের গোছগাছে ব্যস্ত। নবাবকে আর থামানো গেল না।

ফরাসী ও ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন। বিলাতের মালিকরা তৈরী থাকতে হুকুম দিয়েছে। খবর পেয়েছে কোম্পানী যে ফ্রান্স থেকে এক জাহাজ সৈন্য আমদানি করা হয়েছে চন্দননগরে। ইংরেজরা তাই পুরাণো দুর্গ সংস্কার করেছে, বুঁজে আসা মারাঠা খাতকে নতুন করে কেটেছে। বাগবাজারের কাছে বসিয়েছে নতুন বুরুজ। কিন্তু নবাবের চর একটু দক্ষ। এখানে থামেনি সে। কেলসেন সাহেবের বাগানে আটকোণা বাংলো তৈরী হয়েছে হালফিল। চর ভাবলো ওটাও বুঝি নতুন দুর্গ।

খবর পেয়ে হুকুম পাঠালো নবাব, 'নতুন কেল্লা তৈরী করা বন্ধ কর। বাগবাজারের বুরুজ ভাঙতে হবে। আর মারাঠা খাত বুজিয়ে ফেলতে হবে এখুনি।'

হুকুম দিয়ে নবাব ছুটলো পূর্ণিয়ায় শওকতের সঙ্গে মোকাবিলা করতে। শওকতের বিরুদ্ধে এখুনি কিছু করা দরকার। সিরাজ নবাব। কিন্তু

দিল্লীর বাদশা এখনও জীবিত। নামমাত্র হলেও বাদশাহের অধীনে নবাব। সিরাজকে সুবাদার হিসেবে নিয়োগ করে ফর্মান আসেনি বাদশার। ওদিকে শওকৎ দিল্লীর দরবারকে হাত করে নিজের নামে বাদশার ফর্মান আদায় করতে চেষ্টা করছে। খবর পেয়েই নবাব ছুটলো পূর্ণিয়ায়। সরফরাজ আলিবর্দীকে সময় দিয়েছিল। তাই সরফরাজ পারেনি। সিরাজ কোন সময় দিতে চায় না। পূর্ণিয়ার দিকে চললো নবাব।

ড্রেকের উত্তর গিয়ে পৌছলো। নবাব তখন রাজমহলে। ড্রেক লিখেছে যে নবাবের অভিযোগ সত্য নয়। তারা নতুন দুর্গ তৈরী করেনি। পুরানো দুর্গের সংস্কার করেছে মাত্র।

উত্তর পেয়ে নবাব ক্ষিপ্ত। পড়ে থাকলো শওকৎ। হাতীর মুখ ঘুরালো সিরাজ মুর্শিদাবাদের দিকে।

ড্রেকের চিঠি হারিয়ে গিয়েছে। পাওয়া যায় চিঠির মর্ম। কি ভাষায় চিঠিটা লেখা হয়েছিল তা বোঝবার উপায় নেই। তবে চিঠির মর্ম মারাত্মক নয়।

সিরাজ হয়ত দাদুর কথা ভেবেছিল। আলিবর্দী বলেছিল ইংরেজ আর ফরাসী নবাবের প্রজা। তাদের কেল্লার দরকার নেই, তোপের প্রয়োজন নেই। তাদের রক্ষা করার দায়িত্ব নবাবের। সিরাজও ভেবে থাকতে পারে যে, কোথায় কোন সমুদ্র পারে ইয়োরোপ নামে এক জায়গা আছে। সেই ইয়োরোপের ঝগড়ার ঝাপটা এখানে টেনে এনে তার নবাবীত্বকে অপমান করছে ইংরেজরা। ওয়াটস্ অবশ্য ভেবেছিল যে নারায়ণ সিং অপমানের কথাটা তখনই জানিয়েছিল নবাবকে। নবাব তাই এতটা ক্ষিপ্ত।

ওমরবেগ বারো হাজার সৈন্য নিয়ে কাশীমবাজার কুঠির সামনে তাঁবু গাড়লো। নবাবী সৈন্যরা মাঝে মাঝে ভ্রমণ করে। কুঠি স্বাভাবিকভাবে কাজ কর্ম করে যায়। পরের দিন এলো আরো সৈন্য আর হাতী। তুরী ভেরী বাজতে লাগলো। চঞ্চল হয়ে উঠলো কুঠিয়াল।

কুঠিতে সৈন্য থাকে না। আলিবর্দীর কাছেই বলেছিল ডাক্তার ফোর্থ।

নবাব জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমাদের কাশীমবাজারে ওটা কেল্লা না কুঠি? সেখানে কত সৈন্য থাকে?'

জবাব দিয়েছিল ডাক্তার, 'যা নিয়ম, তার বেশী থাকে না। কর্মচারী নিয়ে চল্লিশ। বর্গীর হাঙ্গামার সময় থাকতো আরো কিছু বেশী। হাঙ্গামা মিটে যাবার পর তারা চলে গেছে।'

বারো হাজারের চেয়েও বেশী সৈন্য হাতী ঘোড়া কামান বাইরে। আর কাশীমবাজার দুর্গ নয়, কুঠি। আগে কুঠি ছিল একবারে অরক্ষিত। শোভা সিংহের বিদ্রোহের সময় কুঠির চার পাশে পাঁচিল তুলে কামান পাতার বুরুজ তৈরী করা হয়েছিল। বর্গীর সময় কেবল নতুন বুরুজ হয় চারটে। তখন কুঠিতে ছিল মাত্র পঁয়ত্রিশ জন গোরা। আর এ দেশের লোক লস্কর কয়েকজন মাত্র। তাই যুদ্ধের প্রস্তুতি করে কি লাভ? বিমূঢ় হয়ে বসেছিল কাশীমবাজারের ইংরেজ কুঠি।

দুর্লভরাম খবর পাঠিয়েছিল ডাক্তার ফোর্থকে। বাগবাজারের গড় আর কেলসেন সাহেবের বাগান বাড়ী ভেঙে ফেললে নবাব শান্ত হবে। ওয়াটস্ নবাবের কাছে গেলে কুঠি বাঁচতে পারে।'

ওয়াটস্ গিয়েছিল দরবারে। নবাব অপমান করে বলেছিল, 'মুচলেখা দিতে হবে।'

ওয়াটস্ রাজীও হল। মুচলেখা লিখে দিল যে বাগবাজারের দুর্গ প্রাকার ভেঙে দেওয়া হবে। দস্তক দেখিয়ে নবাবের কত টাকা রাজস্ব ফাঁকি দেওয়া হয়েছে তার হিসেব দিতে হবে এবং ক্ষতিপূরণ করতে হবে। নবাবের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য যারা কলকাতায় আশ্রয় নিতে যাবে, তাদের আশ্রয় দিতে পারবে না। হলওয়েলের ক্ষমতা কেড়ে নিতে হবে। মুচলেখায় সই করলো ওয়াটস্ সাহেব। সাক্ষী থাকলো আরো দু'জন ইংরেজ।

ওমর বেগ কেল্লা অধিকার করেছে ২রা জুন। কুঠির সেনাপতি ইলিয়ট অপমান সইতে না পেরে আত্মহত্যা করেছে। পালিয়ে গিয়েছে কুঠির কেরানীরা, জামিনে মুক্ত ওয়ারেন হেষ্টিংস। আশ্রয় দিয়েছে কান্তবাবু। লোকে ডাকতো কান্তমুদি। কান্তমুদি কাশীমবাজার রাজবাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা।

নবাবের ভয়ে কান্ত নিজের ভবনে।
সাহেবকে রেখে দেয় পরম গোপনে॥
সিরাজের লোক তার করিল সন্ধান।
দেখিতে না পেয়ে শেষে করিল প্রস্থান॥

কান্তমুদি বড় অনুগত। সাহেবকে যত্নে রাখার কোন ত্রুটি করেনি। কিন্তু কি খেতে দেবে সাহেবকে?

ঘরে ছিল পান্তা ভাত আর চিংড়ি মাছ।
কাঁচা লঙ্কা বড়ি পোড়া আর কলা গাছ॥

সেদিন কাশীমবাজারে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছিল।

সূর্যোদয় হল আজি পশ্চিম গগনে।
হেষ্টিংস ডিনার খান কান্তর ভবনে॥

কাশীমবাজার দখল করে থেমে যায়নি সিরাজ। ইংরেজকে বুঝিয়ে দিতে হবে বাংলায় এখনো নবাব আছে। এক পাটি চটি জুতো দিয়ে তাদের শাসন করতে হয়। গৌরবে আঘাত লেগেছে সিরাজের। সিরাজ এগিয়ে যায় কলকাতার দিকে।

সিরাজ যে সত্যি সত্যি কলকাতা জয় করতে যাচ্ছে—এ কথা ভাবতে পারেনি অনেকেই। এমন কি ওয়াটস্‌ও। সে ভেবেছিল বেশ মোটা টাকার নজরাণা দিলে শান্ত হবে নবাব। ওমর বেগের ধারণা যে, নবাব ইংরেজদের ভয় দেখাতে চায়। ওদিকে গোলাম হোসেন মনে করেন যে দরবারের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা সিরাজের ওপর এতই বীতশ্রদ্ধ যে তার কাজের ওপর কেউ কথা বলত না। তা ভিন্ন ব্যাপারটা এতদূর গড়াতো না কিছুতেই।

কিন্তু ব্যাপার গড়াচ্ছে। গড়াতে গড়াতে যে এমন ভীষণ জায়গায় এসে থামবে, তা ভাবতে পারেনি নবাব অথবা কোম্পানী। হয়ত কিছুটা অনুভব করতে পেরেছিল সিরাজের মা আমিনা বেগম আর জগৎশেঠ মহাতপ রায়।

আমিনা বেগম ছেলেকে বারণ করেছে, তিরস্কারও করেছে। সিরাজ মানেনি। সিরাজ হয়ত ভেবে থাকতে পারে যে ডাঙার আগুন যখন নিভে গিয়েছে, তখন জলের আগুন নেভাতে সে পারবে। আলিবর্দীর কথা সে রাখছে।

বারণ করতে এসেছিল জগৎশেঠ মহাতপ রায় আর মহারাজ স্বরূপচাঁদ। জগৎশেঠরা জানে ভারতবর্ষের সঠিক খবর, রাজনীতির উত্থান-পতন, রাজস্বের হিসাব-নিকাশ। বর্গীর হাঙ্গামার সময় বুঝতে পেরেছে যুদ্ধের মানে। জগৎশেঠ বোঝাতে চেয়েছিল যে ইংরেজরা আসলে নিরীহ ব্যবসাদার। ব্যবসায় দেশের লাভ হচ্ছে। সুতরাং নবাবের এতটা রাগ বোধহয় বাড়াবাড়ি।

ইংরেজদের ওপর ফতেচাঁদের গভীর বিশ্বাস। মহাতপ রায় আর স্বরূপ-চাঁদেরও আস্থা অটুট। কিন্তু নবাবের ঘোরতর অবিশ্বাস। নবাব উত্তরে ফর্দ দিয়েছিল, কতবার কতভাবে ইংরেজরা তাকে অপমান করেছে। কৃষ্ণদাসকে কলকাতায় ঠাঁই দিয়ে তারা নবাবের ক্ষমতাকে হেয় করেছে। এমন কি এই কাশীমবাজারে, কুঠিয়াল একবার তাকে কি অপমানই না করেছে।

নবাব তার মা আমিনা বেগমকে নিয়ে কুঠিতে গিয়েছিল। ঢুকতে দেয়নি কুঠিয়াল। সে অপমানের কথা মনে করলে রী রী করে ওঠে নবাবের সারা শরীর।

জগৎশেঠ নবাবকে চতুর বৈষয়িকের মত বোঝাতে চেয়েছিল যে এখন যুদ্ধ করলে অমঙ্গল হতে পারে। কোন পরামর্শই কানে তোলেনি সিরাজ। বরং জগৎশেঠের কাছ থেকে শপথ আদায় করে নিয়েছিল যে এই বিবাদে তারা কোন কথা নবাবকে বলতে আসবে না। নবাবের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ হলেই দরবারে কোম্পানীর পক্ষে ওকালতি করে শেঠবাড়ী। সিরাজ নিজের চোখে অনেকবার দেখেছে সেই সব ঘটনা। এ বিবাদেও জগৎশেঠ আসবে, আসতে হবে। জানতো সিরাজ। কিন্তু নবাব তা পছন্দ করে না। চুপ করে ফিরে যায় শেঠরা। এরপর আর কেউ কোন কথা বলতে সাহস করেনি নবাবকে।

৯ই জুন মুর্শিদাবাদ থেকে বেরিয়ে ১৬ই জুন নবাব এল কলকাতায়। ২০শে তারিখে কলকাতার দুর্গে নবাবের দরবার হল। প্রাণ নিয়ে কেউ কেউ আশ্রয় নিয়েছিল ফরাসী আর ওলন্দাজদের কুঠিতে। ছোট ছোট ডিঙিতে ছেলেমেয়েদের নিয়ে কেউ কেউ গেল ফলতায়। তাদের সঙ্গে ড্রেক সাহেব। ছ'মাস অপেক্ষা করে আছে। দুর্গতির সীমা নেই। নবাবের ভয়ে সামনাসামনি জিনিষপত্র বিক্রী করে না কেউ। রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে আসে গ্রামের লোক। সামান্য কিছু খেয়ে কোনমতে প্রাণ বাঁচায়। নবকেষ্ট, পরে যিনি হলেন রাজা নবকৃষ্ণ, এ সময় সাহায্য করেছিল ইংরেজকে। খাবার যদিবা পাওয়া যায়, বর্ষায় শরীর টেঁকে না। রোগের কামাই নেই। বিপদে দিন কাটছে কুঠিয়ালদের।

খবর পেয়ে মাদ্রাজ থেকে আসে মেজর কিল্‌পেট্রিক। কিছুতেই কিছু হবার নয়। দুপাশে ধানের খেত। মাঝ নদীতে জাহাজ। খাবার নেই, ওষুধ নেই। আছে রোগ। রোজ মারা যায় একজন না একজন। যে সমস্ত সৈন্য নিয়ে এসেছিল কিলপেট্রিক, তাদের অনেকেই আর নেই। বাধ্য হয়ে মেজর সাহেব মিনতি করে চিঠি পাঠায় নবাবকে। আরো একটু সদয় হতে। অন্তত প্রজারা যেন নির্ভয়ে তাদের কাছে জিনিষপত্র বিক্রী করতে পারে।

উমিচাঁদ মেজরের কাছে পাঠায় আরমানি পিজ্রু আর আবরাহাম জেকবকে। উমিচাঁদ নামকরা ব্যবসায়ী। আসল নাম তার আমীর চাঁদ।

জাতে শিখ। অগাধ তার টাকা। লোকে তার দাড়ির জন্য মনে রাখতো আরও বেশী করে। কথায় বলত উমিচাঁদের দাড়ি আর জগৎশেঠের কড়ি। জগৎশেঠের সঙ্গে উমিচাঁদের খাতির খুব। টাকা পয়সার লেনদেনও ছিল খুব বেশী। অনেকের ধারণা উমিচাঁদ আসলে জগৎশেঠের দালাল। যাই হোক পিক্রর হাতে চিঠি পাঠালো উমিচাঁদ। লিখলো, 'জগৎশেঠের কাছে যাও।'

উমিচাঁদ ইংরেজদের পাকা বন্ধু। বন্ধু না হলে এই বিপদে অযাচিত পরামর্শ ই বা কেন দিতে আসবে? কথাটা ভালই। জগৎশেঠ মানী লোক। দরবারে তার প্রতিপত্তির কথা কারো অজানা নয়। ইংরেজরা জানে শেঠবাড়ী কোম্পানীর বন্ধু। কথামত চিঠি লেখা হয়েছিল। কিন্তু উমিচাঁদ সেই চিঠি পাঠায়নি মুর্শিদাবাদে।

ইতিমধ্যে হাওয়া বইতে সুরু করেছে অন্যদিকে। সময় পেয়েছিল শওকৎজঙ্গ। কোম্পানীকে শিক্ষা দেবার জন্য রাজমহল থেকে ফিরে এসেছে নবাব। পূর্ণিয়ায় যাওয়া হয়ে ওঠেনি। কলকাতা জয়ের পর সিরাজ ভাবলো এইবার শওকতের পালা। শুভলগ্নে জন্ম তার। তার গতি অপ্রতিরোধ্য।

ছাব্বিশ

বাদশার দরবার থেকে ফর্মান আনিয়ে দেওয়া জগৎশেঠের রীতি। ফর্মান না আনানোর জন্য রেগে গিয়েছিল সরফরাজ। সিরাজও ভেবে থাকবে তার জন্যে ফর্মান আনাবে মহাতপ।

শওকৎজঙ্গ দিল্লীর উজীরকে হাত করেছে। খবর পেয়ে ছুটেছিল নবাব পূর্ণিয়ায়। পথ থেকে ফিরে এল। ইংরেজদের নিয়ে ব্যস্ত। সেই অবসরে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে শওকৎ। শোনা যায় মুর্শিদাবাদের গণ্যমান্য লোকেরা গোপনে সাহায্য করেছে শওকৎকে। চুপ করে থাকা ভাল নয়। যেতে হবে, ঠিক করে সিরাজ। কিন্তু তার আগে জগৎশেঠের সঙ্গে ফয়সালা করা দরকার।

সিরাজের মনে যাই থাক, ব্যবহার তার খুবই রূঢ়। কাছে তাই কেউ

আসতে চায় না। ছুট বেছুট কখন কি বলে তার ঠিক নেই। নিজের মান নিজের কাছে। সম্ভব হলে পরিহার করে চলে মন্ত্রীরা।

সিরাজ ভাবে মসনদে বসার আগে থেকেই তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত চলছে। মনে তাই সর্বদা আশঙ্কা। ভয় থেকে আসে উগ্রতা। উগ্রতার নামই সিরাজ। পিঠো-পিঠি কয়েকটা জয়ের পর অনেক ভরসা পেয়েছে সে। নিজেকে যতটা অসহায় ভেবেছিল, ঠিক ততটা দুর্বল সে নয়। বুদ্ধিপ্রবণ মানুষ এ সব ক্ষেত্রে সংহত ও বিবেচক হয়। আত্মপ্রত্যয় উদ্বেলতায় বিরোধী সিরাজ আবেগপ্রবণ। ঝোঁকের মাথায় কাজ করে। আবেগই তার কর্মশক্তির উৎস। জন্ম তার শুভলগ্নে। দাদুর আদর না থাক, আছে ভাগ্যের আস্কারা।

জগৎশেঠকে সে কেন ভয় পাবে? সে নবাব। তার হাতে শক্তি, ক্ষমতা, সৈন্য সব কিছু। মুখের কথা আইন। তাকেও যদি সামান্য একজন বেনেকে সমীহ হয়ে কথা বলতে হয়, তবে ধিক্ তার নবাবীতে। নবাব তাই জগৎশেঠদের বলত, শূকর।

পুরানো কর্মচারীরা নবাবের ওপর বিরূপ। সাধ করে অবশ্য হয়নি। নবাবের ব্যবহারই নবাবের শত্রু। আলিবর্দী সিরাজের মেজাজ জানতো। তাই আশঙ্কাও ছিল। বৃদ্ধ নবাব বলেছিল যে, সিরাজ একদিন সবাইকে দূরে ঠেলে দেবে। এমনকি তার দিদিমার সঙ্গে অবধি তিন দিনের পর চারদিন বাস করতে পারবে না। দিদিমার সঙ্গে যদি সে না থাকতে পারে, তবে অন্য কারো সঙ্গে ত পারবেই না।

বর্গীর হাঙ্গামার পর সবাই বুঝেছে সেনাবাহিনী বড় দুর্বল। ওদের ভেতর আনুগত্য বলে কিছু নেই। না ব্যক্তির প্রতি, না মসনদের প্রতি। দেশের কথা ত ওঠেই না। জগৎশেঠও খুব ভাল ভাবে বুঝতে পেরেছে বলে ইয়ার লতিফকে বশ করেছে টাকা দিয়ে। প্রয়োজন হলে ইয়ার লতিফ নবাবের বিরুদ্ধে গিয়েও শেঠবাড়ী রক্ষা করবে।

মহাতপের দূরদৃষ্টি আছে। সিরাজ আলিবর্দীর মৃত্যুর আগে থেকেই বুঝতে পেরেছে সেই সর্বনাশা দিন হয়ত আসবে। অ-প্রস্তুত হয়ে থাকা ঠিক নয়। ভবিষ্যত ভেবে কাজ করতে হবে। ঝোঁকের মাথায় কাজ করলে চলবে না। এক পা চলার আগে দশবার ভেবে নিতে হয়। ভবিষ্যত বড় রহস্যময়। কী আছে কে বলতে পারে? আজকে বসে বড় জোর আগামীকালের একটা ঝাপসা চেহারা আন্দাজ করা চলতে পারে। তার

বেশী আর কিছু বোঝা যায় না। ভবিষ্যত বড় অনিশ্চিত। তবু ভবিষ্যতের জন্যেই ত সব।

ভবিষ্যতের ভাবনা নেই সিরাজের। প্রথমেই সে বিরূপ করেছে সেনাপতিদের। মীরজাফর, রহিম খাঁ, ওমর খাঁ সিরাজ বিরোধী। বেশ কয়েকদিন দরবারেই আসেনি মীরজাফর। পুরাতন মন্ত্রী নবীন নবাবের চক্ষুশূল। রাজা দুর্লভরাম অপমানিত হয়ে দরবার থেকে চলে এসেছে কয়েকবার। আশঙ্কা-তাড়িত সিরাজ আশঙ্কার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে চোখের পলকে। নিজেকে বিপদমুক্ত করার অন্ধ তাগিদে নিজেকেই জড়িয়ে ফেলেছে বিপদের ব্যূহে।

জগৎশেঠ মহাতপ রায় আর মহারাজা স্বরূপচাঁদও জানতো যে, একদিন না একদিন নবাবের খেয়ালে তাদের মাথা নীচে নেমে আসবে। জানতো, যে দরবারে তারা চিরদিন সম্ভ্রম ও গৌরব পেয়ে এসেছে, সেই দরবার থেকে অপমানের বোঝা কাঁধে করে ফিরতে হবে মহিমাপুরে।

কিন্তু অপমান মাথায় নিয়েও কি বাঁচানো যাবে মহিমাপুর? যদি একদিন অভাবে কিম্বা স্বভাবে সিরাজের সৈন্য ঘেরাও করে মহিমাপুরের গদী, সেদিন কি বাঁচতে পারবে তারা? যে গদীকে কত ঝড় ঝাপটার ভেতর দিয়ে মাণিকচাঁদ, ফতেচাঁদ সমৃদ্ধির চূড়ায় এনেছে, সে গদী কি সিরাজের আক্রোশ থেকে বেঁচে যেতে পারবে? যদি গদীই যায়, তবে কি থাকবে তাদের? তারা রাজনীতি করতে আসেনি। মসনদের ওপর কোন লোভ নেই তাদের। কে নবাব হবে এই ঘটনাটুকু তাদের ভাবতে হবে এই জন্য, যে নবাবীর সঙ্গে তাদের ব্যবসার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ। শওকৎ জঙ্গ যদি নবাব হত অথবা নাওয়াজেস, তাদের কিছুই বলার থাকত না। কেন বলতে যাবে। ফতেচাঁদ কোনদিন চক্রান্তের জালে জড়িয়ে পড়ত না যদি সরফরাজ হত নির্ভরযোগ্য নবাব। মহিমাপুরকে বাঁচাতে ফতেচাঁদ যোগ দিয়েছিল হাজীর সঙ্গে। শুধুমাত্র মহিমাপুরই বাঁচেনি, বেঁচেছে সুবা বাংলা। চক্রান্ত করা কি জঘন্য? যদি হয়, হোক। এই সামান্য অনিবার্য প্রয়োজনীয় 'জঘন্য' কাজটুকু না করলে কি বাঁচতো মহিমাপুরের গদী, সুবা বাংলার মসনদ? জীবনের ভেতরেই হিংস্রতা লুকিয়ে আছে। হিংস্র না হলে বাঁচা যায় না। মহাতপরা বাঁচতে এসেছে। বাঁচতে হবে। বাঁচার জন্য যা কিছু প্রয়োজনীয়, তাই শ্রেয়। প্রিয় নাই বা হল। তারা

ব্যবসাদার। শ্রেয় আর প্রেয়ের দার্শনিক দ্বন্দ্বের চেয়ে বাট্টার হিসাব অনেক সহজ, অনেক উপভোগ্য।

সিরাজকে পছন্দ করেনি মহাতপ। পছন্দ করলে নিশ্চয়ই বাদশার ফর্মান আনত। ফর্মান আনানো ত তার কাজ নয়। সৌজন্য মাত্র। সে সৌজন্য দেখায়নি মহাতপ। কিন্তু সিরাজের বিরুদ্ধে বাদশার দরজায় প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ কোন প্রভাব বিস্তারও করেনি। একটা কথাও বলেনি শওকতের পক্ষে। বাদশার ক্ষমতা কমে আসতে পারে। দিল্লীর গৌরব স্মৃতি হতে পারে। তবু বাদশা এখনো বাদশাই। আর এই সময় যখন চক্রান্ত ফণা তুলে চরম মুহূর্তের জন্য অপেক্ষাতুর, তখন শেঠরা যদি বাদশার দরবারে সিরাজের বিরুদ্ধে কোন কথা বলত, শক্তিমান হয়ে উঠত না চক্রান্তকারীরা? জন্মলগ্ন যত শুভই হোক সিরাজের, দুর্ভাগ্য ঘনাত নিশ্চয়ই। সিরাজের ওপর যত বিরূপই হোক না শেঠেরা, তখনও অবধি শত্রুতা করেনি নবাবের। দরবারে অপমান সহ্য করেও চুপ করে থেকেছে।

মহাতপ ব্যবসাদার। তার জাত-ই আলাদা, চেহারা আলাদা। রুচি প্রবৃত্তি ও পৌরুষে তারা নবাবী দরবারে বেমানান। তাদের আত্মীয় নয় সিরাজ। তাদের আত্মীয় নয় রাজা দুর্লভরাম। সামন্ততন্ত্রের ক্ষুদ্র ও অসুস্থ পরিসরে উঠতি বৈশ্যতন্ত্র অদ্ভুত স্বতন্ত্র।

ফতেচাঁদ যে শব্দ অস্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিলো, যে অশরীরী ভয়ে বিচলিত হয়েছে মাঝে মাঝে, মহাতপ রায় সেই শব্দ স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে। ব্যবসা পাতির মন্দা, বাজার দর চড়া, চাষীদের ওপর বাড়ন্ত চাপ। কুঠির শিল্পের ভাঙন ধরেছে। এই অবস্থা যদি অব্যাহত থাকে, তবে কোন উপায় নেই। ধ্বংস অনিবার্য।

বড় দুঃসময়ে মারা গিয়েছে আলিবর্দী। মুর্শিদকুলির মত বিচক্ষণ, আলিবর্দীর মত কঠোর কোন নবাব আসত যদি সুবা বাংলা বাঁচতো বোধ হয়। চিরকাল না বাঁচলেও অন্তত কিছুকাল। অন্তত বৈশ্যতন্ত্র পুঁজি করে পথ করে দিত স্বদেশী, স্বাভাবিক ধনতন্ত্রের। যদি কারো থাকতো কোম্পানীর মত সংগঠনের ক্ষমতা, ব্যবসার প্রতি নিষ্ঠা, তা হলে বাঁচানো যেত হয়ত সুবাকে। কিন্তু সুবাকে বাঁচানো না গেলেও বাঁচাতে হবে মহিমাপুর। ভারতবর্ষ জোড়া তাদের অসংখ্য গদীকে চালিত করতে হবে ধীরভাবে। তাই দু'পাশের আগুনের ভেতর দিয়ে গা বাঁচিয়ে চলতে চায় শেঠরা।

হলকা একদিন ছোবল মারলো। শওকৎ অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছে। যদি

শেঠরা বাদশার দরবারে সিরাজের জন্ত আর্জি পেশ করতো, তবে কোথায় থাকতো শওকৎ? কিন্তু কিছুই করেনি তারা। আশঙ্কা-তাড়িত সিরাজ আবার উগ্র হয়ে উঠলো। শওকতের সঙ্গে তবে কি যোগ দিয়েছে তারাও? সিরাজের মনে সন্দেহ। প্রকাশ্য দরবারে অপমান করলো জগৎশেঠ মহাতপ রায়কে—বাদশার ফর্মান অনুযায়ী যে সম্মান ও প্রতিপত্তিতে নবাবের সমতুল্য। সংযম ও সিরাজ পরস্পর বিরোধী। তার একবার মনেও হয়নি বাসুকীর ফণা টলে উঠলে ওলট পালট হয়ে যাবে সব। কিন্তু জন্ম তার শুভক্ষণে। সে কারো পরোয়া করে না।

পরোয়া করে না কে থাকলো আর বাঁচলো। কে থাকলো আর কে থাকলো না এই নিয়ে শেঠেরাও খুব বিব্রত নয়। দুজনের চিত্তবৃত্তির একই সান্ত্বনা—আত্মতৃপ্তি। কিন্তু নবাব জমিদার রাজারা বড় উগ্র। তাদের লোভ ও লালসা ভীষণ। হাড় মাংস শুষে নিতে চায়। নিংড়ে নিংড়ে ছিবড়ে করেও শান্তি পায় না এরা। দুষ্ট কাপালিকের শব-সম্ভোগের কথা মনে আসে। জরাগ্রস্থ কামুকের মারাত্মক আলিঙ্গন যেন। মৃত্যু আসন্ন দেখে শেষ ইচ্ছা পূরনের উগ্র ব্যাকুলতা। কে থাকবে আর কে থাকবে না তার ভাবনা ওদের নয়। ওদের দিন প্রায় শেষ। মহাতপ যেন দেখতে পায়, মসনদের চারপাশে কয়েকটা খুদে নাদির শা। লুটপাট করে নেবে সব।

জগৎশেঠরাও তাই। তবে তারা ভাবে। কারণ তারা হতাশ নয়। ভবিষ্যত তাদের রহস্যাবৃত। কিন্তু অন্ধকার নয়। পাঁচিলে মাথা ঠুকে ঠুকে ব্যর্থ হতে আসেনি। তারা উঠবে। রক্ত চন্‌মন্ করে। নিংড়ে নিতে অপারগ নয় তারা। হাড় মাস শুষতেও অকুণ্ঠিত। কিন্তু তারা মারে না। জানে, দুধ পেতে হলে গরুকে জাবনা দিতে হবে। তাকে অনাহারে রেখে কতদিন দুধ পাওয়া যাবে?

জগৎশেঠরা ব্যবসাদার। সিরাজের মত ধারণা নয় তাদের। তারা ভাবে না ইয়োরোপ মানে দশ বারো হাজার বাউণ্ডুলে লোকের আড়ৎ। তারা ভাবে ইয়োরোপ মানে একটা বিরাট কিছু। তারা বড় হতে চায়। বিরাট বড়। প্রসারিত করতে চায় তাদের ব্যবসা। চীন থেকে বিলেত অবধি নয়। তার চেয়ে আরো বড় পরিসরে ছড়াতে চায় নিজেদের। শেঠবাড়ীর নাম, শেঠবাড়ীর টাকা থাক সেখানে। সেখানকার লোক এসে ধার নিক, বাঁট্টা দিক। এমন কি ওই মর্ত্যলোকের ওপারের দেবতারাও যদি বাণিজ্য করতে চায়, তৈরী আছে জগৎশেঠ। তারা চায় বাণিজ্য চলুক।

সারা ভুবন জুড়ে বাণিজ্য। ক্ষুধা তাদের স্বাস্থ্যবানের। তারা চায় যেন দেশের ব্যবসার ক্ষতি না হয়।

সিরাজ দাবী করে বসলো তিন কোটি টাকা তুলে দিতে হবে। দাদুর আদুরে নাতি সিরাজ। অত বড় বর্গীর হাঙ্গামার সময়ও সিরাজকে খুশী করতে নতুন আবোয়ার বসিয়েছিল প্রজাদের ওপর। নবাব বুঝতে পেরেছিল ভারটা কত ভয়ানক। কিন্তু বোঝেনি সিরাজ। ঘসেটির মতিঝিল থেকে ষাট লাখ টাকা, আর নাওয়াজেসের যাবতীয় ধনরত্ন নিয়ে এসেছে। আজ আবার তিন কোটি টাকার দাবী। একগুঁয়ে নবাব। জিদ ধরলে আদায় করবেই।

প্রতিবাদ করেছিল মহাতপ। বলেছিল, 'এই অবস্থায় নতুন কর আদায় করা যাবে না। কারো হাতে টাকা নেই। হাঙ্গামার পর শান্তি আসেনি এখনও। এই সময় প্রজাদের ওপর অত্যাচার করা ঠিক হবে না।'

দেশের বাজারের হালচালের অনেক কথাই হয়ত বলেছিল মহাতপ। ভেবে থাকবে, বুঝি সন্ধ্যার অবসরে নবাব আলিবর্দীর সঙ্গে প্রাত্যহিক আলোচনা করছে সে। কিন্তু ভুল ভাঙলো নবাবের এক চড়ে। নবাবের মুখের ওপর কথা বলার মত বেয়াদপি কি করে পায় মহিমাপুরের শেঠেরা? স্তম্ভিত হয়ে থাকলো মহাতপ। রাগ পড়েনি নবাবের। সেপাই টানতে টানতে মহাতপকে নিয়ে গেল গারদে।

সৈন্য নিয়ে পূর্ণিয়ার দিকে যাচ্ছিল তখন মীরজাফর। মাঝ পথে খবর পেয়ে ফিরে এল মুর্শিদাবাদে, সেদিনটা ১০শে আগষ্ট। পূর্ণিয়ার শওকৎ তখন বাদশাহী ফর্মান অনুযায়ী বাংলার নবাব। বাংলার প্রায় দুশ নৌকা আটক করেছে সে। থাকলো শওকৎ। মীরজাফর অন্যান্য মন্ত্রী এবং সেনাপতিদের নিয়ে নবাবের কাছে গেল। অনুরোধ করলো মহাতপকে ছেড়ে দিতে। অনুরোধ রাখেনি সিরাজ। বাংলার দ্বিতীয় নবাব জেলখানায়। বাধ্য হয়ে মীরজাফরের দল তখন বলেছিল, 'আমরা নবাবের অধীনে হলেও, নবাব সম্রাটের অধীনে। সম্রাটের ফর্মান না আসা পর্য্যন্ত আমরা নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করতে পারবো না।'

আলিবর্দী-পত্নীর হস্তক্ষেপে ছাড়া পেল জগৎশেঠ। সিরাজ এইবার বোধ করলো শুধুমাত্র মীর মদন আব মোহনলালকে দিয়ে রাজ্য চালানো কঠিন।

যুদ্ধ হয়েছিল শওকতের সঙ্গে। কপালে বুলেট লেগে মারা যায় শওকৎ। সিরাজ খুব খুশী। আর তার প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। এইবার ইংরেজের পালা।

মুর্শিদাবাদ থেকে মহিমাপুরে ফেরার পথে নিশ্চয় মহাতপ একবার তাকিয়েছিল মসনদের দিকে। দেখেছিল ক্ষমতার প্রতীক স্তব্ধ, তুহিন। দেশের সমস্ত বিত্তবানের পুঁজি তার হাতে। তার কাছে হাত পাতে দিল্লীর বাদশা থেকে গ্রামের মহাজন। তার কথায় ওঠে বসে রাজা, জমিদার। অথচ সেই রাজা জমিদারের স্বগোত্র নবাব তাকে অপমান করতে দ্বিধা করেনি। সে কি শুধু ওই ক্ষমতার স্তব্ধ তুহিন প্রতীকটির জন্য ?

ক্ষমতা চায় মহাতপ। কিন্তু কি ক্ষমতা পাবে ? এক সিরাজের বদলে অন্য সিরাজ আসবে। কি লাভ হবে ? জমিদার আর রাজার ক্ষুদ্র ও হিংস্র লড়াই থেকে দূরে থাকতে পারবে না তো। মহাতপ নিশ্চয় তাকিয়ে দেখেছিল মাঠের শেষ প্রান্তে গ্রামের দিকে। সন্ধ্যার অন্ধকারে মিট মিট করে প্রদীপ জ্বলছে। রাশি রাশি জোনাকির উড়ন্ত আলোয় গাছগুলো রূপকথার দৈত্যের মত দেখাচ্ছে। কানে ভেসে আসছে সংকীর্ত্তনের ধূয়ো। ওই এক অদ্ভুত আত্মতৃপ্ত অচলায়তন। নিশ্চয়ই বড় একা বোধ করেছিল মহাতপ।

সাতাশ

আরমানি বণিক বাজিদ আর পিক্রুর হাতে ইংরেজদের চিঠি পায় মহাতপ। মাদ্রাজ থেকে নতুন সৈন্য না আসা অবধি ভরসা নেই। নবাবের কাছে লেখালেখি করতে হবে। আবেদন নিবেদন করে মন ভেজাতে হবে। কুঠি খুলতে হবে আবার। কিন্তু কুঠি খুলেও কাজ করা যাবে না। সিরাজকে বিশ্বাস নেই। বিনা মেঘে বজ্রাঘাত হতে কতক্ষণ ? আরও বেশী সৈন্য না রেখে কাজ কারবার করার কোন মানে নেই এখন। তাই অপেক্ষা করতেই হবে। তবু কাজ এগিয়ে রাখাই ভাল।

বাজিদের ওপর খুশি নয় মেজর কিলপ্যাট্রিক। ওর ওপর ভরসা করেছিল অনেক বেশী বলেই হয়ত ২৩শে নভেম্বর মেজর লিখলো জগৎশেঠকে, আপনিই আমাদের একমাত্র আশা ভরসা। কোন রকমে একটা মিটমাট করে দিন।

ডাক্তার ফোর্থ তখন চুঁচুড়ায়। ডিসেম্বর নাগাদ ফোর্থ জানালো মেজরকে, জগৎশেঠ এখনো চেষ্টা করছে।

চেষ্টা জগৎশেঠ করেছিল। কিছু হবে না জেনেই চেষ্টা করেছিল। শুধু

মাত্র কোম্পানীর বন্ধু হিসাবে নয়, নবাবের হিতাকাঙ্খী হিসাবেও নয়, নিতান্ত নিজের স্বার্থেই চেষ্টার অন্ত রাখেনি। কোম্পানীর কাছে শেঠদের অনেক টাকা পড়ে আছে। হাঙ্গামার সময় থেকে কথামত টাকা দিতে পারছিল না কোম্পানী। কথার খেলাপ হচ্ছিল বারবার। বাজারে কোম্পানীর সুনাম খুব। যে কথা সেই কাজ। কিন্তু কিছুদিন থেকে বদনাম হচ্ছিল। বাধ্য হয়েই জগৎশেঠ কড়া তাগাদা দিয়েছে কয়েকবার। ফল হয়নি। হাঙ্গামার জন্য কাজকর্ম বন্ধ। ধার ক্রমাগত বেড়ে গিয়েছে। আবার যদি কাজ বন্ধ থাকে কিছুদিন, কিম্বা যদি সত্যি সত্যি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে নবাবের সঙ্গে, তাহলে তার ওত টাকা ডুবে যাবে একেবারে। শুধু ডুবে যাবে না, সিরাজ যুদ্ধের সমস্ত খরচটাই তুলবে তার গদী থেকে। সর্বনাশ হবে শেঠদের। মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে স্বেচ্ছায় অনেক টাকা দিয়েছে শেঠরা। মারাঠারা দুজনের শত্রু। কিন্তু ইংরেজরা ত শেঠদের শত্রু নয়।

মহাতপের ধারণা, ইংরেজরা আসলে নিরীহ ব্যবসাদার। এখানে এসেছে ব্যবসা করতে। ব্যবসা করেই যাবে। ঘর সংসার পাতবে। ছেলে মেয়ে হবে। নাতিপুতির মুখ দেখবে। তারপর একদিন আস্তে আস্তে এ দেশেরই মানুষ হয়ে যাবে। যেমন হয়েছে অনেক পরদেশী। হয়েছে পাঠান শাসনকর্ত্তারা। তা ছাড়া আর কি হতে পারে? ভিনদেশী ত নবাবেরাও। ভিনদেশী তারাও।

নবাব কিন্তু বোঝে না। জগৎশেঠ চেষ্টা করে। শওকতকে হারিয়ে দেবার পর শুভক্ষণের প্রতি সিরাজের বিশ্বাস বেড়ে গিয়েছে বহুগুণ। তাকে আর থামানো যাবে না।

এতদিনে এসে গিয়েছে মাদ্রাজ থেকে ইংরেজদের জবরদস্ত সেনাপতি কর্নেল ক্লাইভ। তৈরী হয়েছে কোম্পানী। কাউন্সিল প্রস্তাব পাশ করেছে। নবাবের সঙ্গে যুদ্ধের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে বোঝাতে চেয়েছে কলকাতার বিপদে-পড়া গোরাদের।

কাউন্সিল জানিয়েছে, মিছি মিছি যুদ্ধ করে মহামান্য কোম্পানীর ওপর খরচের বোঝা চাপানো তাদের উদ্দেশ্য নয়। আবার শুধুমাত্র কলকাতা দখল, এবং কুঠি খোলাও তাদের লক্ষ্য নয়। মোগল বাদশারা যে সব সুযোগ সুবিধা দিয়েছিল কোম্পানীকে, সেগুলো আদায় করতে হবে। এতদিনের

কাজ নষ্ট হয়েছে। প্রাণ নষ্ট হয়েছে এত গুলো। এরজন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ করতে হবে নবাবকে।

দেখতে হবে কিসে খরচ কম হয়, অথচ সব সুযোগ সুবিধে আদায় করা যায়। যাদ সৈন্যদের দেখে নবাব যুদ্ধ বিরতি চায়, ভাল। যদি না চায়, যুদ্ধ হবে। কিন্তু উপযুক্ত সন্ধিপত্র তৈরী করে রাখতে হবে। তলোয়ার আর কলম চালাতে হবে এক সঙ্গে।

কলকাতায় এসে ক্লাইভ কোম্পানীর হয়ে আর ওয়াটসন বিলেতের রাজার হয়ে দুটো চিঠি পাঠায় নবাবকে। সিরাজ নিরুত্তর। কলমে কাজ হবে না। তলোয়ার ওঠালো ক্লাইভ। বজবজের কাছে নামমাত্র যুদ্ধে নবাব-নিযুক্ত কলকাতার শাসনকর্ত্তা মাণিকচাঁদ পালালো ৩০শে ডিসেম্বর। গোরাদের ভয় ভয়ানক। গোলা বারুদের তাগ অব্যর্থ। মাণিকচাঁদ নবাবের কাছে গিয়ে এই কথাই বলেছিল। ১৭৫৭, ২রা জানুয়ারী। কলকাতা দখল করলো ইংরেজরা। ১০ই হুগলী জয় করে তছনছ করে দিল শহর। ইংরেজরা জানত বজবজের মারামারিতেই তাদের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। ভয় পেয়েছে নবাবী সেপাই। হুগলী তছনছ করে দিলে ভয় আরো বাড়বে। নবাব ভয় পেলে সন্ধি হবে সহজেই।

তলোয়ার চলছে। থামেনি কলম। ইতিমধ্যে কোম্পানী চিঠি দিয়েছে জগৎশেঠকে। বাজিদকেও হাতে রেখেছে। জানতো বিদেশীদের ব্যাপারে বাজিদ নবাবের কাছে বিশেষজ্ঞ। পরামর্শ করত তার সঙ্গে। এ ব্যাপারে প্রামাণ্য চিঠি দুটো আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তার উত্তর দিয়েছে জগৎশেঠ।

১৭৫৭ সালের ১৪ই জানুয়ারী জগৎশেঠ উত্তর দিল:

আপনাদের প্রীতিপূর্ণ পত্র পেয়ে এবং সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে আমি খুবই আনন্দিত। আপনারা লিখেছেন যে, আমার কথা নবাব শোনেন। তাই আশা রেখেছেন আমি যেন আপনাদের এবং দেশের মঙ্গলের জন্য আমার প্রভাব নিয়োগ করি। আমি একজন ব্যবসায়ী মাত্র। সম্ভবত যখন ব্যবসায়ী হিসাবে আমি নবাবকে কিছু বলি, তখন তিনি আমার কথা বিবেচনা করেন। আপনারা ব্যবসায়ীর অযোগ্য কাজ করেছেন। যুদ্ধ করে কলকাতা দখল করেছেন। কিন্তু এখানেই আপনারা থামেননি। আপনারা হুগলী অধিকার করে শহরটিকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছেন। আপনাদের হাবভাব এবং কার্যকলাপ থেকে একটা সিদ্ধান্তই

করা যায় যে, আপনারা যুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর। এই অবস্থায় আমি কি করে নবাব এবং আপনাদের বিরোধের মধ্যস্থতা করতে পারি? আপনাদের আবেদন পত্রইবা পেশ করি কি ভাবে? যুদ্ধ বিগ্রহ থেকে আপনাদের একান্ত এবং সত্য উদ্দেশ্য বোঝা অসম্ভব। সুতরাং অবিলম্বে যুদ্ধবিগ্রহ বন্ধ করুন এবং আপনাদের দাবী আমাকে জানান। একমাত্র তখনই মীমাংসার জন্য নবাবের সঙ্গে কথা বলতে পারি। আমি বুঝতেই পারি না, আপনারা কি করে আশা করতে পারেন যে সুবাদারের প্রভুত্বের বিরুদ্ধে আপনারা অস্ত্র ধারণ করবেন এবং নবাব তা দেখেও না দেখার ভান করে নিশ্চেষ্ট থাকবেন? যাই হোক খুব স্থিরভাবে বিবেচনা করবেন।

বাজিদ উত্তর দিল তার তিন দিন পরে। বাজিদ জানালো যে, কোম্পানীর ওপর তার অটুট শ্রদ্ধা। শুধুমাত্র সেইজন্যই সে চন্দননগরের ফরাসী কুঠিয়ালকে মধ্যস্থতা করার জন্য অনুরোধ করেছে।

বসে থাকার লোক নয় ক্লাইভ। বাজিদের চিঠি তার ভাল লাগেনি। ইংরাজ ফরাসীর যুদ্ধ হচ্ছে। ওদের ভেতর প্রকাশ্য শত্রুতা। দু'জনেই সুযোগ খুঁজছে পরস্পরের টুঁটি টিপে ধরবার। এত বড় ব্যাপারের ভার কখনও শত্রুর ওপর ছেড়ে দেওয়া যায় না। আর যদি ফরাসী কুঠিয়াল সত্যি সত্যি দূতিয়ালী করে নবাবের সঙ্গে তাদের বিরোধ মিটিয়ে ফেলতে পারে, তবে ত কুঠি খুলেও কুঠি হারাবে তারা। ফরাসীদের প্রভাব কত বেড়ে যাবে তখন। ক্লাইভ চায় না ফরাসীরা আসুক। বাজিদকে তাই জানিয়ে দেয় ক্লাইভ, ফরাসীদের দরকার হবে না। শেঠরাই বিরোধের মীমাংসা করতে পারবে। বাজিদ তারপর এ বিষয়ে আর কোন আগ্রহ দেখায়নি।

২১শে জানুয়ারী ক্লাইভ সুন্দর ভাষায় জবাব পাঠিয়েছিল মহাতপকে। ক্লাইভ লিখেছিলঃ নবাব তাদের ওপর যে অকথ্য অত্যাচার ও পীড়ন চালিয়েছেন, যে মহামূল্য প্রাণ সংহার করেছেন, ফলতায় অরক্ষিত ইংরেজদের ওপর যে অবর্ণনীয় ব্যবহার করা হয়েছে, তার উত্তরে অস্ত্রধারণ করা ছাড়া উপায় ছিল না। ইংরেজদের দেশ আছে, নীতি আছে, রাজা আছে, যিনি কোন অংশে নবাবের চেয়ে হীন নন। ইংরেজদের দেশপ্রেম আছে। নবাবের অত্যাচারের জবাব যদি তলোয়ার খুলে না দেওয়া যেত, তবে কোন দিন ইংলণ্ডেশ্বরের কাছে দাঁড়ানো যেত না। তার কাছে জবাব দেবার মত কিছুই থাকত না তখন। করমণ্ডল উপকূলে নবাবের মত প্রতাপশালী

শত্রুকে জবাব দিতে সক্ষম হয়েছে ইংরেজরা। তারা এখন আশা করে শক্তি পরীক্ষার দরকার হবে না।

যে সর্তে ইংরেজরা সন্ধি করতে পারে তারও এক প্রতিলিপি পাঠিয়েছিল চিঠির সঙ্গে।

হুগলী ধ্বংস করার পর সিরাজের রাগ বেড়ে গিয়েছে বহুগুণ। আগে এক জোড়া চটি জুতো দিয়ে গোরাদের শাসন করতে মনস্থ করেছিল নবাব। এখন দেখছে তার চেয়ে আরো বেশী কিছু দরকার।

উগ্র মূর্তি দেখে কোন কথা বলেনি মহাতপ। ভার দিয়েছে রঞ্জিত রায়কে। রঞ্জিত বোধ হয় চিন্ময় রায়ের আত্মীয় হবে। যাই হোক, রঞ্জিত মহিমাপুর গদীর বেশ বড় মাথা। জগৎশেঠরা নবাবের কাছে যায়নি আর। সম্ভবত সেই অপমানের পর আর যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু শুধুমাত্র ব্যক্তিগত মান অপমান চিন্তা করে কাজ করতে পারে না মহাতপ। তাহলে সে ত নবাবদের দলে নাম লেখাত। আরো দূরে যেতে চায় সে। দৃষ্টিকে প্রসারিত করতে চায়। তাই শান্তির জন্যে চেষ্টা করে। সে ব্যবসাদার। ব্যবসার জন্যে শান্তি চাই, স্থিতি চাই। চাই নিরাপত্তা। তাই রঞ্জিত রায়কে পাঠায় নবাবের কাছে। খুব উপযুক্ত সে।

২১শে তারিখে জগৎশেঠকে চিঠি পাঠাবার পরও যখন নবাব পক্ষের কোন নড়নচড়ন বোঝা গেল না, তখন ক্লাইভ ভেবেছিল ফাঁকি দিয়ে আবার বুঝি নাম কিনে নেওয়া যাবে দাক্ষিণাত্যের মত।

খবর এল নবাব আসছে ত্রিশ হাজার সৈন্য নিয়ে। ত্রিশ হাজার সৈন্যের জন্য ক্লাইভ তৈরী নয়। ওয়ালস আর স্ক্রাফটনকে দূত পাঠানো হল। ভেবেছিল, নবাব বোধহয় তখনও দূরে। ভুল ভাবনা। নবাবী সৈন্যরা ততক্ষণে উমিচাঁদের বাগানে তাঁবু গেড়েছে। দূতেরা নবাবী ব্যবহার বুঝতে পারেনি। তাদের ভয় দেখালো উমিচাঁদ। বলেছিল প্রাণ বাঁচাতে। অন্ধকারে তারা পালালো।

খবর শুনে ক্লাইভ ভাবলো, আক্রমণ করাই ঠিক। ভোর ছ'টা নাগাদ গোরারা গুলি ছুঁড়তে সুরু করলো। ফেব্রুয়ারী মাস। শীতকাল। চারিদিকে খুব কুয়াশা। ক্লাইভ ভেবেছিল আটটা নাগাদ সূর্যের মুখ দেখা যাবে। বেলা যতই বাড়তে থাকে, কুয়াশা ততই ঘোর হয়ে আসে। ঠাহর করা যায় না কিছুই। এলোপাথাড়ি গুলি ছোঁড়ে গোরারা। আবোল তাবোল গুলি

ছোঁড়ার ফলে প্রাণ দিল নবাবের তেরশ' সেপাই, চারশ' ঘোড়া, দুটো হাতী। পিছু হটে নবাব তাঁবু গাড়লো দমদমে।

পরের দিন রঞ্জিত রায় চিঠি লিখলো ক্লাইভকে : ভেবেছিলাম ইংরেজদের কথা ও কাজের মিল আছে। সেই বিশ্বাসেই আমি এই ব্যাপারে এসেছিলাম। নবাবের সঙ্গে আপনাদের পক্ষ হয়ে কথা বলেছিলাম সেইজন্যই। আপনারা যে দু'জনকে পাঠিয়েছিলেন তারা কোন কথা গুছিয়ে বলতে পারে না। তাই তাদের বিদায় করে আমি নিজে আপনাদের হয়ে কথা বলেছি।

আমি আপনাদের সন্ধির সর্ত পাঠাতেও বলেছিলাম, যাতে নবাবের দস্তখতের ব্যবস্থা করতে পারি। নবাব আপনাদের কলকাতা ফিরিয়ে দিতে রাজী। ফর্মানে বাদশা আপনাদের যে যে সুযোগ সুবিধা দিয়েছিল, তাও আপনারা পাবেন। এমন কি কলকাতায় ট্যাঁকশাল বসিয়ে শিক্কা টাকা তৈরী করতে পারবেন। কলকাতাকে সুদৃঢ় করার জন্য ইচ্ছেমত দুর্গ তোলবার অধিকার থাকবে। কাশীমবাজার বা অন্য কুঠিতে আপনাদের যত ক্ষতি হয়েছে তাও পূরণ করতে নবাব রাজী। তা সত্ত্বেও গতকাল আপনারা যে ব্যবহার করেছেন, আমি তাতে বিস্মিত হয়েছি।

নবাবের কাছে মুখ দেখানো আমার দায়। নবাবের সঙ্গে আমার আলোচনার বিবরণ পিক্রর কাছে শুনতে পাবেন। কিন্তু যা হবার হয়ে গিয়েছে। তাতে সন্ধির সর্তের অদল বদল হবে না। যাই হোক, আপনারা যদি সত্যি কোন মীমাংসা চান, তবে আপনাদের সর্ত দিয়ে নবাবকে চিঠি লিখুন। আমি আপনাদের প্রস্তাবে নবাবের সই করিয়ে শিরোপা হাতী আর মনিমুক্তোর খেলবৎ দিয়ে পাঠিয়ে দেব। সই হয়ে গেলে নবাব মুর্শিদাবাদে চলে যাবেন। আর যদি আপনারা সত্যি সত্যি যুদ্ধ চান আমাকে জানান। তারপর আমি আমার কর্তব্য স্থির করবো।

সন্ধির স্বপক্ষে ও বিপক্ষে মন্ত্রনা দেবার লোকের অভাব নেই। রঞ্জিত রায় হাল ছাড়েনি। ওদিকে পিক্র ক্লাইভকে বোঝাবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছে। সন্ধি করা সিরাজের মত নবাবের পক্ষে অভাবনীয় ব্যাপার। বিশেষত ইংরেজদের সঙ্গে। তবু সিরাজ নেমে এসেছে। সন্ধির কথা হচ্ছে। এখন যদি একবার পিছিয়ে যায়, তবে আর তাকে ফেরানো যাবে না। এ সুযোগ ছাড়বে না ফরাসীরা। মন ঠিক করে ফেলতে হবে এখুনি। একটা মিনিটও নষ্ট করার উপায় নেই। কখন কি হয় বলা যায় না। পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে নিজের মুখে স্বীকার করেছে ক্লাইভ এই কথা।

সন্ধির সর্ত পাঠানো হবে। রঞ্জিত রায় যত গুলো লিখেছিল তার চেয়ে আরো বেশী সর্ত ঢুকে গেল। মুর্শিদকুলি কলকাতার আশপাশের আশীখানা গ্রাম কিনতে দেয়নি। এবারে সেই আশীখানা গ্রাম দিতে হবে। যারা ইংরেজের শত্রু তারাই হবে নবাবের শত্রু। কলকাতার ট্যাঁকশালের টাকার ওপর কোন বাট্টা নেওয়া চলবে না।

সিরাজ তাতেই রাজী। ক্লাইভ চিঠি লিখলো জগৎশেঠ মহাতপ রায় আর মহারাজা স্বরূপ চাঁদকে। কৃতজ্ঞতার চিঠি। তাদের জন্যেই সন্ধি হল এবং কোম্পানীর ব্যবসা আবার চালু হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাদের প্রশংসা করে রিপোর্ট পাঠানো হল বিলেতে।

মুর্শিদাবাদে ফিরে এসেছে সিরাজ। শেঠদের ওপর নবাব অকস্মাৎ প্রসন্ন। ভাবনায় পড়লো মহাতপ। জগৎশেঠ মহাতপ ও মহারাজ স্বরূপ চাঁদকে ডেকে ক্ষমা চেয়েছে সিরাজ। সে বুঝতে পেরেছে বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে তার।

বজবজ কলকাতার অভিজ্ঞতা তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, এরা সত্যি অন্য লোক। নতুন গোরা সৈন্য বড়ই দুঃসাহসী। এদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে খুব প্রস্তুত হয়ে। যুদ্ধ করতে হলে শেঠদের টাকার দরকার। তা ছাড়াও নিশ্চয়ই আরো কোন বড় দরকার আছে—যা সে জানে না। তা ভিন্ন কোম্পানী শেঠদের এত সমীহ করে কেন? কোম্পানী একমাত্র শেঠদের মধ্যস্থতা ছাড়া আর কারো হস্তক্ষেপকে বরদাস্ত করেনি। সিরাজ বুঝলো, ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য শেঠরা অপরিহার্য। ওরা যেদিকে ঝুঁকবে, সে দিকের জয় অবশ্যম্ভাবী। তাই অপমান করার বদলে সিরাজ খুব সম্মান দেখায় জগৎশেঠকে। অবহেলা করার বদলে করে পরামর্শ। জন্মলগ্নের শুভ তারার উদার আশিবাদের উপর সিরাজের অগাধ বিশ্বাস এক ধাক্কায় অনেকখানি ভেঙ্গে গেল।

বড় দেরী হয়ে গিয়েছে। শেঠরা মসনদ থেকে অনেক দূরে এখন। সিরাজের ওপর সন্দেহ তাদের। অকস্মাৎ ভদ্র ব্যবহারের তলায় স্বার্থের অব্যর্থ প্রেরণা খুঁজতে লাগলো তারা। সিরাজ ইংরেজদের ঘৃণা করে। কলকাতার সন্ধি নবাবের পক্ষে অপমানকর। এই অপমান স্বীকার করতে যারা পরামর্শ দিয়েছে, তাদের ওপর সিরাজের অপ্রসন্নতা স্বাভাবিক। সিরাজের প্রিয়-পাত্রদের ঘুষে বশ ক'রে নবাবের মনোগত ইচ্ছা জানতে চায় মহাতপ।

জানতেও পারে একদিন। জেনে আরো দূরে সরে যায়। এতদূরে যায়নি ফতেচাঁদও। মহাতপ জানতে পারে সিরাজের সাম্প্রতিক শেঠ-প্রীতি

প্রয়োজনীয় ভান মাত্র। তাদের নির্মূল করার জন্য সে চরম সুযোগের প্রতীক্ষা করছে।

মুর্শিদাবাদ নরক হয়ে উঠেছে। তার আবছা অন্ধকারে দেখা যায় গুপ্ত হত্যা আর ষড়যন্ত্র। যে অশুভ প্রেত মুর্শিদকুলির সিংহাসনের চারপাশে ব্যর্থ হয়ে ঘুরে ফিরে গিয়েছে, সে আজ দ্বিগুণ শক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মসনদে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। মুখের নীচে থাকে আরো একটা গোপন অদৃশ্য মুখ। এতগুলো মুখোসের মানুষ দেখে সন্দেহ আর অবিশ্বাস ছাড়া অন্য কোন সত্য আছে বলে ভাবতে পারে না কেউ। পোষাকের তলায় বর্ম পরে দরবারে আসা যদিবা গা সওয়া হয়ে যায়, কিন্তু বর্ম পরে কি চব্বিশ ঘণ্টা থাকা যায়? কিন্তু থাকতেই হবে। গুপ্ত হত্যা কোন দিক থেকে কখন আসবে কে জানে? সন্দেহ আর সন্দেহ। সন্দেহ ছাড়া আর কোন কিছুই সত্য নয় মুর্শিদাবাদে।

সিরাজের প্রিয়পাত্ররা যে তার মনের স্থির সংকল্পটা বুঝতে পেরেছে, এমন কোন প্রমাণ পায়নি মহাতপ। ঘুষ দিয়ে যে সংবাদ পেয়েছে শেঠেরা, তাকে সত্য বলে মানবার কারণ নেই। অকস্মাৎ প্রসন্নতার কারণ সিরাজের বাস্তব বুদ্ধিও হতে পারে। অন্যদিকে যে নবাব অভদ্রতা আর রূঢ়তায় অভ্যস্ত, তার আকস্মিক নম্রতা সহজে স্বীকার করাও কষ্টকর। এক পক্ষের ঐকান্তিকতা, এক বিশেষ অভিজ্ঞতার দৃশ্যপটে, অন্য পক্ষের সন্দেহের উৎস হতে পারে। ছড়ানো বিষের ক্রিয়া কাজ করছে। তাই মহাতপ আরো দূরে সরে যায়। সন্দেহ ও সংশয় তাড়িত এখন শুধুমাত্র সুবা বাংলার নবাব নয়, মসনদের প্রতিটি অমাত্যও।

কলকাতার সন্ধি ধাক্কা দেয়নি শুধুমাত্র সিরাজকে। সিরাজের অপমান সিরাজ নিজে ডেকে এনেছে। কিন্তু কলকাতার সন্ধিপত্র ধাক্কা দিয়েছে মহিমাপুরকে। টাঁ্যাকশালের চেষ্টা বহুদিন থেকে করে আসছে ইংরেজরা। তাদের কোন চেষ্টা শেঠদের অজানিত নয়।

বুদ্ধির যুদ্ধে স্থরম্যান হার মেনেছে। মাণিকচাঁদ ও ফতেচাঁদ জয়ী। কলকাতায় শেঠদের পরাজয়ের পূর্বাভাস পাওয়া গিয়েছে যেন। অন্য সময় হলে ঘুরে দাঁড়াত জগৎশেঠ। সন্ধি থেকে টাঁ্যাকশালের সর্ত তুলে দিতে বাধ্য করত। সে ক্ষমতা তাদের ছিল। কিন্তু এখন সময় আলাদা। এখন আর কথা বলা যায় না। থাক টাঁ্যাকশালের সর্ত। সর্ত থাকলেই যে

পালন করতে হবেই এমন কথা কি আছে? ফাররুকশের ফর্মানে সর্ত ছিল কয়েকটা নিষ্প্রাণ বর্ণমালা হয়ে। নতুন কায়দায় যুদ্ধ করতে হবে। কিন্তু যুদ্ধ করার আগে বাঁচা দরকার। সিরাজ থাকলে বাঁচতে পারবে না জগৎশেঠ।

সিরাজকে সরানোর জন্যে ব্যগ্র দরবারের অমাত্যরা। হাত কামড়ায় ফরাসী কুঠির মঁসিয়ে ল'। সুযোগ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আর আসবে না কোন দিন। মাত্র তিন চার শ' ফরাসী সৈন্য আর সিরাজ বিরোধী এই চক্র নিয়ে ফরাসীরা সহজেই হারিয়ে দিতে পারত ইংরেজকে। এখন আর হয় না। কলকাতার যুদ্ধে ইংরেজরা জয় করেছে অমাত্যদের মন। তাদের এলোপাথাড়ি দুঃসাহসিকতা ভয় ধরিয়েছে নবাবের মনে। অমাত্যরা ভাবে সিরাজের হাত থেকে বাঁচাতে পারে একমাত্র ইংরেজ কোম্পানী। হাত কামড়ায় ফরাসী কুঠিয়াল ল' সাহেব।

কুঠিয়াল বুঝেছে জগৎশেঠ কিছুতেই আসবে না ফরাসীদের পক্ষে। যায়নি শওকতের পক্ষে। সিরাজের বিরুদ্ধে শওকতের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল অনেকেই। কিন্তু যোগ দেয়নি শেঠবাড়ী। চক্রান্তের জন্য চক্রান্ত চায়নি তারা। তারা দেখেছিল শওকৎ সিরাজের চেয়ে কোন অংশে উন্নত নয়। এই পরিবর্তনে কোন লাভ হবে না। যে শান্তি ও নিরাপত্তা শেঠবাড়ী চায়, তা দিতে পারবে না শওকৎ। তাই সরে ছিল মহিমাপুর।

ইংরেজদের উপর শেঠবাড়ী বরাবরই উদার। এখন অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে। শেঠবাড়ী ইংরেজ কোম্পানীর ওপর নির্ভর করছে। হাত কামড়ায় ল' সাহেব। ফরাসীদের সুযোগ নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

শঙ্কিত শেঠবাড়ী নির্বান্ধব। তার স্বগোত্র কেউ নেই। পুঁজি তাদের হয়েছে। হিন্দুস্থানে সোনার অভাব ঘটেনি। হিন্দুস্থান সোনার গহ্বর। কিন্তু সেই বৈশ্যপুঁজি উন্নত হল না শিল্পপুঁজিতে। কামারশালা কখনও ঠাঁই করে দিল না কারখানাকে। মুদ্রা-অর্থনীতি স্বাভাবিক গতি ও বিকাশের পথ পেতে গিয়েও পায়নি সঠিক পরিণতি।

সামন্ততন্ত্রের পাশাপাশি চলছে টাকা পয়সার কেনা বেচা। বরং এটাই ক্রমাগত হয়ে পড়ছে জমিদার নবাবীতন্ত্রের অঙ্গ। সংঘবদ্ধ বণিক চেতনা আসেনি ব্যবসাদারদের মনে। উৎপাদক ও উৎপাদন রীতির মধ্যে এল না পরিবর্তন। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতাকে ছিনিয়ে নিয়ে নতুন সভ্যতার বীজ বপনের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় মাতেনি তারা। সে স্বপ্নও দেখেনি।

বরং ধীরে ধীরে কোন নিশ্চিত নির্ভর আশ্রয় করে কোন ক্রমে মাথা তুলতে চায় লতার মত।

বনস্পতির মত বুক ফুলিয়ে সূর্যের সমস্ত আলো লুণ্ঠন করে নেবার মত সুন্দর হিংস্র প্রাণশক্তি তাদের নেই। সমস্ত রকম অনুশাসনকে উপেক্ষা করে, লোকাতীত কর্তৃত্বকে অবহেলা করে নিজের ব্যক্তি সত্তার জয় ঘোষণা শোনা গেল না কোথাও। আত্মিক শক্তিতে দুর্বল এই বৈশ্যতন্ত্র আর তাদের প্রতিভু মহিমাপুরের ধনকুবের জগৎশেঠ মহাতপ সংঘশক্তি ও ঐতিহাসিক চেতনার অভাবে অসহায় ও বিমূঢ়।

মুর্শিদাবাদ শহর হলেও আধুনিক শহর সে নয়। নবাব-সর্বস্ব এই শহরটি টিঁকে আছে প্রাসাদের জৌলুষ যোগাতে। গ্রাম্য মানসিকতার এই উর্বর ভূমি বৈষয়িক জটিলতা ও সংকীর্ণতায় পঙ্ক-কুণ্ড। শিক্ষিত হয়েও অশিক্ষিত অনেকে। পাঠশালা, চতুষ্পাঠি আছে। আছে মোক্তব। ন্যায়, স্মৃতি এবং শুভঙ্করীর বাইরে আর কোন বিদ্যা নেই। পুরাতনের অক্লান্ত অনুশীলনে যান্ত্রিক নিপুণতা আয়ত্ত করে প্রতিভাবান। কোরাণের ব্যাখ্যায় পটু হয় মুসলমান ছাত্র। ভক্তিবাদের প্রাবল্যে যে আলোড়ন দেখা গিয়েছিল তা সেই সময় অনেক স্তিমিত।

চৈতন্য প্রভাব কিংবা সহজিয়া মতবাদ মানুষের বাস্তব বোধের বনিয়াদকে পালটাতে পারেনি। পক্ষান্তরে, পরের যুগে, বস্তুগ্রাহ্য জগত থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে তাদের কোন রহস্যময় অলৌকিক আনন্দের নেশায়। গ্রাম্য জীবনের ভয়াবহ স্বয়ংসম্পূর্ণতা আর অটুট আত্মতৃপ্তি প্রতি বার নিবৃত্ত করেছে জীবনের নতুন মূল্যমানের সন্ধান থেকে।

সেই সমাজে মানুষ থাকে, বাঁচে এবং কালক্রমে মরে। শুধু বংশানুক্রমিক ধারা প্রবাহমান ও অক্ষুন্ন। মানুষ তখন ব্যক্তি নয়। সমাজের একটি ধাপ। গাণিতিক সংখ্যা মাত্র। একটি স্যোসাল ইউনিট। লোকাচার, দেশাচার এবং সংস্কারের বাঁধনে সমাজ বিষাক্ত স্থবির জলাভূমি। কোথাও কোন তরঙ্গ নেই, প্রাণ নেই। প্রচলিত বাঁধা ছক ভেঙে, বংশানুক্রমিক নির্দ্ধারিত ও নির্দিষ্ট জীবন ভঙ্গির নোঙর ছিঁড়ে বেয়াড়া এবং অবাধ্য হয়নি কেউ।

সেনরাজাদের গড়া কৌলিন্য প্রথার কুণ্ডলীর ভেতর থাকে হিন্দুরা। তার ভেতর দেখা দিয়েছে স্বেচ্ছাচারিতা এবং ব্যভিচার। আর্থিক কারণে ব্রাহ্মণেরা কুলবৃত্তি ত্যাগ করে যোগ দিয়েছে দরবারে। ওদিকে কুল যত অন্তহীন, দোষও তত সংখ্যাহীন। কুল দোষ, কোচ দোষ, হলান্তক দোষ, হেড়া দোষ, রজক দোষ, মেঘ দোষ, বলাৎকার দোষ, যবণ দোষ ইত্যাদি দোষের

ছড়াছড়ি। কেবল দোষ, আর দোষের সমুদ্র। 'গণইতে দোষ গুণ লেশও ন পাওবি। কুলীন ব্রাহ্মণের চিত্র দিয়েছেন রামেশ্বর ভট্টাচার্য :

কুলীনের পো-কে অন্য কি বলিব আমি
কন্যার অশেষ দোষ ক্ষমা করো তুমি।

খুব বেশী কিছু চাননি ভট্টাচার্য মশাই। অতি সামান্য তার প্রার্থনা,—'আঁঠু ঢাকি বস্ত্র দিহ পেট ভরি ভাত।'

নবাবের চাকুরে মুখোপাধ্যায় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কুলীন ব্রাহ্মণেরা ক্রমে হয়ে উঠছে মজুমদার, সরকেল, শিকদার। সমাজের অচল অনড় নোঙর স্থাণু। কিন্তু নৌকা জীর্ণ। সপ্তদশ শতকের শেষের দিকে সীতারাম বলাৎকারের ভয়ে বন্দ্যবংশীয় রামানন্দের তের দিনের মেয়েকে বিয়ে করতে স্বীকৃত হন।

সমান সমান কুল ধরা ধরি তায়
লোকে বলে সীতারাম তিন'শ টাকা পায়।
দিবসে আঁধার হল পথ বেরাল চেয়ে
সীতারাম বিহা করেন তের দিনের মেয়ে॥

জাতিগত আর কুলগত দৃঢ় সংস্কারের জন্য অন্যপূর্বা বিবাহের দৃষ্টান্ত মেলে প্রচুর। বিমাতা বিবাহের খ্যাতি অর্জনও সহজলভ্য। 'হরিসুত রামদাস বিমাতার পতি।' কুলাচার শেষকালে দাঁড়ালো স্বেচ্ছাচার এবং ব্যভিচারে। বিবাহ গিয়ে দাঁড়ালো কুলীন ব্রাহ্মণের জাত ব্যবসার পর্যায়ে। সহমরণ সতীদাহের তখন অখণ্ড প্রভাব। বিত্তশালী হিন্দু এবং মুসলমানের পক্ষে রক্ষিতা পোষণ সর্বাংশে সম্মানযোগ্য। উচাটন কিংবা বশীকরণ মন্ত্র সতীন-কাতর স্ত্রীর ব্রহ্মাস্ত্র।

সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের জীবন ছিল আড়ম্বরের বিজ্ঞাপন। মদ খাওয়া, হাতী পোষা এবং বেশ্যা রাখা তাদের আভিজাত্যের ব্যারোমিটার। গ্রামান্তের মোগল প্রতিনিধির বাড়ীতে থাকত অতি-বিরল হামাম, আর মির্জাদের বৈঠকখানা মূল্যবান আসবাবের গুদাম ঘর। বিত্তবান হোক কিংবা বিত্তহীন হোক, কেউ কোন প্রশ্ন তোলেনি। দেশাচার এবং লোকাচারকে বিধিদত্ত বিধান হিসাবে মেনে নিয়েছে। আর তলার দিকে, হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত জীবনে অলস নিরাসক্ত মন্থরতা। সেই সময়ের প্রচলিত প্রবাদ—মারে ঠাকুর, না মারে কুকুর। যারা মারবে তারাই ভগবান আর যে মারবে না

সে কুকুরের সমান। সমস্ত মানুষ তাই ঠাকুরের মারের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকে।

সভ্যতা দাঁড়ায় জবাবদিহি করার জন্যে। প্রতি সভ্যতাই হল প্রশ্ন আর উত্তরের ইতিহাস। প্রথমে থাকে অদ্ভুত তৃপ্তি, স্বর্গীয় সম্পূর্ণতা। সেই সম্পূর্ণতা ভেঙে যায় বাইরের কোন সংঘাতে। স্বর্গের নন্দন কাননে সুখে ছিল আদাম আর ইভ। বনের মধ্যে সুখে ছিল রাম আর সীতা। ফাউষ্ট ছিল জ্ঞানের প্রতিমূর্তি। গ্রেচেন রূপ আর শুচি। সেই ভারসাম্য বেশীদিন থাকেনি। এসেছে বিরোধী শক্তি। নষ্ট হয়ে গিয়েছে পুরাতন দৃশ্যপট। সংগ্রাম আরম্ভ হয়েছে দুই শক্তির। এই সংগ্রামের ভেতর সভ্যতা। এই চ্যালেঞ্জ এবং রেসপনস্ এর ভেতর অগ্রগতির বীজ। সভ্যতার ইতিহাস তাই স্পর্দার ইতিহাস। ক্রমাগত অবরোহণের দুর্জ্ঞেয় আকাঙ্খা ও অহংকারের কাহিনী।

প্রত্যেক সমাজে থাকে একদল মানুষ। তারা ভাবে না। তারা চালায় না। তারা চালিত হয়। তারা প্রশ্ন করে না, উত্তরও খোঁজে না। তারা প্রশ্ন এবং উত্তর মুখস্থ করে। তারা লোকাচার দেশাচার এবং সংস্কারের অসহায় শিকার মাত্র।

তাদের মাঝখানে আসে আর এক নগন্য গোষ্টি, কিম্বা কোন একক পুরুষ। সে চ্যালেঞ্জকে স্বীকার করে উত্তর দেবার জন্য। প্রচলিত বিধি ব্যবস্থা ভেঙে গুঁড়ো করে নতুন আর এক মূল্যমান স্থাপিত করে যায়। সেই বাঁচার এক নতুন প্যার্টান। মৃদু আপত্তি, শত্রুতা কিম্বা বিরোধের পর এসে দাঁড়ায় মুখস্থ-নিপুণ মানুষের দল। গুরু বলে স্বীকার করে তাকে। অনুকরণের প্রবল বাসনায় তারা সেই প্যাটার্ণকেই আবার আচার, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানের ভিতরে টেনে আনে। সন্ধান আর থাকে না। থাকে না উত্তর দেবার স্পর্ধা। প্রাপ্ত উত্তরকে কাজে লাগায়। সৃষ্টিকামী আবেগ কালক্রমে হয়ে দাঁড়ায় প্রথা, দৃষ্টি হয় অনুশাসন। তখন টীকা টিপ্পনির যুগ। দেখা দেয় গুরুকে যথাযথভাবে অনুকরণ করার প্রবণতা। যথাযথ উক্তি এবং উদ্ধৃতির মধ্যে তারা পায় চরম সার্থকতা।

নব্যন্যায় কোন দিক-দিশারী জীবনবেদ হতে পারেনি। চৈতন্যের প্রবল আলোড়ন ভিন্নপথে ঘুরে গেল। তান্ত্রিক সহজিয়া হল রহস্যময় আচার ও ধর্ম। গ্রামের অজস্র মানুষ সেই আচার অনুষ্ঠান পালন করে যায়। সেই এক যান্ত্রিক অভ্যাস। গ্রাম গ্রামান্তরের অটুট অচলায়তন মগ্ন থাকে অন্ধ তামসিকতায়। যৌথ পরিবারের চাপে জবুথবু সংসার নিশ্চুপ।

রাষ্ট্রের পরিবর্তনে তাদের কিছু আসে যায় না। তারা মেনে নিয়েছে। স্বীকার করে নিয়েছে সব কিছু। জাতি বলে কোন বোধ নেই। আছে ধর্মবোধ। বিধর্মী মুসলমান রাজত্ব করছে বহুদিন। দেখেছে তারা পাঠান শাসক। দিল্লীর মোগলেরা পাঠিয়েছে সুবাদার। কেউ তারা বাঙালী নয়। ভারতীয় নয় কেউ। মুর্শিদকুলির বাপ মা ভারতীয় ছিল শুধু। তা ছাড়া আর ত কেউ নয় তাদের নিজেদের লোক। মসনদের ওঠা-পড়া, ক্ষমতা, প্রতিপত্তির সংগ্রাম ও সংঘর্ষ এড়িয়ে বাঁচত গ্রামের মানুষ আপনার শান্ত পরিমিত পরিধিতে।

হিন্দু মুসলমানের বিরোধের বীজ গ্রামের দিকে বেড়ে উঠতে পারেনি। নবাবী আমলেই দেখা গিয়েছে, এক অদ্ভুত পরিবেশের মধ্যে সম্মেলনের কাজ আরম্ভ হয়েছে। আকবরশাহী এক রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ফলে হোক কিংবা জীবনধারনের সাধারণ নিয়মেই হোক এই সংশ্লেষণ হচ্ছিল। কিন্তু তাতে রাষ্ট্র ব্যবস্থার ওপর কোন প্রভাব পড়েনি। পড়া সম্ভবও নয়।

অথচ দরবারের মধ্যে ছিল চক্রান্ত, হিন্দু মুসলমানের বিরোধ। দিল্লীর মোগল প্রভাব বিলীয়মান। হিন্দু জমিদারদের মধ্যে আবার চাঞ্চল্য এসেছে।

তবু নবাবেরা হোলি খেলেছে। আলিবর্দীর ভাইপো শাহামৎজঙ আর সৌলতজঙ আবীর মেখেছে মতিঝিলের বাগানে। সাত দিন ধরে চলেছিল তাদের রাসলীলা। দুশো চৌবাচ্চা ভর্তি রঙ আর গাদা গাদা আবীর নিয়ে মাতিয়ে রেখেছিল মতিঝিল। পাঁচশ অপূর্ব সুন্দরী যুবতী ছিল তাদের সেই হোলি খেলার সঙ্গী। ৯ই ফেব্রুয়ারী আলিনগরের সন্ধির পর মনসুরগঞ্জে হোলির আবীরে ডুবেছিল সিরাজ। তারও আগে নবাব জাফর আলি খাঁ গঙ্গা পার হয়ে হোলি খেলতে গিয়েছিল। সঙ্গে গিয়েছিল শহরের গন্যমান্য লোকেরা। আর নবাবের সঙ্গে ছিল মর্তের অপ্সরী ফারজানা। নবাবী হোলি তাই কোন সৎ সংশ্লেষণ নয়। ও আর এক ইন্দ্রিয় বিকার।

দেশ জাতি রাষ্ট্র বলতে আজকে যে এক অনুভূতি আসে মানুষের মনে, সেদিন এই বোধ ছিল একান্ত অজ্ঞাত। জাতীয় চেতনা কিংবা রাষ্ট্রীয় চেতনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক দান। মধ্যযুগের পরে এসেছে তারা। একটি বিশেষ সীমার মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের একদল মানুষ জাতি কিম্বা রাষ্ট্রের আধারে বড় হয়ে ওঠে। সেই একটি আবেগ তাদের ধরে রাখে। জাতীয়তা তাই ধারক মন্ত্র। এর কোন বিশেষ চেহারা নেই। বহুদিনের ঘনিষ্ঠতায়, পরিচিত পরিমণ্ডলের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে যে ঐক্যবোধ জেগে ওঠে

মাতৃভূমি কিংবা জন্মভূমি শব্দ হয়ে ওঠে সেই আবেগের সংহত প্রতীক। তখন মুক্তি-সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধ—এই নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে জীবন্ত হয়ে ওঠে। তখন মানুষের কাছে জাতীয়তাবোধ একটি বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ। জাতির স্বার্থের সঙ্গে ব্যক্তির স্বার্থ এক করে নিতে শেখে মানুষ। নিতান্ত বিরোধী হলে ব্যক্তি স্বার্থ বলি দিতে হয় জাতীয় স্বার্থের কল্যাণে।

জাতীয় পতাকা হয়ে ওঠে পরম শ্রদ্ধেয় ও পবিত্র। সে পায় ইন্দ্রজালের মহিমা। সে হয় পুরাতন মধ্যযুগীয় ভক্তির আধুনিক প্রকাশ। গুরুমন্ত্রের কাজ করে জাতীয় সঙ্গীত। জাতীয় বীর উঠতে থাকে বিস্মৃতির গুহা থেকে। মধ্যযুগের স্বামীধর্ম ফিরে আসে আধুনিক যুগে জাতিধর্ম হয়ে।

মানুষকে সব সময়ই কিছু না কিছুর সঙ্গে সংযুক্ত থাকতেই হবে। আত্মিক দিক থেকে জাতীয়তাবাদ তাই রেনেসাসের পরের ধাপ। বিমূর্ত মানবতা-বাদকে খণ্ড করে সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে ভূগোলের একটি বিশেষ পরিধিতে। অর্থনৈতিক দৃষ্টি থেকে জাতীয়তাবাদ কিংবা নেশান ষ্টেট সম্পূর্ণভাবে শিল্প বিপ্লবের দান। ধনতন্ত্রবাদের প্রথম পদে এর জন্ম। জাতীয় রাষ্ট্রে নতুন মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় পেল ক্ষমতা। তাদের ছিল না অন্য দেশের সম্ভ্রান্ত মানুষের সঙ্গে পরিচয়। বিমূর্ত মানবপ্রীতি আয়ত্ত করা তাদের অসাধ্য।

ভূগোলের এক বিশেষ সীমানায় একদল মানুষকে সমস্ত মানুষের প্রতিনিধি ভেবে তাদের সঙ্গে গ্রথিত হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের। তাই তাদের কাছে দেখা দিল ব্যক্তি, ব্যক্তি থেকে জাতি এবং জাতি থেকে মানবতন্ত্র।

জাতীয়তাবাদ কিংবা জাতীয় রাষ্ট্র অনেক পরের ঘটনা। আমাদের দেশে তার আরম্ভ হয়ত রামমোহনের কালে। নির্বান্ধব শেঠবাড়ী তাই ইতিহাসের এক বিশেষ অধ্যায়ে বিমূঢ়। নবাবীতন্ত্র ভেঙে যাচ্ছে। দিল্লীর প্রভাব শেষ হয়ে গিয়েছে। মোগল প্রভুত্বে দেশ পেয়েছিল অপেক্ষাকৃত শান্তি এবং ব্যবসার সুযোগ। শান্তি নেই আজ। সেদিক থেকে ব্যবসার ক্ষতি হয়েছে। নবাবী প্রভুত্ব ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যে ব্যবসার প্রতিবন্ধকতা করেছে। কিন্তু পারেনি। পুঁজি জমেছে। তবু তা থেকে গিয়েছে নিতান্ত প্রাথমিক স্তরে। তার কোন বিবর্তন সম্ভব হয়নি।

গ্রাম্য জীবনের অচল অনড় শান্তি মারাত্মক ভাবে মাঝে মাঝে ভেঙে গেলেও অন্ধ দৈব নির্ভরতা এবং ঐহিক অনাসক্তির নেশার ঘোর ঘোচাতে পারেনি। চিন্তার জগতে কোন বিরাট ধাক্কা আসেনি যার আঘাতে মানুষ

আবার সোজা হয়ে উঠে বসতে পারে। অসংখ্য মানুষ পঙ্গু সামন্ততন্ত্রের গুহায় বসে কোন মতে দিন কাটিয়ে দেয়। অবক্ষয় অনেক গভীর। ধাক্কা আসেনি নীচে থেকে।

ওপর থেকেও ধাক্কা আসেনি। সেখানে এক জমিদারের সঙ্গে অন্য জমিদারের লড়াই। মুসলমান জমিদার বনাম হিন্দু জমিদার কিংবা এক বংশের মুসলমান জমিদার বনাম অন্য বংশের মুসলমান জমিদার,—সিরাজ বনাম শওকৎ।

ব্যবসায়ী শ্রেণী দুর্বল এবং অসংগঠিত। তারা মাথা তুলে ক্ষমতা কেড়ে নিতে পারে না। এ চিন্তাও বোধহয় কখনও আসেনি তাদের। তাই মহাতপ আর স্বরূপ চাঁদ ইতিহাসের এক বিশেষ মোহনায় এসে বিভ্রান্ত ও বিমূঢ়। সাধারণ গ্রাম্য স্থূল ও প্যাঁচালো বিষয় বুদ্ধি তাদের জীবন দর্শন। নব্যন্যায় কোন হদিশ দিতে পারেনি। উঠতি শ্রেণীর জীবনবেদ হতে পারেনি বৈষ্ণবতন্ত্র কিংবা সহজিয়া মতবাদ।

বাংলার 'অক্সফোর্ড' মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নবদ্বীপে বাংলা কবিতার পূজনীয় কবি ভারতচন্দ্র তখন বিদ্যাসুন্দরের সুড়ঙ্গ ভেদী প্রেম কাহিনীতে মশগুল। দেশের সর্বাঙ্গে অবক্ষয়। অবক্ষয় অনেক গভীর। প্রাণহীন, আড়ম্বরসর্বস্ব, নীতিবোধ বর্জিত উঁচু তলার অভিজাত সমাজ দুর্গন্ধময় অস্তিত্বকে নগ্নভাবে প্রকাশ করছে। এক বিরাট নেতির ভেতর দেশ ও সমাজ অপ্রতিরোধ্য ভাবে এগিয়ে যাচ্ছে।

অসহায় মহাতপ আর স্বরূপ চাঁদ আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়। সেই আত্ম-রক্ষা কিন্তু তাদের অসহায় আত্মসমর্পন। সেই আত্মসমর্পনে তাদের ধ্বংস।

সে কথা বোঝেনি মহাতপ। ইংরেজ বণিকের চেহারা তার কাছে অস্পষ্ট। সে জানে ইংরেজরা ব্যবসাদার জাত। সেই ব্যবসাদারদের সঙ্গে বিরোধ বেধেছে নবাবের,—যে নবাবের সঙ্গে বিরোধ তাদেরও। ইংরেজ কোম্পানীর শক্তি আছে। সেই শক্তির সাহায্য নিয়ে শত্রুমুক্ত হলে ক্ষতি কি? আর জমিদাররা তার অনুগত। নবাবীতন্ত্রের বাইরে আর কোন শাসনতন্ত্র যে থাকতে পারে, এ কথা জানতো না কেউ। শোনায়নি কোন বাঙালী পণ্ডিত। মহাতপ, স্বরূপ চাঁদ তাই প্রচলিত গ্রাম্য বুদ্ধির ওপর ভরসা করে স্থির করে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে।

আটাশ

তারও আগের কথা।

১২ই নভেম্বর ১৭৫৬ সাল। বিলেত থেকে চিঠি পেয়েছে কোম্পানী। ফরাসীদের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে। কাউন্সিল ওয়াটসনকে নির্দেশ দিল চন্দননগর জয় করতে।

চিঠি পেতে দেরী হয়েছিল দু'মাস। নবাবের সঙ্গে বিবাদ তখন পাকিয়ে উঠেছে। ওয়াটসন ভেবেছিল আক্রমণ করার সময় পার হয়ে গিয়েছে। এখন ফরাসীরা সোজা নবাবের সঙ্গে যোগ দেবে। তাহলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তারা। নবাব যতদিন না শান্ত হয়, ততদিন ফরাসীদের গায়ে হাত তোলা ঠিক নয়। কালক্ষেপ করে মিত্রতার কথা পেড়ে। প্রস্তাব দিয়েছিল অবশ্য ফরাসীরা। বলেছিল, অন্য যেখানে যা খুশি হোক, বাংলা দেশে ইংরেজ আর ফরাসীরা মিলেমিশে থাকবে।

ইতিমধ্যে নবাবের সঙ্গে সন্ধি হয়ে গেল ১৭৫৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারী। এখন ইংরেজরা আক্রমণ করতে পারে চন্দননগর। নবাবের খেলাৎ নিয়ে রঞ্জিত রায় যখন এসেছিল কোম্পানীর তাঁবুতে, ক্লাইভ কথাটা পেড়েছিল তার সামনে। সমর্থন করতে পারেনি রঞ্জিত রায়।

ওয়াটসন ভেবেছিল ফরাসীদের কাছে শেঠদের বহু টাকা বাকি। যুদ্ধ বাধলে টাকা ডুবতে পারে। সেইজন্যই শেঠেরা কিছুতেই ইংরেজদের পক্ষে থাকবে না। নবাবও কয়েকবার বলে পাঠিয়েছে যে, ইংরেজরা যেন কিছুতেই ফরাসীদের আক্রমণ না করে। কথা কানে তোলেনি ক্লাইভ। সৈন্য নিয়ে চন্দননগরের দিকে এগিয়ে যেতেই নবাব হুকুম পাঠালো যে, যুদ্ধ যদি বন্ধ না করে ইংরেজরা, তবে সিরাজ ফরাসীদের পক্ষে যোগ দেবে।

নবাবের দৃঢ় মত। কথা নড়চড় হবে না। কোম্পানী ভেবেছিল সবেমাত্র নবাবের সঙ্গে সন্ধি হয়েছে। এখন আবার ঝগড়া বাধিয়ে কি লাভ? ফরাসীদের সঙ্গে সন্ধি করার কথা সব ঠিক। সন্ধিপত্র রচনাও হল। সই হবে হবে। এমন সময় বেঁকে বসলো ওয়াটসন সাহেব। বললে, 'পণ্ডিচেরীর ফরাসী কাউন্সিলের সই ভিন্ন কোন দাম নেই সন্ধিপত্রের।'

ব্যাপার আবার ঘোরালো হয়ে উঠলো। মুর্শিদাবাদে উত্তেজনা। ক্লাইভ

আর ওয়াটসন খোলাখুলি চিঠি লিখতে লাগলো সিরাজকে ফরাসীদের বিপক্ষে যেতে। তারা পুরানো কথা তুললে। নবাবকে লিখলো, যারা কোম্পানীর শত্রু, তারা নবাবেরও শত্রু। কোম্পানীর শত্রু ফরাসীরা। সুতরাং নবাবের উচিত কোম্পানীর সঙ্গে যোগ দেওয়া। তা ভিন্ন কি মর্যাদা থাকবে সন্ধির।

প্রতিদিন সকালে দরবারে যেত ল'। সিরাজ প্রতিবারই আশ্বাস দিয়েছে তাকে। ল' এর সামনে সেনাপতিকে ডেকে হুকুম দিয়েছে, প্রয়োজন হলে কালবিলম্ব না করে ফরাসীদের সাহায্য করতে হবে। ক্লাইভ আর ওয়াটসনের চিঠির জবাব দিয়েছে নবাব। নবাব বোঝাতে চেয়েছে যে, সম্রাটের অধীনে থেকে তারা ব্যবসা করে যাচ্ছে। তাদের বিপদে আপদে রক্ষা করার দায়িত্ব সম্রাটের অধীনস্থ নবাবের। এ ক্ষেত্রে ইংরেজ বণিক যদি ফরাসী বাণককে আক্রমণ করে, তবে বাধ্য হয়েই তাকে ফরাসীদের সঙ্গে যোগ দিতে হবে।

জবাব দিয়েছে ক্লাইভ। প্রতি চিঠিতে সন্ধির সর্তের কথা। সন্ধির কথা ভুলে যেতে চায় নবাব। কেউ যদি সে সম্পর্কে কোন ইংগিত করে, সিরাজ ধৈর্য হারায়। সন্ধির চেয়ে অপমান, আর যেন জীবনে কিছু হয়নি তার। নবাবের এই দুর্বলতা কোম্পানীর অজানা নয়। তাই প্রতি চিঠিতে পুরানো ঘায়ে খোঁচা মারতে ভুল করে না তারা।

সিরাজ হুকুম দিয়েছে, নবাবী সৈন্য যাবে চন্দননগরে। ল' নাছোড়-বান্দা। সে নিজের চোখে দেখতে চায় যাত্রা। তা ভিন্ন মন খুঁত খুঁত করবে। সিরাজ তাড়াতাড়ি বিবাদ বাধাতে চায় না। বলে, 'শান্তির জন্যে শেষ চেষ্টা করতে হবে।'

ক্লাইভের চিঠি পেয়েছে সিরাজ। লিখেছে, নবাবের হুকুম মেনে চলবে কোম্পানী।

সকালে এক কথা, বিকেলে অন্য কথা। ল' বুঝলো, জগৎশেঠের হাত আছে এর পেছনে। ল' সোজা গেল মহিমাপুরে।

চন্দননগর অবরোধের কথা পাড়তে চায় ল'। জগৎশেঠ বলে অন্য কথা। বলে, 'তাদের কাছে শেঠবাড়ীর পাওনা এক লাখ পাউণ্ডেরও বেশী। টাকা দেবার নামগন্ধও করছে না। কথা দিয়ে কথা রাখতে ভুলে যাচ্ছে ফরাসীরা।'

'আমি এখন দেনা-পাওনার কোন কথা শুনতে চাই না, বলতেও চাই না। আমাদের যাই যাই অবস্থা। যদি উদ্ধার হতে না পারি, কার কাছ থেকে টাকা আদায় করবেন? বরং আমার কথার স্পষ্ট জবাব দিন। কেন আমাদের বিরুদ্ধে আপনি ইংরেজদের সাহায্য করছেন?'—ল' সোজাসুজি কথাটা পেড়ে বসে।

'আপনার ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আপনারা দু'জনে আমার খাতক। আপনাদের যদি কোন প্রস্তাব থাকে, বলুন। নবাবের সঙ্গে কথা হবে আমার। আমি যতদূর জানি, ইংরেজরা চন্দননগর আক্রমণ করবে না। ওরা শুধু ভয় দেখাতে চায়।'

'আমার ধারণা ঠিক তার উল্টো। চন্দননগর অবরোধ করার সব ব্যবস্থা পাকা। আপনি যদি আমাদের সাহায্য করতে চান, তবে নবাবকে অনুরোধ করুন তাড়াতাড়ি সৈন্য পাঠাতে। নবাব রাজীও ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ কি যে হল।'

'মাত্র কয়েকদিন হল ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি হয়েছে নবাবের। আবার এখুনি যুদ্ধ।'

ল' বুঝলো জগৎশেঠ ফরাসীদের জন্য নড়ে বসবে না। সেখানে দাঁড়িয়েছিল রঞ্জিত রায়। টিপ্পনি কেটে বললে, 'ইংরেজদের এত ভয় পান আপনারা? আক্রমণ যদি সত্যিই করে, নিজেদের রক্ষা করতে পারবেন না? করোমণ্ডল উপকূলের কথা মনে আছে ত?'

রেগে গিয়েছিল ল'। উত্তর দিল, 'বাঙ্গালী সদাগরের মধ্যে এত বড় বীরও যে আছে তা আমি জানতাম না। যাই হোক, বেশী কৌতূহলী হবেন না। পরিণাম সব সময় ভাল নাও হতে পারে।'

অবশ্য পরিণাম ভাল হয়নি রঞ্জিতের। কিছুদিন পরেই রাস্তায় খুন হয়েছিল সে।

ওদিকে সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্ত দানা বেঁধে উঠেছে। মুর্শিদাবাদে তখন তিনটি দল। একদিকে সিরাজ, অন্যদিকে সিরাজের বিরোধীরা। মাঝখানে ইংরেজ। আর কিছু নেই। দেশ জাতি প্রজা কল্যাণ ও স্বাধীনতা, অথবা আরো বড় বড় মহৎ শব্দ যা পরবর্তী কালে মানুষকে চিন্তিত করে তুলেছে, তার এক বর্ণও খুঁজে পাওয়া যাবে না মুর্শিদাবাদে। নাকের

বাইরে দুনিয়া দেখার মত দূরদৃষ্টি ছিল না কারো। না নবাবের, না নবাব বিরোধীদের।

অকস্মাৎ পরশ পাথর কুড়িয়ে পাওয়ার মত ইংরেজরা পেয়েছে মসনদ। তাদের প্রস্তুতি ছিল না। এ একটা দুর্লভ দৈব মাত্র। লক্ষ তাদের ব্যবসা। তখনও অবধি ঠিক চিনেছিল জগৎশেঠ।—ইংরেজরা নিরীহ ব্যবসাদারের জাত। জগৎশেঠের নিরীহ বিশেষণ অবশ্য গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। কিংবা ওই বিশেষণ হয়ত ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে নবাবকে নিরস্ত করার জন্য।

সে কথা বাদ দিলেও, ব্যবসাদার জাত ইংরেজ। কুঠিয়ালীতে ক্রমাগত প্রতিষ্ঠা বাড়ছে তাদের। ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা নামমাত্র। কিন্তু সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতাও নির্মূল করতে চায় ওয়াটসন আর ক্লাইভ। এই ঝোঁক আগে থাকতেই ছিল। প্রাবল্যও দেখা দিয়েছে মাঝে মাঝে, সাগর পারের শান্তি সত্বেও। ১৭৫০-৫১ সালে কলকাতার কাউন্সিল তাদের এদেশী দালাল ও কারিগরকে খুব স্পষ্ট ভাষায় নির্দেশ দিয়েছে যে, তারা যেন কোন মতে ফরাসীদের কোন কাজ না করে, তাদের কোন মাল বিক্রি না করে। ইয়োরোপের যুদ্ধ তাদের সুযোগ দিয়েছে ফরাসী নির্মূল করতে।

বিশেষ কিছু করারও ছিল না ফরাসীদের। তারা জানত, তাদের দিন ঘনিয়ে এসেছে। নবাবের কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া উপায় নেই।

নবাবও নিরুপায়। কলকাতার সন্ধি তার জীবনের মর্মান্তিক গ্লানি হলেও ইংরেজদের দুঃসাহসিকতায় নবাব ভীত। ইংরেজদের সঙ্গে তাই সহজে বিরোধে নামতে রাজী নয়। ওদিকে বিশ্বাস নেই ইংরেজকে। কোনদিন বিশ্বাস করেনি নবাব। কোনদিন করবেও না। সবাই জানে। তাই ফরাসীদের তাড়াতে চায় না। আপ্রাণ চেষ্টা করে যেন ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজদের একটা সন্ধি হয়ে যায়। ফরাসীরা থাকলে তবু কিছুটা ভয় পাবে কোম্পানী।

পাঠান আক্রমণ হতে পারে। খবর পেয়েছে নবাব। এদিকে তার বিরুদ্ধে চক্রান্ত। ল' সাহেব চক্রান্তের কথা জানিয়েছিল নবাবকে। হেসেছিল নবাব। কিন্তু ভয়ও তার ছিল। জন্মলগ্নের ওপর বিশ্বাস তার কমে গিয়েছে। উগ্রতা কিছুটা নিষ্প্রভ। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি নবাব। ল' সাহেবের মত অনেকেই হতবুদ্ধি হয়েছে সিরাজের অস্থিরতা দেখে। এখনও জগৎশেঠকে ডাকে। এখনও পরামর্শ দেয় জগৎশেঠ।

কিন্তু ভয় যায়নি শেঠদের। শেঠদের প্রথম ভয়, নবাব একটু দাঁড়াতে পারলেই মহিমাপুরের গদী আর থাকবে না। লুটের মণিমুক্তায় আরো ফুলে ফেঁপে উঠবে মনসুরগঞ্জ। জগৎশেঠের ধারণা হয়েছে সিরাজ কোনদিন দেশে শান্তি আনতে পারবে না। তার রাজত্বে লোকে নির্ভয়ে থাকতে পারবে না। নাওয়াজেসের মত দানব থেকে দেবতা হবার পাত্র নয় সিরাজ। দেশের দুর্গতি বাঁচাতে, ব্যবসা বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা করতে যে দূরদর্শিতা থাকা দরকার, তা কোনদিন আয়ত্তে আনতে পারবে না সিরাজ। সিরাজের হাতে তাই শুধুমাত্র শেঠবাড়ী নয়, সমস্ত সুবাও বিপন্ন।

ল' সাহেবের কোন সন্দেহ নেই যে শেঠেরাই চক্রান্তের উদ্যোক্তা। সমস্ত ফন্দি ফিকির বেরিয়েছে ওদের মাথা থেকে। একদিন মহিমাপুরে মহাতপের সঙ্গে কথা বলতে বলতে ল' পেড়েছিল এই কথা। মৃদুকণ্ঠে উত্তর দিয়েছিল মহাতপ, 'ও সব কথা প্রকাশ্যে বলবেন না।'

জগৎশেঠের বাড়ীতে জমিদারদের আড্ডা। নানান কাজে তারা এখানে আসে। বহুদিন থেকেই আসে। এলে কথা হয়। কথা একটাই—কি করে সিরাজের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। মহিমাপুরের শেঠবাড়ী তাই নিঃসন্দেহে চক্রান্তের গুপ্ত ঘাঁটি। এখানে পরামর্শ হয়। জগৎশেঠের কথাবার্ত্তা জমিদার সেনাপতিরা শোনে। তার কাছে সবাই বাঁধা। সুতরাং মহাতপকে সামনে থাকতেই হয়। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার তাৎপর্য কোথায় তা বোঝার মত শক্তি নেই কারো। কিন্তু কাঁটা তোলার কথা পাকা।

এ ছাড়া আর কোন উপায় খুঁজে পায়নি জগৎশেঠ। জগৎশেঠ বড় একা। কারো ওপর নির্ভর সে করতে পারে না। অথচ অনেকে নির্ভর করে আছে তার ওপর। বাণিজ্যই ভরসা। শুধুমাত্র তার নয়, বাদশারও। ১৬৯০-৯৮ সালে ইংরেজরা বেশী বাণিজ্য করতে পারেনি। রাজস্বের অভাব হয়েছিল বাদশা আরঙ্গজেবের। দেশে বিরাট অভাব দেখা দিয়েছিল। কারিগরদের নৈপুণ্য কমে গেল হঠাৎ। বিলাস উবে গেল দরবার থেকে। বাণিজ্যের সঙ্গে মসনদ বাঁধা। সেই বাঁধন এখন অচ্ছেদ্য।

বিক্রি ছিল। জিনিষ তৈরী হত। বাজারের জন্যেই তৈরী হত। বিক্রি যে সব সময় উদ্বৃত্ত থেকে হত এমন কথা নয়। অনেক সময় বিক্রি করতে তারা বাধ্য হয়েছে। গায়ে লাগত। কিন্তু খুব নয়। কারণ অভাববোধই ছিল সংকীর্ণ। জীবনযাত্রার মান বড় সাদামাটা। অভাব

শুধু কিছুটা মানসিক বোধ। কিন্তু দীর্ঘদিনের জীবন-বিমুখ সংস্কৃতি ও সংস্কার মনকে দৈবনির্ভর ও অসহায় করে রেখেছে। প্রবীণ পরাজিতের মত তারা ইহলোক থেকে কাল্পনিক পরলোককে কাম্য জেনে ক্রমাগত সরে এসেছে মনের মধ্যে। আধিভৌতিকের চেয়ে আধিদৈবিক বিশ্বাস তাদের বেশী।

সবকিছুকে গ্রহণ করে মিলিয়ে ফেলার দুর্লভ ক্ষমতা বাংলার গ্রামের। মুদ্রা-অর্থনীতির চাপে কত দেশের জমিদারতন্ত্র ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে। গড়ে উঠেছে নতুন শক্তি। শক্তি কখনও এসেছে ওপর থেকে। কখনও নিচের থেকে। অচলায়তন থাকেনি। ঠাঁই করে দিয়েছে সময়কে, নতুনকে। কিন্তু সেই স্বাভাবিক নিয়মও ব্যর্থ হয়েছে বাংলায়।

মুদ্রা-অর্থনীতি চালু। খুব ভাল রকম চলে। টাকা দ্রুত হাত ঘোরে। জগৎশেঠদের লাভ বাড়ে। কিন্তু সেই মুদ্রা-অর্থনীতিও স্তব্ধ হয়ে গেল আবহমানকালের শান্ত সমাহিত গ্রামীনতার কাছে। ওঠেনি কোন নতুন শক্তি। কোন নতুন বল ভরসার ভাষা নিয়ে কথা বলেনি কেউ। কথা বলে এখনও সেই নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র, আর ঢাকার শাসনকর্তা দুর্লভরাম। চিন্তা করে না কেউ। অতি প্রাচীন পরিচিত চিন্তার ওপর দাগা বুলিয়ে টোল চতুষ্পাঠির পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আর মোক্তব মাদ্রাসার মোল্লা মৌলবী আসর জমায়।

এমন কোন শক্তি উঠলো না যাদের ওপর জগৎশেঠরা ভরসা করতে পারে। দেশীয় বণিকদের অল্প সুদে ধার দিয়েছে, কিন্তু তারাও ওঠেনি। টাকা যে ছিল না তাও নয়। টাকা তাদের ছিল। কিন্তু টাকা নিয়োগ করতে ভয়। মগ হার্মদ বর্গীর ভয়, ভয় বাইরের। তাদের হাত থেকেও ত্রাণ পাওয়া যায়। ত্রাণ পাওয়া যায় না ভেতরের ভয় থেকে। সেই ভয় জয় করতে হয় আত্মশক্তিতে। আত্মশক্তি আসে পরিবেশ থেকে। আত্মশক্তি ও আত্মনির্ভরতার অনুকূল পরিবেশ নেই। দাদনী মহাজনদের সঙ্গে যখন কোম্পানীর ঝগড়া হয়েছিল, খুশি হয়েছিল জগৎশেঠ। ভেবেছিল নতুন ভাষায় কথা বলছে কেউ হয়ত। ভুল ভেঙে গেল। সব চুপচাপ। মোটামুটি মানিয়ে নিয়েছে। যেমন বহি-বাণিজ্য হাতছাড়া হবার পর উপকূল-বাণিজ্য নিয়ে মানিয়ে নিয়েছিল সওদাগর।

জগৎশেঠ বাধ্য হয়ে ঝুঁকে পড়ে জমিদারদের দিকে। তারা বিশ্বাস করে কোম্পানীকে। অন্ততঃ কোম্পানীর সঙ্গে থাকলে ব্যবসা চলবে। তারা

দিতে পারবে শান্তি, নিরাপত্তা। আত্মরক্ষার সোজা পথে পা দিয়েছে মহাতপ।

সমস্ত পলাশীর যুদ্ধ ক্ষুদ্রতার যুদ্ধ। অহমিকা লোভ লালসা ও বিকৃত বিলাসের সঙ্গে আরো উগ্র লোভী শঠ ও প্রবঞ্চকের যুদ্ধ। এখানে কোন নীতি নেই, মূল্যবোধ নেই। একমাত্র নিজের স্বার্থকে পরম পবিত্র জেনে চক্রান্তের জাল বুনেছে মহাতপ, মীরজাফর। নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে তাড়িত পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়েছে সিরাজ। আর, আরো বেশী লাভ হবে জেনে এগিয়ে এসেছে ক্লাইভ।

হোয়াইহেড যথার্থই বলেছেন, সজ্ঞান আর অজ্ঞান শক্তির জোরেই ইতিহাসের গতি। সজ্ঞানগতি নিয়ে যায় আলোকিত পথ দিয়ে আরো বড় সভ্যতার কাছে। বুদ্ধি বিবেক ও আবেগের সুসম সঙ্গতিতে মহৎ উদ্দেশ্য ব্যক্ত। আর অজ্ঞানগতি, দুর্বার ও অন্ধকার। আশু প্রয়োজনের বাধ্যবাধকতায় ক্ষুধার্ত পশুর মত সে বর্বর ও হিংস্র। দীর্ঘ নৈরাশ্য ও সাধনার পর তার আলোর উত্তরণ।

পলাশীর যুদ্ধ সেই অজ্ঞান শক্তির আড়ম্বর মাত্র।

ঊনতিরিশ

ইংরেজরা যখন সত্যি সত্যি চন্দননগর অধিকার করে নিল, ল' পালিয়ে এল আবার মুর্শিদাবাদে। নবাব তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। ইংরেজরা নবাবের ওপর খুব চোটপাট করতে থাকলো তখন। সেই পুরানো যুক্তি। যারাই ইংরেজের শত্রু তারাই নবাবের শত্রু। সুতরাং ওকে কিছুতেই থাকতে দিতে পারবে না নবাব। পারলোও না। ল' যাত্রা করলো পাটনার দিকে। যাবার আগে ল' বলেছিল নবাবকে, 'নবাব সাহেব, আবার আমাকে ডেকে পাঠাবেন। আর আমার কথা মনে রাখবেন। এই আমাদের শেষ দেখা।'

চন্দননগরের পতন হল। ক্লাইভ ভেবেছিল এবার নবাব নির্ভর করবে তাদের ওপর। আর কোন শক্তি নেই যার ওপর ভরসা করা চলতে পারে। পর পর কয়েকটা চিঠিতে ক্লাইভ নবাবকে এই কথাই জানিয়েছে।

মীরজাফর ও রাজা দুর্লভরাম তখনও সেনাপতি। তারা নবাবের ওপর অসন্তুষ্ট। মাণিকচাঁদ এসেছে তাদের পক্ষে। ইয়ারলতিফ জগৎশেঠের লোক। মাইনে করা সেনাপতি প্রায়। ঘসেটি ও রাজা রাজবল্লভ এই সুযোগের অপেক্ষায় বসেছিল। মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে ইংরেজদের যোগ বহুদিনের। জমিদারী দেখার ছুঁতো করে প্রায়ই আসত কলকাতায়। ইংরেজদের সঙ্গে খাতির জমাত। নবাবের ওপর রাগ তার বহুদিনের। শেঠবাড়ীতে এই সব মহাপুরুষদের দেখা সাক্ষাৎ ঘটতে লাগলো প্রায়ই।

ল' যখন পাটনার পথে, ক্লাইভের সৈন্য ছুটছে ল'এর পিছু পিছু। খবর পেয়ে আহত নবাব ডেকে পাঠালো উকিলকে। বললে, 'মুচলেকা দিতে হবে যে তারা ফরাসীদের কোন অনিষ্ট করবে না।'

রাজী হয় না ইংরেজ। উত্তর তাদের মুখে মুখে। 'যতদিন এ দেশে একজন ফরাসী থাকবে, ততদিন কিছুতেই শান্ত হবে না তারা।'

উত্তেজনা বাড়তে থাকে।

উত্তেজনায় চক্রান্তের সুযোগ। শেঠবাড়ীতে সভা বসেছিল। রাজা দুর্লভরাম, রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ। মীরজাফর, কৃষ্ণদাসও হাজির ছিল সেই সভায়। অনেক তর্কবিতর্ক হয়েছে। কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি কেউ। নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বুদ্ধি নাকি ক্ষুরধার। ডাক পড়েছিল মহারাজার। প্রথমে তিনি পাঠান দেওয়ান কালী প্রসাদকে। কালী প্রসাদ ফিরে গিয়ে মহারাজাকে জানিয়েছিল সমস্ত ঘটনা। পরের দিন এলেন মহারাজা নিজে।

আবার সভা বসলো জগৎশেঠের বাড়ীতে। প্রথমে কথা উঠেছিল হিন্দুকে রাজা করা যায় কি না। নির্বাক ছিল মহারাজা। তারপর বলেছিল, 'যে সভায় মীরজাফর একজন নেতা সেখানে মুসলমানের বদলে কোন হিন্দুকে রাজা করার কথা উঠতেই পারে না। আমার মতে মীরজাফরকে কেন্দ্র করে ইংরেজদের সাহায্যে আমরা সিরাজকে নামাতে পারি মসনদ থেকে। ইংরেজদের সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। আমি এ বিষয়ে কিছু সাহায্য করতে পারি।'

সম্মতি দিয়েছিল জগৎশেঠ। 'ব্যবসার খাতিরে ইংরেজদের সঙ্গে আমার পরিচয়ও আছে। আমি তাদের চিনি। আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারবো। আমার মনে হয়, মহারাজের কথাই মানা উচিত।'

মহারাজের কথা মেনেছিল সবাই

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি স্ক্রাফটনের সঙ্গে কথা হয়েছিল উমিচাঁদের। উমিচাঁদ বলেছিল, ইংরেজদের সঙ্গে নবাব মোটেই বন্ধুত্ব করতে চায় না। বন্ধুত্বের ভান করে যাচ্ছে। নবাব এখন ভীত। অবস্থা তার খুব খারাপ। ফরাসীদের কাশীমবাজার থেকে যেতে দিয়েছে। ইংরেজদের হাতে তুলে দেয়নি। তার কারণ ফরাসীদের খুব কাছে রাখতে চায় নবাব। বিপদের সময় তারাই হবে সহায়। ওদিকে ক্রমাগত গুজব শোনা যায়, বুশী নাকি বিপুল সৈন্য নিয়ে বাংলায় প্রায় আসে আসে। পাঠান আক্রমণের ভয়ে নবাব এখন চুপচাপ। পাঠান আক্রমণ যদি সত্যি না হয়, আর ইতিমধ্যে বুশী যদি এসে পড়ে, তখন মজা টের পাবে কোম্পানী।

উমিচাঁদ তাই উপদেশ দিয়েছে স্ক্রাফটনকে,—নবাবের কাছ থেকে এখুনি কেটে পড়। ওর ওপর মোটেই বিশ্বাস করো না। সিরাজের বদলে পার ত অন্য কাউকে মসনদে বসাও। ইয়ারলতিফই ভাল। সে দু'হাজারী মনসবদার। জগৎশেঠ তাকে সাহায্য করবে। মাণিকচাঁদ কলকাতার সৈন্য নিয়ে যোগ দেবে লতিফের সঙ্গে।

খবর গেল ক্লাইভের কাছে। পরের দিন এল পিক্রু। মীরজাফর পিক্রুর কাছে খবর পাঠিয়েছে, আত্মরক্ষার জন্য আমাকে অস্ত্র ধরতে হচ্ছে। প্রত্যেকবার দরবারে আসার সময় আমার প্রাণনাশের আশঙ্কা। ইংরেজরা সিরাজকে গদীচ্যুত করতে সাহায্য করলে দুর্লভরাম জগৎশেঠ ইত্যাদি সবাই সঙ্গে থাকবে। আপনারা যদি রাজী থাকেন, জানান। তাহলে এখন সিরাজকে খুশী রাখতে হবে। সেজন্য আপনাকে হুগলী থেকে ছাউনি সরাতে হবে।

এতটা আশা করেনি ক্লাইভ। কোম্পানী ভেবে দেখলো ইংরেজরা যোগ দিক বা না দিক, বিরোধ এত প্রবল যে সিরাজ বেশীদিন সিংহাসনে থাকতে পারবে না। কিন্তু এ চক্রান্তে যোগ না দিলে কোম্পানীর ব্যবসার ক্ষতি হবে। রাজী হয় ক্লাইভ। যোগাযোগ করার ভার পড়লো ক্লাইভ আর ওয়াটসের ওপর।

চন্দননগরে ইংরেজরা যখন ফরাসীদের তাড়া করছে, নবাব রাজা দুর্লভরামের অধীনে একদল সৈন্য পাঠিয়েছিল পলাশীতে। এখন আবার

খবর এসেছে চক্রান্ত প্রায় পাকা হয়ে এসেছে। নবাব মীরজাফরকে পাঠালো পলাশীতে।

মীরজাফরের সন্ধিপত্র রচনা হল শেঠবাড়ীতে। দাবী দাওয়া ঠিক ঠাক। কলকাতা রাজী হয়েছে। মীরজাফর নবাব হলে সিরাজের সঞ্চিত ধনভাণ্ডার ভাগ করে নিতে হবে। বখরায় বিবাদ যেন না হয়। পাকাপাকি ভাবে কাজ করতে হবে। তাই ঠিক হয়েছে কোম্পানী পাবে এক কোটি, ইয়োরোপীয় ব্যবসাদাররা পঞ্চাশ লাখ, দেশীয় ব্যবসাদাররা কুড়ি লাখ, আরমানি ব্যবসাদাররা সাত লাখ, সেনাবিভাগ পঞ্চাশ লাখ। তা ছাড়া দরবারের কর্মচারীদেরও খুশী রাখতে হবে।

কিন্তু উমিচাঁদকে এড়ানো মুসকিল। সে বলে, 'সেও ত এই চক্রান্তে জড়িত। মীরজাফর যদি হারে, তবে ধনে প্রাণে মারা যাবে সেও। কিন্তু যদি জেতে, তবে লাভের বখরা কেন পাবে না।' দাবী তার মন্দ নয়। সে চায় সিরাজের সঞ্চিত ধনের শতকরা পাঁচ টাকা, আর মণিমুক্তার চার ভাগের এক ভাগ।

উমিচাঁদকে হাতে রাখা ভাল। চক্রান্তের কথা সে জানে। হাতে না রাখলে ফাঁস করে দিতে পারে। তাই দু'খানা দলিল হল। একটা লাল, আর একটা সাদা। লাল দলিলটা জাল, সাদাটা ঠিক। কোম্পানী দু'খানা দলিলেই সই করে পাঠিয়ে দিল মুর্শিদাবাদে। চক্রান্তকারীরা সই করলো। লাল দলিলে সই করানো হল উমিচাঁদের। তাকে ফাঁকি দেবার ব্যবস্থা পাকা।

রাজধানীতে এল মীরজাফর আর দুর্লভরাম। আসতে দেরী হয়েছে অনেক। প্রায় দু' হপ্তা পার হয়ে গিয়েছে। দেরী দেখে ক্লাইভ বিব্রত। চুক্তি ও কথা কলকাতার লোকজন জানে। মাঝে মাঝে বলাবলিও করে। ক্লাইভ ভাবছিল বাতিল করে দেবে সব। উমিচাঁদের লোভ বেশী। তাকে কুড়ি লাখ ত পেতেই হবে। কিন্তু আগেভাগে সিরাজের মণিমুক্তা কিছু পাচার করা যায় কিনা এই নিয়েই সে চিন্তিত।

৫ই জুন রাত্রে পালকি চড়ে ওয়াটস এল জাফরগঞ্জে মীরজাফরের বাড়ীতে। খোলা পালকিতে চড়েনি ওয়াটস। মেয়েদের জন্যে ঢাকা পালকি তখন প্রচলন ছিল। ওয়াটস সেই পালকিতে চড়ে এল। নজর এড়াতে

হবে। মীরজাফর সই করলো চুক্তিতে। মীরণও কোরাণ ছুঁয়ে শপথ করেছিল তখন।

১১ই জুন ক্লাইভ চুক্তি ফিরে পেল। ১৩ই সে লিখলো নবাবকে যে, কলকাতার সন্ধি নবাব পালন করছে না। করার ইচ্ছেও নেই। বুশীকে আসার জন্য চিঠি লিখেছে নবাব। জগৎশেঠের গদীতে হুণ্ডি দিয়েছে নবাব, ল'কে দশ হাজার টাকার মাসোহারা দেবার জন্য। এই সব কারণে তাকে সসৈন্যে কাশীমবাজার যেতেই হবে। জগৎশেঠ মোহনলাল মীরজাফর প্রমুখ মাননীয় ভদ্রলোকদের ডেকে বিচার করতে আবেদন জানাবে ক্লাইভ।

পরের দিন রাত্রে বেরিয়ে পড়লো ক্লাইভ। ১৯ তারিখে কাটোয়া তার অধিকারে এল। কয়েকদিন চুপ করে ছিল কর্নেল। ২১শে তারিখে তার মন্ত্রনাসভা শেষ হল। ২২শে তারিখে নদী পার হয়ে ২৩শে পলাশী। খুব ভোর বেলা যুদ্ধ আরম্ভ হল। শেষ হল বিকেল চারটে। নবাব উটে চড়ে পালিয়ে গেল। সঙ্গে লুৎফা, তার বেগম।

আমাদের জাতীয় যুদ্ধ শেষ হল মাত্র কয়েক ঘণ্টার ভেতর।

কোম্পানীর ১৬ জন এদেশীয় সেপাই, ১৩ জন গোরা সৈন্য মারা গেল। আহত হল ৭২ জন। নবাবের সৈন্য মারা গেল ৫০০, আর আহত হল ৫০০।

কিন্তু এই পতনের সঙ্গে আরো একটা বিরাট পতন হয়ে গিয়েছে। তার চরিত্র বুঝতে দেরী হয়েছিল অনেকদিন। এখনও অবধি বোধ হয় সঠিক চরিত্র বোঝা যায় না। সে এত জটিল, এত তর্কশঙ্কুল। সে সমস্যা ইংরেজ যুগের আমাদের সামাজিক ও মানসিকতার সমস্যা, আমাদের সভ্যতা ও ঐতিহ্যের সমস্যা।

পরের দিন মীরজাফর এসেছিল ক্লাইভের কাছে। অকৃপণ কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিল মীরজাফর। ইংরেজরা তাকে সাহায্য না করলে কিছুতেই মসনদ পেত না সে। কোম্পানীর কাছে সে কৃতজ্ঞ। বেইমান সে নয়। অক্ষরে অক্ষরে পালন করবে চুক্তির সর্ত। ক্লাইভ আশ্বাস দিয়েছিল তাকে। মুর্শিদাবাদের দিকে রওনা হল মীরজাফর।

একটাও কথা বলেনি শেঠেরা। বাড়ীর ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দিয়েছিল ঢাকায়। মহিমাপুরে বসে নজর রেখেছিল পলাশীর মাঠে।

আলিবর্দীর কথা ভেবে একবার বিমর্ষ হয়েছিল মীরজাফর। চেষ্টা করেছিল চক্রান্ত থেকে দূরে থাকতে। লোভ আর কৃতজ্ঞতার খণ্ড যুদ্ধে হার হল মানুষ মীরজাফরের। মোগল সাম্রাজের ক্ষয়িষ্ণু সভ্যতার উত্তর সাধক সে। লোভ জয় করেছে তাকে।

উমিচাঁদ আর রাজা দুর্লভরাম প্রতি মুহূর্তে আশ্রয় নিয়েছে শঠতার। ছল চাতুরী করে ধনরত্ন সরাবার করুণ চেষ্টায় তারা বিপর্যস্ত। ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন।

মহাতপ রায় নিশ্চুপ। শেঠবাড়ীর ঐতিহ্য রেখেছে সে। ঘুষ আর লুণ্ঠন থেকে তারা অনেক দূরে। যখন দরবারের প্রত্যেকটি মন্ত্রী নজরাণার উপরি আয়কে বিধিসম্মত অধিকার জেনে নিজেদের সিন্দুক ভর্তি করেছে, তখন একটা কড়িও স্পর্শ করেনি শেঠরা। ব্যবসার স্বার্থ ছাড়া অন্য কোন স্বার্থ মূল্যবান নয় তাদের কাছে। তারা ইংরেজদের প্রতি অনুরক্ত। ইংরেজদের কয়েকটা কর্মদক্ষতায় তারা মুগ্ধ। তারা ভেবেছিল আবার কাজ কারবার আরম্ভ করতে পারবে। আবার হুণ্ডি, দর্শনী, টিপ, বাঁট্টার হিসেব করতে করতে গমগম করে উঠবে মহিমাপুরের ওত বড় গদী।

কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার বাস্তব বুদ্ধির চরম সার্থকতায় মহাতপ নিশ্চয়ই খুশি হয়েছিল সেদিন। তখন একবারও বোধ হয়নি তার যে, একটি কাঁটা উঠলো ঠিকই। যে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলেছে, সেটি কিন্তু বিঁধে আছে একান্ত গভীরে, হৃদপিণ্ডের দিকে।

বোঝেনি মহাতপ। সময়ের গণ্ডী ছাড়াতে পারেনি সে। ভেবে থাকতে পারে ইংরেজের সাহায্য নেওয়ার পিছনে কোন অন্যায় নেই। বরং হয়ত ইতিহাসের সমর্থন আছে। আলেকজাণ্ডার যখন ভারত আক্রমণ করেছিল তক্ষশিলার রাজা তাকে বল যুগিয়েছে। শত্রু তার পুরু। জয়চাঁদ ডেকে এনেছিল মহম্মদ ঘোরীকে পৃথ্বীরাজের বিরুদ্ধে। ইব্রাহিম লোদীকে শাসন করার জন্য দৌলত খাঁ আর আলম খাঁ নিমন্ত্রণ করেছিল বাবরকে। সিরাজকে শান্ত করার জন্য তারা সাহায্য নিয়েছে ইংরেজের। ইংরেজরা নবাব নয়। নবাবের বন্ধু। তারা শক্তিশালী ব্যবসাদার। বন্ধু তারা শেঠবাড়ীরও।

ইয়োরোপ আর বাংলার তফাৎ দেখে অবাক হয়েছিল এক ইংরেজ লেখক। গিরিয়ার মাঠে যে বছর সরফরাজকে খুন করা হল, ঠিক সেই

বছরেই বিদেশীর হাতে খুন হয়েছিল হাঙ্গেরীর মহারাণী। হাঙ্গেরী ইয়োরোপের অন্ধকার দেশ। সে ইংলণ্ড নয়, ফ্রান্স নয়। সেই অন্ধকার দেশের মহারাণী খুন হবার আগে আবেদন জানিয়েছিল হাঙ্গেরীর মানুষের কাছে। সেদিন হাপস্‌বার্গ রাজবংশের প্রতি অনুগত থাকার কোন কারণ ছিল না হাঙ্গেরীর সাধারণ মানুষের। তবু তাদের মিলিত কণ্ঠের ধ্বনিতে নাড়া খেয়ে উঠেছিল সারা ইয়োরোপ।

সেদিন সেই ইংরেজ ভদ্রলোক বোঝেনি যে ইতিহাসের সার্থক বিবর্তনের ধারায় হাঙ্গেরী তখন জাতি। স্থাপিত হয়েছে নেশান ষ্টেট। জাতীয়তা বোধ তাদের জীবন্ত। আর আমাদের জাতীয়তা বোধ জেগেছে পলাশীর অনেক পরে। তাই পলাশীর অত বড় পতনে ক্ষোভ ও ঘৃণা ছিল না সাধারণ মানুষের মনে। তারা নিজেদেরকে ক্রমাগত গুটিয়ে নিয়েছে সংকীর্ণতর পরিসরে। গ্রাম-কেন্দ্রিক ঐক্যবোধ ছাড়া আর কোন ঐক্যবোধ নেই তার। এত নিঃসাড়তা, এত নিষ্প্রাণতা দেখে ওয়ারেণ হেষ্টিংসও বলেছিল, এরা দুঃখ ভোগ করার জন্য এসেছে। কোন বোধ যদি থাকে, তবে তা আছে ওই মারাঠাদের।

অবাক হয়েছিল ক্লাইভও। পলাশীর ঠিক পরে, ২৯শে জুন ভোর বেলা দু'শ গোরা আর পাঁচশ সেপাই নিয়ে ক্লাইভ যখন মাদপুর থেকে এল মুর্শিদাবাদে, তখন পথের দু'পাশে অগণিত মানুষের দেওয়াল দেখে বুক কেঁপে উঠেছিল তারও। পার্লামেণ্টে সাক্ষ দেবার সময় ক্লাইভ নিজেই বলেছে: 'মুর্শিদাবাদের রাজপথে সেদিন যে লোক জড়ো হয়েছিল, তারা ইচ্ছা করলে গোটাকতক ইংরেজকে লাঠি আর ঢিল মেরে তাড়িয়ে দিতে পারত।'

কিন্তু সে ইচ্ছা করেনি বাংলা দেশের মানুষ। কারণ সে ইচ্ছা করার মত সময় এবং জাতীয় চৈতন্য তখনও আসেনি। তাই পলাশীর যুদ্ধ নিয়ে গ্রাম্য কবিয়ালের ছড়া কতদূর পলাশীর যুদ্ধের সময়ে রচিত—এ বিষয়ে ঘোর সন্দেহ থাকা স্বাভাবিক।

ওয়াটস আর ওয়ালস গিয়েছিল মুর্শিদাবাদে, চুক্তি অনুযায়ী এক কোটি টাকা আনতে। টাকা পায়নি। রাজা দুর্লভরাম খুব অনুগত ভঙ্গীতে জানিয়েছিল যে, রাজকোষে পড়ে আছে বড় জোর এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা। জগৎশেঠের কাছ থেকে এক কোটি টাকা পাওয়া যাবে না।

খবর পেয়ে ক্লাইভ বিচলিত। সেইদিনই মুর্শিদাবাদ যাবার ঠিক হল। কিন্তু খবর এল তাকে খুন করার জন্য গুপ্ত আয়োজন হয়েছে। সেদিনের মত পিছিয়ে গেল ক্লাইভ।

২৯শে বিকেলবেলা ক্লাইভ মীরজাফরকে নবাব হিসাবে সেলাম জানিয়ে গেল। সন্ধ্যাবেলা জগৎশেঠ এসেছিল ক্লাইভের কাছে। অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা হল দু'জনের। পরের দিন নবাব মীরজাফর যখন ক্লাইভের সঙ্গে দেখা করতে আসে, কথাটা খুব সোজা করে বললে ক্লাইভ। তার সন্দেহ হয়েছে যে সিরাজের গুপ্ত ধনরত্ন ইতিমধ্যে বে-হাত হয়ে গিয়েছে। সে যে কোন পথ দিয়ে কার ঘরে গিয়ে উঠেছে তা আর বোঝবার উপায় নেই। এখন যে টাকা পড়ে আছে তাতে ত আর সবাইকে খুশি করা যাবে না। একটা উপায় ঠিক করতে হবে।

মীরজাফর আর ক্লাইভ ঠিক করলো জগৎশেঠের কাছে যাওয়াই ভাল। মহিমাপুরে আবার সভা বসলো। এল ওয়াটস, স্ক্রাফটন, দুর্লভরাম। উমিচাঁদও ছিল। কিন্তু তাকে সভায় থাকতে দেওয়া হয়নি। দূরে বসে পাওনা কড়ির হিসেব করছিল উমিচাঁদ।

দীর্ঘ আলোচনা হয়েছিল তাদের। পরস্পরের প্রতি সন্দেহ এসে গিয়েছে ইতিমধ্যে। জগৎশেঠ অতি ধীরভাবে অবস্থা বুঝিয়েছিল। মহাতপই ভাগ করলো। এখন যখন টাকার এত অভাব, তখন কোম্পানীকে এক কোটি টাকা এক সঙ্গে দেওয়া যাবে না। কোম্পানী এখন পাবে তাদের প্রাপ্যের অর্দ্ধেক। কিছুটা টাকায় আর কিছুটা মণিমুক্তা নিয়ে শান্ত হতে হবে কোম্পানীকে। বাকি অর্ধেকটা তিন বছরে তিন কিস্তিতে শোধ করতে হবে।

নবাবের জন্যে কিছু রাখা দরকার। বিপুল সৈন্যবাহিনী। মাইনে বাকি অনেক দিনের। আবার দুর্লভরামকে কিছু না দিয়ে উপায় নেই। সে এখন দেওয়ান। সবই তার হাতে। ফরাসীদের পতনের জন্যে অনেক টাকা ক্ষতি হয়েছে জগৎশেঠের। ফরাসীদের যে সব মালপত্তর পড়ে আছে তাই নেবে জগৎশেঠ। যদি তাতে খুব বেশী টাকা না ওঠে তবে কোম্পানী কিছু দিয়ে ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করবে। জগৎশেঠ কথা দিয়েছে বাদশার কাছ থেকে মীরজাফরের জন্য ফর্মান এনে দেবে। কোম্পানীর কাজ আগের মতই চলবে।

সভা শেষ হলে স্ক্রাফটন জানালো উমিচাঁদকে—তার এক কড়িও প্রাপ্য

নেই। লাল দলিলটা জাল। আঘাতের ধাক্কা সামলাতে পারেনি উমিচাদ। অজ্ঞান হয়ে পড়লো মাটিতে। পালকী করে বাড়ী পাঠানো হল উমিচাঁদকে।'

শেষে পাগল হয়ে গিয়েছিল উমিচাদ। ক্লাইভ তাকে বলেছিল তীর্থে যেতে। কিন্তু কোন ফল হয়নি। বুড়ো উমিচাদ খুব সাজগোছ করে মণিমুক্তা পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখত শুধু।

তিরিশ

মসনদে বসলো সুজা উলমুল্ক হিসামউদ্দৌলা মীরজাফর আলি খাঁ বাহাদুর মহবৎজঙ্গ। এত বড় উপাধি নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ত লোকে। তাই তারা নিজের মনের মত নতুন নবাবের নাম দিল 'ক্লাইভের গাধা'।

বসতে না বসতেই বিপদ। তার মহাজন অনেক। নবাবী কায়দায় পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে অনেককে। কিন্তু এত টাকা কোথায়। দুর্লভরাম যে হিসেব পেশ করেছে শেঠবাড়ীতে, তাতেই অন্ধকার দেখেছে অনেকে।

দুর্লভরাম দিয়েছিল বাইরের ধনাগারের হিসেব। শেঠবাড়ীতে একটা আন্দাজ দেওয়া হয়। সঠিক হিসাবে একটু বেশী হয়ে পড়ে। ধনাগারে পাওয়া গেল, এক কোটি ছিয়াত্তর লক্ষ রুপোর টাকা, বত্রিশ লক্ষ সোনার টাকা, দু' সিন্দুক সোনার পাত, চার সিন্দুক মণিমুক্তার অলঙ্কার, ছোট দু'সিন্দুক ভর্তি জহরৎ। শেঠবাড়ীতে লুটের এই মালের ওপর বখরা নিয়ে কথা হয়।

কিন্তু প্রকাশ্য ধনাগার ছাড়াও থাকত গুপ্ত ধনাগার। বেগম মহলের ধনাগারে নাকি ছিল আট কোটি টাকা। তার হিসেব পায়নি ক্লাইভ। সেটা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয় মীরজাফর, আমিরবেগ, রামচাদ ও নবকৃষ্ণ।

রামচাদ কোম্পানীর সামান্য মুন্সী। মাইনে তার ষাট টাকা। মরার সময় বংশধরদের জন্য দিয়ে যায় বাহাত্তর লাখ টাকা,—কুড়ি লাখ টাকার মত মণিমুক্তা, আঠারো লাখ টাকার জমিদারী, আর চারশ কলসী সোনা রুপোর টুকরো। পলাশীর মাত্র দশ বছর পরে মারা যায় এই করিৎকর্মা ভদ্রলোকটি।

শোভাবাজার রাজবাড়ীর এই মহারাজা ষাট টাকার মাইনের কর্মচারী। কিন্তু মায়ের শ্রাদ্ধে খরচ করেছিলেন ন'লাখ টাকা।

মণি বেগমের অগাধ ধনরত্ন আসলে এই বেগম মহলের টাকা। এই টাকা দিয়েছিল মীরজাফর তার প্রাণের বিবিকে।

রাজ্য জয়ের পর শূন্য হাতে ফেরেনি কোম্পানীর কর্মচারীরা। প্রামাণ্য হিসেব এই :

গভর্ণর ড্রেক : ২৮০,০০০

কর্ণেল ক্লাইভ :

মেম্বার হিসাবে...২৮০,০০০
সেনাপতি ...২০০,০০০
বিশিষ্ট দান ...১৬০০,০০০

২০৮০,০০০

ওয়াটস :

মেম্বর হিসাবে ... ২৪০,০০০
বিশিষ্ট দান ৮০০,০০০

১০৪০,০০০

মেজর কিলপ্যাট্রিক ... ২৪০,০০০
অতিরিক্ত ৩০০,০০০

৫৪০,০০০

ম্যানিংহাম ২৪০,০০০
বেকার ২৪০,০০০
ওয়ালস ৫০০,০০০
স্ক্রাফটন ২০০,০০০
লুসিংটন ৫০০,০০০
কাউন্সিলের ছ'জন সভ্য প্রত্যেকে...৬০০,০০০

ক্লাইভ কিন্তু টাকা নিয়ে মোটেই বিবেক-দংশনে ভোগেনি। বিলেতের কমিটির সামনে সে সহজভাবে বললে, 'মীরজাফরের কাছ থেকে টাকা নেওয়া আমি মোটেই অন্যায় কাজ বলে মনে করিনি। আমার মালিক, কোম্পানীর কোন ক্ষতি হয়নি। ও দেশের লোক আমাকে যত টাকা দিতে

এসেছিল তা যদি সব আমি নিতাম, তবে বিলেতের কোটিপতি হতে পারতাম। মুর্শিদাবাদের কোষাগারে ঢুকে আমার চারদিকে যে রাশি রাশি মণিমুক্তা আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি, তা মনে পড়লে আমি ভাবি, কি করে এত সামান্য টাকা নিয়ে তৃপ্ত হয়েছিলাম।

শুধু ক্লাইভ নয়, তৃপ্ত কোম্পানীও। ৬ই জুলাই একশ নৌকায় সাতশ সিন্দুক বোঝাই লুটের বখরা নিয়ে কোম্পানীর জাহাজ ডঙ্কা বাজিয়ে এল কলকাতায়।

নবাবী রীতি অনুযায়ী এই অঢেল উপহার গেল জগৎশেঠ মহাতপ রায়ের হাত দিয়ে।

মাত্র কয়েকদিন আগে ইংরেজরা ছিল নিরীহ বণিক। আর এক বছর আগে ত অসহায়। এখন তারা প্রধান সহায়। নবাব তাদের হাতের মুঠোয়।

গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট বললে, 'মীরজাফরের কাছ থেকে ব্যবসার জন্যে কোন নতুন সুযোগ সুবিধা চাইনি। আমাদের দরকার ছিল না। ১৭১৬ সালে যে সব সুযোগ আমরা ফর্মান অনুযায়ী পেয়েছিলাম, সেটাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। এখন চাই নবাব যেন তার ওপরে কোন হাত না দেয়।'

কয়েকদিন যেতে না যেতেই মীরণ বোধ করলো নবাব ত পুতুল। আসল ক্ষমতা ক্লাইভের। বুকের ভেতর জ্বলে উঠলো মীরণের।

বাণিজ্যের জন্য পরোয়ানা বার করলো নবাব। দুর্লভরাম মীরজাফরের অনেক দিনের বন্ধু। বহু সুখ দুঃখের সঙ্গী। কিন্তু সেই দুর্লভরামের সঙ্গে বন্ধুত্ব বোধ হয় আর থাকে না। নানা কারণে দু'জনের মধ্যে সন্দেহ ঘোরালো হয়ে ওঠে।

হিন্দুদের মনে পুরানো ভয় এসেছে নতুন করে। পলাশীর কিছু আগে সিরাজ খবর পাঠিয়েছিল ল'কে। টাকা পেতে কিছু দেরী হয়। ল' তাই সময় মত আসতে পারেনি। রাজমহলে এসে পলাশীর খবর পেয়ে ফিরে গেল পাটনায়। পাটনার শাসনকর্তা তখন রামনারায়ণ। ভয় তার মনে অনেক আগে থাকতেই ছিল। ল' আসতে সাহস বাড়লো।

গোলোযোগ বেধেছে মেদিনীপুরে। পূর্ণিয়া অশান্ত। রাজকোষে টাকা নেই। মীরজাফর বড় বিপদে পড়েছে। মাইনে বাকি সেপাইদের। তারাও বুঝি আর স্থির থাকে না।

কিন্তু মীরজাফর নবাব। একটু আমোদ আহ্লাদ না করলে চলবে কেন? বিপদের মাঝখানে বসে থেকেও ফুর্তি করতে ভোলে না নবাব। ওদিকে তার মণি বেগম। আগুনের মত রূপ। ওকে দেখে বুক কেঁপে ওঠে মীরজাফরের।

একদিন পুরাণো এক বন্ধু বলেছিল নবাবকে, 'জাঁহাপনা, একদিন দেদার দিলের জন্য আপনি ছিলেন বিখ্যাত। আজকে এমন হলেন কেন?'

উত্তর দিয়েছিল মীরজাফর, 'সেদিন নদীটা ছিল আলিবর্দীর। আমি খুশ মেজাজে জল তুলতাম আর ঢালতাম। এখন নদীটা যে আমার নিজের। তাই এখন নদীর একবিন্দু জল দিতে আমার বুক ফেটে যায়।'

পুরাতন পরিচিত সেনাপতি বশে রাখতে পারে না তার সেপাইদের। মুর্শিদাবাদে অসন্তোষ।

ক্লাইভ কলকাতায়। মুর্শিদাবাদে তখন স্ক্রাফটন। চারপাশে অসন্তোষ আর সন্দেহ দেখে তারও হাত পা হিম। ভাবলো বাংলাকে আর রক্ষা করা যাবে না। ৭ই নভেম্বর স্ক্রাফটনের আর্ত আবেদন পৌছালো ক্লাইভের কাছে, 'আপনি যদি পত্রপাঠমাত্র নিজে সসৈন্যে এখানে না আসতে পারেন, তবে আদেশ করুন, আমিই আপনার কাছে যাবো।'

অভয় দিল ক্লাইভ। 'অকারণে ভীত হয়ো না। সৈন্য নিয়ে আমি যাচ্ছি। ইতিমধ্যে শুধু তীক্ষ্ণ নজর রাখো।'

ক্লাইভের নাম তখন যাদু। নেই নেই করে খাজাঞ্চিখানা থেকে টাকা বেরুলো। সাময়িক শান্তি এল সেনাবাহিনীতে। দুর্লভরাম ও মীরজাফরের মৌখিক বন্ধুত্ব হল। ক্লাইভ ভিন্ন ভরসা নেই। মীরজাফরের ইচ্ছা তার সঙ্গে ক্লাইভও যাক বিহারে। টাকা না পেলে ক্লাইভ যেতে রাজী নয়। জগৎশেঠের কাছে হাত পেতে কিছু হয়নি। শেঠেরা বলেছে, তাদের টাকার বড় টানাটানি। দিতে পারবে না। অগত্যা রাজকোষ থেকে এল বারো লাখ টাকা। বাকিটা হুগলী বর্ধমান এবং নদীয়ার জমিদারদের খাজনা থেকে নিয়ে নেবে কোম্পানী। নন্দকুমার আদায় করে দেবে এই টাকা।

মীরজাফর, রায়দুর্লভ আর ক্লাইভ বার হল অশান্তি ঘুচিয়ে শান্তি আনতে। মাথা নীচু করলো মেদিনীপুরের রাজারাম। পালিয়ে গেল পূর্ণিয়ার বিদ্রোহী, রামনারায়ণের সঙ্গে মিটমাট হল।

অল্পদিনের ভেতর মহাতপও বুঝতে আরম্ভ করেছে কোম্পানীর প্রতাপ।

এ কোম্পানীকে চিনত না মহাতপ। এরা যেন আগের সেই নিরীহ বণিক আর নেই। তাদের আর আসতে হবে না শেঠবাড়ী, দরবারে ওকালতি করার জন্য। মধ্যস্থতা করার জন্য ডাকও পড়বে না। আগের মত মিনতি করে দাঁড়াবে না দরজায়। পরিবর্তন বুঝতে পারে মহাতপ।

ট্যাঁকশাল বসেছে কলকাতায়। শিক্কা টাকা তৈরী হচ্ছে। বিচলিত হয়নি শেঠরা। ক্ষতি যে তাদের হচ্ছে না এমন নয়। ক্ষতি হচ্ছে। কাজও হচ্ছে কিছু কম। হবে জানত। কিন্তু অন্য বুদ্ধিতে মারতে হবে কোম্পানীকে।

শেঠবাড়ীতে মজুত রূপোর পরিমাণ অনেক বেশী। হার মানাতে পারবে না কোম্পানী। রাজ্য জয় করে কোম্পানীর এখন অনেক টাকা। ইয়োরোপ থেকে রূপো আমদানী কমে যাচ্ছে দিনের পর দিন। বাজার দর শেঠবাড়ীর হাতে। কলকাতায় ট্যাঁকশাল বসিয়েও এঁটে উঠতে পারে না জগৎশেঠের সঙ্গে। আর টাকার বাজারে এত সুনাম কি করে পাবে কোম্পানী।

আইনত কলকাতার টাকা আর মুর্শিদাবাদের টাকার দর সমান। কিন্তু বাজারে কেনাবেচার সময় মুর্শিদাবাদের টাকা চলবে বেশী। হাত ঘুরবে আগের মত। লোকের বিশ্বাস আছে ওই টাকার ওপর। আইন করে মারা যাবে না মহিমাপুরকে। কার্যত শেঠবাড়ী জয়ী হবেই।

ডগলাস কলকাতার স্বাধীন ব্যবসায়ী। সে নিজে কলকাতার টাকা নিতে অস্বীকার করেছে। সে জানিয়ে দিয়েছে কলকাতার শিক্কা নিয়ে ব্যবসা করা যায় না। তাকে শতকরা পাঁচ থেকে দশ টাকা অবধি বাট্টা দিতে হয় কলকাতার টাকার জন্য। টাকার দাম ওটা নামা করে জগৎশেঠের মর্জি মাফিক। দেশ জোড়া তার ঘাঁটি। এই অবস্থায় কলকাতার শিক্কা নিয়ে ব্যবসা করা অসম্ভব।

বুদ্ধির যুদ্ধে ক্লাইভ কাবু করতে পারেনি মহাতপকে। বাধ্য হয়ে কোম্পানী লিখে পাঠালো বিলেতে, আমাদের নতুন ট্যাঁকশাল থেকে খুব বেশী সুবিধে আমরা পাব না। কয়েক বছর ইয়োরোপ থেকে রূপো আমদানী প্রায় বন্ধ। রূপো এলেও লাভ হবে না। কলকাতার শিক্কা টাকা শেঠদের স্বার্থকে আঘাত করছে। তারা আপ্রাণ চেষ্টা করছে আমাদের শিক্কা টাকার দাম কমিয়ে দিতে। ওজন ও দামের দিক থেকে মুর্শিদাবাদের শিক্কার সঙ্গে আমাদের শিক্কার কোন তফাৎ না থাকলেও, আমাদের টাকার বাট্টা দিতে হচ্ছে। লোকে নিতে চায় না।

অন্যদিক থেকেও পারেনি কোম্পানী। চলতি বছরের টাকার ওপর বাট্টা নেই। কিন্তু পুরাণো টাকায় বাট্টা ত দিতেই হবে। জগৎশেঠের স্থবিধে। নবাবের ট্যাকশাল থেকে নামমাত্র মজুরী দিয়ে পুরাণো টাকাকে নতুন টাকা করে নেবে। কলকাতার সন্ধি তাই শেঠদের খুব বেশী ধাক্কা দিতে পারেনি। তবে তাদের সতর্ক করে দিয়েছে। তবু বড় অনুগত মহাতপ।

এতকাল ধরে জমিদারের খাজনা জমা পড়ত মহিমাপুরে। এখন তিনটে জেলার খাজনা আদায় করবে নন্দকুমার। জমা পড়বে সোজাস্থজি ইংরেজদের ঘরে। এই ব্যবস্থায় ক্ষতি হল শেঠদের। প্রভাবের দিক থেকে যেমন, অর্থের দিক থেকেও তেমন। মহাতপ নবাবকে জানালো যে বাজারে তাদের বহু টাকা পড়ে আছে। বাকী ত শুধুমাত্র ইংরেজদের কাছে নেই। মহিমাপুরের গদী থেকেও মীরজাফর টাকা নিয়েছে স্বয়ং। শোধ দিতে হবে এখন। কোম্পানীকে টাকা দিতে নবাব জমিদারীর বরাত দিয়েছে। মহাজন তারাও। স্থতরাং তাদের বেলায়ও জমিদারীর আয়ের ওপর বরাত দেওয়া হোক। প্রজাদের কর থেকে শোধ হবে নবাবের দেনা। এই ব্যবস্থা করা দরকার। কারণ তাদের টাকার প্রয়োজন।

এমন ধরণের চাপ আশা করেনি মীরজাফর। ক্লাইভ ত করেইনি। নবাব চাইলো ত্রাতার দিকে। ক্লাইভ অভয় দিল আবার। শেঠদের কাছে গিয়ে বললে যে, তাদের এমন দাবী করার মানে কোম্পানীর বিরুদ্ধে যাওয়া। জগৎশেঠকে বেছে নিতে হবে যে, সে কোম্পানীর বন্ধু হয়ে তার দাবীর কথা ভুলে যাবে, না কোম্পানীর শত্রু হয়ে দাবী আঁকড়ে থাকবে। মহাতপ আর কিছু বলতে পারেনি। জয়ী হয়েছে ক্লাইভের ইচ্ছা।

লুটের টাকা বাঁটোয়ার সময় জগৎশেঠ নিজেই বলেছিল, বাদশার দরবার থেকে ফর্মান আনিয়ে দেবে মীরজাফরকে। এখনও অবধি আসেনি ফর্মান। ক্লাইভ তাড়া দেয় মহাতপকে। মহাতপও জানে না কবে সে আনিয়ে দিতে পারবে। দর কষাকষি চলছে। দিল্লীর চাহিদা অনেক।

১৭৫৮ সালের ২৯শে জানুয়ারী খবর এল ফর্মান আসছে। উপাধি পেয়েছে মীরণ। নবাব পরিবারের কেউ বাদ পড়েনি। বাদ পড়েনি ক্লাইভও। তার পদবী খুব ভারী। মনসবদার এখন কর্নেল ক্লাইভ। স্থতরাং জায়গীর তাকে দিতেই হবে। নবাব রাজী হয়, ক্লাইভকে করতে হবে জয়গীরদার।

বছর ঘুরে গেল। জায়গীরদার হল না ক্লাইভ। চিঠি এল মহাতপের কাছে। নবাব ক্লাইভের বন্ধু। ক্লাইভের বন্ধু জগৎশেঠও। তাই কর্নেল লিখলো যে, বন্ধুর কাছে কথাটা সোজাসুজি পাড়তে তার বাধছে। জগৎশেঠ যদি নবাবকে জায়গীরের কথা মনে করিয়ে দেয়, তবে খুব উপকৃত হবে সে।

পত্রপাঠ উত্তর দিল জগৎশেঠ। নবাব জমিদারী দিতে সব সময় ব্যাকুল। তবে জমিদারীর স্থান নির্বাচন নিয়েই সমস্যা। বাংলায় কোন নতুন জায়গীরদার করতে নবাব অনিচ্ছুক। উড়িষ্যা জায়গা হিসাবে অনুর্বর। তাই দেওয়া যায় না। তবে বিহার যদি ক্লাইভের ভাল লাগে, তবে এখুনি জমিদারী দেওয়া যেতে পারে সেখানে। ক্লাইভ যেন তার অভিমত জানায়। শেঠেরা মাস দেড়েকের জন্যে রাজধানীর বাইরে যাচ্ছে। পরেশনাথের তীর্থ করার ইচ্ছা। ফিরে এসে এ বিষয়ে পাকা কথা হবে।

কিন্তু এই যাওয়া নিয়েই বিবাদ বাধলো নবাবের সঙ্গে। ১৭৫৯ সালের দিকে নতুন বিবাদ গজিয়ে উঠেছে। সম্রাট আলমগীর বাদশার ছায়া মাত্র। প্রকৃত ক্ষমতা উজীরের হাতে। কাঠের পুতুল হয়ে বসে থাকতে রাজী নয় আলমগীরের বড় ছেলে শাহজাদা শাহ আলম। এক দল সৈন্য নিয়ে দিল্লী থেকে পালিয়ে এল শাহ আলম। বাংলা জয় তার ইচ্ছা।

হঠাৎ বাংলার ওপর শাহ আলমের অকারণ উৎসাহে সন্দিহান হল নবাব। ভাবলো, পাটনার রামনারায়ণ নিশ্চয়ই ডেকে এনেছে তাকে। এ সময় শেঠদের তীর্থ করার পিছনে ধর্মবাসনা ছাড়া অন্য আকর্ষনও থাকতে পারে। নবাব হবার সময় মীরজাফর ভেবেছিল, শেঠদের টাকার অভাব যখন নেই, তখন টাকার অভাব ভোগ তাকে করতে হবে না। কিন্তু অকস্মাৎ শেঠবাড়ীর টানাটানি পড়ে গেল। টাকা দিতে চায় না। দেনা শোধ করার জন্য তাগিদ দেয়। শেঠদের হাতটান যে এত হবে, তা মীরজাফর কল্পনাও করতে পারেনি। বিশ্বাসও করতে পারে না যে ধনকুবেরের টাকা নেই। টাকা আছে বলেই তার ধারণা। নিশ্চয়ই আছে এই কৃপনতার অন্য কোন কারণ। অকস্মাৎ মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করার পিছনে চক্রান্ত আবিষ্কার করে নবাব।

মহারাজা স্বরূপ চাঁদ তখন পরেশনাথের পথে। আগের মত আড়ম্বর ছিল এ বারেও। সঙ্গে তার দু'হাজার সৈন্য।

কিন্তু কিছুদুর যেতে না যেতেই পথ আটকাতে সৈন্য পাঠালো নবাব। যেতে দেবে না স্বরূপ চাঁদকে। সসম্মানে ফিরিয়ে আনতে হবে রাজধানীতে।

কিন্তু নবাবের আদেশ পালন করেনি তারা। তারা পথ পরিস্কার করতে করতে মহারাজার আগে আগে গিয়েছে। তারা নবাবের সৈন্য। কিন্তু নবাবের অনুগত নয়।

টাকার বশ সবাই। সৈন্যদের মাইনে দিতে পারে না নবাব। অথচ নবাবী আদপ কায়দার একচুল নড়চড় হবার যো নেই। স্বরূপ চাঁদ বলেছে যে সে তাদের সব বকেয়া মাইনে চুকিয়ে দেবে। তারা এখন আর নবাবের সৈন্য নয়। তারা এখন শেঠদের সেপাই। মালিকের পরিবর্তন হল চোখের নিমেষে।

অক্ষম মীরজাফর। তার এমন কোন ক্ষমতা নেই যে এই অবাধ্য প্রজা ও ব্যাঙ্কারকে নিয়ে আসবে তার পায়ের নীচে। তাদের নীরব ঔদ্ধত্য আরো ভয়ঙ্কর। তলোয়ার খুলে ঘোড়া ছুটিয়ে মীরণের মত প্রকাশ করে না তাদের ক্রোধ ও ঘৃণা। অদৃশ্য থেকে আসে তাদের অমোঘ শক্তিশেল।. নিঃশব্দে ছিন্ন-ভিন্ন করে। দেশ জোড়া তাদের অসংখ্য গদী জটিল জালের মত ছড়িয়ে আছে। কোন এক অবসরে যদি টান পড়ে সেই জালে, তবে উঠে আসবে বাদশা, নবাব, উজীর, আমীর, নোকর। অগাধ তাদের ধনদৌলত। কিন্তু কত, কেউ আন্দাজ করতে পারে না। এতদিনেও পারেনি মীরজাফর। ও যেন জলের মত। ক্রমগত যাচ্ছে, আসছে। সঞ্চয় যে নেই, তাও নয়। তবে সে সঞ্চয় নবাবদের মত বেগমপুরীতে লুকিয়ে রাখে না। তারা টাকা খাটায়। যতই খাটায়, ততই তাদের প্রতাপ বাড়ে। এ এক রাজ্য জয়। সৈন্য সেপাই হাতী ঘোড়া লোক লস্কর কিছুর দরকার হয় না। অথচ জয় করে। বশ করে। মাথা তোলে না কেউ। মাথা তুলতে গেলে ছিটকে পড়ে। পড়েছে সরফরাজ, পড়েছে সিরাজ। সৈন্যরা যখন তাকে তুচ্ছ করে মহারাজ; স্বরূপ চাঁদের সঙ্গে গেল পরেশনাথের দিকে, কোন কথা বলেনি মীরজাফর।

শাহজাদাকে বিহার থেকে তাড়িয়ে দিল ক্লাইভ। লজ্জিত হল মীরজাফর। কাশীমবাজার কুঠিতে তখন হেষ্টিংস। ক্লাইভকে জানালো হেষ্টিংস, নবাব আপনার কাছ থেকে কাজ আদায় করে নিচ্ছে, অথচ প্রত্যুপকার করতে পারছে না বলে লজ্জিত। এবারে আপনার জায়গীরদারীর কথাটা পাকা। জগৎশেঠের পরামর্শ অনুসারে দেওয়া হয়েছে চব্বিশ পরগণার ছিটমহল।

১৭৫৯ সালের ৪ঠা জুলাই জগৎশেঠ এই শুভ সংবাদ জানালো ক্লাইভকে।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে নবাব নিমন্ত্রিত হল কলকাতায়। সঙ্গে জগৎশেঠ মহাতপও বাদ পড়েনি। আড়ম্বরের অভাবও হয়নি। আজকে ত অচিন্তনীয়। তুই নবাব ছিল মাত্র চারদিন। এই চারদিনের জন্য নবাব মীরজাফরের জন্য খরচ হল কোম্পানীর ৭৯,৫৪২ আর্কট টাকা, আর জগৎশেঠের জন্য খরচার পরিমাণ দাঁড়ালো ১৭,৩৭৪ আর্কট টাকা।

মীরজাফরকে ফেলে ক্লাইভ যখন কিছুদিনের জন্য বিলেতে গেল, তখন ইংরেজকে আর একবার বন্দুক চালাতে হয় নবাবকে বাঁচাতে। শাহজাদা শাহ্ আলম আরো সংগঠিত এবার। বাংলা তার চাই-ই। ওদিকে মারাঠা চৌথের জন্য কামড়া-কামড়ি করে কিছু ফল হবে না দেখে সসৈন্যে এগিয়ে আসছে বাংলায়।

অসহায় মীরজাফর আর একবার তাকালো কোম্পানীর দিকে। এখন নবাবের ক্ষতির চেয়ে কোম্পানীর ক্ষতি আরো বেশী। ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে তারা জমিদারের খাজনা থেকে। এই সব উৎপাত অপ্রতিহত থাকলে জমিদারের না দেবার কারণ থাকবে। কর না দেবার জন্য আসবে হাজার বায়না। সোজা জোর জবরদস্তি করতে হবে। কোম্পানী জমিদারকে চটাতে চায় না। উৎপাত ঠাণ্ডা করে কোম্পানী। নবাবী করে মীরজাফর।

সে সময় টাকার জন্যে আটকে পড়েছিল ঢাকার কুঠি। বড় তাড়া তাদের। যদি কাশীমবাজার কুঠিতে টাকা থাকে ত ভালোই। যদি না থাকে তবে জগৎশেঠের কাছ থেকে ধার করেও যেন পাঠানো হয়। জগৎশেঠ টাকা দিয়েছিল তখন। খুশি হয়েছিল হলওয়েল।

হলওয়েল কোম্পানীর মাথা তখন। বিলেত যাবার সময় খুশি হতে পারেনি ক্লাইভ। তার মতে হলওয়েল বড় পাজী, আর মিথ্যাবাদী। তবু হলওয়েলই কাজ চালায়।

মে মাসে আবার টাকার জন্য দূত পাঠালো হলওয়েল। টাকা দিতে অস্বীকার করেছিল জগৎশেঠ। বললে, 'কতদিক সামলাবো। নবাব রোজ রোজ টাকার জন্য জুলুম করছে। রোজ রোজ তার দাবীর বহর বেড়ে যাচ্ছে। তাকে সামলাতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত। আবার এদিকে কোম্পানী। এখন টাকা দিতে পারবো না।'

অপমান বোধ করলো হলওয়েল। হেস্টিংসকে জানালো, 'কোম্পানীর বিশেষ প্রয়োজন ও স্বার্থের জন্য আমি জগৎশেঠের কাছে পনেরো লাখ চেয়েছিলাম। অন্তত পক্ষে দশ লাখ হলেও চলত। কিন্তু নানা অজুহাতে জগৎশেঠ

আমাকে সে টাকা দেয়নি। ভেবেছিলাম ওদের নিরাপত্তার জন্যে এবং কোম্পানীর স্বার্থে আমাদের তুষ্ট করতে সর্বদা ব্যগ্র থাকবে। কিন্তু এখন দেখছি তারা তা চায় না। যাই হোক, দিন নিশ্চয়ই খুব শীঘ্র আসবে। জগৎশেঠরা বুঝবে, কোম্পানীকে বিমুখ করার ফল কত ভয়াবহ হতে পারে।'

হেষ্টিংস জগৎশেঠের পক্ষে কথা বলতেই তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো হলওয়েল। বললে, 'আপনি যখন ওদের পক্ষে কথা বলছেন, তখন বাধ্য হয়ে আমাকে মানতেই হবে। অত বেশি টাকা দিতে যদি সত্যিই তাদের খুব অসুবিধে, তাহলে শুধুমাত্র দেওয়ার ইচ্ছা দেখানোর জন্য উপযুক্ত কোন টাকা রফা করতে আপত্তি ছিল না। তাতে তাদের ক্ষতিও হত না। কোম্পানীরও মান বাঁচত। আমাদের টাকা ধার না দেওয়ার কারণ হিসেবে তারা বলেছিল নবাবকে তারা ধার দেয়নি। এ অবস্থায় কোম্পানীকেও দেওয়া যেতে পারে না। আমি খোঁজ খবর নিয়েছি। ওরা নবাবকে টাকা দিয়েছে। আমাদের কাছে তাহা মিথ্যে বলেছে জগৎশেঠ।

কিন্তু ওরা যদি আমাদের টাকা ধার দিত, তবে নবাবের ক্রমাগত ধারের হাত থেকে এড়িয়ে যেতে পারত। সেটাই তাদের পক্ষে হত নিরাপদ ও শ্রেয়। তখন নবাবকে খুশি না করতে পারলে কোন অসুবিধে হত না। নবাবও কিছু বলতে পারত না। নবাব যদি কেড়ে নেবার কোন চেষ্টা করত, সৈন্য পাঠিয়ে জোর জবরদস্ত করত, আমরা তখন তাদের রক্ষা করতে পারতাম। কিন্তু একদিন আসবেই যখন তারা কোম্পানীর কাছে এসে পড়বে নিরাপত্তার জন্য। সেদিন দেখবে একমাত্র শয়তান ছাড়া আর কেউ নেই তাদের স্বপক্ষে।'

আলিবর্দীর মৃত্যুর পর থেকে যে ছায়া দেখে ক্রমাগত চমকে উঠছিল মহাতপ আর স্বরূপ চাঁদ, সে ছায়া এখনও তাদের তাড়িয়ে বেড়ায়। ভেবেছিল, সিরাজের পতন হলে সে ভয় ঘুচে যাবে। লক্ষ্মী থাকবে অচলা হয়ে। ধন দৌলত মণি মাণিক্য হীরে জহরৎ থরে থরে সাজানো থাকবে কামরার পর কামরায়। তাদের ঝিকমিকান আলো থরথর করে নাচবে অন্ধকারে চোখের মণির ওপর। অর্থের আদিম আসক্তি তাদের যেমন শক্তি যোগায়, তেমনি আবার শক্তি শুষেও নেয়। একলা হলে চমকে ওঠে। থাকবে না বুঝি।

লুটে-পুটে নিয়ে যাবে দস্যু। না হলে নবাবের সেপাই। লুটতরাজ অবাধ। দেশ জোড়া লুট। যারা রক্ষক, তারাই ভক্ষক। তাদের কথার ওপর কোন

কথা নেই। তাদের অনুরোধ দাবী। তাদের দাবী হুকুম। হুকুম তামিল করতেই হবে। সিরাজের মসনদ পাওয়ার পর ভয় আরো বেড়ে গেল মহিমাপুরে।

ভেবেছিল জাফর আলি আর যাই করুক না কেন, বুড়ো আলিবর্দীর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে এতদিন। নিজের চোখে দেখেছে কি করে শাসন করতে হয়। বয়সও হয়েছে। সিরাজের মত বিলাসী ত হবে না।

কিন্তু ভুল ভাঙতে দেরী হয়নি। হারেমের রঙ লেগেছে তারও চোখে। ওদিকে নবাব হবার আগেই বিলিয়ে দিয়েছে রাজকোষ। কোম্পানীর কাছে সিংহাসন বাঁধা পড়ার উপক্রম। তবু ঋণ শোধ হয় না। বিদেশী শক্তিমান পাওনাদারকে হাতে রাখতে হয় সব সময়। হাতে রাখতে গিয়ে নাম কিনতে হয় 'ক্লাইভের গাধা'। তবু নিস্তার নেই। ভার পড়ে মহিমাপুরে। নবাবকে শান্ত রাখতে হবে। নবাবের সেপাই অশান্ত। মাইনে বাকি। আয়ের পথ ক্রমশঃ বন্ধ। চব্বিশ পরগণা, বর্ধমান, মেদিনীপুর, চট্টগ্রাম, নদীয়ার কোন আয় আর ঘরে ওঠে না। পলাশীর পর বেপরোয়া কোম্পানীর কর্মচারী। দস্তকের অপব্যবহার অসহনীয় ভাবে বেড়ে গিয়েছে। নুন লবঙ্গ সুপারি ইত্যাদি নিষিদ্ধ জিনিষ নিয়ে কারবার বন্ধ করার কোন ক্ষমতা নেই জেনেও জাফর আলি মৃদু প্রতিবাদ করে স্তব্ধ। দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়ছে। যতই ভাঙছে ততই দেশের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিচ্ছে।

ক্লাইভ বুদ্ধি দিয়েছিল যে দেউলে হবার অবস্থা যখন প্রায় ঘনিয়ে এসেছে, তখন এত সৈন্য পুষে কি হবে। কিছু যে হবে না তার প্রমাণ ত কলকাতা। সিরাজের মত ইংরেজ বিদ্বেষীও ভয়ে পালালো। এ সৈন্য দরবারের শোভা বাড়াবে, লড়াই করতে পারবে না। তার ওপর তাদের মাইনে মাসের পর মাস যোগাতে হয়। মিষ্টি কথায় চিরকাল পেটের ক্ষিধে চেপে রাখতে পারে না কেউ। বিদ্রোহ লেগেই আছে। আগুন নিয়ে খেলা করা ঠিক নয়। কখন যে চালে লাগবে তার ঠিক ঠিকানা নেই। নবাবী বিপন্ন হতে কতক্ষণ। অসন্তুষ্ট সৈন্য নিয়ে বসে থাকার চেয়ে সন্তুষ্ট কম সৈন্য থাকা ভাল। বিপদ হলে কোম্পানী ত আছেই।

ক্লাইভের যুক্তি মনে ধরুক বা নাই ধরুক এ ছাড়া পথও নেই। অগত্যা মেনে নিতে হয়। বিপদ হলে কোম্পানী ত আছেই। কোম্পানীর বিরুদ্ধে যাবার কোন কথা মনে ওঠে না জাফর আলির। মীরণ মাথা গরম করতে পারে। বয়েস কম। অভিজ্ঞতা আরো কম। অক্ষমদের হিংসা একটু

বেশী। মীরণ ভাল করেই জানে, বুদ্ধি ও বীরত্বে ক্লাইভের ধারের কাছে দাঁড়াবার যোগ্যতা তার নেই। মীরণের মত অবিবেচক নয় জাফর আলি। সিরাজের মত ইংরেজ বিদ্বেষীও নয় সে। তাছাড়া ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত ক্ষমতা নেই নবাবী সৈন্যের। অথচ ধার করে হাতী পুষে ক্রমাগত দেনায় জড়িয়ে পড়ছে।

কাজে কাজেই নবাব ছাঁটাই করেছে আশী হাজার সৈন্য। মহাতপ বোঝে দেশে ছাড়া হল আরো আশী হাজার শিক্ষিত ডাকাত। দাঙ্গা হাঙ্গামা লুটতরাজ বেড়ে যাবে বহুগুণ। আইন আছে। কিন্তু আইন অমান্যকারীকে শাস্তি দেবার ক্ষমতা নেই। সামরিক ও অসামরিক কোন বিভাগই কর্মক্ষম নয়। তাই শাসন নেই কোন দিকের, না বাইরের, আইনের, জোরের। না ভেতরের, নীতির, বোধের। সিরাজের পতনের সময় মহাতপ ভেবেছিল, ভয়ের রাজ্য পার হয়ে যাবে। সিরাজের পতনের পর দেখলো, ভয়ের রাজ্যের মাঝখানে সে।

হলওয়েলের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হবার পর ভয় আরো বেড়ে গেল মহাতপের। ক্লাইভের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল নবাব আর কোম্পানীর মাতব্বররা যে, শেঠবাড়ীর গায়ে আঁচড় লাগতে দেবে না তারা। কিন্তু ক্লাইভ সরে যেতে না যেতেই এমন ভয় কোম্পানীর তরফ থেকে দেখানো সম্ভব হবে—ভাবতে পারেনি জগৎশেঠ।

শয়তান আসতে দেরী করেনি। মীরণ মারা গেল বজ্রাঘাতে।

অভিশাপ দিয়েছিল আলিবর্দীর বেগম। সিরাজের মৃত্যুর পর আলিবর্দীর কুলের সবাইকে পাঠানো হয়েছিল ঢাকায়। ওরা রাজধানীতে থাকলে বিদ্রোহ হতে পারে ভেবে অনেক দূরে পাঠানো ঠিক করেছিল জাফর আলি। কিন্তু এতেও শান্ত হবার লোক নয় মীরণ। আমিনা বেগম আর ঘসেটি বেগমকে ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসার নাম করে পথের মাঝে জলে ডুবিয়ে মেরেছিল তাদের। তাই মরার পাশের শাপ দিয়েছিল বৃদ্ধা বেগমসাহেবা, 'বজ্রাঘাতে যেন মৃত্যু হয়।'

দৈবক্রমে সেই বজ্রাঘাতেই মারা গেল মীরণ।

মীরণ গিয়েছিল যুদ্ধে। গিয়েছিল শাহ আলমকে পাটনার সীমান্ত থেকে তাড়িয়ে দিতে। সঙ্গে ছিল ইংরেজ সেনা, ইংরেজ সেনাপতি কেলভ।

পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা খাদেম হোসেন খাঁ বিদ্রোহী বাদশার সঙ্গে যোগ দিতে গিয়েছিল। নক্স আর সেতাব রায় তাকে হারিয়ে দেয়। পরাজিত শাসনকর্তার পিছু নেয় কেলভ ও মীরণ। পথে তুমুল ঝড় ঝঞ্ঝা। ঝড়ের ভেতর ঘোড়া ছুটিয়ে মীরণ শত্রুর সন্ধানে অধীর। বেশীদূর যেতে না যেতে বজ্রাঘাতে শান্ত হল মীরণ।

মীরজাফর খবর পেল। পুত্রশোক সইতে পারেনি নবাব। মীরণ যে তার অবর্তমানে নবাব হবে এমন নয়। তবু মীরণ ছোট নবাব। তার সময়েই সে নবাবের অনেক কাজ চালায়। অনেক হত্যা, গুপ্ত ঘাতকের নায়ক সে। অনেক হিংস্রতার হোতা, চক্রান্তের ভাগীদার। মীরণ শুধুমাত্র ছেলে নয়, সমদর্শী ও সহকর্মী। মীরণের মৃত্যুতে কাতর হয়ে পড়ে মীরজাফর। এখন নবাবকে ভরসা করতে হবে তার জামাই মীরকাশিমের ওপর।

হলওয়েল ক্রুদ্ধ, মীরণ মৃত। মীরজাফর মসনদে বিষণ্ণ। হীরাঝিলে সিরাজের প্রাসাদ থেকে উঠে এল মীরজাফর কেল্লার ভেতর—আলিবর্দীর প্রাসাদে।

একত্রিশ

হলওয়েলের হুমকিতে শেঠেরা বিচলিত। কিন্তু ডাচদের পতন তাদের কাছে ক্ষতির কারণ। শুধুমাত্র ব্যবসার দিক থেকে ডাচরা প্রধান ছিল না। এ ছাড়া অন্য এক দিকও ছিল তাদের। সে দিকটা আকৃষ্ট করত শেঠকে। শেঠবাড়ীর নতুন সংযোজন যা হয়েছে, তার সব নক্সাই ওই ওলন্দাজদের। একটা বাড়ীর সব ছাদটাই ছিল টালির। এই টালি হল্যাণ্ড থেকে আমদানি। বাইবেলের বিভিন্ন উপাখ্যান চিত্রায়িত ছিল সেই টালিতে। রঙের ঔজ্জ্বল্য, বর্ণবৈচিত্রে অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্যের কথা মনে আনে। এ সব দিকে ইংরেজদের চেয়ে ওদের প্রভাব বেশ ভালভাবে পড়তে আরম্ভ করেছে। শেঠরা তাই আকৃষ্ট ওদের প্রতি।

ওদের সঙ্গে ব্যবসা করে বেশ কয়েক লক্ষ টাকা ডুবে গিয়েছে। উদ্ধারের কোন আশা আর নেই। ফরাসীদের পতনের পর তাদের ক্ষতিপূরণের কিছু ব্যবস্থা হয়েছিল। ক্লাইভ আর যাই হোক অকৃতজ্ঞ নয়। শেঠদের ঋণ

স্বীকার করেছে অকুণ্ঠভাবে। ক্লাইভ যদি আরো কিছুদিন থাকত, তবে একটা ব্যবস্থা হয়ত হত। কিন্তু হলওয়েলরা অন্য মানুষ। ও বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করে না একেবারে।

মহাজনী কারবার ছাড়া আরো চার রকমের কারবার ছিল ওলন্দাজদের সঙ্গে। মালপত্র কেনাবেচার কাজ একবার হয়েছিল কোম্পানীর সঙ্গে। বড় বিপদের সময় এই কাজের ভার নিয়েছিল ফতেচাঁদ। তারপর আর করেনি। কিন্তু করেছে ওলন্দাজদের সঙ্গে। তাদের বাজার ইয়োরোপের বাইরে। ইয়োরোপের বাইরে ব্যবসার জন্য লেনদেন করতে হয় শেঠদেরও। সেদিক থেকে ক্ষতি হয়েছে শেঠদের।

কিন্তু বড় ক্ষতি ঠিক টাকার নয়। ডাচরা ইয়োরোপ থেকে আনত রূপো। রূপোই তাদের প্রথম ও প্রধান আমদানি। সমস্ত রূপোটাই গিয়ে উঠত ওদের ঘরে। সেই রূপো আসা বন্ধ হল একেবারে।

সেটাই মস্ত বড় ক্ষতি ওদের। কলকাতার টঁ্যাকশাল চালু হবার পর থেকে শেঠরা বুঝেছে যে, যাদের কাছে যত বেশী রূপো মজুত থাকবে, জিতবে তারাই। টঁ্যাকশালের যুদ্ধে রূপোই বড় রসদ। সেই রসদ থেকে বঞ্চিত হয়ে আশঙ্কা বেড়ে গিয়েছে শেঠদের।

তার ওপর হলওয়েলের হুমকী। পলাশীর যুদ্ধে যেন শুধুমাত্র সিরাজের পতন হয়নি। শুধুমাত্র আলিবর্দীর দৌহিত্র হয়নি সিংহাসনচ্যুত। তার সঙ্গে যেন আরো বড় কিছু হারিয়েছে শেঠরা। যে ভয় থেকে মুক্ত হবার জন্য এত চক্রান্ত, সেই ভয় আরো আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে ধরেছে তাদের। সিরাজের ভয়ের হাত থেকে মুক্তি পেতে গিয়ে পড়েছে মীরজাফরের ভয়ের হাতে। কোম্পানী কোনদিন চোখ রাঙিয়ে কথা বলতে সাহস করেনি। ক্লাইভ তাদের সমীহ করত। কিন্তু হলওয়েল অপমান করতে কসুর করে না। রোজগার পড়ে গিয়েছে অনেক। হাজার মুখে টাকা আগে ঝাঁপিয়ে পড়ত মহিমাপুরের ভাণ্ডারে। আর এখন···

একটা একটা করে সেই মুখ যেন বন্ধ হয়ে আসছে। খিজির খানের উৎসবের শেষে যেমন একে একে নিভে আসত রোশনাই, শান্ত হত শানাই। ক্লান্ত হত নবাব মুর্শিদকুলি। মুর্শিদাবাদ ঘুমিয়ে পড়ত তখন। কিন্তু সে ঘুম ছিল আনন্দের। এ ঘুম ভয়ের, ক্লান্তির। পলাশীর পর থেকে অন্ত পতন অনুভব করে শেঠরা। চলা ফেরা আগের চেয়ে অনেক কম। সাজসজ্জা না করে বাইরে আসে না। সতর্ক হয়ে থাকতে হয়

সর্বদা। এ এক নতুন পতন। এমন পতন কোনদিন যেন আসেনি। ভেঙে গিয়েছে কোথায়। তবু এই ইংরেজকে আশ্রয় করেই থাকতে হবে।

'ছোট নবাব' মীরণের মৃত্যুর পর মীরজাফর ভরসা করে থাকে জামাই মীরকাশিমের ওপর। চুপ করে বসে আফিমের মৌতাতের সুখ-নেশা ভোগকরা ছাড়া কিইবা আছে করবার।

পলাশীর যুদ্ধের পর মারাঠা আর শাহজাদার বাংলা আক্রমণকে ব্যর্থ করার পর ইংরেজদের প্রভাব অনস্বীকার্য। ত্রাণকর্তা হিসেবে ওরা থাকে। দম্ভ ওদের ভয়ানক। প্রতাপ ভীষণ। প্রতিদ্বন্দ্বী বলে আর কেউ নেই। ফরাসীদের পরে ছিল ডাচেরা। তারা শেষ হয়ে গিয়েছে। আর কোনদিন বাংলা দেশে ওরা মাথা তুলতে পারবে না। নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। মুখের দিকে তাকাতে আছে ওই একমাত্র ইংরেজ।

মীরজাফর এই কথা বুঝে চুপ করে থাকে। মীরণ বুঝে চঞ্চল হত। কখন কখন তার রাগের অসংযত প্রকাশের জন্য ক্ষমা চাইতেও হয়েছে। মীরণ আর কিছু বলবে না। সে মৃত। বোঝে জগৎশেঠ মহাতপ রায়। বুঝে আরো ঘনিষ্ঠ হতে চায় ইংরেজদের সঙ্গে। অনুগত চাকরের মত থাকতেও পিছিয়ে যাবে না তারা। প্রাণ বাঁচানোর জৈব প্রবৃত্তির একনিষ্ঠ সেবক বুঝেছে এ ছাড়া আর অন্য পথ নেই।

কোম্পানীর কর্মচারী ভাল করে বোঝে বলেই উগ্র। তাদের লোভ লালসার নিবৃত্তি নেই। বরং ঘৃতাহুতি পেয়েছে। দাউ দাউ করে জ্বলছে। অবাধ লুণ্ঠন করে যেন কৃতার্থ করেছে জমিদার রাজা নবাব আর শেঠদের। মসনদ প্রায় বিক্রীত। পলাশীর প্রতিশ্রুত ক্ষতিপূরণ এখনও হয়নি। হবে কিনা জানা নেই। সর্বস্ব অর্পণ করেও ঋণমুক্ত নয় নবাব। বিনা শুল্কে বাণিজ্য করে দেশের একান্ত গভীরে মর্মান্তিক টান দিয়েছে তারা। হাহাকার উঠেছে সর্বত্র। আফিমের নেশা কেটেছে মীরজাফরের। মৃদু প্রতিবাদের পর আবার ঘুমিয়ে পড়েছে নবাব। কিছু করার নেই। মানুষের নিকৃষ্ট স্বভাব পেয়ে বসেছে ওদের। কোম্পানীর প্রথম দিকে আসত বিলেতের অবাধ্য যুবকেরা। সেই নিকৃষ্ট ও অমার্জিত মানুষের দুর্দমনীয় লোভের থাবা ঠিক বুকের ওপর।

অন্যদিকে চক্রান্তের অন্ত নেই। পলাশীর পর শান্ত হয়নি। প্রতিদ্বন্দ্বী চক্রান্তকারী গিয়ে পড়ে কোম্পানীর কাছে। তারাও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়। পুরস্কার পায়। নজরাণার অভাব হয় না। সাহায্যের ব্যবসায় ক্লাইভ

একা ধনপতি নয়। ধনপতি হতে চায় সবাই। হবার জন্যই আসা। সাহায্যের ব্যবসার এই উপযুক্ত সময়। ইংরেজ সেনাপতি কোমর বাঁধে।

১৭৬০ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারী ক্লাইভ পাড়ি জমালো বিলেতে। তার জায়গায় এল হলওয়েল। হলওয়েলকে গদীতে বসিয়ে খুশি হতে পারেনি ক্লাইভ। কিন্তু না করে উপায়ও ছিল না। চক্রান্ত শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদের মসনদ ঘিরে নয়। চক্রান্ত কলকাতায়ও। জাল জুয়াচুরি আর মিথ্যা নিয়েই কলকাতা। কলকাতা মানে কোম্পানীর রাজত্ব। হলওয়েল মনের মত লোক বেছে নিল তার কমিটিতে।

হলওয়েলকে টাকা রোজগারের সুযোগ দিল মীরকাশিম।

ইংরেজের হাত থেকে মুক্তি চেয়েছিল মীরকাশিম। ·কিন্তু সময়ের বর্ণমালা পড়তে পারেনি সেও। মোগল যুগের শেষের দিকে, দিল্লীর কেন্দ্র ভেঙে গেলে, ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বি-কেন্দ্রিক স্বাধীন খণ্ড রাষ্ট্র গড়ে উঠতে থাকে। সেই সব রাষ্ট্রের উৎসমুখ বিগত-গৌরব মোগল দরবার।

তারা ছোট পরিসরের ভেতর মোগল দরবারকে বসাতে চেয়েছিল। দৃষ্টি তাদের পিছনে। গতি তাদের অতীতের দিকে। পুরাণোকে পুরাণো হিসেবেই বসাতে চায়। পুনরুদ্ধার নয়, ঐতিহ্য সন্ধান নয়। বর্তমানকে চিনে ভবিষ্যতের গতি নির্ণয় নয়। সে শুধু অতীতের দাসবৃত্তি। একটি নবাবী আত্মপ্রবঞ্চনা। ও যেন আয়নার সামনে মণি মাণিক্য পরা উমিচাঁদের বেয়াকুব আত্মতৃপ্তি।

তবু মীরকাশিম চেয়েছিল ইংরেজদের প্রতাপ দূর হোক। আবার ফিরে আসুক মুর্শিদকুলি খাঁর আমল। সেটা ফিরে আসবে ইংরেজদের দম্ভ চূর্ণ করে দিলে। মীরকাশিম ভেবেছিল পলাশীতে হেরে গিয়েছে একজন নবাব—যার নাম সিরাজ। ইংরেজের জয় সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র তাদের সুকৌশল যুদ্ধ নৈপুন্যের জন্যে, গোলা বন্দুকের ভাল ব্যবহার জানে বলেই। তার চেয়ে আর বেশী কিছু ভাবতে পারেনি কাশেম আলি।

কাশেম আলি জানত না যে পলাশীতে শুধুমাত্র একটা নবাব হেরে যায়নি। হেরে গিয়েছে একটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। জয় সম্ভব হয়েছে শুধু মাত্র সুকৌশল রণনৈপুন্যের জন্য নয়, চক্রান্তের জন্যও নয়। তার চেয়ে আরো একটা অদৃশ্য শক্তি অনিবার্যভাবে কাজ করেছে তাদের স্বপক্ষে। সে শক্তির নাম উৎপাদন ব্যবস্থা। সে ভাবতেও পারেনি জমিদার রাজাদের অন্তঃসারশূন্য নীতিবোধ আর সংস্কৃতি দিয়ে জয় করা যাবে না সময়।

বিদ্রোহী তার সদিচ্ছার গৌরব নিয়েই ব্যর্থ। সময়ের বর্ণমালা পড়তে পারেনি মীরকাশিম।

চক্রান্তে নেমেছে মীরকাশিম। জগৎশেঠ মহাতপ চক্রান্ত থেকে দূরে। তারা আর জড়িয়ে পড়বে না নবাব বসানো নামানোর সর্বনাশা খেলায়। কিছু ফল হয় না। বরং আরো গভীর জটিলতায় তলিয়ে যেতে হয়। এক চক্রান্তের গুপ্ত পথ মিশে গিয়েছে অন্য এক চক্রান্তের দোরে। কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে যাত্রা। এক বন্দীত্ব থেকে অন্য বন্দীত্বের শিকলে।

মুক্তি নেই। কোন পক্ষেই মুক্তি নেই। ভাল করে জেনেছে মহাতপ। যোগ দিয়েছিল পলাশীর মন্ত্রণায়। আর যোগ দেবে না। মীরজাফর তার ধনরত্ন কেড়ে নিতে পারে। যে কোন সময়ে তাকে ঠেলে দিতে পারে সর্বনাশের দিকে। করতে পারে পথের ভিখারী। মীরজাফরের কাছ থেকে যে নিরাপত্তা তারা পায়নি, সে নিরাপত্তা পাবে না কাশেম আলির কাছেও। কাশেম আলিও ত বন্ধকী মসনদ বিক্রি করে নবাব হবে। হাত পাতবে মহিমাপুরের গদীতে। না পেলে চোখ রাঙাবে। চোখ রাঙানো বিফল হলে শেষ হবে জগৎশেঠ মহাতপ আর মহারাজা স্বরূপ চাঁদ। মীরজাফর কাশেম আলিদের স্বরূপ জানা আছে তাদের। শেঠরা তাই ডেরা বেঁধেছে কোম্পানীর শিকড়ে। এখানেও কি তারা নিরাপদ?

নিরাপদ নয় জানে। জানে কোম্পানীর স্বার্থ আর শেঠদের স্বার্থ এখন স্পষ্ট বিরোধী। একদিন ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নামবে তারা। নেমেও হয়ত জিততে পারবে না। তাই তারা ছোট অংশীদার হিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচাবে শুধু। প্রসারতা চেয়েছিল মহাতপ। সামান্য কয়েক বছর আগেও ভাবত—যদি পারত তবে মেঘলোকে গিয়ে মহাজনী কারবার আরম্ভ করত তারা। আজ আর সে কথা ভাবে না। আজ কোনমতে আত্মরক্ষা করতে পারলে বেঁচে যাবে যেন। কোথাও নিরাপত্তা নেই। নিশ্চয়তা নেই।

চার হাজার লোকের পুরী মহিমাপুর তবু গম্‌গম্‌ করে। হয়ত আনমনা মহাতপ দুপুরে তাকিয়ে থাকে গ্রামের দিকে। কোন সাড়া নেই। নিরুপদ্রব গ্রাম রোদ-পিঠ করে পড়ে আছে। মাঠে গরু ঘাস থেকে মুখ তুলে ল্যাজ দিয়ে পিঠের মাছি তাড়াচ্ছে। ঘরের বৌ দাওয়ায় বসে চরকা কাটছে। আর ওদিকে, শহরের মাঝখানে, জাফরগঞ্জের পথে ধুলো উঠতে দেখলে বুকের ভেতর কেমন করে ওঠে মহাতপের। চোখের সামনে দেখতে পায় যেন খোলা তলোয়ার নিয়ে কোন অশ্বারোহী গদীর ওপর ঝাঁপিয়ে

পড়ছে। ঠিক ওই পথের পাশের ঘরে মহম্মদী বেগের তলোয়ারে খসে এসেছে সিরাজের মাথা। একটা আর্তচিৎকার এখনও কানে ভেসে আসে তার। মহাতপ নিরাপত্তা পাবে না আর।

চক্রান্তের মাঝখানে কাশেম আলি। হলওয়েলরা স্বীকার করেছে কাশেম আলিকে সাহায্য করবে। আবার আর একবার মুকুটমোচন পালা হবে মুর্শিদাবাদে। আর একবার সাজ-সাজ রব। আর এক ধরণের কর্মতৎপর ক্ষিপ্রতায় ঝাঁঝিয়ে উঠবে স্নায়ু। উত্তেজনা, হত্যা, রক্ত, অর্থ। বাঁচবার নির্ভরযোগ্য অবলম্বন পাওয়া যাবে আর একবার। দরবার উন্মুখ।

ওদিকে হলওয়েলরা হিসেব ঠিক করে রাখে। ক্লাইভ একা ধনপতি হয়নি। অংশ পেয়েছিল ক্লাইভের চেলা চামুণ্ডারাও। আজ আর ক্লাইভ নেই। বিলেতে ফিরে গিয়ে কি বলবে হলওয়েল? তাকে কিছুটা গুছিয়ে রাখতে হবে। হিসেবে ঠিক হল, মীরকাশিমকে নবাব করা হলে কোম্পানীর সভ্যদের কিছু নজরাণা দিতে হবে। সেই 'কিছুর' পরিমাণ আগেই ঠিক হল:

হলওয়েল	...	৩০,০০০ পাউণ্ড
সামার	...	২৮,০০০ "
ম্যাগুয়ার	...	২০,৬২৫ "
স্মিথ	...	১৫,৩৫৪ "
মেজর ইয়র্ক	...	১৫,৩৫৪ "
জেনারেল কেইলড	...	২২,৯১৬ "
ভ্যান্সিটার্ট	...	৫৮,৩৩৬ "

ম্যাগুয়ারের সোনার ওপর একটু বেশী আসক্তি। কাশেম আলি তাকে দেবে পাঁচ হাজার সোনার মোহর, যার দাম পড়বে ৮৭৫০ পাউণ্ড। কিন্তু এ ত প্রকাশ্য মজুরী। আর অপ্রকাশ্য নজরাণার হিসেব পাওয়া ভার।

পার্লামেণ্টে সাক্ষী দেবার সময় কেইলড সাহেব বলেছে, 'ওই রাতে কাশেম-আলি ভ্যান্সিটার্টের হাতে একখানা কাগজ দেয়। সে কাগজটা বিশ লাখ টাকার হুণ্ডি।' নজরের বহরে বিলেতের সাহেবরা চঞ্চল হয়ে পড়েছিল। পার্লামেণ্টে জিজ্ঞাসা করা হল সামারকে, 'টাকা দেওয়ার সময় দেশের অবস্থা কেমন ছিল?'

সামার উত্তর দিয়েছিল, 'সে বিচারের ভার আমাদের ওপর ছিল না। নবাবই তার বিচারকর্তা।'

কিন্তু যাই করুক হলওয়েল, তাদের একটা গুণ ছিল। তারা কখনও কোম্পানীকে ফাঁকি দেয়নি। নিজেরা অর্থ বিত্ত প্রতিপত্তি বাড়িয়েছে। বাড়ানোর জন্যেই এসেছে। তবু আত্ম-সর্বস্ব হয়নি কখনও। ওই নিকৃষ্ট অসংস্কৃত লোকগুলিও একটি অমানবিক সত্তার কাছে অনুগত। সে সত্তা তাদের মহামান্য কোম্পানী। তাই কাশেম আলির সঙ্গে ১৭৬০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বরের সন্ধিতে লিখিয়ে নেওয়া হল, কোম্পানীর এবং কথিত সৈন্যের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্য বর্ধমান, মেদিনীপুর, ও চট্টগ্রাম প্রদেশ দেওয়া হবে কোম্পানীকে এবং তার জন্য লিখিত সনদও দেওয়া হবে। এর লাভ লোকসান কোম্পানীর। এ ছাড়া কোম্পানী অন্য দাবী করবে না।

চব্বিশ পরগণা কলকাতার পর কোম্পানীর রাজত্ব বাড়ালো তিনটে জেলায়। তাই অভ্যস্থ মিথ্যাবাদী হলওয়েল যখন আক্ষেপ করে যে আজীবন কোম্পানীর সেবা করে তার কপালে জুটেছে কলঙ্ক, তখন তার ভেতরে এক ছিটে সত্যির আঁশ থাকে কোথাও।

সে সময়ের কোম্পানীর কিছু কিছু লোক জাতীয় গৌরব সম্পর্কেও সচেতন ছিল। তাই মীরকাশিমের মসনদ আরোহণ পর্বটা অমন তর্কসঙ্কুল। শুধুমাত্র লাভ লোকসানের ভাগ বাঁটোয়ারার ঝগড়া নয়। তাদের কেউ কেউ সত্যিই বিশ্বাস করত যে, মীরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করা তাদের পক্ষে কলঙ্কজনক।

কিন্তু একেবারে সিংহাসনচ্যুত করতে চায়নি তারা। প্রথমে ঠিক ছিল মীরজাফর থাকবে নামমাত্র নবাব। তিন সুবার নায়েব-নাজিম হবে মীরকাশিম। মীরজাফর ভাতা হিসেবে পাবে মাসে মাসে এক লাখ টাকা।

ভ্যান্সিটার্ট আর কেইলড এসেছে কাশীমবাজারে। নতুন ঘটনা কিছু নয়। ওরা অমন আসে মাঝেমাঝে। সঙ্গে আসে কোম্পানীর সেপাই। মীরজাফর ভেবেছিল এ সাধারণ আগমন মাত্র। নবাব নিজে গিয়ে আপ্যায়ন করে এসেছে তাদের। ভদ্রতার শেষ হলে মীরজাফর ফিরে এসেছে প্রাসাদে।

পরের দিন আবার গিয়েছে নবাব। দেবতাকে প্রসন্ন রাখতে আফিমের মৌতাতের মেয়াদ কমাতে হয়েছে। সেদিন আলাপের ফাঁকে ভ্যান্সিটার্ট জানিয়েছে যে নবাবের কাজ খুব ভাল হচ্ছে না। শাসন ব্যাপারে আজকাল

কেমন একটা ছাড়ো-ছাড়ো ভাব দেখা যাচ্ছে। মীরজাফর একে অভিযোগ হিসেবে নিয়ে ফিরে এসেছে মণি বেগমের কাছে।

কিন্তু ভোর বেলা ঘুম ভাঙতে না ভাঙতে অবাক মীরজাফর। সমস্ত কেল্লা ছেয়ে ফেলেছে লালমুখো লালকুর্তির সেপাই। কেল্লার ফটকে মীরকাশিমের পতাকা।

দিন শেষ হল মীরজাফরের। বর্গীর হাঙ্গামার বীরের রক্ত আর একবার চনমন করে উঠেছিল। কিন্তু ঐ একবারই। তারপর আবার শান্ত হয়ে অবস্থার কাছে হার স্বীকার করতে দ্বিধা করেনি।

মীরজাফর কিন্তু আত্মপ্রতারক নয়। দিনকে দিন হিসেবেই স্বীকার করে। রাতকে রাত হিসেবে মানতে দ্বিধা নেই তার। সে জানে সে নায়ক নয়। ইতিহাসের একটি ভাঁড়। বন্ধুর বিশেষণ সহাস্যে মেনে নিয়েছে। সে 'ক্লাইভের গাধা'। নিরপরাধ, কিন্তু ঐকান্তিক। মন-গড়া স্বর্গ রাজ্যে বাস করে না। সে আত্মসমর্পণ করে। কোনমতে গোঁজামিল দিয়ে মান বাঁচাতে চায়নি। তবু মনসুরগঞ্জের প্রাসাদে মাসে এক লাখ টাকা মাইনের নবাবী নিতে তার বাঁধলো। বেগম বিবি নিয়ে উঠে এল কলকাতার চিৎপুরে। নবাব এখন মীরকাশিম।

মীরকাশিম নবাব। ওদিকে মহিমাপুরের কুবের বাড়ীতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা আরো পাকা। দিনরাত পাহারার ব্যবস্থা। বিশ লাখ টাকার হুণ্ডি ভাঙাতে ভাঙাতে বোধ হয় আর একবার শিউরে উঠেছিল মহাতপ।

ভ্যান্সিটার্ট এসেছিল শেঠবাড়ী। পরামর্শ চেয়েছিল মহাতপের। সাহায্যও চেয়েছিল তাদের। বিনীত ভাবেই অবশ্য চেয়েছিল। হলওয়েলের হুমকি আর নেই। শয়তানের হাতে সঁপে দেবার ঘোষণা ভুলে গিয়েছে তারা।

এসেছিল মীরকাশিম। টাকা চাই। রাজকোষে পড়ে আছে মাত্র চল্লিশ পঞ্চাশ হাজার টাকা। আর কিছু সোনা রূপোর বাসনপত্তর। দাম তার বড় জোর তিন লাখ টাকা।

বত্রিশ

অসম্ভবের নেশা পাওয়া মীরকাশিম। ক্ষিপ্র, ত্বরিত ও বিবেচক। একটি উজ্জ্বল আত্মহত্যার নিপুন প্রস্তুতিতে মেতে আছে প্রথম থেকে। নবাবী-আলস্য, বিলাস তার নেই। হয়ত বংশগত অধিকার হিসাবে মসনদ তার প্রাপ্য নয় বলেই।

কর্মঠ ও স্থিরচিত্ত ছিল মুর্শিদকুলি আর আলিবর্দী। কারণ ক্রুর অভিজ্ঞতা তাদের শিক্ষক। নগণ্য তুচ্ছতার ভেতর দিয়ে তাদের জীবনের আরম্ভ। ভবিষ্যতকে তৈরী করতে হয়েছে। কেউ তাদের জন্য মসনদ রেখে যায়নি। সরফরাজ, সিরাজ ব্যতিক্রম। তাদের সিংহাসন জয় করতে হয়নি। বংশগত দাবীর যুক্তিহীন জোরে তারা পেয়েছে নবাবী। মীরজাফর ব্যতিক্রম মাত্র। মুর্শিদকুলি আলিবর্দীর স্বগোত্র মীরকাশিম। কিন্তু সে আবেগে অন্ধ। সে সিরাজের ভাবগত আত্মীয়।

মসনদে বসেছে নাসির উল্ মুলউক্ ইমতিয়াজউদ্দৌলা মীর মহম্মদ কাশেম আলি খাঁ নসরৎ জঙ্গ বাহাদুর।

নবাবী সৈন্য অবাধ্য। মাইনে বাকি। সামান্য কিছুদিন আগে এই সৈন্য অপমান করেছে নবাবকে। অশ্রদ্ধা জানিয়েছে বেগমদের। এতদূর স্পর্ধার কথা কেউ কোনদিন ভাবতেও পারত না। নবাবী দম্ভকে অবজ্ঞা করার অপরাধে এতদিন হয়ত এদের মৃতদেহ ঝুলত মুর্শিদাবাদের রাজপথে। কিন্তু মীরজাফরকে সইতে হয়েছে।

শাহজাদার আক্রমণ রোধ করার জন্য মেজর কেইলড রয়েছে পাটনায়। গোরা সৈন্যদের মাইনে বাকি রাখা চলবে না। বিহারের নবাবী সেনা মাইনের জন্য অধীর। রাজকোষে টাকা নেই। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। কুবের বাড়ী কৃপণ। ওদের হাত টান। পিছপা নয় কাশেম আলি। পাটনার টাকা দিল জগৎশেঠ। কথা হল কলকাতা থেকে দু'টাকা হারে সুদ সমেত ফেরৎ দেওয়া হবে।

সোনা রূপোর বাসনপত্তর গেল ট্যাঁকশালে। টাকা তৈরী হয়ে এল। দাসদাসীরা রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। নবাব বাড়ীতে আর কাজ নেই। ঘরের কাজকর্ম চালাতে মাত্র জনকয়েক নোকর রাখা দরকার। বিলাস বন্ধ।

আহার পরিমিত। প্রাসাদের ঘরে ঘরে কঠোর সংযম। কোথাও বাহুল্য নেই। স্বচ্ছতার দীপ্তি লেগেছে অতি-বিলাসের কলুষ-কালিমার ওপর। নবাবী আমলে এই এক অভাবনীয় ব্যাপার। শান্ত প্রতিজ্ঞায় অটল মীরকাশিম প্রতিবেশ অগ্রাহ্য করে শানিত।

রাজকর্মচারী ছাটাই হল। যে কর্মচারীরা ভেবেছিল নবাবের তবিল থেকে কিছু সরিয়ে ইহকালের ব্যবস্থা করে নেবে, তাদের ভুল ভাঙতে বেশী দেরী হল না। এক নবাবের টাকা ফিরে এল অন্য নবাবের কাছে। সর্বত্র অনুসন্ধান। গুপ্তচর তৎপর। লুকানো টাকা বেশীদিন থাকলো না মাটির তলায়। দাসদাসী থেকে আরম্ভ করে মন্ত্রী অবধি জেরার সামনে কাহিল। শৈথিল্য কেটে গেল। দরবার চঞ্চল। কাজের লোক মীরকাশিম।

টাকা আদায়ের প্রথম চোটটা এসে পড়লো জমিদারদের ওপর। জগৎশেঠ সমর্থন করতে পারেনি মীরকাশিমকে। মহাতপের মতে এমন করে টাকা আদায় করা যেতে পারে না। এই মত নতুন নয়। পুরাণো মত তাদের। তারা প্রমাণ করে দিতে পারে নবাবকে যে, এই ভাবে প্রজাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করলে পরিণামে ক্ষতি হবে নবাবেরই।

আপত্তি কানে তোলেনি কাশেম আলি। নতুন কর চাপানো হল। আলিবর্দীর সময়ে মোট করের পরিমান ছিল ৪,৩৯৮,৫০৬। কাশেম আলি এই অঙ্কের ওপর চাপালো আরো মোটা অঙ্ক—৭,৪৮১,৩৪০ টাকা। রাজস্বের পরিমান বেড়ে দাঁড়ালো ১১,৮৭৯,৮৪৬ টাকায়।

বিরুদ্ধে গিয়েছিল বীরভূমের জমিদার আসাদ খাঁ। নির্দ্ধারিত রাজস্ব ছাড়া এক কড়িও দিতে চায়নি খাঁ সাহেব। নিজের সেনাপতি গুরগণ খাঁ আর ইংরেজদের মেজর ইয়র্ককে নিয়ে হাজির হল বুধগ্রামে। সামান্য যুদ্ধ করে পালিয়ে গেল খাঁ সাহেব। যুদ্ধের পর বীরভূম থেকে উঠে এল আট লাখ টাকা। বর্ধমান মেদিনীপুরের জমিদারকে বাধ্য করতে বেশী সময় লাগেনি কোম্পানীর। ইংরেজের বল পেয়ে মাথা নীচু করলো বিহারের জমিদার।

রীতিমত খাজনা আদায়ের জুলুমে ভিটে-মাটি ছাড়া হয়ে গেল অনেক চাষী। কোলব্রুক সাহেব সেইসব কাহিনী বলে গিয়েছে। এই ফেরারী কৃষক আর বেকার সৈন্য ভয়াবহ করে তুলেছে গ্রামের জীবন। নিরাপত্তা নেই।

মীরজাফরের আমল থেকে কোম্পানীর পটু হাত গিয়ে পড়েছে গ্রামের

ভেতর। দেশীয় বাণিজ্যে জেঁকে বসেছে তারা। তাদের বেনিয়ান গোমস্তা আয় করছে প্রচুর। ১৭৫৩ সাল থেকে দালাল লাগিয়ে কাজ করার প্রথা রহিত করেছে কোম্পানী। নিজেদের লোকই এখন যায় গ্রামে, গঞ্জে। এই প্রথায় লাভ বেশী। উমিচাঁদের কদর কমেছিল তার পর থেকে।

দাদনি প্রথা উঠিয়ে দিয়েছে কোম্পানী। চলছে এজেন্সি প্রথা। তাই কোম্পানীর ব্যবসা আর কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যবসা মিলেমিশে একাকার। এজেন্সি প্রথার আদিম স্তরে বেনিয়ান গোমস্তার যুগ। কাশীম বাজার কুঠির কান্তবাবুর উত্তরাধিকারী এরা। তখন এই বেনিয়ানরা এক ধরণের মহাজন। তারা টাকা কড়ি দিয়ে, হিসেব পত্তর রেখে, বুদ্ধি পরামর্শ দিয়ে নবাগত স্বর্ণ শিকারী লালমুখোদের কোটিপতি করে নিজেরাও হত লাখপতি। নবাগতের গায়ের চামড়া সাদা হওয়া দরকার। চোখ দুটো নীল, মাথার চুল কটা, আর ভারীক্কী মেজাজ হলেই চলবে। সোজা কথায়, তাকে কোম্পানী ইংরেজ বলে স্বীকৃতি দিলেই এ দেশের বেনিয়ানরা টাকা দেবে, পুরীর পাণ্ডার মত ঘিরে ধরবে।

পলাশীর যুদ্ধের আগে বৈশ্য সম্প্রদায়ের লোকরাই হত বেনিয়ান। পলাশীর পর বামুন কায়েতরাও এই লোভনীয় ব্যবসায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। পলাশীর সময়ে জার্মানদের বেনিয়ান ছিল দুর্গাচরণ মিত্র। তারপরের যুগে প্রসিদ্ধ বেনিয়ান হল গোকুল ঘোষ, বারাণসী ঘোষ, হিদারাম ব্যানার্জী, অক্রুর দত্ত, মনোহর মুখার্জী, মহারাজা নবকৃষ্ণ, গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ, কৃষ্ণকান্ত নন্দী।

যাই হোক, দেশের ভেতরে বাণিজ্য করবার বে-আইনী অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের বেনিয়ানরা শোষণ করেছে প্রজাদের। তারা জোর জবরদস্তি করে নামমাত্র দামে কৃষকের জিনিষ কিনেছে। চড়া দামে কিনতে বাধ্য করিয়েছে তাদের পন্য। এক কথায়, জুলুম করেনি শুধু মাত্র মীরকাশিম। জুলুম করেছে বেনিয়ান গোমস্তা। নতুন বাংলার বহু মাননীয় ভদ্রলোকের অতীত এমনি ঘোর অপরিচ্ছন্ন।

দেশের মধ্যে এক অদ্ভুত শ্রেণী উঠছে। তারা এই বেনিয়ান। তাদের হাতে এসেছে টাকা। কিন্তু সাহস নেই। ইংরেজদের মত স্বাধীন ব্যবসা তারা করতে পারবে না। সাগর পার হয়ে নিয়ে যেতে পারবে না ভারতের পণ্য। তারা থাকবে তলপী বাহক হয়ে। খালি হাতে কোন ইংরেজ বাংলার মাটিতে পা দিলে আঠার মত লেগে থাকবে টাকা দাদন দেবার জন্য। ইংরেজের হয়ে ব্যবসা করে দেবে। তাই ভিখারী ইংরেজ রাতারাতি হবে লক্ষপতি।

আর তারা কিছু মুনাফা কুড়িয়ে বড় লোক হবে। সেই-ই নিরাপদ পথ। মারিত হাতী, লুটিত ভাণ্ডার—এই মারাত্মক নীতিতে তারা বিশ্বাস করত না। বরং পৌরুষহীন অথচ নিশ্চিন্ত প্রাণধারণ তাদের কাছে বরণীয়। এই বিসদৃশ ভীরুতার জন্য পরবর্তী কালে কত আক্ষেপ করেছেন ঈশ্বর গুপ্ত। কিন্তু পরগাছা বৃত্তি থাকলোই।

ব্যবসায় প্রতিপক্ষ নেই। ফরাসী আর ডাচেরা আর আসবে না জিনিষের দাম বাড়াতে। ক্রেতা এখন একমাত্র কোম্পানী। তাঁতীদের অবস্থা খুব খারাপ।

জগৎশেঠ তাই বারণ করেছিল নবাবকে। নবাব শোনেনি। মীরকাশিম শুধুমাত্র ইংরেজদের ঘৃণা করে না। ঘৃণা করে যারা ইংরেজের পক্ষে, তাদেরও। শেঠদের ইংরেজ প্রীতি প্রথাগত। তাই মীরকাশিম শুধুমাত্র শেঠদের কথায় কান দেয়নি তা নয়, তাদের জব্দ করার চেষ্টাও করেছে। ১৭১৮ সালে রঘুনন্দন দারোগা মারা যাবার পর থেকে মুর্শিদাবাদে ট্যাঁকশালের ওপর অপ্রতিহত আধিপত্য করে এসেছে শেঠরা। দেশের মুদ্রানীতি পরিবর্তিত হয়েছে তাদের স্বার্থের খাতিরে। কিন্তু ১৭৬০ সালে মীরকাশিম নিজের হাতে তুলে নিয়েছে রাজস্বের ভার। আর আধিপত্য নেই শেঠদের। এই পরিবর্তনের অর্থ বুঝতে আরম্ভ করেছে মহাতপ।

ফরাসী, ডাচ বণিকরা গিয়েছে। অনেক টাকা মারা গিয়েছে। তাদের কারবার অনেকখানি সঙ্কুচিত। লেন দেন কমে গিয়েছে। থাকার মধ্যে আছে কোম্পানী। কিন্তু পলাশীর পর অভাব তাদের খুব কম। অনেক টাকার মালিক তারা। রাতারাতি কুবের। যা দাবী আসে, তা ঠিক ব্যবসার প্রয়োজনের নয়। নবাবের ব্যাঙ্কার মাঝখানে হয়েছিল কোম্পানীর ব্যাঙ্কার। কোম্পানী এখন কয়েকজনের ব্যাঙ্কার হয়ে উঠছে। লেন দেন কমে গিয়েছে অনেক।

টাকার বাট্টার হেরফের এখন সচল। শেঠবাড়ীর বড় উপায় সেটাই। কিন্তু এশিয়ার বাণিজ্য প্রায় শেষ। দেশের ভেতরের বাণিজ্যে এসেছে বেনিয়ান গোমস্তার আবির্ভাব। সোনা রূপো কম আসছে। মজুত সোনা রূপোয় ক'দিন যাবে? নতুন করে সোনা আসার পথ প্রায় বন্ধ। সোনা রূপো আসত ভারতের বাইরের দেশ থেকে। আনত ফরাসী ডাচ ইংরেজ। ওই দেশ থেকে আর আসবে না। মহাতপ ভাবনায় পড়ে। এমন কোন

বণিকশ্রেণী ওঠেন, যারা জাহাজে পাল তুলে ইংরেজদের সঙ্গে পাল্লা দেবে ব্যবসায়। বিদেশ থেকে সোনা নিয়ে আসবে। সে আশা আর নেই।

নতুন যুগ এসেছে। মাণিকচাঁদ ফতেচাঁদের কৌশল ঠিক কাজ করছে না। কিন্তু কোন্ কৌশল নেবে মহাতপ? কোন পথ খোলা আছে? আজ শিকড় সমেত টান পড়েছে। উপড়ে আসবে সমূলে। যদি আসে তবে কি নিয়ে থাকবে শেঠবাড়ী? অর্থই তাদের বাঁচার লক্ষ্য; তাদের কমাত্র সাধনা ও সিদ্ধি। কিন্তু সেই অর্থের উৎস শুকিয়ে আসছে।

হিসেব মিথ্যা হতে পারে না। হিসেবের অঙ্ক চোখে আঙুল দিয়ে প্রতিদিন এই সত্য বোঝাচ্ছে তাকে। মহাতপ ক্রমাগত ভীত হয়ে পড়ে। যা আছে তাকে যদি কোনক্রমে আঁকড়ে রাখতে পারে, তবে যেন বেঁচে যাবে। যদি না বাড়ে না বাড়ুক। ক্ষতি হলেও সহ্য করা যাবে। কিন্তু বাড়াতে গিয়ে সর্বস্ব ডোবাতে পারবে না তারা। নিজের ভেতর গুটিয়ে আসে। নতুন হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। এ হাওয়াকে জানা নেই ওদের। কি আছে এই হাওয়ায়? কোন ইংগিত? বোধহয় সর্বনাশের। আজ কোন নির্দেশ দিতে পারে না জগৎশেঠ।

মোগল বাদশার গৌরব পেয়ে বসেছে মীরকাশিমকে। কোম্পানী তাকে নবাব করেছে। নবাবী পাওয়ার জন্য সিংহাসন বিক্রি করতে হয়েছে। কিন্তু মীরকাশিম ঠিক করেছে ওই বিক্রি হওয়া সিংহাসন আবার কিনে নিয়ে আসবে। বহুদিনের সিংহাসন—তখ্‌ত মোবারক। একদিন সুলতান সুজা এই সিংহাসনে বসে বাংলা দেশে মোগল সাম্রাজ্যের জয় ঘোষণা করেছে। রাজমহল ঢাকা ঘুরে সিংহাসন এসেছে মুর্শিদাবাদে। গৌরব রাখতে হবে তার।

মীরকাশিম জানে কোম্পানীর সকলেই তাকে সমর্থন করেনি। হলওয়েল ক্লাইভ নয়। তার বিরুদ্ধে একদল আছে কলকাতায়। আন্দোলন করছে। লেখালেখি করেছে বিলেতে। যে সমর্থন সে আজ পেয়েছে, কাল তা নাও থাকতে পারে।

থাকলেও রাখতে দেবে না। ইংরেজদের সঙ্গে লড়াই অনিবার্য। প্রস্তুত হয় মীরকাশিম। রাজপুতদের মত অটল প্রতিজ্ঞা নিয়ে নিজেই সাজায় নিজের চিতা।

সনদ পাঠিয়েছে দিল্লীর বাদশা শাহ আলম। মীরকাশিম বাংলা বিহার

উড়িষ্যার নবাব। সনদ বোধহয় আপনি এসেছিল। জানা যায় না জগৎশেঠ মহাতপ রায় কোন চেষ্টা করেছিল কি না।

মীরকাশিম বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। শাহ আলম ভারতের শেষ স্বাধীন বাদশা। শাহ আলম কবি। পতনকে নাড়িতে নাড়িতে অনুভব করেছিল। কবিতা লিখেছে মোগল বাদশা :

ছাখো ক্রুদ্ধ ঝঞ্ঝা ফোঁসে দিগন্তের কোলে ক্রমাগত
রাজকীয় তারা ম্লান ভয়ঙ্কর মেঘের ছায়ায়
বাতাস ছড়ায় ত্রাস, ঢাকে দূর নির্বাক নীলিমা
তার কাছে সমর্পিত দেশ, রাজ্য, আমার গৌরব।

হে সম্রাট, একদিন শক্তিমত্ত কণ্ঠস্বর শুনে
কুর্নিশ করেছে জাতি সম্ভ্রমে বিনয়ে অনুগত।
হায়, আজ বিপরীত, বিক্রীত সাম্রাজ্য, সিংহাসন
সোনার ঢিবির পাশে চক্রান্তের জান্তব চিৎকার।

মীরকাশিমও ঠিক এই কথাই বলতে চায়। শুনতে পায় চক্রান্তের জান্তব চিৎকার। সতর্ক হয় নবাব। গুপ্তচর সচকিত। ভয়ার্ত শহরবাসী। কেউ কোন কথা বলে না। কয়েকজন নামকরা লোককে কোতল করা হল। ভয়ের মাত্রা ছাড়িয়ে গেল। ঘুমিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখে আঁৎকে ওঠে গৃহস্থ। কোনমতে নবাবের কুনজরে পড়লেই সর্বনাশ।

১৭৬২ সালের দিকে সব দেনা শোধ করে দিল মীরকাশিম। কোম্পানী আর তার পাওনাদার নয়। ইংরেজদের তাড়াবার দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য বাসনায় দেশের মানুষের ঠিক কোনখানে আঘাত করেছিল মীরকাশিম তা বোঝা গেল ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে। কিন্তু দেনা শোধ করেছে সে। মুঙ্গেরের পুরাণো কেল্লা সংস্কার হল। রাজধানী উঠে গেল সেখানে। এ দেশের কুশলী কামার ডেকে বসানো হল কামান বন্দুকের কারখানা। খুব মজবুত বন্দুক তৈরী হল। এমন বন্দুক ছিল না কোম্পানীরও। ইংরেজী কায়দায় সংগঠিত হল সেনাবাহিনী। সেনাপতি তার আরমানী গ্রেগরী। এ দেশের নাম গারগিন খাঁ। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে গুর্গন খাঁ। মার্কার আর সমরু সাহায্য করে গুর্গনকে। ক্ষিপ্র ও নিপুনভাবে তৈরী হয় মীরকাশিম।

১৭৬২ সালে বিলেত থেকে চিঠি এল। কোম্পানীর ডিরেক্টররা ভাল চোখে দেখতে পারেনি হলওয়েলের কাজ। প্রতিপক্ষ হাতে অস্ত্র পেয়েছে। তারা বলতে আরম্ভ করেছে এবার মীরজাফরকে আবার সিংহাসনে বসানো হবে। ক্ষুব্ধ হয়েছিল নবাব। শান্ত করেছিল হেষ্টিংস।

ছাই চাপা আগুন একদিন আবার ফুটে উঠলো। হেষ্টিংস ও ভ্যান্সিটার্ট হাজার চেষ্টা করেও শান্ত করতে পারলো না। শান্ত হতে আসেনি কাশেম আলি।

দস্তক নিয়ে কোম্পানীর সঙ্গে নবাবের ঝগড়া নতুন নয়। পলাশীর পরে কোম্পানীর নবাব-প্রীতি একেবারে উবে গিয়েছে। নিষিদ্ধ কারবার চলছে পুরোপুরি। মীরজাফরের মত নবাবও একবার মৃদু প্রতিবাদ করে উঠেছিল। কোন ফল হয়নি। সোনার নেশা বড় তীব্র। সেই নেশার ঘোর জমে উঠেছে। কোম্পানীর গোমস্তা বেনিয়ানরা গ্রামের চাষীদের অত্যাচার করে, অল্প দামে তাদের কাছ থেকে জিনিষ ছিনিয়ে নিয়েও অতৃপ্ত। নবাবের শাসনকে পরোয়া নেই। চৌকিদার কোন কথা বলতে সাহস করে না। মাঝে মাঝে চৌকিদারকে বেঁধে উত্তম মধ্যম প্রহারও দিয়েছে। মালদার কুঠিয়াল জর্জ গ্রে তেজপুরের জমিদার ওয়াদেদার ও পেস্কারকে বন্দী করেছে। কৃষকদের ধান কেড়ে নিয়েছে। বিনা অনুমতিতে পরগণা জুড়ে গড়ে তুলেছে অনেক কুঠি।

পরগণার নায়েব শের আলি নালিশ করেছে নবাবের কাছে। নবাব সেই নালিশ পাঠিয়েছিল কলকাতায়। কোন ফল হয়নি। আরমানী বণিক এন্টন কিনেছিল মাত্র পাঁচ মণ সোরা। সেই অপরাধে কোম্পানী তাকে দিয়েছে তিন মাস জেল। তিন মাস পরে নবাবের কাছে পাঠিয়েছে আরো গুরুতর শাস্তির জন্যে। ঢাকা লক্ষ্মীপুরে কোম্পানীর অত্যাচার অবাধ।

ঢাকা থেকে মহম্মদ আলি লিখে পাঠালো : প্রথমে বেশ কিছু মালপত্তর খরিদ করার পর কোম্পানীর একজন লোক পাকড়াও করা হয়। নৌকায় মালপত্তর বোঝাই করে উড়িয়ে দেওয়া হয় কোম্পানীর নিশান। ভাবটা যেন নৌকার সব মালই কোম্পানীর। গোমস্তারা বাজার থেকে অল্প দামে তুলো, তামাক, সুপারি, লোহা ইত্যাদি কিনে নেয়। এই কৃষকদের দিতে হয় গোমস্তা আর তার পিয়নদের খাই খরচা। মাঝে মাঝে জোর করে তারা

তালুকদারের তালুক কেড়ে নেয়। তহশীলদারকে সম্মতি দিতে বাধ্য করায়। তার জন্যে কোন খাজনা তারা দেয় না। কোন প্রতিবাদ করলে আসে গোরা সেপাই। গ্রামে ভয় ছড়ায়। সায়ের চৌকি অধিকার করে। বে-আইনী কর আদায় করে নেয়। তাদের অত্যাচারে ঘর বাড়ী ছেড়ে কৃষক পালায়।

এ চিঠি একা মহম্মদ আলির নয়। জমিদার রাজিব আলি করেছে ঠিক একই অভিযোগ অন্য পরগণা থেকে। শ্রীহট্টের গোমস্তার বিরুদ্ধে আরো গুরুতর অভিযোগ এনেছে দুর্লভরাম।

শেষে একদিন অভিযোগ এল জগৎশেঠের কাছ থেকে। ভদ্রতার খাতিরে উত্তর দিয়েছে ভ্যান্সিটার্ট। আশ্বাস দিয়েছে যে, কড়া হুকুম পাঠাচ্ছে যেন কোন প্রজার ওপর অত্যাচার করা না হয়। আর জগৎশেঠকে অনুরোধ করেছে ভ্যান্সিটার্ট, সেও যেন অত্যাচারীর নাম পাঠায়।

জগৎশেঠ ও ভ্যান্সিটার্ট জানে এই আশ্বাস কত মূল্যহীন। বে-আইনী ব্যবসা বন্ধ করা তার সাধ্যাতীত। সভায় এ বিষয়ে আলোচনাও হয়েছে। কেউ কোন গুরুত্ব দেয়নি। অধিকাংশ সভ্যের ধারণা এ সব নবাবের চালাকি। পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া বাধাবার ফন্দি। পলাশীর পর এ সব ব্যবসা করার অধিকার তাদের আছে। আর আলোচনা করেনি ভ্যান্সিটার্ট। অকারণে শত্রু বৃদ্ধি করে লাভ নেই। তাকে শুধু নানা উপায়ে নবাবের সঙ্গে বোঝা পড়া করতে হবে।

নবাব চিঠি লিখলো কলকাতার গভর্নরকে: আপনাদের কর্মচারীদের ব্যবহার অকথ্য। তারা আমার দেশময় অসন্তোষ ছড়াচ্ছে। আমার প্রজাদের শোষণ করছে। আমার কর্মচারীকে অপমানিত, অপদস্থ করে প্রজার সামনে আমার শাসনকে হেয় প্রতিপন্ন করতে অকুণ্ঠিত। তাদের একমাত্র কাজ প্রতি গ্রামে গঞ্জে আমাকে অবজ্ঞার পাত্র করে তোলা।

পরগণায় পরগণায় কম পক্ষে কুড়ি পঁচিশটি নতুন কুঠি বসেছে। কোম্পানীর নিশান উড়িয়ে দস্তক দেখিয়ে আমার কৃষক প্রজাকে ও ব্যবসাদারকে শোষণ করছে। দস্তককে পরীক্ষা করার যে চুক্তি আগে হয়েছিল, সেই অনুসারে কাজ করতে গিয়ে আমার চৌকিদাররা অপমানিত হয়েছে। কুঠি বসিয়ে তারা এমন সব জিনিষের ব্যবসা করছে, যার নাম কোম্পানী কোনদিন শোনেনি। প্রত্যেক বাঙালী গোমস্তা মনে করছে সে-ই কোম্পানী।

মীরকাশিমের চিঠি দীর্ঘ। অভিযোগ প্রচুর। নবাব শেষে বলেছে এই

বে-আইনী কারবারের জন্ত তার লোকসান হচ্ছে বছরে প্রায় পঁচিশ লাখ টাকা।

মাঝে মাঝে কোম্পানীর কিস্তি আটক করেছে নবাব। চোখ রাঙিয়ে চিঠি এসেছে কলকাতা থেকে। বাদশাহী ফর্মানকে অমান্ত করার কোন অধিকার নেই নবাবের। ব্যবসার কোন ক্ষতি তারা মুখ বুঁজে সহ্য করবে না।

নবাব আর কোম্পানীর বিরোধ মেটানোর চেষ্টা করতে গিয়ে বিপদে পড়লো ভ্যান্সিটার্ট। নবাব তখন থাকত মুঙ্গেরে। ব্যবসা চালানো এবং দস্তক পরীক্ষার রীতি নিয়ে কয়েকটা আইন তৈরী করেছিল ভ্যান্সিটার্ট। কিন্তু কারো মন রাখতে পারেনি সে। কোম্পানীর অধিকাংশ সভ্যের কাছে ভ্যান্সিটার্ট শত্রু। নবাব তার ওপর বিরক্ত।

হেষ্টিংসের মতও তাই। ভ্যান্সিটার্টকে সে সমর্থন করে। হেষ্টিংস বলেছে, 'আমি কোম্পানীর খুব নীচু পদে ছিলাম। সে জন্যে এ দেশের সাধারণ মানুষের সঙ্গে থেকেছি। তখন আমরা সরকারের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। কিন্তু সে সময়ও আমরা জমিদার ও সরকারী কর্মচারীদের কাছ থেকে সশ্রদ্ধ ব্যবহার পেতাম। কখনও কখনও তারা আমাদের আস্কারা দিয়েছে। কোনদিন তারা আমাদের বিরুদ্ধে যায়নি। এ বিষয়ে আমার কোন সংশয় নেই।

আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি যে, যদি আমাদের গোমস্তা কর্মচারীরা নিজেদের নবাব হিসাবে না ভাবে, যদি তারা নিজেদেরকে এই দেশের মালিক হিসেবে মনে না করে, যদি আইন সম্মত প্রতিষ্ঠিত সরকারের কাছে নতি স্বীকার করে, তা হলে তারা দেশের সর্বত্র সম্মানিত হবেই।'

কথা কানে নেবার মত মন ছিল না বেশীর ভাগ সভ্যের। মান সম্ভ্রম ন্তায় নীতি সত্য মিথ্যা ইত্যাদি বোধগুলো বহুদিনই বিসর্জিত। যে যতটা পারে ততটা যোগাড় করে নিতে ব্যস্ত।

১৭৬৩ সালের মার্চ মাসে নবাব বাণিজ্যের ওপর সব শুল্ক তুলে দিল দু'বছরের জন্ত। এবার কোন কর না দিয়ে ব্যবসা করতে পারবে এদেশ ওদেশের সমস্ত ব্যবসাদার। ক্ষিপ্ত হল কোম্পানী। চুক্তিভঙ্গ করেছে নবাব। বিশ্বাসঘাতকতা করেছে নবাব। কোন কথা কানে নিতে নারাজ

কাউন্সিল। পাঠানো হল আমিয়ট আর হে সাহেবকে নবাবের কাছে। তারা দাবী করবে নবাবের কাছে, এই অন্যায় আদেশ তুলে নেবার জন্য।

নবাব তখন মুঙ্গেরে। চোখ তার মুর্শিদাবাদে। কাউন্সিলের ভেতর তার বিরুদ্ধে দল পাকিয়ে উঠেছে। প্রকাশ্যে প্রচার চলছে যে মীরজাফরকে আবার নবাব করা হবে। দস্তক নিয়ে কোম্পানীর সঙ্গে বিরোধটা ক্রমাগত জটিল হয়ে উঠছে। যুদ্ধ বাঁধাও বিচিত্র নয়। যুদ্ধে জগৎশেঠরা নিশ্চয়ই কোম্পানীর বিরুদ্ধে কোনদিন যেতে পারবে না। ওদের ওপর তাই গভীর সন্দেহ। আজ নয়, অনেকদিন আগে থেকেই আছে। এখন ওদের মুর্শিদাবাদে রাখা যায় না। অর্থ প্রভাব প্রতিপত্তি ওদের অতুলনীয়। ইংরেজদের পক্ষে যোগ দিলে নবাবের বিপদ আরো ঘোরতর হয়ে উঠবে। ওদের অতদূরে গুপ্তচরের ভরসায় রেখে দেওয়া নিরাপদ নয়। আর সামান্য সন্দেহ হলে পালিয়ে যাবে কলকাতায়।

শেঠদের সাহায্য পেয়েই সিরাজ চোখের পলকে সরে গেল। মীরকাশিমের অভিজ্ঞতা। মীরজাফর ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হল সেজন্যই। মীরজাফরের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে শেঠরা প্রকাশ্যভাবে যোগ দেয়নি। কিন্তু তাদের এই নির্বিকারভাব কোম্পানীকে বিব্রত করেনি। যদি বিরোধিতা করত, তবে হলওয়েল যত গর্জাক, কিছুই করতে পারত না। শেঠকে ভয় করে নবাব।

গুপ্তচর সম্প্রতি কয়েকটা চিঠি হাত করেছে। শেঠদের চিঠি। কয়েকটা লেখা কোম্পানীকে, কয়েকটা মীরজাফরকে। সমস্ত চিঠিতেই মীরকাশিমের বিরুদ্ধে কথা বলা আছে। নবাব আঁৎকে উঠলো।

দূত গেল বীরভূমের ফৌজদার মহম্মদ তাকী খাঁর কাছে। তাকী দক্ষ সেনাপতি, একান্ত বিশ্বস্ত। কোনদিন তাকীর ওপর কোন সন্দেহ হয়নি সন্দেহপরায়ণ মীরকাশিমের।

তাকী হুকুম পেয়েছে নবাবের। কথামাত্র কাজ। ওদিকে মার্কার সৈন্য নিয়ে আসছে গঙ্গা দিয়ে। কথা আছে তাকী মহিমাপুরের বাড়ী ঘিরে ফেলবে সৈন্য দিয়ে। পিঁপড়ে অবধি যেন বাইরে না আসতে পারে। মার্কার মুর্শিদাবাদে পৌছালে জগৎশেঠ মহাতপ আর মহারাজ স্বরূপচাঁদকে তুলে দেবে মার্কারের হাতে। মার্কার প্রাপ্তি স্বীকার করে সই করে দেবে। পাকা ব্যবস্থা মীরকাশিমের। নবাব তাকী আর মার্কারকে বলে দিয়েছে

যেন শেঠদের শরীরে কোন আঘাত না লাগে, যেন তাদের সম্মান হানি না হয়।

যাত্রা করে মার্কার। সঙ্গে তার তেলেঙ্গী সেনা। গঙ্গায় পাল তুলে নৌকা ছোটে তীরের মত। বত্রিশ দাঁড়ির নৌকা। পৌঁছাতে দেরী হবে না।

তাকী ঘিরে ফেলেছে মহিমাপুর। শেঠবাড়ী থেকে জনপ্রাণী বার হতে পারে না। চার হাজার মানুষের পুরী। দু'হাজার সেপাই পাহারাদার। অন্তত আত্মরক্ষার জন্য কিছুক্ষণ লড়াই করতে পারে তারা। এই যুদ্ধে কি লাভ হবে তাদের? নবাবের সৈন্যকে হারিয়ে পালিয়ে যেতে পারবেন কোনমতে। তাতে ত তছ্‌নছ হয়ে যাবে সব। কিছুই থাকবে না আর মহিমাপুরের। যে লুণ্ঠনের ভয়ে দিনে ভাবিত হয়েছে, রাতে জেগে কাটিয়েছে, চোখের সামনে দেখতে হবে সেই লুণ্ঠন। জগৎশেঠ জানেও না কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে কাশেম আলির।

তাকী খবর পাঠায়, তারা আক্রমণ করতে আসেনি। কোন ক্ষতি করবে না শেঠদের। গায়ে তাদের আঁচড় লাগবে না। তার সৈন্যরা মহিমাপুরের একটা কুটোও নিয়ে যাবে না। অভয় দিয়েছে তাকী। সে শুধু সঙ্গে করে নিয়ে যাবে জগৎশেঠ মহাতপ রায় আর মহারাজ স্বরূপ চাঁদকে মুঙ্গেরে। থাকতে হবে নবাবের কাছাকাছি। নবাব কথা দিয়েছে কোন ক্ষতি হবে না শেঠদের।

নবাবের কথা জানাচ্ছে মহম্মদ তাকী। তার কথার ওপর বিশ্বাস করতে হবে। বিশ্বাস অবিশ্বাসের কোন প্রশ্ন নেই। অবস্থার চাপ। পছন্দ অপছন্দর কথা ওঠে না। এখন হয় তাকে যুদ্ধ করতে হবে। অথবা স্বীকার করতে হবে নবাবের আদেশ। অন্য কোন পথ নেই।

আকস্মিক ও অভাবনীয় অবস্থাকে মর্য্যাদার সঙ্গে মেনে নিয়েছে দু' ভাই। আত্মসমর্পণ করেছে তারা।

মার্কারের আসতে লাগলো দিন তিনেক। তাকী দুই ভাইকে তুলে দিল মার্কারের হাতে। কথামত প্রাপ্তি স্বীকার করেছে মার্কার।

বত্রিশ দাঁড়ি নৌকার পাল উঠেছে আবার। ক্রমে ক্রমে মুছে আসছে মহিমাপুর। শ্বেত পাথরে বাঁধানো ভাগীরথীর ঘাট লোকে লোকারণ্য। আর দেখা যাচ্ছে না মন্দির।

দুঃসহ ইতিহাসের অংশীদার হয়ে মুঙ্গেরে যাচ্ছে ভারত বিখ্যাত জগৎশেঠ আর মহারাজ। আত্মরক্ষার জন্যে যে জটিলতার জাল পেতেছে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ, সেই জটিলতার জালে জড়িয়ে পড়ে অসহায় বন্দী মহাতপ আর স্বরূপ চাঁদ।

মুঙ্গেরে যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানালো নবাব মীরকাশিম। সম্মানীয় অতিথি। আপ্যায়নের কোন ত্রুটি রাখেনি। একবার কলকাতায় গিয়ে অভ্যর্থনা পেয়েছিল জগৎশেঠ। সেদিন জাঁকজমকের অন্ত ছিল না। সেদিন আনন্দ ছিল। আজকের এই আপ্যায়নের তলায় চোরা গোপ্তার ফলা অনুভব করতে লাগলো জগৎশেঠ।

নবাব বললে, তাদের এমন ভাবে যে মুঙ্গেরে নিয়ে আসতে হবে তা কোন দিন কেউ ভাবতে পারেনি। ভাবতে পারেনি কাশেম আলি নিজেও। কিন্তু অবস্থার বিপাকে এই অপ্রীতিকর কাজ করতে হয়েছে। করতে বাধ্য হয়েছে, কারণ এ ছাড়া আর কোন পথ ছিল না। এই রূঢ় ব্যবহারের জন্য ক্ষমা চাওয়া ছাড়া আর কি করতে পারে নবাব। তবু নবাব আশা করে যে জগৎশেঠ আর মহারাজ মুঙ্গেরে থাকবেন। তাদের সুখ স্বাচ্ছন্দের কোন ত্রুটি হবে না। এখানে থেকেই তারা কাজকর্ম করবেন। নতুন গদী হবে মুঙ্গেরে। উঠবে·শেঠদের নতুন বাড়ী। আগের মত দরবারে আসবেন তারা। আগের মতই রাজস্বের সব ভারই তুলে নেবেন।

নবাব এমন এক ভাষায় কথা বললে যেন মুর্শিদাবাদের দরবারে আসা আর মুঙ্গেরের দরবারে আসার·ভেতর কোন তফাৎ নেই। যেন মহিমাপুরের বাড়ী আর মুঙ্গেরের বাড়ী একই।

ওদিকে গুপ্তচর কড়া হুকুম পেয়েছে সব সময় নজরে নজরে রাখার। বাঁধা চৌহদ্দি ছাড়া বেশী দূরে যেন যেতে না পারে কোন মতে।

বিচক্ষণ ব্যবসাদার টের পায়। কিন্তু কোন পথ নেই আর। ছলনা করতে হবে। প্রসন্নতার ভাব নিয়ে আসতে হবে দরবারে। মুঙ্গেরে উঠলো শেঠদের নামমাত্র গদী।

তেত্রিশ

মার্কার যেদিন মহাতপ আর স্বরূপচাঁদকে নবাবের হাতে তুলে দিতে নৌকা ছাড়লো হীরাঝিলের ঘাট থেকে, সেইদিনই মুঙ্গের যাবার পথে অমিয়ট আর হে পৌছালো কাশীমবাজারে। এমন অভাবনীয় ব্যাপার নিজের চোখে না দেখলে ওরা কেউ বিশ্বাস করতে পারত না। লোকের মুখে এক কথা নানাভাবে নানারকম হয়। কিন্তু নিজের চোখ কানকে অবিশ্বাস করবে কি করে?

সেইদিনই চিঠি পাঠালো কলকাতায়। ভ্যান্সিটার্টের ধারণা যে নবাব ইংরেজ বিদ্বেষী। শেঠদের ইংরেজ প্রীতি তর্কাতীত। নবাবের সঙ্গে শেঠদের বিরোধ নিশ্চয়ই এই ইংরেজকে কেন্দ্র করে। এ ছাড়া আর কি কারণ থাকতে পারে? ভ্যান্সিটার্ট জানে পলাশীর পর থেকে শেঠরা বিমর্ষ হয়ে পড়েছে। কারবারে মন্দা যাচ্ছে। মীরকাশিমকে বুক দিয়ে আগলে রাখেনি শেঠরা। কিন্তু তারা মোটামুটি নিরপেক্ষ। অযাচিত উপদেশ দিতে আসেনি আর। নবাব যখনই পরামর্শ চেয়েছে, তখনই তারা নিজেদের বিচার বুদ্ধি অনুযায়ী পরামর্শ দিয়েছে। যদি তারা সরে গিয়ে থাকে, তবে তার কারণ নবাব নিজেই; তার অহেতুক নিষ্ঠুরতা, সন্দেহ ও কঠোরতা।

তা ভিন্ন শেঠরা কেন এই নবাবের আমলে নিজেদের ছেলে নিয়ে কোনদিন পথে বার হয়নি? শেঠবাড়ীর উত্তরাধিকারীরা কেন থাকতে বাধ্য হয় মহিমাপুরের পাঁচিলের আড়ালে? ফতেচাঁদ ত কখনও আনন্দ চাঁদকে লুকিয়ে রাখেনি! এমন কি সিরাজের সময়ও তাদের আত্মগোপন করতে হয়নি। তবে মীরকাশিমের আমলে এই মহাতপ আর স্বরূপ চাঁদ কেন আড়াল করে রাখতে যাবে তাদের ছেলেদের? ভ্যান্সিটার্ট বুঝতে পারে না কি কারণ থাকতে পারে নবাবের এমন শেঠ বিদ্বেষের।

১৭৬৩ সালের ২৪শে এপ্রিল চিঠি লিখলো ভ্যান্সিটার্ট: মিষ্টার অমিয়টের চিঠি আমি এখুনি পেয়েছি। আমি জানতে পারলাম যে বীরভূম থেকে মহম্মদ তাকী খাঁ সেনাবাহিনী নিয়ে গত ২১শে রাত্তিরে শেঠবাড়ী

ঘিরে ফেলে। সেখান থেকে জগৎশেঠ ও মহারাজা স্বরূপ চাঁদকে হীরা ঝিলের প্রাসাদে বন্দী করে রাখা হয়েছে।

আমি এই ঘটনায় বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছি। আপনি যখন দেশের শাসনভার নিজের হাতে তুলে নেন, তখন আপনি এবং আমি শেঠদের বাড়ী মিলিত হয়েছিলাম। আমরা উভয়ে স্থির করেছিলাম যে, যেহেতু শেঠরা দেশের মধ্যে গণ্যমান্য এবং সম্মানীয় ব্যক্তি, আপনি দেশ পরিচালনার ব্যাপারে তাদের পরামর্শ গ্রহণ করবেন। তাদের যাতে কোন মতে বিন্দুমাত্র ক্ষতি না হয়, তা আপনি দেখবেন। মুঙ্গেরে আপনার সঙ্গে যখন আমার আবার দেখা হয়, তখন এ প্রসঙ্গে কথা হয়েছিল। আপনি আমাকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, শেঠদের বিন্দুমাত্র ক্ষতি ও অপকার আপনার অনভিপ্রেত। আপনি তা কখনও ঘটতে দেবেন না। কিন্তু নিজের বাড়ী থেকে অমন সম্মানীয় তুই ব্যক্তিকে অসম্মানজনক ভাবে নিয়ে আসা শুধুমাত্র গর্হিত নয়, দেশের কাছে তাদের হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে। এ ঘটনা চূড়ান্ত অপমানকর। অধিকন্তু আমাদের চুক্তি লঙ্ঘন করা হয়েছে। এই ব্যাপার উভয়ের পক্ষে কলঙ্কজনক। এরজন্যে আমরা প্রত্যেকের কাছ থেকে অপবাদ কুড়াব। কারণ এই শেঠরা কোনদিন নাজিমের কাছ থেকে অসম্মান পাননি।

কাশেম আলির জবাব গেল ২রা মে। কাশেম আলি লিখেছে: শেঠদের ব্যাপারে আজও অবধি কেউ আমাকে কোন কথা বলেনি। কিংবা লেখেনি। আপনি অযথা উদ্বেগ নিয়ে আমাকে এই চিঠি লিখেছেন। কিন্তু এ কথা ত সূর্যের মত স্পষ্ট যে বাংলার প্রত্যেক নাজিমের আমলে, (উমিচাঁদ উদাহরণ স্বরূপ) কিংবা ইংরাজের আশ্রিত প্রত্যেক ব্যক্তি, এমন কি এই ভদ্রলোক তু'জনও, নাজিমের কাজকর্ম দেখেছে এবং সেই সঙ্গে নিজেদের ব্যবসাও চালিয়ে গিয়েছে। আপনি লিখেছেন যে এই ভদ্রলোকরা প্রভাবশালী। শাসন কার্যে এদের পরামর্শ গ্রহনীয়। হা হতোস্মি! আমি তিন বছর এই দেশ শাসনের গুরুভার হাতে নিয়েছি। আমি বহুবার এই ভদ্রলোকদের অনুরোধ করেছি তাদের স্বাভাবিক ব্যবসা চালিয়ে যাবার জন্য। আবেদন করেছি নিজামতের কাজে সহায়তা করার জন্য। আমার কথার কণামাত্র মূল্য দেয়নি এরা।

অধিকন্তু তারা নিজেদের কাজ কারবার বন্ধ করে দিয়েছে। নিজামতের কাজকে পণ্ড করে দেবার যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটিও রাখেনি। আমাকে শত্রু

ও অবাঞ্ছিত মনে করে দরবারে অবধি আসেনি। এ কথা ঠিকই যে আমি আমার লোক পাঠিয়ে ভদ্রলোক দু'জনকে এখানে নিয়ে এসেছি। কিন্তু তা ইংরাজদের সঙ্গে বনিবনা রাখার অপরাধের জন্য নয়। এই ভদ্রলোক দু'জনের সহায়তা আমার কয়েকটি কাজের জন্য আপরিহার্য বলেই।

আপনার .আমার চুক্তির সময় এ কথা ঠিক ছিল যে, এই ভদ্রলোক দু'জন নিজেদের ব্যবসা করে যাবেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে নিজামতের কাজও দেখাশোনা করবেন। আপনি যে ভঙ্গিতে চিঠি লিখেছেন, অকারণে ভুরু কুঁচকেছেন, ছেলেদের খেলনা ভাঙ্গার মত চুক্তির সর্ত্ত ভাঙ্গার কথা অবলীলাক্রমে ব্যবহার করেছেন—তা থেকে আমি কী ধারণা করতে পারি?

আপনার কর্মচারী আমার আমিনদের ঘর থেকে টেনে নিয়ে যায়, বন্দী করে। আপনার কর্মচারীদের এই অসঙ্গত ঔদ্ধত্যে বরং চুক্তির সর্ত্ত ভঙ্গ হয়েছে। চরিত্রকে খর্ব করেছে। কিন্তু এই ব্যাপারে আপনি বিশ্বাস ভঙ্গের কারণ খুঁজে পান না। কিন্তু আমি যখন আমারই একজন প্রজাকে ডেকে নিয়ে আসি, তখনই সন্ধি ভাঙ্গার অভিযোগ আসে। অভিযোগ আসে যে আমার সরকার দুর্বল হয়ে পড়েছে। দেশের প্রত্যেকটি লোকের মুখে আমার কুকীর্ত্তি ছড়িয়ে পড়ছে। অন্তত আপনাদের কাছে ত বটেই। এই অদ্ভুত ব্যাপার বোঝা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। যাই হোক, আমার শাসন কার্যের প্রথম দিনেই প্রতিজ্ঞা করেছিল, আমার জীবন যা, তাদেরও জীবন তাই। আমার কাজ এবং তাদের কাজে এক ও অভিন্ন। এই শপথ সকলের জানা। আমি এই শেঠদের এখানে নিয়ে এসেছি যাতে তারা নবাবী প্রথা অনুযায়ী আমার কাজ দেখতে পারেন এবং নিজেদের ব্যবসাও চালাতে পারেন।

জানি না আপনি আমাকে কেন এই চিঠি লিখেছেন। হয়ত এই ভদ্রলোকের প্রতি একান্ত মমতার জন্য। না হয় আমাদের সন্ধির সর্ত্তে এদের নাম ছিল বলেই আমাকে তিরস্কৃত করতে। ঈশ্বর জানেন, আমার কাজ চালু করতে আমি এদের ডেকে নিয়ে এসেছি। তা ভিন্ন আমার অন্য কোন অভিপ্রায় নেই। তারা এখানে চিরকালও থাকবেন না। যেমন বাজিদের বেলায় হয়েছে, এদের বেলায়ও ঠিক তাই-ই হবে। অহেতুক হত্যা দিয়ে আমার চৈতন্যকে পীড়িত করতে চাই না। বিধিসঙ্গত কাজও যদি আপনাদের কাছে অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত বলে গণ্য হয়, তবে আমি নিরুপায়। সুবিচারের দিক থেকে দেখলে বোঝা যাবে যে এই ঘটনা এমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, যার জন্যে আমি এতটা তিরস্কৃত হতে পারি।

এই চিঠিতে সই করেছে কাশেম আলি। কিন্তু নিজের হাতে লিখেছে আর একটা চিঠি ঃ

মহাশয়,

সন্ধির সর্ত্ত অনুসারে আমি কোম্পানীর কর্মচারী বা আশ্রিতদের কিছুই বলব না। আপনারাও আমার ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবেন না। কিন্তু আপনাদের কাছে এই সন্ধিপত্র প্রায় মুছে গিয়েছে। আপনারা সমস্ত সর্ত্ত অবজ্ঞা করে আপনাদের নাম ও নিজস্ব রীতি আমার ওপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। এ ক্ষেত্রে আমি নাচার।

ওদিকে কর নিয়ে নবাবের সঙ্গে কোম্পানীর সম্পর্ক প্রায় উঠে যাবার উপক্রম। উত্তেজনা বেড়েই চলেছে।

অমিয়ট আর হে এসেছে মুঙ্গেরে। দাবী করেছে, জগৎশেঠ আর মহারাজকে মুক্তি দিতে হবে। নবাব দৃঢ়চিত্ত। শেঠদের মুক্তি দিতে পারবে না কাশেম আলি। মাথা নীচু করে কথা বলতে আসেনি অমিয়টও।

কিন্তু পাটনা থেকে অস্ত্রের নৌকা যদি মুঙ্গেরের কাছে নবাবের লোক না ধরে ফেলত, তবে হয়ত যুদ্ধ বাধতে দেরী হত আরো। খবর এল পাটনার কুঠিয়াল এলিস শহর দখল করেছে। বেশী দিন অবশ্য রাখতে পারেনি দখল করে। হেরে গিয়েছে এলিস। কিন্তু খবর শুনে কাশেম আলি আগুন। প্রতিহিংসার যে আগুনকে সে এতদিন বুকের ভেতর পুষে রেখেছিল, আজ তা হাজার মুখে আকাশের দিকে উঠতে চায়।

অমিয়ট যাচ্ছিল কলকাতায়। কিন্তু বেশীদূর যেতে পারেনি। মুর্শিদাবাদের কাছেই তাকে খুন করা হল।

মীরকাশিম এতদিন এই মুহূর্ত্তের জন্য নিজেকে তৈরী করছিল। তার আত্মহত্যার আয়োজন শেষ হয়েছে। কোম্পানীও প্রতীক্ষা করছিল এই চরম সময়ের। আবার আর একটা যুদ্ধ। হত্যা রক্ত আর লোভের আর একটা যজ্ঞ।

১৯শে জুলাই। পলাশীর উল্টো দিকে কাটোয়ার যুদ্ধে নবাব হেরে গেল। মারা গেল তাকী। তাকী বীর। বীরের মতই প্রাণ দিয়েছে সে। ছড়ার রাজ্যে তাকী অমর।

পড়িল মামুদ তাকী,
দোনের আঁখি ছুঁড়ছে মনের আশ,
তা দেখে সায়ন খাঁ দাঁতে কাটে ঘাস।

চন্দ্রশেখরের মহম্মদ তাকী বিশ্বাসঘাতক। কিন্তু ইতিহাসের তাকী বীর। ২৩শে জুলাই মোতিঝিলের কাছে যুদ্ধে হেরে গিয়ে নবাবের সৈন্য পালিয়ে গেল সুতিতে।

২৫শে আবার সিংহাসনে বসলো মীরজাফর।

বৃদ্ধ মীরজাফর অতীতকে ভুলতে পারেনি। ইংরেজ আর মীরজাফর এবার এক সঙ্গে মীরকাশিমের বিরুদ্ধে। পয়লা আগষ্ট গিরিয়ার যুদ্ধে হেরে গিয়েছে কাশেম আলি। এই গিরিয়ায় হেরে গিয়েছিল সরফরাজ। আলিবর্দীর মসনদ যে অভিশাপ ডেকে নিয়ে এসেছিল, গিরিয়ার মাঠে এই তার শেষ প্রায়শ্চিত্ত। কাশেম আলির সৈন্য আশ্রয় নিল উধুয়ানালার শিবিরে।

রাজমহল পাহাড় থেকে বেড়িয়ে এসেছে উধুয়ানালা। বড় সুরক্ষিত দুর্গ উধুয়ানালা। সামনে গঙ্গা। এক পাশে পীর পাহাড়। পীর পাহাড়ের গা ঘেঁসে আরো ছোট বড় অনেক পাহাড়। গিরিয়া থেকে এসেছে পরাজিত সেনাপতি মার্কার, সমরু, আসাদউল্লা। বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে খুন হয়েছে প্রধান সেনাপতি গার্গিন খাঁ।

১১ই আগষ্ট। ফুদকিপুর গ্রামে তাঁবু গেড়েছে মেজর এডামস। গোল' বৃষ্টি হয়েছে কাশেম আলির দুর্গে। দুর্গ স্থির। সামান্য ক্ষতিও হয়নি। ইংরেজরা এবার অন্য পথ নিয়েছে। ঝিলের পথে এসেছে উধুয়ানালায় ৪ঠা সেপ্টেম্বর। ৫ই সেপ্টেম্বর সকাল বেলা দুর্গ ইংরেজদের। পালিয়ে গিয়েছে কাশেম আলি।

কিন্তু পালানোর আগে চরম হত্যার কলঙ্ক নিয়েছে বিগত নবাব। যারা বন্দী হয়ে এসেছিল মুঙ্গেরে, তারা কেউ ফিরতে পারেনি। প্রত্যেক বন্দীর গলায় বালির থলি বেঁধে মুঙ্গেরের দুর্গপ্রাচীর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে গঙ্গার ভেতর। ভ্যান্সিটার্টকে লিখেছিল কাশেম আলি যে, অহেতুক হত্যা করে সে তার চৈতন্যকে পীড়িত করতে চায় না। কিন্তু কি হেতু ছিল এই হত্যার? কারণ অবশ্য খুঁজে পাওয়া দায়। একি শুধুমাত্র অন্ধ প্রতিহিংসা, অথবা প্রাগৈতিহাসিক আদিমতার একটি জান্তব মানসিক প্রবণতা?

যাই হোক, বহু অখ্যাতের সঙ্গে প্রাণ দিয়েছে বহু বিখ্যাত। আছে সপুত্র রাজা রাজবল্লভ, সপুত্র রায় রায়ান উদিম রায়, টিকারীর জমিদার ফতে সিং ও বুনিয়াদ সিং। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও ছিল বন্দী হয়ে মুঙ্গেরে। কিন্তু ভাগ্য বরাবরই এই ভদ্রলোককে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এবারও বেঁচে গেল। এই সময় মহারাজ পূজোয় বসেছিলেন।

জগৎশেঠ মহাতপ আর মহারাজ স্বরূপ চাঁদ প্রাণ দিয়েছিল এইভাবে। অন্তত এই ত চলতি কথা। সঙ্গে থাকত চাকর চুনী। চুনী বড় প্রিয় ও বিশ্বস্ত। সেও প্রার্থনা করেছে অমনভাবে গলায় বালির বস্তা বেঁধে ফেলে দেওয়া হোক তাকে জগৎশেঠের সঙ্গে। অস্বীকার করেছে ঘাতক। মিনতি করেছে জগৎশেঠ। কিন্তু চুনী অটল। জগৎশেঠ আর মহারাজের মৃত্যুর পর জীবনের কোন অর্থ নেই তার। সে নিজেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে দুর্গের প্রাচীর থেকে। তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

মুতাক্ষরীনের অনুবাদক বলেছেন যে, বছরে কত হাজার হাজার মাঝি মুঙ্গের দুর্গের তলা দিয়ে যায়। কিন্তু তারা কেউ বলতে পারে না, ঠিক কোন্ খান থেকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল জগৎশেঠ আর মহারাজকে। বলতে পারে না, কোন খান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চুনী। স্নানার্থী কত বৃদ্ধা চুনীর সঙ্গে ঘাতকের কথাবার্তা মুখস্ত বলতে পারে। কিন্তু তবু মনে হয় না জগৎশেঠকে এখানে মেরে ফেলা হয়েছিল।

এ কথা মনে করার কারণ আছে যে, বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে সেনাপতি গার্গিন খাঁকে যেদিন হত্যা করা হয়, ঠিক তার পরের দিন পাটনার নিকটে জগৎশেঠ মহাতপ আর মহারাজ স্বরূপ চাঁদকে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিল। মেজর এডামসও এই কথা জানিয়েছে কলকাতায় তার ১৮ই অক্টোবরের চিঠিতে। এডামস বলেছে যে, শেঠদের শব দাহ করতে দেওয়া হয়নি। তাকে ফেলে রাখা হয়েছিল চৌকীদারের পাহারায়।

অনেক টাকা নিয়ে ফেরার হয়েছে মীরকাশিম। আশা তার অমর। সে এখনো বিশ্বাস করে যে, মোগল গৌরব আবার প্রতিষ্ঠিত করা যাবে। খুনের পর খুন করে পথ পরিষ্কার করেছে মীরকাশিম। পাটনার হত্যাকাণ্ড আজো বিমূঢ় বিস্ময়ের উৎস। এটাই বোধ হয় ভাগ্যের বিদ্রূপ দর্পিত উক্তির উত্তর। অকারণ হত্যায় পীড়িত হয়নি কাশেম আলির চৈতন্য।

অযোধ্যায় গিয়েছে কাশেম আলি। অযোধ্যার নবাব আর বাদশা শাহ

আলম কথা দিয়েছিল মীরকাশিমকে সাহায্য করার। অসম্ভবের নেশা পাওয়া মীরকাশিম। অসম্ভবকে দেখেই মারা গেল দিল্লীর এক জীর্ণ কুঠিরে। গায়ের শাল বেচে শেষ কৃত্য করা হয় তার।

পলাশীর পরেই জগৎশেঠ বুঝেছিল সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার সনাতন সিদ্ধ পদ্ধতি যথাযথ কাজ করেনি। ভয়ের ভিতর কেটেছে দিনরাত। প্রহরীর সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। নিরাপত্তা পায়নি। মুর্শিদাবাদের পথে ঘাটে বার হয়েছে কখনও কখনও। দরবারে যাওয়া প্রায় বন্ধ। কিন্তু দু'ভাই কখন এক সঙ্গে বার হয়নি। বাড়ীর ছেলেরা বাইরে যেত ক্বচিৎ কখনও। তীর্থ যাত্রার সময় যেত পরিবারের সবাই। আত্মরক্ষার সব ব্যবস্থাই করেছে জগৎশেঠ। কিন্তু রক্ষা করতে পারেনি। যে গদীকে বাঁচানোর জন্য তাদের এত চেষ্টা, যত্ন, সে গদীও বাঁচেনি।

চলতি কথাই বোধহয় সত্যি। লক্ষ্মী চলে গিয়েছে। হাজার খোঁজাখুঁজি নিষ্ফল। ধনরত্ন কমে আসছে। কারবার ক্রমাগত ছোট হয়ে আসছে। প্রভাব ক্রমাগত ক্ষীণ। যে কোম্পানী একদিন আসত মহিমাপুরে আশ্রয়ের জন্যে, পলাশীর পর সেই মহিমাপুর কোম্পানীর আশ্রয় প্রার্থী। ক্লাইভ নিজে অভয় দিয়েছে।

ক্রাফটন ভাবে কোম্পানী যদি আগেই যুদ্ধে নামত, মান বাঁচত তাদের। যেদিন জগৎশেঠকে বন্দী করা হয়েছিল, সেদিনই যুদ্ধ করলে ভাল হত। তা হলে সে যুদ্ধ হত ন্যায়ের জন্যে যুদ্ধ, চুক্তি রাখার জন্যে যুদ্ধ। কিন্তু যুদ্ধ করেছে তারা ব্যবসার অধিকার নিয়ে, দস্তকের চোরা কারবার নিয়ে। ন্যায়ের দিক থেকে, নীতির দিক থেকে, কোন সমর্থন পাওয়া যাবে না এই যুদ্ধের।

ক্লাইভ ফিরে এসে তিরস্কার করেছিল ভ্যান্সিটার্টকে। ভ্যান্সিটার্ট অক্ষম। রক্ষা করতে পারেনি মহিমাপুর।

কথা রাখা ক্লাইভের গুণ। এই গুণের মধ্যে ইংরেজদের সুনাম অনেক বেড়ে গিয়েছে। ক্লাইভের একটা কথায় সুবার প্রত্যেকটা লোক উঠত, বসত। জগৎশেঠকে রক্ষা করার জন্য সেদিন যদি ইংরেজরা যুদ্ধ করত, তা হলে কেউ যেত না তাদের বিপক্ষে। ইংরেজদের প্রতি থাকত তাদের অগাধ বিশ্বাস। কিন্তু আজ তারা বীতশ্রদ্ধ। ক্রাফটন আত্মগ্লানিতে মর্মাহত।

চৌত্রিশ

পলাশীর পরের সময় আরো জটিল। আলিবর্দীর সময় থেকেই বাইরের চাপে দেশের অর্থনীতি ভেঙে পড়েছিল। কিন্তু চেহারা বোঝা যায়নি। পলাশীর পরে সব যেন ঝাপসা। কিছুই বোঝা যায় না। কিন্তু ধাক্কা বড় সত্য। কোনদিক থেকে যে আঘাত আসবে জানা নেই। কিন্তু আঘাত প্রচণ্ড। শক্তিমান কোন নবাব বোধ হয় বাঁচাতে পারত দেশকে। এই আশা শুধুমাত্র শেঠরাই করেনি। করেছে অনেকে। তারা মনে করেছিল, নিতান্ত বাইরের কারণে, যুদ্ধ বিগ্রহে, অন্তর্দ্বন্দ্বে চুরমার হয়ে যাচ্ছে দেশ।

১৭৫৭, ১৭৬০, আর ১৭৬৩ সালে, তিন ধাক্কায় ফুটো নৌকা ভরা ডুবি হয়ে গেল। জগৎশেঠ মহাতপ আর মহারাজ স্বরূপ চাঁদ গঙ্গায় নিশ্চিন্ত হয়নি। তার সঙ্গে নিশ্চিন্ত হয়েছে বাংলার সমস্ত সম্পদ। লোকে বলে, কুবেরের টাকা টেনে নিয়েছে কুবেরে। যক্ষের ধন ফিরে গিয়েছে যক্ষের কাছে। মাটির জিনিষ ফিরে এসেছে মাটিতে।

তারা বুঝতে পারেনি, যক্ষের ধন গিয়েছে সাগর পাড়ে—সিরাজ যাকে ভাবত, যাযাবরদের আস্তানা। অনেকদূর পথে চোখের অগোচরে পাচার হয়েছে সেই সব ধনরত্ন।

তা ভিন্ন কি করে এত দ্রুত হবে শেঠদের পতন? ওদের উঠতি সময় ১৭০৪ সাল থেকে। গ্রহণ লাগলো ১৭৫৬ সালে। ইতিহাস যদি হয় ন্যায় অন্যায়ের বিচারশালা, যদি হয় পাপ পুণ্যের অডিট অফিস, তবে সান্ত্বনা পাওয়া যাবে এই ভেবে যে, পলাশীর বিশ্বাসঘাতকতার শোধ তুলেছেন ভগবান।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আজকের চেতনা বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার দান। নতুন জাতীয়তা বোধের স্বীকৃতি। ইতিহাস যদি হয় সজ্ঞান ও অজ্ঞান শক্তির সংঘাত, তবে এই পতনকে দুর্বার অজ্ঞান শক্তির জয় বলে স্বীকার করা ছাড়া উপায় নেই। আর ইতিহাস যদি হয় শাসক ও শোষিতের অনির্বাণ সংগ্রাম, শ্রেণী স্বার্থের অমোঘ নিয়ম, তবে জগৎশেঠের এই পতনকে বোধহয় ব্যাখ্যা করা যাবে এই বলে যে, সময়ের সেই সন্ধিক্ষণে মহাতপ ছিল একান্ত একা। নির্ভর করার মত কোন শ্রেণী গড়ে ওঠেনি তখন।

যাই হোক, তিন ধাক্কায় কোম্পানী বাংলার শাসক। নবাব বড়জোর ছায়াবাজীর পুতুল।

মীরজাফরের সঙ্গে সন্ধিতে কোম্পানী নতুন কোন সুযোগ সুবিধে চায়নি। চেয়েছিল সিরাজ যে সুবিধা দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তাকে শুধু কাজে পরিণত করবে নবাব।

কলকাতা জয় করে সিরাজ যে ক্ষতি করেছে, তা পূরণ করেছে মীরজাফর। তাকে দিতে হবে ২,১৫০,০০০ পাউণ্ড। তা ছাড়া আছে উপহারের বহর। পরিমাণ নিতান্ত নগণ্য নয়। সিলেক্ট কমিটির হিসেব মত তার অঙ্ক দাঁড়ায় ১, ২৩৮, ৫৭৫ পাউণ্ড। এর মধ্যে একা ক্লাইভের অংশ ২৩৪,০০০ পাউণ্ড। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৩ সাল অবধি নবাব বসানো নবাব নামানো খেলায় কোম্পানী আর তার কর্মচারীরা পেয়েছিল ক্লাইভের জায়গীর বাদ দিয়ে ৫,২৬৬,১৬৬ পাউণ্ড। এই টাকার অধিকাংশ চলে গিয়েছে বিলেতে—যাযাবরদের দেশে।

দেশ থেকে গেল। কিন্তু প্রতিদানে কিছু এল না। এক হাতে দেওয়া, আর এক হাতে নেওয়া—এই নিয়ে বাণিজ্য। হিসেবে সমান সমান অন্তত রাখতে হবে।

কিন্তু পলাশীর পর বাংলার হিসেবে ক্রমাগত খাকতি। রূপোই ছিল বাংলার সহায়। সেই রূপো যেতে থাকলো বাংলা ছেড়ে। সে যায়নি বিলেতে। গিয়েছে চীনে, কোম্পানীর তবিল হয়ে।

পলাশীর পর কোম্পানীর কর্মচারীরা প্রায় সবাই ছোট নবাব। অগাধ তাদের টাকা। সে টাকা থাকবে না এখানে। চালান যেতে থাকলো বিলেতে। কখনও তারা মণি মুক্তা কিনে পাঠিয়েছে স্বদেশে, কখনও পাঠিয়েছে হুণ্ডিতে। ১৭৮০ সাল অবধি এমন ভাবে টাকা গিয়েছে। হুণ্ডিতে টাকা গিয়েছে আরো বেশী। ডাচ কোম্পানী এই সব হুণ্ডির কারবার করেছে সবচেয়ে বেশী। ১৭৬১ থেকে ১৭৭১ সাল অবধি শুধু কোম্পানীর কাছে হুণ্ডির পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ২,৫৯৮,৯৩১ পাউণ্ড। কিন্তু এর বদলে বাংলা পায়নি এক কড়াক্রান্তি—না পণ্যে, না টাকায়। এছাড়া ডাচ কোম্পানীর কাছে কাটা হুণ্ডির পরিমাণ সঠিক আন্দাজ করা যায় না। অনেকের মতে কোম্পানীর কর্মচারীরা পাঠিয়েছে এক মিলিয়ন পাউণ্ড।

পলাশীর আগে ব্যবসার জন্যে কোম্পানীকে খাটাতে হত ঘরের টাকা। মহিমাপুরের শেঠবাড়ীতে কতবার কত টাকা নিয়েছে কোম্পানী শুধুমাত্র চুক্তিগুলোকে চালু রাখার জন্যে। পলাশীর পরে অন্য অবস্থা। অনেক টাকার মালিক তারা। বাইরের টাকার দরকার নেই। নিজেদেরই আছে উদবৃত্ত। দেশীয় রাজাদের কাছে সেনাবাহিনীর সাহায্য বিক্রি করে তারা লাভ করেছে দশ বছরে ১,১৯০,০০০ পাউণ্ড। এই টাকার পণ্য বাইরে গিয়েছে। তার বদলে বাংলার ঘরে আসেনি এক কড়ি।

১৭৫৭ থেকে ১৭৯৭ অবধি কোম্পানী বিলেত থেকে এক রতিও সোণা আমদানি করেনি। করার দরকার হয়নি। পলাশীর আগে ডাচরা বছরে প্রায় ৩৭ লাখ টাকার রূপো আমদানি করত। সে পথ এখন বন্ধ। কিন্তু রপ্তানি চলছে অন্যান্য উপনিবেশে।

কোম্পানী দেওয়ানী পাওয়ার পর জুলুমের মাত্রা আরো বাড়লো। ১৭৬৬ থেকে ১৭৮০ সাল অবধি বাড়তি রাজস্ব প্রায় দশ মিলিয়ন পাউণ্ড চলে গেল বিলেতে। হিসেবটা মোটামুটি ভাবে দাঁড়ায়:

বিল ইত্যাদি খরিদ বাবদ	(১৭৫৭—১৭৮০)···	২৪,০০০,০০০	পাউণ্ড
কোম্পানী বাবদ	(১৭৫৭—১৭৬৫)···	২,০০০,০০০	,,
চীনে রূপো রপ্তানি বাবদ	(১৭৫৭—১৭৮০)···	২,৪০০,০০০	,,
উদবৃত্ত রাজস্ব বাবদ	(১৭৬৬—১৭৮০)···	১০,০০০,০০০	,,
	মোট	৩৮,৪০০,০০০	পাউণ্ড।

এটাই বাহ্য। এর সঙ্গে যোগ করতে হবে আরো কয়েক কোটি পাউণ্ড বেসরকারী ও বেআইনী রপ্তানি।

কিন্তু এ সময়ের টাকার দাম না বললে দৈন্যের বোঝা আঁচ করা যাবে না।

		১৭২৯ সালে মুর্শিদাবাদে প্রতি টাকায় পাওয়া যেত		১৭৭৬ সালে কলকাতায় প্রতি টাকায় পাওয়া যেত	
		মন	সের	মন	সের
চাল	···	১	১০	০	১৬
,,	···	১	২৩	০	১৮
,,	···	১	৩৫	০	২১
গম	···	৩	০	০	৩২
,,	···	৩	৩০	০	৩৫
তেল	···	৪	৩৫	০	২০
ঘি	···	৩	১০½	০	৩

এই প্রতিদানহীন বাণিজ্যে দেশ ডুবে গেল। কোম্পানীর একচেটে ব্যবসা, কোম্পানীর কর্মচারীর বেনিয়ান গোমস্তার জুলুম, তাঁত শিল্পের ক্রমবর্দ্ধমান ধ্বংসে মানুষ ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে গেল। যে সর্বনাশা অত্যাচার শেষ নবাবী যুগে চলছিল, কোম্পানীর দেওয়ানী পাওয়ার পর, সেই অত্যাচার একান্ত অসহনীয়।

১৭৫৬ সালে এ দেশে কোম্পানী আমদানী করেছিল ২,২৮৩,৮৪৩ পাউণ্ড রূপো। সে আমদানী এখন বন্ধ। এর প্রায় সবটাই উঠত শেঠদের ঘরে। আজ আর ওঠে না। সঞ্চিত রূপো চিরকাল থাকে না। মীরকাশিম যাবার আগে শেঠবাড়ীর সম্ভার চেটেপুটে নিয়ে গিয়েছে। যাওয়ার সময় কাশেম আলি নিয়ে গিয়েছে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা। পারস্য ও লোহিত সাগরের বাণিজ্য থেকে আসত বছরে ১৫০,০০০ পাউণ্ড। সে বাণিজ্যের ধারা প্রায় শুকিয়ে এসেছে। দেশে টাকার হাহাকার। দৈনন্দিন সওদা করার মত সম্বল নেই।

অথচ একদিন ফতেচাঁদ ভারতবর্ষের টাকার দুর্ভিক্ষ ঘুচিয়েছিল একাই। ব্যবসাদাররা আরো বিপন্ন। মাল কিনে দাম দেবার ক্ষমতা নেই। প্রতি মুহূর্তে দেউলে হবার সম্ভাবনা। আবেদনের পর আবেদন আসে কোম্পানীতে। অথচ একদিন এই অবস্থায় কি না করতে পারত মহিমাপুর। আজ তারা কিছুই করতে পারে না। দেশের সাধারণ ব্যবসাদারদের মত তারাও অত্যাচার ভোগ করে। দেশের অর্থনীতি ও রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা তারা হারিয়েছে। হেরে গিয়েছে মহাতপ।

আর কোনদিন কেউ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তাদের আয়ের সব পথ একে একে রুদ্ধ। অসহায়ভাবে মাথা কোটা ছাড়া আর কোন উপায় নেই। যখের ধন গিয়েছে বিলেতে। বিলেতের সঙ্গে বুদ্ধির যুদ্ধে পারেনি তারা। ছোট অংশীদারও তারা নয়। তারা নিতান্ত নোকর। ইংরেজকে বড় বিশ্বাস করত ফতেচাঁদ। মুদ্রানীতি নির্দ্ধারণ করার যে ক্ষমতা তারা এতদিন ভোগ করে নিজেদের সুযোগ সুবিধে পুরোপুরি আদায় করে এসেছে, আজ আর সে ক্ষমতা নেই। তারা নির্দ্ধারক নয়, আজ্ঞাবহ।

বাট্টার কারবার বন্ধ। ১৭৬৮ সালে ১১ই নভেম্বর হুকুম এল ডিরেক্টরের, সিক্কা আর সোনায়ৎ নিয়ে বাট্টার কারবার বন্ধ করে দিতে হবে একেবারে। হুকুম করা আর হুকুম মানা এক জিনিষ নয়। তা ছাড়া দেশ জোড়া যখন টাকার বিভ্রাট। বাট্টা একবারে তাই বন্ধ হয়নি। কিন্তু এই কারবারে

শেঠরা পরে বিশেষ সুবিধা করে উঠতে পারেনি। প্রথমত, বাজারের সুনাম তাদের পড়তির মুখে। দ্বিতীয়ত, অনেক ছোট বাট্টাদার বড় হয়ে গিয়েছে ইতিমধ্যে।

জগৎশেঠ মহাতপ রায় আর মহারাজ স্বরূপ চাঁদের মৃত্যু শেঠবাড়ীর চরম সর্বনাশ।

মহাতপের চার ছেলে : খোসালচাঁদ, গোলাপচাঁদ, সমীরচাঁদ, সুখলালচাঁদ। আর ছিল এক মেয়ে তাকে খুন করেছিল মীরকাশিম। স্বরূপ চাঁদের ছেলে তিনটে : উদায়তচাঁদ, অভয়চাঁদ, মহাচাঁদ।

গদীতে বসেছে মহাতপের ছেলে খোসালচাঁদ আর স্বরূপচাঁদের ছেলে উদায়ত চাঁদ। খোসালচাঁদ ছোট। বয়স তার মাত্র আঠারো বছর। ডুবন্ত নৌকা কিনারে নিয়ে আসতে পারেনি অনভিজ্ঞ খোসালচাঁদ। নতুন অবস্থার সঙ্গে মেলাতে পারেনি নিজেকে। পূর্বপুরুষের রক্তের তেজে ও দাম্ভিকতায় যতটা মনে জোর পাওয়া যায়, বাস্তবে হেরে যেতে হয় ঠিক ততখানি। অবস্থাকে স্বীকার করেই অবস্থাকে পরিবর্তন করতে হয়, এবং পরিবর্তিত হতে হয় সেই সঙ্গে। অভিজ্ঞতার আগুনে পোড় খায়নি খোসালচাঁদ।

পঁয়ত্রিশ

১৭৬৬ সালে বাদশা শাহ আলমের ফর্মান অনুসারে জগৎশেঠ হয়েছে খোসালচাঁদ, আর মহারাজ হয়েছে উদায়তচাঁদ। অন্য সব ভাইরা পদবী পেয়েছে শেঠের। কিন্তু বিপদ তাদের ঘোচেনি।

মীরকাশিম শুধুমাত্র মহিমাপুরের গদী লুটপাট করে সর্বস্বান্ত করেনি শেঠকে। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে গোলাপচাঁদ আর মহাচাঁদকে। মহাতপ আর স্বরূপ চাঁদের মত খুন করেনি এদের দুজনকে। এরা কাশেম আলির জীবন্ত সম্পত্তি। সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছে দুই ভাইকে। অবস্থা খারাপ হলে বন্ধক দেবে শেঠদের দুই ছেলেকে। টাকা আসবে অনেক। কারণ এদের ছাড়িয়ে নিতে শেঠরা কোন কার্পণ্য করবে না। কাশেম আলি ভাল করে জানত বলেই খুন করেনি দুই ভাইকে।

অযোধ্যার নবাব আর বাদশা শাহ্ আলমের হাতে তুলে দিয়েছিল দুই ভাইকে। মীরজাফর নবাব হয়ে চিঠি লিখেছিল অযোধ্যার নবাবকে। মীরজাফর বলেছিল, শেঠবাড়ীর দুই ছেলেকে ফিরিয়ে দিতে। রাজী হয়েছিল নবাব। উত্তর পাঠিয়েছিল, রাজা বেণী বাহাদুর গিয়ে সব ব্যবস্থা করবে।

ঠিক হতে লেগে গেল প্রচুর টাকা। সে সময় শেঠদের এত টাকা এক সঙ্গে বার করার কোন ক্ষমতা নেই। নিজেদের বাসনপত্র গলিয়ে টাকা করা হল। বিক্রি করা হল হীরে জহরৎ। তারপর মুক্তি পেল দুই ভাই। মহিমাপুরের অফুরন্ত ভাণ্ডার শুকিয়ে এসেছে। সূতীর কাছে ভাগীরথীর মুখ বন্ধ করার ক্ষমতা আজ তাদের কাছে শোনা কথা, স্মৃতি মাত্র।

নতুন ভাবে নবাবী পেয়ে বেশীদিন বাঁচেনি মীরজাফর। ১৭৬৫ সালে কুষ্ঠরোগে মীরজাফর মারা গেল কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত মুখে দিয়ে। মরার সময় মহারাজ নন্দকুমার এনে দিয়েছিল সেই চরণামৃত। পাপ স্খালন হয়েছে কিনা জানি না। কিন্তু বাঁচেনি নবাব।

ভ্যান্সিটার্ট তখন বিলেতের পথে। বোম্বাই থেকে স্পেনসার এসে বাংলার ভার নিয়েছে। বিলেত থেকে বাংলার দিকে আবার পা বাড়িয়েছে লর্ড ক্লাইভ।

মীরণের ছেলে ছিল। কিন্তু সে নাবালক। কোম্পানীর কাউন্সিল অগ্রাহ্য করেছে নাবালকের আবেদন। মণিবেগমের ছেলে নজমউদ্দৌলার পক্ষে রায় দিয়েছে তারা। জানত সবাই মণিবেগম জিতবে। কোম্পানীর কর্মচারীরা ঋষি নয়। বরং একটা বিষয়ে সাধারণের চেয়েও বেশী দুর্বলতা আছে তাদের। মণিবেগমের আছে টাকা, আছে রূপ। কাকে পরোয়া করতে যাবে মণিবেগম? হেষ্টিংসের বুকে মাথা রেখে ফিস ফিস করে যদি কোন কথা বলে থাকে মণিবেগম, তাকে ঠেলতে পারে এমন শক্তিধর নয় সে। এমন কি স্বয়ং ক্লাইভও নয়। মণিবেগম অব্যর্থ শিকারী।

নজমউদ্দৌলা মণিবেগমের আদরের ছেলে। মণি তাকে আদর করে ডাকে মীর ফুলুরী। নজমউদ্দৌলা তখনও মণির পেটে। বড় ফুলুরী খেতে হত তখন বেগমের। মণি তাই আদর করে আদরের ছেলের নাম রেখেছে। নবাবের বেগম ছিল। এখন নবাবের মাও হতে হবে তাকে। মণিকে হারাতে পারে না কেউ।

টাকার অভাব নেই মণির। নজমউদ্দৌলার সঙ্গে সন্ধিপত্র রচনা হয়েছে। কাউন্সিলের চার জন এসেছে মুর্শিদাবাদে। হলওয়েল না থাকলেও আছে অভিজ্ঞ জনষ্টোন। নবাব বাদশার রীতিনীতি জানা। নজরাণা দিতে হবে সভ্যদের। টাকা আছে মণিবেগমের। টাকা এনেছে ঢাকা থেকে রেজা খাঁ। সঙ্গে সঙ্গে হিসেব ঠিক হয়ে যায়।

স্পেনসার	...	২০০,০০০
জনষ্টোন	...	২৩৭,০০০
মিডলটন	...	১২২,০০০
লেষ্টার	...	১১২,০০০
তিনজন সদস্য	...	৩০০,০০০
সিডিয়ান জনষ্টোন	...	৬০,০০০

এরপর খুব সঙ্গত কারণেই নবাব হল নজমউদ্দৌলা। দেওয়ান তার রেজা খাঁ। নজমউদ্দৌলা চেয়েছিল দেওয়ান হোক মহারাজা নন্দকুমার। কিন্তু হয়নি। বিফল হল মহারাজা আর দুর্লভরাম।

কোম্পানীর হাত গিয়ে পড়লো মহিমাপুরে। মতিরামের কাছে বলে পাঠালো জনষ্টোন। কোম্পানীকে খুশি করতে হবে। তা হলে তাদের সকল রকম সুযোগ তারা দেবে। খুশি করা ত তাদের রীতি। ক্লাইভকে খুশি করেছিল তাদের বাপ খুড়ো। প্রতিবাদ করার পরও দিতে হয়েছিল সোয়া লাখ টাকা জগৎশেঠ খোসালচাঁদকে। তার মধ্যে নগদ দিতে হয় পঞ্চাশ হাজার। ঠিক হল, বাকি টাকা দেওয়া হবে বাজার থেকে আদায় করার পরে।

অথচ নতুন হুকুম এসেছে মাত্র সেদিন। ১৭৬৫ সালের ২৪শে জানুয়ারী। বিলেত থেকে জানিয়েছে ডিরেক্টরেরা কোম্পানীর কোন কর্মচারী কোন ভারতীয় জমিদার বা রাজার কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে জমি, খাজনা বা উপহার নিতে পারবে না। যদি বা কোন কারণে নেওয়া হয়, তবে তার পরিমান যেন কিছুতেই চার হাজার টাকার বেশী না হয়। কিন্তু কোম্পানীর এই আজ্ঞা একেবারে চেপে গিয়েছে জনষ্টোন।

ক্লাইভ জানিয়েছে বিলেতে যে, এখানে ধনদৌলত করার পথ এত সহজ, প্রশস্ত ও লোভজনক যে, তার মায়া কাটিয়ে ওঠা খুবই দুঃসাধ্য। তাই মীরজাফরের মৃত্যুর পর খুব তাড়াতাড়ি এক সন্ধিপত্র রচনা হয়ে গেল।

পুরানো সর্ত্তগুলোকে নতুন করে লেখা হল। কয়েকটি অপ্রয়োজনীয় সংযোজনও করা হয়েছে। কিন্তু কোন ভাবনা চিন্তা করে সন্ধিপত্র তৈরী করা হয়নি। কোন রকমে পুরানো সন্ধিপত্রকে নতুন কাগজে নতুন কালিতে লিখে জনষ্টোন, মিডলটন আর লেষ্টার ছুটেছেন মুর্শিদাবাদে।

সিংহাসনের আইনসঙ্গত দাবীদার মীরজাফরের নাতিকে ফাঁকি দিয়ে বসানো হল মীরজাফরের ছেলেকে। সিংহাসনের আইনসঙ্গত দাবীদার নাবালক। শুধুমাত্র এই যুক্তিতেই সমস্ত সুবা আসতে পারত কোম্পানীর মুঠোয়। ক্লাইভের মতে সেই সময় এর প্রয়োজন ছিল সব চেয়ে বেশী। কারণ শক্তি সংগঠিত হতে পারত। কোন পরাক্রান্ত আক্রমণে সর্বস্ব হারানোর দুঃস্বপ্ন দেখতে হত না আর। কিন্তু কোম্পানীর স্বার্থের চেয়ে নিজেদের স্বার্থ বড় হয়ে উঠলো। নতুন সন্ধিতে কোম্পানী পেল না এক পয়সা। অথচ রাজকোষ ধুয়ে নিয়ে গেল কোম্পানীর কর্মচারীরা।

১৭৬৫ সালের ৩রা মে ক্লাইভ পৌঁছালো কলকাতায়। ৬ই মে কাউন্সিলের সভা ডাকলো লর্ড। পড়া হল বিলেতের নির্দেশনামা এবং সেই নির্দেশনামাকে কার্যকরী করার জন্য ডিরেক্টরের ক্ষমতা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক কিছু হতেই, অনেকে বোধ করলো যে এখন আর ভ্যান্সিটার্ট গভর্নর নয়। নতুন গভর্নরের নাম লর্ড ক্লাইভ। লেষ্টার বললে যে, সে এ বিষয়ে আর কোন তর্ক তুলবে না। শুধুমাত্র তার প্রতিবাদ জানিয়ে রাখবে। জনষ্টোন বলেছিল যে, ডিরেক্টরদের কথার ওপর কথা বলার সাহস নেই তার। মুখ চুণ করে কাউন্সিল নির্দেশনামা মেনে নিল। ক্লাইভকে সাহায্য করার জন্য তৈরী হল সিলেক্ট কমিটি।

ত্রাণকর্তা ক্লাইভ আবার এসেছে। নতুন নবাব এল কলকাতায় ক্লাইভকে সেলাম জানাতে। ভাগ্য ঘুরে গিয়েছে। আগে নতুন কুঠিয়াল যেত দরবারে উপহার নিয়ে মুবারক জানাতে। এখন নবাবকেই যেতে হয়।

ক্লাইভের দরবারে নালিশ জানিয়েছে নজমউদ্দৌলা। তীব্র ও তীক্ষ্ণ আক্ষেপ করেছে নবাব। বলেছে যে, সন্ধির সময় তার রাজকোষ থেকে বার করতে হয়েছে প্রায় বিশ লাখ টাকা। কিন্তু এই টাকা যে কি হল, আর কোম্পানীর কোন কাজে যে লাগলো তা জানে না নবাব।

নবাবের এমন প্রকাশ্য ও তীব্র অভিযোগ হজম করতে পারেনি লর্ড সাহেব। কিংবা হজম করতে চায়নি। হয়ত ক্লাইভ নিজেই ছিল এই

সুযোগের সন্ধানে। ঘটনা আগাগোড়া অনুসন্ধান করার দায় পড়লো সিলেক্ট কমিটির ওপর। অভিযোগ লিখিতভাবে দিয়েছে নবাব।

১লা জুন সিলেক্ট কমিটির প্রথম সভা বসলো। প্রথমেই নবাবের চিঠি নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত। সিলেক্ট কমিটি ঠিক করেছে, রেজা খাঁকে ডেকে পাঠাতে হবে। প্রায় বিশ লাখ টাকা খরচ হয়েছে রেজা খাঁর হাত দিয়ে। কমিটিকে খুঁজে বার করতে হবে কে কে সেই টাকা নিয়েছে এবং সেই টাকা নেওয়ার পিছনে কিবা তাদের উদ্দেশ্য। কমিটিকে উপায় বার করতে হবে, কি করে এই ঘুষ নেওয়া বন্ধ করা যায়। অথচ মজার ব্যাপার এই যে প্রাপ্ত উপহারের পরিমাণে কর্ণেল ক্লাইভ তখনও স্মরণীয়। যাই হোক, লর্ড ক্লাইভের নেতৃত্বে সিলেক্ট কমিটি খুবই তৎপর।

৬ই জুন নবাবের নতুন দেওয়ান মহম্মদ রেজা খাঁ দাঁড়ালো সিলেক্ট কমিটির আদালতে। ক্লাইভের ভাষায় রেজা খাঁর কাহিনী খুবই বিস্ময়কর। হিসেব দিয়েছে মহম্মদ রেজা খাঁ বিশ লাখ টাকার। খুঁটিনাটি সব বলেছে খাঁ সাহেব। কবে কোথায় কাকে কি কি ভাবে টাকা দিয়েছে তাও বাদ যায়নি বিবরণ থেকে। এত নিখুঁত ও পাকা হিসেব উপেক্ষা করতে পারা যায় না। পারেওনি সিলেক্ট কমিটি।

এই সময় টাকা দিতে হয়েছে জগৎশেঠকে। জগৎশেঠ খোসালচাঁদ টাকা দিয়েছে মতিরামের হাত দিয়ে। মতিরামকে লাগিয়েছিল জনষ্টোন। ক্লাইভ সব ব্যাপার জানাতে থাকলো বিলেতে।˙

সাক্ষী দিতে এল জগৎশেঠ খোসালচাঁদ। তারও একই অভিযোগ। কোম্পানীর চার জন তার কাছ থেকে অন্যায়ভাবে টাকা আদায় করে নিয়েছে। এক এক করে সমস্ত বিবরণ দিয়ে যায় খোসালচাঁদ। সে এসেছে বিচার চাইতে। এত জঘন্য ব্যাপারকে এত প্রকাশ্যে আলোচনা করতে বাধছিল অশিক্ষিত ইংরেজদের ভদ্রতায়। বাধা দিয়ে বলেছিল ক্লাইভ, 'অন্য কথা বলো।'

রুখে উঠেছিল খোসালচাঁদ। উত্তর দিয়েছিল, 'তার কথা মিথ্যা প্রমাণ হলে, এক কোটি টাকা জরিমানা দেবে।'

জগৎশেঠ খোসালচাঁদ অভিযোগ করেছে, যখন জনষ্টোন প্রমুখ চার ব্যক্তি কোম্পানীর তরফ থেকে সুবাদার ঠিক করতে মুর্শিদাবাদ যান, তখন মতিরামের মারফৎ তাকে বলে পাঠানো হয়, আমাদের কিছু নজরাণা দাও। আমরা তোমার ব্যবসাকে পাকা করে দেব। তুমি প্রাণ খুলে কারবার

করতে পারবে তখন। আমাদের খুশি করতে না পারলে তোমাদের সমূহ ক্ষতি হবে। তোমাদের পূর্বপুরুষ লর্ড ক্লাইভ এবং আরো কয়েকজনকে এমনভাবে খুশি করেছেন।

আমি তার উত্তরে বলে পাঠালাম, লর্ড ক্লাইভ কোনদিন এ বিষয়ে একটা কথাও বলেননি। আমরাও তাকে কোনদিন এক কড়িও নজরাণা হিসেবে দিইনি।

উত্তরে আমাকে বলে পাঠানো হল, তুমি এ সব ব্যাপার কিছু জানো না। তোমার বাবা আমাদের প্রায় পাঁচ লাখ টাকা নজরাণা দিয়েছে।

আমি তখন জানালাম, আমাদের পূর্বপুরুষ কোনদিন লর্ড ক্লাইভকে এক তামার দাম অবধি দেয়নি।

পরের বার আমার কাছে খবর পাঠানো হল, যদি তুমি খুশিমত ব্যবসা চালাতে চাও, তবে আর কথা না বাড়িয়ে নজরাণা পাঠাও।

আমার আর কোন পথ থাকলো না। বাধ্য হয়ে আমি ১২৫,০০০ টাকা দিতে রাজী হলাম। আমি বললাম যে, এখুনি আমি পঞ্চাশ হাজার নগদ টাকা দেবো। তারপর বাজার থেকে টাকা আদায় করে বাকিটা শোধ করব। সাহেবরা রাজী হলেন। আমি পঞ্চাশ হাজার টাকা পাঠালাম আমার মুৎসুদ্দি ও মতিরামের মারফৎ। জনষ্টোন সাহেবরা কলকাতায় চলে এলেন। এখনও অবধি বাজার থেকে আমি কোন পাওনা আদায় করতে পারিনি। তাই আর টাকা দেওয়া হয়নি। ইতিমধ্যে শুনলাম, লর্ড ক্লাইভ এসেছেন কলকাতায়। তাকে নমস্কার জানাতে আমিও এলাম। ব্যাপারটা এখানেই এখন মুলতুবী আছে। এ বিষয়ে অনুসন্ধান হচ্ছে। আমিও আমার বিবরণ লিখিতভাবে দিলাম। আমার উক্তির প্রতিটি অক্ষর সত্য।

জগৎশেঠের লিখিত অভিযোগ পেশ করা হয়েছে ৫ই জুন। ৭ই তারিখে ডাক পড়লো মতিরামের। মতিরাম তখন জগাটীর শাসনকর্তা। রেজা খাঁ ও জগৎশেঠের সামনে দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিতে হবে তাকে। সত্য বার করতে হবে সিলেক্ট কমিটিকে। দেখতে হবে কোম্পানীর কর্মচারীরা এক্ষেত্রে সত্যি সত্যি টাকা নিয়েছে, না জগৎশেঠ শুধু শুধু অপবাদ দিচ্ছে তাদের।

কমিটির সামনে হাজির হল মতিরাম। দীর্ঘ তার জবানবন্দী।

কূট প্রশ্ন কমিটির। একদিনে শেষ হল না। থাকতে হল তাকে পরের দিনও।

'তুমি কি জগৎশেঠের কাছে টাকার দাবী নিয়ে গিয়েছিলে?'

'গিয়েছিলাম।'

'কে তোমাকে জগৎশেঠের কাছে পাঠিয়েছিল?'

'মহম্মদ রেজা খাঁ আমার কাছে ইসমাইল আলি খাঁকে পাঠিয়েছিল। আমরা দু'জনে গিয়েছিলাম জগৎশেঠের কাছে।'

'মহম্মদ রেজা খাঁর কাছে পাঠিয়েছিল কে?'

'মিষ্টার জনষ্টোন।'

'মিষ্টার জনষ্টোন কি কথা বলে পাঠিয়েছিল মহম্মদ রেজা খাঁকে?'

'জগৎশেঠের কাছ থেকে উপঢৌকন আদায় করার জন্য।'

'আর অন্য কেউ কি এই কথা বলতে বলেছিল মহম্মদ রেজা খাঁকে?'

'মিষ্টার জনষ্টোনই হুকুম করেছিলেন।'

'মিষ্টার জনষ্টোন কি নিজের বলে পাঠিয়েছিল, না কোম্পানীর প্রতিনিধি হিসেবে এই আদেশ দিয়েছিল?'

'মিষ্টার জনষ্টোন নিজের নামেই আমাকে পাঠিয়েছিলেন। তবে তার সঙ্গে গিডিয়ান, লেষ্টার ও মিডলটনের নাম যোগ করতে বলেছিলেন।'

'বেশ, তুমি মহম্মদ রেজা খাঁর কাছে গেলে। তারপর কি হল? তুমি কি তাকে শেঠদের কাছ থেকে টাকা আদায় করে দিতে বলেছিলে?'

'আমি তাই বলেছিলাম। আমি তিন লাখ টাকা চেয়েছিলাম।'

'তুমি কোন্‌দিন মহম্মদ রেজা খাঁর কাছে গিয়েছিলে?'

'আজ আমার সঠিক স্মরণ নেই। তবে যতদূর মনে পড়ে নতুন নবাব হবার দিন কুড়ি পরে গিয়েছিলাম।'

'কোন এক বিশেষ তারিখও কি তুমি মনে করতে পার না?'

'না। তবে মনে হয় রমজান মাসের একুশে হবে।'

'তুমি বললে জগৎশেঠের কাছ থেকে তিন লাখ টাকা আদায় করে দিতে। কি উত্তর দিল মহম্মদ রেজা খাঁ?'

'আমাকে খাঁ সাহেব বললেন, বেশ, আদায় করে দেবার চেষ্টা করব। তারপর আমাকে উদ্দেশ করে বললেন, শেঠদের কাছ থেকে টাকা না চাওয়াই ভাল। এতে আমার বদনাম হবে।'

'জগৎশেঠের চিঠিতে যে ঘটনা বলা আছে তা কি সত্য?'

'সত্য।'

'তুমি কি মহম্মদ রেজা খাঁকে বলেছিলে যে টাকা না দিলে তাদের কারবার বন্ধ হয়ে যাবে?'

'আমি বলেছিলাম যে কোম্পানীর সাহেবদের উপহার দিলে তাদের ব্যবসা চলবে। উপহার দিতে অস্বীকার করলে, তারা কোম্পানীর কোন সাহায্য এবং নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি পাবে না।'

'তুমি বলেছ যে তোমার সঙ্গে গিয়েছিল ইসমাইল আলি খাঁ। তারপর কি হল?'

'যখন ইসমাইল আলি খাঁ তিন লাখ টাকা দাবী করেছিল, তখন জগৎশেঠ বললে, যদি কোম্পানীর সাহেবরা আংটি আর মুক্তো নিতে রাজী থাকেন, তবে দিতে পারি। তার দাম হবে কুড়ি থেকে পঁচিশ হাজার টাকা। কিন্তু ইসমাইল আলি খাঁ তাকে খুব জোর জবরদস্তি করতে থাকলো। তখন জগৎশেঠ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে রাজী হয়েছিল। কিন্তু রাজী হয়নি ইসমাইল আলি। তখন জগৎশেঠ উত্তর দিয়েছিল, বেশ তা হলে আমি নিজে মহম্মদ রেজা খাঁর সঙ্গে কথা বলবো।'

'এই কথাবার্তার সময় কে কে উপস্থিত ছিল?'

'আমি ছিলাম, কিন্তু কোন কথা বলিনি।'

'ব্যাপারটার নিষ্পত্তি হয়েছিল কি করে? তুমি কি কিছু জান?'

'জানি। আমি মহম্মদ রেজা খাঁর কাছে শুনেছি যে, জগৎশেঠ প্রথমে পঁচাত্তর হাজার, পরে এক লাখ, তারপরে এক লাখ পঁচিশ হাজার টাকা অবধি দিতে রাজী হয়েছিল।'

জগৎশেঠ তখন সেখানে হাজির।

তাকে প্রশ্ন করলে কমিটি, 'এই চিঠিতে যে সব কথা লিখেছেন, তা কি আগে অন্য কাউকে জানিয়েছেন?'

'জানিয়েছি। আমার ভাই, আমার মুৎসুদ্দি আর উকীলকে বলেছি।'

তখন জিজ্ঞাসা করা হল জনষ্টোনকে।

'তুমি শেঠদের কাছ থেকে টাকা চেয়েছিলে নিজের নামে, না তোমাদের নামে?'

উত্তর দিল জনষ্টোন, 'আমাদের নামে ত বটেই। আর আমাদের যারা পাঠিয়েছিল তাদের নামেও।'

আবার প্রশ্ন করা হল মতিরামকে।

'জগৎশেঠ টাকা পাঠিয়েছিল মহম্মদ রেজা খাঁর বাড়ীতে। রেজা খাঁ তখুনি সেই টাকা পাঠিয়েছিল মিষ্টার জনষ্টোনের কাছে। তিনি তখন মোতিঝিলে ছিলেন। মিষ্টার জনষ্টোন কি রেগে গিয়েছিলেন তখন?'

'মোতিঝিলে টাকা পাঠানোর জন্য রেগে গিয়েছিলেন জনষ্টোন সাহেব। তিনি বলেছিলেন, কেন এই টাকা মতিরামের হাত দিয়ে পাঠানো হয়নি? কেন আরো গোপনভাবে পাঠানো হল না?'

'জগৎশেঠ বলেছেন যে তুমি তার কাছে তিনবার গিয়েছ। একবার যখন তিনি একা ছিলেন। দ্বিতীয়বার উপস্থিত ছিলেন মহম্মদ ইসমাইল আলি খাঁ। তৃতীয়বারে উপস্থিত ছিলেন জগৎশেঠের ভাই। এ কথা কি সত্য?'

'সত্য। আমি তিনবারই গিয়েছিলাম।'

'এই সময় টাকা কড়ির ব্যাপারে কোন কথা হয়েছিল?'

'হয়েছিল। আমি যখন প্রথমবার যাই জগৎশেঠ পঁচাত্তর হাজার টাকা দিতে রাজী ছিলেন। তিনি আমাকে তার অবস্থার কথা জানাতে অনুরোধ করেছিলেন।'

'তুমি মহম্মদ রেজা খাঁকে বলেছিলে যে, যদি শেঠরা টাকা দেয়, তবে তাদের কারবার রক্ষা করা যাবে। যদি না দেয়, তবে কারবার থাকবে না। এই কথা কি তুমি নিজের খুশিমত বলেছিলে, না তোমাকে বলার জন্য হুকুম করা হয়েছিল?'

'মিষ্টার জনষ্টোন আমাকে এই কথা বলার জন্য আদেশ দিয়েছিলেন।'

'তুমি যে সাক্ষ্য দিয়েছ, তা কি তোমার বুদ্ধি বিবেচনাসম্মত সত্য?'

'সত্য। আমি এর একটা বর্ণও ভুলে নিতে ইচ্ছুক নই। তবে আমার আগের কথার সঙ্গে কোন বিরোধ থাকতে পারে। আমাকে যে অবস্থায় কমিটির সামনে দাঁড় করানো হয়েছে, তার জন্য আমি একটু বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলাম।'

১৮ই তারিখে মতিরামকে আবার দাঁড়াতে হল কাউন্সিলের কাছে। গত দুদিনের সাক্ষ্য তাকে পড়ে শোনানো হল। মতিরাম কোন প্রতিবাদ করেনি। কয়েক জায়গায় একটু ভুল বোঝার অবকাশ ছিল বলেই সংশোধন করতে অনুরোধ জানিয়েছে সে।

ক্লাইভ কাগজপত্র পাঠিয়ে দিয়েছে বিলেতে। আগের কোম্পানী আর নেই। ভারতবর্ষের হাল চাল নিয়ে নানা কথা বলাবলি আরম্ভ হয়েছে। বিরুদ্ধ শক্তি খুবই প্রবল সেখানে। লর্ড ক্লাইভও একটু বিচলিত। জায়গীরের সত্ব তার যায় যায়।

কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীরা কুণ্ঠিত নয় বিন্দুমাত্র। তারা টাকা নিয়েছে। অকুণ্ঠিত ভাবে স্বীকার করেছে তাও। টাকা নেওয়া তাদের পক্ষে কোন অপরাধ নয়। তাদের লজ্জিত হবার কোন কারণ নেই। যারা টাকা দিতে এসেছে, লজ্জা তাদেরই পাওয়া উচিত।

তারা টাকা জোর করে আদায় করে নেয়নি। টাকা দিয়েছে এ দেশের অসমর্থ নবাব, অপারগ ব্যাঙ্কার তাদের দক্ষতায় উপকৃত হয়ে। এই টাকা উপহার, কৃতজ্ঞতা ও বন্ধুত্বের প্রতীক। তারা জোর করে নেয়নি।

কিন্তু জনষ্টোনদের কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করতে পারেনি কমিটি। তারা বলেছে যে, জগৎশেঠের কাছ থেকে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা আদায় করা হয়েছিল ভয় দেখিয়ে। এত বড় ভয়ের সামনে না দিয়ে থাকতে পারে না কেউ। পর পর তাদের কতগুলো বিপদ ঘটে গিয়েছে। এই বিপদ থেকে যে কোন পরিণত অভিজ্ঞ মানুষের পক্ষে সামলে ওঠা কষ্টকর। জগৎশেঠ খোসালচাঁদ তখন নাবালক। বয়স তার মাত্র আঠারো।

উপকার ও কৃতজ্ঞতার প্রতীক হিসাবে উপহার দেবার দিন চলে গিয়েছে তাদের। নবাব বাদশার বন্দীত্ব থেকে ভাইকে ছাড়িয়ে আনতে তাদের রূপোর বাসন গলিয়ে টাকা করতে হয়েছে। পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বিক্রি করতে হয়েছে মণিমুক্তো। এই কল্পনাতীত ও অবিশ্বাস্য ব্যাপারগুলো ঘটে গিয়েছে মাত্র কয়েকদিন আগে। শেঠবাড়ীর এই অপমান স্বীকার করতে হয়েছে খোসালচাঁদকে। আঠারো বছরের নাবালক জগৎশেঠ। রক্তে তার অতীত দিনের স্মৃতি। মাথা নীচু করা তার কাছে মৃত্যুর সমান। তবু মাথা নীচু তাকে করতেই হয়েছে। উপহার দেবার দিন তাদের এখন নয় নিশ্চয়ই। উপহার দিতেও চায়নি। আজো অবধি তাদের বংশের কেউ কোনদিন কাউকে এমন টাকার তোড়া উপহার দেয়নি।

লেষ্টার উপহার ফেরৎ পাঠিয়েছিল খোসালচাঁদকে। লেষ্টার জানিয়েছে যে, যখন উপহার খুশি মনে তাকে দেওয়া হয়নি, তখন সেটা আর উপহার থাকে না। ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেওয়া কোন জিনিষ তার কাছে গ্রহণীয় নয়। সুতরাং সে ফেরৎ পাঠিয়েছে তার ভাগ।

বিপদে পড়েছে খোসালচাঁদ। এই টাকা আবার সে কি করেই বা ঘরে তুলে রাখে। বিপদের কথা কিছু বলা যায় না। ভয় দেখিয়েছে কোম্পানীর বড় সাহেবরা। কোম্পানীর ওপর ভরসা করে থাকা। তারা যদি রাখে থাকবে। না রাখে ডুববে। কোম্পানীর অনুগ্রহ ছাড়া নিরাপত্তা নেই। একা ক্লাইভের ওপর ভরসা করে কি থাকা যায়? ক্লাইভ যদি আবার চলে যায়। কোথায় দাঁড়াবে খোসালচাঁদ। ক্লাইভ চলে গিয়েছিল বলেই ত হলওয়েল অমন ভয় দেখাতে পেরেছিল তার বাবাকে। ক্লাইভ ছিল না বলেই ত মীরকাশিম তাদের এমন সর্বনাশ করতে পারলো। বড় সমস্যায় পড়ে খোসালচাঁদ।

জেনারেল কারনাক তখন মুর্শিদাবাদে। খোসালচাঁদ গিয়ে পড়লো কারনাকের কাছে। বুদ্ধি চায়। ইংরেজ জাত। ভাইয়ের মন বোঝে ভাল। ওদের কূটবুদ্ধি খোসালচাঁদের মাথায় ঢোকে না। ভদ্রতা ও বিনয়ের নীচে ভীষণ শত্রুতা ও আক্রোশ ওরা চেপে রাখতে জানে ভাল করে। ভাল করে বোঝা যায় কার্যকালে। কালাচ সাপের বিষের মত আস্তে আস্তে ওঠে। ওঝার অসাধ্য। খোসালচাঁদ বড় ভয় পেয়ে পরামর্শ চায় জেনারেলের।

সময় ভাল হলে এত বিপদের ঝুঁকি নিত না জগৎশেঠ। কিন্তু এখন তাদের টাকার বড় দরকার। লেষ্টার যদি টাকাগুলো ফেরৎ দেয় এবং ফেরৎ নিলে যদি কোন বিপদ না হয় তাদের, তবে খুব উপকার হয়।

জেনারেল বলেছিল যে, যদি সে সত্যি অনিচ্ছাক্রমে টাকা দিয়ে থাকে, তবে লেষ্টারের ফেরৎ টাকা হাসিমুখে ঘরে তোলা উচিত। কিন্তু যদি সে ইচ্ছাকৃত ভাবে এই উপহার দিয়ে থাকে, তবে লেষ্টারের অভিমান ভাঙানো দরকার। তাকে এই উপহার নিতে অনুরোধ করা দরকার।

কিন্তু হাসিমুখে টাকা দিতে পারেনি জগৎশেঠ। ফেরৎ নিয়েছে লেষ্টারের টাকা। জিজ্ঞাসা করেছে জেনারেলকে, আর কেউ টাকা ফেরৎ দেবে নাকি?

কমিটি রায় দিয়েছে যে, ভয় দেখানো হয়েছিল। জোর জবরদস্তি ছিল। কিন্তু তার সব দায়িত্ব জনষ্টোনের। জনষ্টোনই হচ্ছে এই কলঙ্কের নায়ক। সে-ই উপহার আদায় করেছে নবাব আর জগৎশেঠের কাছ থেকে। লুটের মালের ভাগ বাঁটোয়ারা করেছে সে-ই।

জনষ্টোনইবা ছেড়ে কথা বলবে কেন? সে সোজা উত্তর দিয়েছে, 'আমি

অনুমাত্র আমাদের লর্ড ক্লাইভের অনুকরণ করেছি। লর্ডই আমাদের পথ প্রদর্শক। মৃত নবাবের বদান্যতা তাঁর সৌভাগ্যের পথ সহজ করে দিয়েছে। তবু তিনি জগৎশেঠের মারফৎ তিন লাখ টাকার জায়গীর প্রার্থনা করেছিলেন।' আশ্চর্যের বিষয় এদেশে থাকার একমাত্র কারণ তাঁর শুধু কোম্পানীর উপকার করা। জগৎশেঠের মারফৎ জায়গীর প্রার্থনা করার কথা একবারও অস্বীকার করেননি লর্ড সাহেব। নবাবের আয় তখন মোটেই ভাল নয়। অবশ্য এখনও ভাল নয়। কোম্পানীর দেনা এখনো শোধ করতে পারেনি। অথচ ক্লাইভের উপহার ঘরে উঠেছে বহুদিন আগেই।

জনষ্টোন শুধু গায়ের জ্বালা মিটিয়েছে। কোম্পানীর চাকরি তার থাকলো না। লেষ্টার ছাড়া আর কারো অবশ্য শুভবুদ্ধি হয়নি।

২৫শে জুন ক্লাইভ এল মুর্শিদাবাদে। কোম্পানীর হাল ফেরাতে হবে। নাবালক নবাবকে ঠিক করে যেতে হবে।

ক্লাইভের ব্যবস্থা পাকা। আজ আর কারো কাছে গোপন করার নেই যে, দেশরক্ষার ভার নিয়েছে কোম্পানী। সুতরাং সৈন্য রাখার কোন দরকার নেই নবাবের। মীরজাফরের আমলে বেশ কিছুটা সৈন্য ছাঁটাই হয়ে গিয়েছে। এখন ক্লাইভ ব্যবস্থা করলো যে তিন সুবার যা রাজস্ব উঠবে তার সবটাই নিয়ে নেবে কোম্পানী। কারণ নবাবের কাছে এখনো অনেক পাওনা তাদের। চিরকাল পাওনা ফেলে রাখা যায় না। আদায় করার জন্য কড়া ব্যবস্থা করা দরকার। তাই সব রাজস্ব আসুক কোম্পানীর ঘরে। কোম্পানী সেই রাজস্ব থেকে বছরে ৫৩ লাখ টাকা দেবে নবাবকে। এই টাকা থেকে নবাব দরবার আর বিচার বিভাগের খরচা চালাবে। অন্য বিভাগ নিয়ে ভাবতে হবে না তাকে। সব ভার এখন কোম্পানীর।

এই ব্যবস্থায় খুশি হয়েছিল নবাব। ক্লাইভ উঠে যেতেই বলে উঠলো, 'খোদাতাল্লার ফরজ। এবার এত টাকা আমার হাতে। হারেম আমার ভরে উঠবে।'

নতুন নবাবের মন্ত্রী এবার তিনজন। রেজা খাঁ,—নাবালক নবাবের দায়িত্ব তার ওপর। সে এখন নায়েব-নাজিম। দেওয়ান হল মহারাজা দুর্লভরাম। আর ব্যবসা বাণিজ্যের ভার পড়লো, জগৎশেঠ খোসালচাঁদ আর মহারাজা উদায়তচাঁদের ওপর।

প্রত্যেক মন্ত্রীর কাজ ও দায়িত্ব বাঁধা। কেউ কাউকে যেন ছাড়িয়ে না যেতে পারে। ক্লাইভ ভাল করে জানে, রেজা খাঁর সঙ্গে আছে মহারাজা দুর্লভরামের শত্রুতা। ঠিক হল যে, খাজাঞ্চিখানায় তালা থাকবে তিনটে। তিন তালার তিন চাবি থাকবে তিনজনের কাছে। কেউ কাউকে না জানিয়ে খাজাঞ্চি খুলতে পারবে না তা হলে। আর যদি দু জনের মতের বিরুদ্ধে তৃতীয় জন কোন কাজ করে, তখুনি তা জানাবে কলকাতায় গভর্ণরের কাছে। গভর্ণর কাউন্সিলের পরামর্শ নিয়ে যথাযথ নির্দেশ দেবে। এবং তাই-ই পালন করতে হবে।

মন্ত্রীদের মাইনেও বেঁধে দেওয়া হবে। রেজা খাঁ পাবে বছরে ন' লাখ টাকা। মহারাজা দুর্লভরামের আর জগৎশেঠের মাইনের অঙ্ক জানা যায় না। জেনারেল কারনাক শেঠদের হিতাকাঙ্ক্ষী। জেনারেলের মত এ বিষয়ে খুব সহজ। জেনারেল বলে যে, জগৎশেঠরা এই নতুন চাকরীতে খুব খুশি হয়নি। তাদের কোন উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই। যাই হোক, তিনজনের ওপর চোখ রাখার জন্যে মুর্শিদাবাদে থাকলো সাইক সাহেব।

১৭৬৫ সালের ১২ই আগষ্ট সম্রাট শাহ আলম আনুষ্ঠানিক ভাবে কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির কথা ঘোষণা করলো। এই দেওয়ানী পাওয়ার জন্য কোম্পানী বাদশাকে দেবে ২৬ লাখ টাকা। অর্থাৎ বাদশার ২৬ লাখ, নাজিমের ৫৩ লাখ টাকা ছাড়া আর সব টাকা আসবে কোম্পানীর ঘরে।

অবস্থা ফিরলো না জগৎশেঠের। দেওয়ানীর ভার কোম্পানী তুলে নিতেই মুর্শিদাবাদ নিষ্প্রভ। মুর্শিদকুলির সময় থেকে মহিমাপুরে পুণ্যাহের রেওয়াজ। এতদিনের প্রথা উঠে গেল। জমিদারদের সঙ্গে টাকার সম্পর্ক উবে গেল। দিনে দিনে ফুলতে থাকলো কলকাতা। আয়ের আর একটা পথ এবার বন্ধ।

১০ই মে তারিখে জগৎশেঠ খোসালচাঁদ আবেদন জানালো লর্ড ক্লাইভের কাছে। 'আমি কি বলব? কি লিখব? কি করলে আমাদের করুণ অবস্থা আপনাকে জানানো যাবে? অত্যাচারী মীরকাশিম অকারণে আমার বাবাকে এখান থেকে নিয়ে গিয়েছে অসম্মান করে। তার ওপর এমন অকথ্য অত্যাচার ও নিপীড়ন করেছে, যা ভাষায় বলা যায় না। কেউ চিন্তাও করতে পারে না। তাকে অন্যায় ভাবে হত্যা করেছে। আমাদের সমস্ত সঞ্চয় লুট করেছে। যাওয়ার সময় নিয়ে গিয়েছে আমার ভাই শেঠ গোলাপচাঁদ ও মহাচাঁদকে বন্দী হিসেবে। অনেক টাকার লোভে বাদশার মুৎসুদ্দির কাছে

তাদের জিম্মা রেখেছে। তারা বন্দী হয়ে অকথ্য অত্যাচার সহ্য করেছে। তারপরে অনেক টাকার বিনিময়ে তাদের মুক্ত করে আনা হয়েছে। এত টাকা না থাকায় কিছু মণিমুক্তো বিক্রি করে, বাঁধা রেখে, ধার করে টাকার যোগাড় করতে হয়েছে। আমাদের নিত্য ব্যবহার্য্য বাসনপত্র গলিয়েও টাকা করতে হয়েছে শুধু এইজন্যই। আমরা এখন বিপদাপন্ন। অবশিষ্ট টাকা কি করে যোগাড় করব জানি না।'

তারপরে ক্লাইভের সঙ্গে চিঠিপত্র বিনিময় হয়ে থাকতে পারে। খোসালচাঁদ ভেবে থাকবে, ক্লাইভের কাছে খুব দীন ও নম্র ভাবে থাকলে বোধহয় বিপদ থেকে অক্ষতভাবে নিষ্কৃতি পেতে পারবে। নিজের কারবারকে আবার বড় করার মত অবস্থা আর নেই। সুদখোর ও বাট্টাদার হয়ে কোন মতে অস্তিত্ব বজায় রাখা যায়। কোন মতে টিকে থাকা যায় আরো বহু স ফদের মত। কিন্তু মহিমাপুরের গৌরব ফিরিয়ে আনা যায় না।

শুধু পরগাছার মত ভর করে থাকা ছাড়া কোন গতি নেই। খোসালচাঁদ বোধ হয় অবস্থা অনুযায়ী নিজেকে তৈরী করতে চাইছিল। অবস্থা অনুযায়ী নিজেদের তৈরী করতে পারেনি মহাতপ রায়। ব্যবসাদার হয়ে ব্যবসার প্রয়োজনে যে রাজনীতির ঘুর্ণির ভেতর গিয়ে পড়েছিল, তা থেকে মুক্তি পেতে পারেনি ওরা। শেঠদের অবস্থা তাই আজ নিতান্ত করুণ।

২৪শে নভেম্বর ক্লাইভ খুব কঠোর ভাষায় চিঠি লিখলো খোসালচাঁদকে:

'আপনি জানেন, আপনার বাবাকে আমি কি চোখে দেখতাম এবং কেমন ভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করে এসেছি। আমি আপনার এবং আপনার পরিবারের সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী। কিন্তু দুঃখের বিষয় আপনি নিজের মান নিজেই রাখতে জানেন না। সাধারণের প্রতি আপনার কর্তব্য সম্পর্কে চিন্তাও করেন না। আমার ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজকোষের অর্থ তিনটে চাবির দ্বারা রক্ষা করা হয় না। সমস্ত অর্থ জমা হয় আপনার কাছে। আপনারা অল্প রাজস্বে জমি ইজারা দিতেও সম্মত হচ্ছেন।

আমার কাছে এ খবরও এসেছে যে জমিদাররা সরকারের কাছে ঋণী থাকা সত্ত্বেও আপনি তাদের সরকারের টাকা ফেলে রেখে আপনার পূর্বপুরুষের ঋণ শোধের জন্য তাগাদা দিচ্ছেন। এই ব্যবহার সমর্থনের অযোগ্য। আপনারা এখনো আগের মত ধনী। আপনাদের এই ধনতৃষ্ণার প্রবৃত্তিতে শুধুমাত্র নিজেদের ক্ষতি হচ্ছে না। আপনাদের ওপর আমার বিশ্বাস ছিল। জনসাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষী বলেই আপনাকে আমি জানতাম। কিন্তু

আপনাদের এই ব্যবহারের জন্য আমার সেই বিশ্বাস ক্রমাগত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

ওই বছরই সিলেক্ট কমিটি আবার দেড় লাখ টাকা ধার করলো খোসাল চাঁদের গদী থেকে।

১৭৬৬ সালের এপ্রিল মাসে ক্লাইভ আবার এল মুর্শিদাবাদে। কোম্পানী দেওয়ানী পেয়েছে। এবার পুণ্যাহ হবে মোতিঝিল প্রাসাদে। দিন ঠিক হয়ে গিয়েছে। ২৯শে এপ্রিল ভাল দিন।

নবাব নজমউদ্দৌলা মণিমুক্তা মাণিক্যের পোষাক পরে এসে বসলো মসনদে। তার পাশে বসলো লর্ড ক্লাইভ। তিন সুবার নতুন ইংরেজ দেওয়ান। নির্দ্দিষ্ট আসনে রেজা খাঁ, মহারাজ দুর্লভরাম, জগৎশেঠ খোসাল চাঁদ, মহারাজা উদায়ত চাঁদ। বাংলার সমস্ত রাজা, মহারাজা, জমিদার দাঁড়িয়ে আছে হাত জোড় করে, মাথা নীচু করে। দরবারী কায়দায় অভ্যস্ত তারা সবাই। চোপদার ও সৈন্যরা বাইরে। নিশানে ছেয়ে গিয়েছে মোতিঝিলের আকাশ। ঝিলে হাজার হাজার শোভিত নৌকা। বিহার হবে। মহা ধুমধাম করে প্রথম পুণ্যাহ শেষ হয়ে গেল।

কোম্পানীর কাছে অনেক টাকা পাওনা শেঠদের। খোসালচাঁদ আশা করেছিল কোন তাগাদা দিতে হবে না।

সে ছোট। অত বড় কারবারের দায়িত্ব তার ওপর। তাদের বিপদের কথা কারো অজানা নয়। সুতরাং কোম্পানী নিজে থেকেই পাওনা মিটিয়ে দেবে। আর ক্লাইভ যখন আছে, টাকা তখন পাওয়া যাবেই। কিন্তু দিন যায়। নম্র দীন চিঠি লেখার পর অত কড়া উত্তর সোজা ভাবে নিতে পারেনি খোসালচাঁদ। বংশ মর্যাদায় আঘাত লেগেছে।

পুণ্যাহের পর খোসালচাঁদ দাবী করলো যে কোম্পানীর কাছে তাদের প্রাপ্য পঞ্চাশ থেকে ষাট লাখ টাকা। এই টাকা দিয়ে দিতে হবে।

দাবী করা এক কথা। দাবী আদায় করা অন্য কথা। পঞ্চাশ ষাট লাখ টাকা প্রাণ থাকতে তুলে দিতে পারবে না কোম্পানী।

লর্ড ক্লাইভ, জেনারেল কারনাক ও সাইকের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করেছে যে অত টাকা দেওয়া যাবে না। জগৎশেঠ দাবী করতে পারেও না সব টাকা কোম্পানীর কাছে। কারণ ত্রিশ লাখ টাকা ধার নিয়েছে মীরজাফর। ঐ টাকা দিয়ে মীরজাফর তার নিজের সেনাপতিদের মাইনে দিয়েছে।

কোম্পানী নিশ্চয়ই সে টাকার জন্য দায়ী নয়। তবে একুশ লাখ টাকা দাবী করতে পারে জগৎশেঠ। কারণ এই টাকা থেকে মাইনে দেওয়া হয়েছে ইংরেজ সৈন্যের।

নবাবের সৈন্যও ছিল কিছু। আর সৈন্যদের কাজে লাগানো হয়েছে নবাবের স্বার্থেই। সুতরাং এই একুশ লাখের সবটাই ত কোম্পানীর দেয় নয়। ক্লাইভ ঠিক করেছে, এই টাকার অর্দ্ধেক দেবে কোম্পানী আর অর্দ্ধেক নবাব। এক সঙ্গে দিতে পারবে না অত টাকা। ঠিক হয়েছে, দশ বছরের ভেতর শোধ করে দেবে। ১৭৬৮ সালে কাউন্সিল সম্মতি জানিয়েছে ক্লাইভের প্রস্তাবে। কাউন্সিল শেঠবাড়ীর সাহায্যকে নতুন করে স্বীকার করেছে। বলেছে, শেঠদের রক্ষা করা দরকার।

পুণ্যাহের কয়েকদিন পরেই মারা গেল নজমউদ্দৌলা। এক সঙ্গে অনেক টাকা পেয়ে প্রাণ ভরে ভোগ করবার স্বপ্ন নিয়েই মারা গেল সে। শরীর তার চিরকালই বড় খারাপ। ওই শরীরে নবাবী বিলাস খুবই মারাত্মক। কিন্তু তার মৃত্যুর আকস্মিকতার ভেতর অনেকে গুপ্ত চক্রান্তের ছায়া দেখেন।

নজমউদ্দৌলার পর সিংহাসনে বসলো তার ভাই সৈফউদ্দৌলা। কোম্পানীর সঙ্গে নবাবের নতুন চুক্তি হল, তার বেলায় ব্যয়-বরাদ্দ কমে দাঁড়ালো ৪,১৮৬,১৩১ টাকায়। রেজা খাঁ, দুর্লভরাম আর জগৎশেঠ খোসালচাঁদ ও উদায়তচাঁদ নতুন নবাবের মন্ত্রী। কিন্তু অবস্থা ফিরলো না শেঠদের। খোসালচাঁদ ত মীরকাশিম নয়। কঠোর সংযম থেকে যে সঞ্চয় করা যায়, এ কথা মানতে পারেনি খোসালচাঁদ। আয়ের পথ ক্রমাগত বন্ধ। অথচ ব্যয়ের পুরুষানুক্রমিক পথ মসৃন, উন্মুক্ত।

খোসালচাঁদের বৃত্তির ব্যবস্থা করেছিল ক্লাইভ। বছরে তিন লাখ টাকার বৃত্তি। ক্লাইভ বলেছিল শেঠরা এখনো বিরাট ধনী। তাদের কাছে বছরে তিন লাখ টাকা কিছুই নয়। বৃত্তি নেয়নি খোসালচাঁদ। বলেছিল, 'তার মাসিক খরচা এক লাখ টাকা। বছরে তিন লাখ টাকার সাহায্য নিয়ে ভিখারীর নাম কুড়োতে যাবে কেন?'

অবস্থা যতই খারাপ হোক, লোকের কাছে ছোট হওয়া চলে না। বিশেষ করে তারা জগৎশেঠ। ভারতবর্ষ জুড়ে তাদের নাম, প্রতিপত্তি। মান সম্মানের দিক থেকে নবাবের সমান তারা। নবাব যদি বৃত্তি নেয়, নিক। কিন্তু তাদের মাথা নীচু করা চলে না।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের মাথা। আপদে বিপদে দেবতা সহায়। বাদশা

মুহম্মদ শাহের কাছ থেকে পরেশনাথের জন্যে নিষ্কর জমি যোগাড় করে দিয়েছে তার পূর্বপুরুষ। তাকেও কিছু করতে হবে। বংশ গৌরবের জন্য, এবং নিজের জন্যও বটে।

লোকে বলে পরেশনাথের আদি তীর্থ নাকি আবিষ্কার করেছিল খোসালচাঁদ। হাতীর পিঠে চড়ে পরেশনাথের তীর্থে গেল জগৎশেঠ। কিন্তু প্রকৃত তীর্থ খুঁজে পেল না। খোসালচাঁদ হতাশ হয়ে ফিরে আসছিল। পথে বিশ্রাম নেই। ক্লান্ত শরীর। ঘুম আসতে দেরী হয়নি। স্বপ্ন পেল, খোসালচাঁদ যেখানে পীতচন্দনের রেখা দেখবে, সেই হল প্রকৃত তীর্থ। পীত চন্দনের চিহ্ন দেখে শেষকালে প্রকৃত তীর্থের সন্ধান পেয়েছিল জগৎশেঠ।

পরেশনাথ পাহাড়ে যত মন্দির আছে, তার মধ্যে জগৎশেঠদের মন্দিরই সব চেয়ে সুদৃশ্য। অনেক বিগ্রহের নীচে জগৎশেঠদের নাম লেখা আছে। পরেশনাথ পাহাড়ের নীচে মাঝারি মন্দিরটি শেঠদের। মাঝারি মন্দির মধুবনে। শ্বেতাম্বর জৈনদের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে শেঠরা।

জগৎশেঠিনীর ধর্ম কামনায় খোসালচাঁদ কেটেছে একশ' আটটা পুকুর। মহিমাপুরের বাড়ীর নিকটে তৈরী করেছে বিরাট সুন্দর বাগান। নাম তার খোসাল বাগ।

যে বছর ছিয়াত্তরের মন্বন্তর আরম্ভ হল, সে বছরই মারা গেল সৈফ-উদ্দৌলা। বুব্বু বেগমের ছেলে মোবারকউদ্দৌলা এবার নবাব। কিন্তু মনি বেগমের প্রভাব অপ্রতিহত। গভর্ণর হয়ে এসেছে ওয়ারেণ হেষ্টিংস। মনি বেগমের আর কোন ভয় নেই।

কারবার চলছিল কোনমতে। কিন্তু মন্বন্তর এসে সেই কারবারের ওপর এক আঘাত দিল। মন্বন্তর আর হেষ্টিংসের শাসন সংস্কার শেঠবাড়ীর নাট্যমঞ্চে শেষ অঙ্ক। তারপর যবনিকা।

ছত্রিশ

পলাশীর পর ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি শুধুমাত্র। বাংলার কাঠামো ভেঙে পড়তে আরম্ভ করেছে। চাষবাসের হাল খুব খারাপ।

নবাব বাদশার বিলাস বাহুল্যের ফল অনিবার্য ভাবে চাষীর ওপর এসে পড়বেই। মুর্শিদকুলির আমল থেকে চাপ বাড়তে আরম্ভ করেছে। পলাশীর পর এল নতুন উপসর্গ। কৃষকের রোজগার ক্রমাগত কমতে আরম্ভ করেছে।

প্রথম হামলা এল কোম্পানীর বেনিয়ন গোমস্তার। বাংলার গ্রামের ভিতরে গিয়ে চলেছে তাদের নতুন জুলুম। প্রজার কাছ থেকে নামমাত্র দরে জিনিষ কেনে। বিক্রি করে আসে চড়া দরে। বোলটস্ সাহেব বিবরণ দিয়েছে তার। ওদিকে মোগল গৌরব প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে দিশেহারা মীরকাশিম নতুন আবোয়াব চাপালো চাষীর ওপর। অবসর সময়ে তাঁতের কাজ করে কাঁচা পয়সা হাতে আসত কৃষকের। কিন্তু কোম্পানীর জ্বালায় সেই তাঁতকেও টিকিয়ে রাখা গেল না। কৃষকরা ক্রমাগত গরীব হতে থাকল। কোম্পানী দেওয়ানী পেল। তারপর থেকে বাংলার ক্রমবর্ধমান গ্রামের হাহাকার।

দেওয়ানী পেয়ে চাষীর হাল ফেরেনি। হাল ফেরানোর জন্য দেওয়ানীর ভার নেয়নি কোম্পানী। রাজস্ব আদায় কোম্পানীর কমেনি। আলিবর্দীর সময় চাষীদের অবস্থা মোটামুটি এক রকম ছিল। অন্তত এত ঝড় ঝঞ্ঝা যায়নি তাদের ওপর দিয়ে। শান্তি ছিল কিছুদিন। এখন অবস্থা খারাপ। তবু কোম্পানীর রাজস্বের পরিমাণ কাশেম আলির সময়ের রাজস্বের চেয়েও বেশী।

আদায় করার পদ্ধতিও মারাত্মক। দেওয়ানী পাওয়ার পর কোম্পানীর লক্ষ্য স্থির। এই দেশ থেকে যতদূর সম্ভব বেশী টাকা তুলে আনতে হবে। তাই কোনদিকে তাকানোর অবসর নেই। কোন ভাবনার বালাই নেই। যে কোন প্রকারে হোক খাজনা আদায় করতে হবে। জমিদাররা সময় মত খাজনা দিতে পারত না। জমিদারী হারাত। জমিহারা জমিদারের সংখ্যা কম নয়। আদায় করার জন্য আছে আমিল। খারিজ জমি নিলামে

চড়লে আসত আমিলরা। জমিদারীর খাজনা ঠিক করা। নিলামে সেই কম দামের নীচে কোন দাম থাকবে না। যে বেশী দর দিতে পারবে, সেই পাবে খাজনা আদায়ের ভার। তার নাম হবে আমিল।

নিলামে পাওয়া জমিদারী সাময়িক। তিন চার বছর অবধি তার মেয়াদ। তারপর আবার নিলাম। তাই অল্প বিত্তের লোক ভিড় করত নিলামে। তাদের কোন ভয় নেই। লাভের আশা ষোলো আনা। তারা হাঁকত চড়া দাম। কোন মতে আমিল হতে পারলে কোম্পানীর প্রাপ্য রাজস্ব মিটিয়ে দিয়ে তুলতে হবে নিজের লাভ। সেই লাভের পদ্ধতি বিচিত্র ও জঘন্য। রায়তের প্রতিরোধ নেই। নালিশ জানাবার জায়গা নেই। আমিলেরা থাকবে না চিরকাল। তাই তাদের কোন দয়া মায়া নেই। কৃষকের জন্য ভাবনা করতে যাবে কেন তারা? আমিলদের নিষ্ঠুর লুণ্ঠনে জমি হারা হতে থাকলো কৃষকরা।

ভূমিহীন কৃষকরা আগে ঠাঁই পেত সৈন্য ব্যারাকে। কোম্পানীর শাসন যতই কায়েম হতে থাকে, সেনাবাহিনী ছোট হতে থাকে ততই। মীরজাফরের সময় অনেক সৈন্য বেকার হয়েছে। নজমউদ্দৌলার সময় সৈন্য আর থাকলোই না। ছিল নবাবীয়ানার প্রতীক হিসাবে মাত্র কয়েকজন সেপাই। দেশরক্ষার ভার নিয়েছে কোম্পানী নিজে। এই ছাঁটাই-হওয়া সৈনিকের খুব কম অংশ নতুন ভাবে চাকরী জোটাতে পেরেছে কোম্পানীর পল্টনে। অফিসাররা কোন চাকরী পেল না। কোম্পানীর পল্টনের নিয়ম যে ভারতীয়রা বড় জোর হতে পারবে সুবাদার। মীর-কাশিমের রাজস্ব আদায়ের তাগাদায় বহু জমিদার সর্বস্বান্ত হয়েছে। বিলাস কমাতে হয়েছে। লাঠিয়ালদের সংখ্যাও কমে এসেছে। জমিদারের লাঠিয়াল এখন বেকার।

দেওয়ানী পাওয়ার পর নবাব ছায়া মাত্র। দরবারে আগে অনেকে চাকরী পেত। রুজি রোজগারের ব্যবস্থা হত সেখান থেকে। কিন্তু নবাব এখন পেন্সন ভোগী। সে অঙ্ক আবার ক্রমাগত কমে আসছে। জাঁকজমক কমছে ক্রমাগত। বেকার সংখ্যা বাড়ছে ততই। চারপাশের এই দুর্গতির জন্য চুরি ডাকাতির অন্ত নেই।

এই অবস্থায় এল ১১৭০ সালের দুর্ভিক্ষ। আগের বছর শীতকালের ফসল পাওয়া যায়নি। তার আগের বছরও ফসলের অবস্থা খুব ভাল নয়। সময় মত জল হয়নি। দুর্ভিক্ষ হলে সাধারণত যে সব যুক্তিগুলো শুনে

মুখস্থ হয়ে গিয়েছে, ১৭৭০ সালের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সেই যুক্তিগুলোই ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভিক্ষের ন'মাস মেয়াদের ভেতর এক লাখ মানুষ প্রাণ দিয়েছে অনাহারে। দরবারের রেসিডেণ্ট সাহেব বর্ণনা দিয়েছে সেই আকালের।

যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ নিয়ে ব্যবসা করা শুধু আজকের, সভ্যযুগের রীতি নয়। দীর্ঘকালের ঐতিহ্য। নায়েব-নাজিম রেজা খাঁ উপায় করার এই মহেন্দ্রক্ষণ হেলায় হারায়নি।

দেশের সমস্ত চাল কিনিয়া বাজারে।
দেশ ছারখার হল রেজা খাঁর তরে॥
একচেটে ব্যবসা, দাম খরতর।
ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হল ভয়ঙ্কর॥
পতি পত্নী পুত্র ছাড়ে পেটের লাগিয়ে।
মরে লোক অনাহারে অখাদ্য খাইয়ে॥

জন শোর তখন খাস বিলেতী। এ দেশের অনাহার দারিদ্র বোধ হয় নীলচোখে খুব কর্কশ লেগেছিল তার। শোর মন্বন্তরের বর্ণনা দিল:

Still fresh in memory's eye the scene I view
' The shrivelled limbs, sunk eyes and lifeless hue
Still hear the mother's shrieks and infants moans
Cries of despire and agonizing groans
In wild confusion dead and dying lie ;—
Hark to the jackale's yell and vulture's cry
The dog's fell howl, as amidst the glare of day
They riot mumolested on their prey
Dire scenes of horror which no pen can trace
Nor rolling years from memory's page efface.

স্মৃতি থেকে যদি একান্তই না মোছা যায়, থাক। কিন্তু তা বলে খাজনা বাকী থাকতে পারে না। স্মৃতি নিরপরাধ। অবসর সময়ে দু' ফোঁটা চোখের জল ফেলবে, চুকে যাবে। কিন্তু খাজনা না উঠলে বিপদ। তাই ১৭৭০-৭১ সালের প্রথম ছ'মাসে, যখন মন্বন্তর ভয়াবহ অবস্থায়, তখনই গত বছরের চেয়েও সোয়া দু'লাখ টাকা বেশী আদায় হয়েছে। পরের বছর রাজস্ব বেড়েছে তেরো লাখ।

তাই মন্বন্তরের পর বাংলার অর্ধেক চাষী আর শতকরা পঁয়ত্রিশ জন বাসিন্দা স্বর্গরাজ্যে চলে গেল। জঙ্গল অধিকার করেছে গ্রাম। আর কোন কাজ কারবার নেই। জগৎশেঠ খোসালচাঁদের বংশগৌরব যতই থাক, পাওনা আদায়ের কোন আর ভরসা নেই। নতুন রোজগারের কোন উপায় নেই। মন্ত্রী হিসাবে যে টাকাটা পাওয়া যেত, তাও বন্ধ হয়ে গেল এই সময়।

রোজগারের একমাত্র পথ বাট্টা। ফতেচাঁদ মহাতপের সময় বাট্টা থেকে তাদের আয় হত অঢেল। অনেক রকমের টাকা দেশে এক সঙ্গে চালু। নবাব বাদশার কাছে একমাত্র চলতি বছরের শিক্কা গ্রহণযোগ্য। যার হাতে যত বেশী শিক্কা মজুত, তার লাভ তত বেশী। নবাবের মন্ত্রী তারা। তাদের কাছে খাজনা জমা দেয় জমিদার। মুর্শিদাবাদের ট্যাঁকশাল তাদের হাতে। অজস্র উপায় হত সেখান থেকে। তবু শেঠবাড়ীর স্বার্থ ছিল দেশে এক ধরণের টাকা চলুক। আপাতত তাদের ক্ষতি হলেও পরিণামে লাভ হত। তারা দালাল হিসাবে তখন বাঁচতে চায়নি। তারা হতে চেয়েছিল ব্যাঙ্কার। গড়তে চেয়েছিল নতুন অর্থনীতি। দেশ বিদেশের বাণিজ্য চালু রাখা তাদের স্বপ্ন। দেশ এগিয়ে গিয়েছে। জিনিষের সঙ্গে জিনিষের বিনিময় করে আর চালানো যায় না। কুঠির শিল্প নামে হলেও খুবই সমৃদ্ধ সে। সুতরাং দেশের স্বার্থে এবং তার নিজেদের স্বার্থে দেশে এক ধরণের টাকার প্রচলন সেদিন ছিল বরণীয়।

আজ অবস্থা ভিন্ন। নামমাত্র ব্যাঙ্কার তারা। আদপে সাধারণ বাট্টাদারের স্তরে নেমে আসছে ক্রমাগত। হরেক রকম টাকা থেকে দু' পয়সা কামানো ছাড়া কোন পথ নেই। তাই বাট্টা উঠিয়ে দেবার প্রস্তাবে তারা শঙ্কিত হয়েছিল স্বাভাবিক কারণেই।

কলকাতার মিণ্ট মাষ্টার ক্যাম্বেল আপত্তি করেছিল। সে বলেছিল, বাট্টা উঠিয়ে দিলে সুবিধের চেয়ে অসুবিধে হবে বেশী। প্রথমত এ প্রস্তাব কার্যকরী নয়। দ্বিতীয়ত এই প্রথায় বাট্টাদাররা মার খাবে। মহম্মদ রেজা খাঁর সে-ই মত। বাট্টার প্রথা উঠে গেলে লোকসান হবে কোম্পানীর। কেন না এখন এক টাকা থেকে অন্য টাকা করার খরচা দিচ্ছে সাধারণ লোক। তখন সরকারী খরচায় সেই কাজটা করতে হবে।

তাই বাট্টা উঠলো না। কেবল চারটে ট্যাঁকশালের টাকার দর হল সমান। মুর্শিদাবাদের ট্যাঁকশালের টাকার নাম ও দাম বেশী।

জগৎশেঠদের প্রতিপত্তি তাই আগে ছিল কোম্পানীর চেয়েও অনেক ভারী। এখন কলকাতার টাকা মুর্শিদাবাদের টাকার সমান হয়ে গিয়ে পলাশীর শেষ পরিণাম পেল জগৎশেঠ খোসালচাঁদ।

কিন্তু অটল বিলেতের মালিকরা। ক্যাম্বেলও রেজা খাঁর যুক্তি, বাংলার গভর্নরের কাজ তাদের মনে ধরেনি। তারা আবার হুকুম পাঠালো শিক্কা সোনায়তের তফাৎ তুলে দাও। বাট্টার প্রথা খতম করতেই হবে। ১৭৭১ সালে বার হল নতুন পরোয়ানা।

তিন সুবায় চারটে ট্যাকশাল ছিল। পাটনা, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা, আর ঢাকায়। হেস্টিংস বন্ধ করে দিল পাটনা আর ঢাকার ট্যাকশাল। বিহারে তখন টাকার অভাব। মুর্শিদাবাদের টাকার দাম সাময়িক ভাবে বাড়লো। কিন্তু শেঠদের কাছে রূপো নেই। সুযোগ পেয়েও ব্যবহার করা গেল না। ইতিমধ্যে এতদিনের এত সাধের মুর্শিদাবাদের ট্যাকশালও হয়ে গেল শেঠদের হাত ছাড়া। একজন ইংরেজ ট্যাকশালের রক্ষক। দূরে এল খোসালচাঁদ।

আস্তে আস্তে সব উৎস শুকিয়ে আসছে। নতুন কাল পড়েছে। সময়ের দাবী একেবারে অমোঘ। আকবর আরঙ্গজেবের দিন শেষ হয়ে গিয়েছে। ব্যাঙ্কার ত আর সুদখোর নয়। তার অন্য কাজ। নিজেদের অগোচরেই বোধহয় সেই ব্যাঙ্কারের কাজ করে এসেছে মহিমাপুর। তাদের 'ক্রেডিট অরগানাইজেশন' সেই বিকেন্দ্রিত অবস্থায়ও অসাধারণ।

পলাশীর পর পতন হয়েছে সেই সংগঠনেরও। ওদিকে মাথা তুলেছে রামচরণ সাউ, গোপালচরণ সাউ। রামকিষন লক্ষ্মীকিষনের নাম ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে। নিষ্প্রভ হচ্ছে মহিমাপুর।

বহির্বাণিজ্য এখন প্রায় সবটাই ইয়োরোপীয়ানদের হাতে। তারা টাকার জন্য এখন আর এ দেশের সুদখোরদের কাছে আসবে না। পলাশীর পর ভাগ্য খুলে গিয়েছে। তাই ইয়োরোপীয়ানদের বাণিজ্য চালাবার জন্য কলকাতায় নতুন ব্যাঙ্ক হল। তার নাম ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্থান।

১৭৭০ সালে আলেকজাণ্ডার কোম্পানী আরম্ভ করে সেই ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের আসল মালিক অবশ্য কোম্পানীর ভূতপূর্ব কর্মচারীরা। একদিকে তাদের এজেন্সি ব্যবসা, আর সেই এজেন্সি ব্যবসার সুবিধার জন্য নিজেদের ব্যাঙ্ক। জগৎশেঠের দ্বারস্থ হতে হয় না তাদের। তারা স্বাধীন। বিত্তবান ও প্রতিষ্ঠিত। ব্যাঙ্কার হতে পারে তারাই। এই 'ব্যাঙ্ক অফ হিন্দুস্থান' ভারতবর্ষে প্রথম নোট বাজারে ছাড়ে। এ নোটের সরকারী স্বীকৃতি না থাকলেও প্রায়

হুণ্ডি পঁচিশ লাখ টাকার নোট চলত বাজারে। একবার ফতেচাঁদ হুণ্ডি ছেড়েছিল দিল্লীতে। তারপর এই নোট। এই সময় আরো একটা ব্যাঙ্ক হয়। তার নাম 'বেঙ্গল ব্যাঙ্ক'।

ওদিকে খোদ মুর্শিদাবাদে মনোহরদাস দ্বারকাদাসের গদী খুব নাম করা। কলকাতায় হুজুরীমল আর দয়ালচাঁদ স্বীকৃত ব্যাঙ্কার।

সমস্ত আয়ের উৎস শুকিয়ে এসেছে খোসালচাঁদের। কোম্পানীর স্বীকৃতি হিসাবে আছে মুর্শিদাবাদ টাঁকশালে অন্য সব বাট্টাদার থেকে খোসালচাঁদের একটু সুবিধে—তার হার একটু কম।

১৭৭২ সালে মুর্শিদাবাদ থেকে যখন খালসা উঠে গেল কলকাতায়, শেষ প্রতিপত্তি হারালো নবাব ও শেঠরা। মেকলে তার বর্ণনা দিয়েছে:

The heir of Mirjafar still resides at Mursidabad, the ancient capital of his house, still bears the title of Nawab, is still accosted by the English as 'your Highness', is still suffered to retain a portion of the regal state which surrounded his ancestors. A pension of one hundred and sixty thousand pounds a year is annually paid to him by the Government. His carriage is surrounded by guards, each preceded by attendants with silver maces. His person and dwelling are exempted from the ordinary authority of the minister of justice. But he has not the smallest share of political power and is in fact only a noble and wealthy subject.

পলাশীর পতনের অর্থ বুঝতে পারেনি কেউ। প্রাচীন বিদ্যার ওপর ভরসা করে জগৎশেঠ মহাতপ ভেবেছিল, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলছে। কিন্তু তারপর থেকেই বোঝা গেল, নিরপরাধ বণিক নয় কোম্পানী। আরও কিছু তারা চায়। চাওয়া এবং পাওয়ার পরিমাণ দেখে আঁৎকে উঠেছে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট। ১৭৮৪ সালের প্রস্তাবে বলা হয়েছে:

The result of the Parliamentary enquires has been that the East India company was found totally corrupted and totally perverted for the purpose of its institution, whether political or commercial.

দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য লুণ্ঠনে বড় ডাকাত লর্ড ক্লাইভও বিচলিত। ১৭৭২ সালে পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে বললে :

'The company has acquired an Empire more extensive than any kingdom in Europe, France and Russia excepted.'

কিন্তু কি করেছে কোম্পানী সেই সাম্রাজ্যের জন্যে ?

'They treated it rather as a South Sea Bubble than as anything solid and substantial. They thought of nothing bnt the present time, regardless of the future. They said, let us get what we can to-day, let tomorrow take care of itself ; they thought of nothing but the immediate division of the loaves and fishes.'

তাই দেওয়ানী আসার আগের বছর, ১৭৬৪-৬৫ সালে, বাংলার রাজস্ব আদায় হত ৮১৭,০০০ পাউণ্ড। কোম্পানীর দেওয়ানী পাওয়ার বছর রাজস্ব হল ১,৪৭০,০০০ পাউণ্ড। ১৭৭১-৭২ সালে সেটা বেড়ে দাঁড়ালো ২,৩৪১,০০০ পাউণ্ড।

মুর্শিদাবাদ দরবারের রেসিডেন্ট বেকার ১৭৬৯ সালে লিখলো, 'I will remember this country when trade was free and the flourishing state it was in ; with concern I now see its present runious condition, which I am convinced is greatly owing to the monopoly that has been made of late years in the company's name of almost all the manufactures in the country.'

বার্কের বাগ্মিতায় শোনা গেল, 'Were we to be driven out of India this day, nothing would remain to tell that it had been possessed, during this inglorious period of our domination, by anything better than the ourangotang or the tiger.'

১৭৮৯ সালে এই কথার প্রতিধ্বনি করে বলেছিল লর্ড কার্জন, 'I may safely assert that one-third of company's territory in Hindustan is now a jungle inhabited only by wild beasts.'

দেশ থেকে টাকা চলে যেতে থাকলো বন্যার জলের মত। ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ লিখে পাঠালো বিলেতে কোম্পানীর ডিরেক্টরদের কাছে :

'Your revenues, by means of acquisition, will as near as I can judge, not fall far short for the ensuing year of 250 lacks of Sicca Rupees, including your possession of Burdwan etc. Here after they will at least amount to 20 or 30 lacks more. Your civil and military expenses in the time of peace can never exceed 60 lacks of Rupees ; the Nabab's allowances are already reduced to 42 lacks, and the tribute to the king (the great Mogul) at 26, so that there will be remaining a clear gain to the company of 122 lacks of Sicca Rupees or £ 1,650,000 Sterling.'

তাই দেওয়ানীর প্রথম ছ'বছরের হিসাব গেল বিলেতে। বাংলা থেকে রাজস্ব আদায় হয়েছে ১৩,০৬৬,৭৬১ পাউণ্ড। মোট খরচ হয়েছে ৯,০২৭,৬০৯ পাউণ্ড। বাকি ৪,০৩৭,১৫২ পাউণ্ড গিয়েছে বিলেতে। কিন্তু এত খোদ কোম্পানীর প্রাপ্য। তা ছাড়া আছে কোম্পানীর কর্মচারীর পাওনা। আমদানি রপ্তানির হিসাবেও দেখা যাবে যে, ১৭৬৬-৬৮ সালে রপ্তানি হয়েছে ৬,৩১১,২৫০ পাউণ্ড আর আমদানি হয়েছে মাত্র ৬,২৪,৩৭৫ পাউণ্ড।

ব্যবসা বাণিজ্যে চিরকাল পাওনা হয়ে এসেছে ভারতের। তাই ভারতের সোনা বিদেশে যাবার কোন কথা উঠত না। আর বাণিজ্যের চেহারা ছিল প্রধানত আঞ্চলিক। জাতীয় বাণিজ্য গড়ে তুলতে গেলে আঞ্চলিক কিংবা প্রাদেশিক শুল্ক তুলে দিতে হয়। পশ্চিমী দেশে এইভাবেই জাতীয়তাবোধ জেগেছে। আকবর বাদশার পর ভারতীয় ঐক্যের কথা আর ওঠেনি।

জাতীয়তাবোধ জাগা অসম্ভব। মোগল বাদশার পতনের পর আঞ্চলিক কর বেড়ে গিয়ে বাণিজ্যের প্রাদেশিক চেহারা স্থায়ী হতে থাকে। পশ্চিমী দেশে সোনা রূপো চলাচলের ওপর বাধা ছিল না। যদিও বৈশ্যযুগে সোনা-ছাড়া হওয়ার চেয়ে মৃত্যু মনে হত শ্রেয়। ভারতবর্ষ থেকে সোনা কিংবা রূপো রপ্তানি করার জন্য হত প্রাণদণ্ড। টেরী কিংবা মণ্ডেলস্লা সে কথা-ই লিখেছেন। কোম্পানীর অন্য উপনিবেশ ঘুরে এই রপ্তানিতে বাংলাদেশ হল সর্বস্বান্ত।

দেশের মধ্যে শিল্প বিস্তারের স্বাভাবিক বিকাশ হবার সম্ভাবনা যদি কখনও দেখা দিত, তার সমাধি রচনা হল পলাশীতে। বৈশ্যপুঁজির নিরাপত্তা চাই। নিরাপত্তা পাবার জন্য জগৎশেঠেরা যুক্ত ছিল কোম্পানীর সঙ্গে। কিন্তু কুঠির শিল্পের ধ্বংসে জগৎশেঠের শেষ স্বপ্নও নিশ্চিহ্ন হল। মূলধন খাটাবার পথ তার বন্ধ। তাই তাদের শিল্পের ব্যাঙ্কার হয়ে দেখা দেবার আর কোন আশা থাকলো না।

মহাতপ কিংবা ফতেচাঁদ কোনদিন ভাবতেও পারেনি যে, শেঠবাড়ীর স্বার্থ আর কোম্পানীর স্বার্থ একদিন বিরোধী হয়ে উঠবে। বরং তারা জমিদার আর রাজার ওপর বিরূপ। কর চাপিয়ে ব্যবসা নষ্ট করার জন্য নবাবকেও সে বন্ধু বলে মানতে পারেনি। তাই তারা এসেছে কোম্পানীর কাছে। দেওয়ানী পাওয়ার পর কোম্পানীর স্বার্থ আর শেঠবাড়ীর স্বার্থ এত বিরোধী হয়ে পড়বে, তা কেউ ভাবতে পারেনি।

দেওয়ানী পাবার পর কোম্পানী বন্ধুত্ব করেনি খোসালচাঁদের সঙ্গে। তাকে করেছে করুণা। কৃতজ্ঞতা স্বীকারও করেছে। কিন্তু তার ওপর নির্ভর করেনি। তারা হাত বাড়িয়েছে নতুন জাতের জমিদারদের দিকে। পুরানো জমিদার গিয়েছে কিংবা যাচ্ছে। হেষ্টিংস বলেছিল, পুরানো জমিদাররা বড় প্রভাবশালী। ওদের প্রভাব নষ্ট করা দরকার। গেল বীরভূম বাঁকুড়া মেদিনীপুরের পুরানো জমিদাররা।

উঠতে থাকলো আনকোরা নতুন জমিদার। এরা আগে থাকতেই কোম্পানীর সঙ্গে পরিচিত। কেউ মুহুরী, কেউ গোমস্তা, কেউ বেনিয়ান। কাশীমবাজার কুঠির পশম ব্যবসায়ী কান্তমুদি প্রতিষ্ঠা করলো কাশীমবাজার ষ্টেট। নাটোরের জমিদারীর কিছুটা উদরস্থ করে আরও প্রতিষ্ঠা পেল কান্ত-মুদি। সবই হল কোম্পানীর দৌলতে। হেষ্টিংসের মুন্সি হল নবকিষেণ। এই মুন্সি পেলেন জমিদারী। পরে হলেন শোভাবাজার রাজবাড়ীর মহারাজা নবকৃষ্ণ। গঙ্গা গোবিন্দ সিংহ হেষ্টিংসের পরামর্শদাতা। পরে ইনি পাইকপাড়া রাজবাড়ীর প্রতিষ্ঠাতা। পাথুরেঘাটার ঠাকুর, জোড়াসাঁকোর সিংহীরা, বড়বাজারের মল্লিকরা, সিমলার দেবরা কিংবা হাটখোলার দত্তরা—সবাই বড় হয়েছে এই ভাবে।

এদের ওপর কোম্পানী ভরসা করেছে। কারণ নতুন যুগে কোম্পানীর চাই কাঁচা মাল। বিলেতের শিল্পের বিকাশের জন্যে চাই টাকা, আর কাঁচা মাল। সেই কাঁচা মাল যোগাড় করে দিতে পারবে এই অনুগৃহীতের দল।

অথচ পরিণামে ভয় থাকবে না প্রতিদ্বন্দ্বিতার। তারা জমিদার। তারা শিল্পপতি হবে না। বাংলার বাজার হাত ছাড়া হবে না তাদের।

তাই খোসালচাঁদ যখন তিরস্কার আর অপমান পেয়েছে, তখন আর এক ধরণের জমিদার তৈরী হয়েছে। কোম্পানী এই ব্যবসাদারদের সুনজরে দেখেনি।

যে আশা আর নিরাপত্তার জন্যে মহাতপ আশ্রয় চেয়েছিল কোম্পানীর, নতুন যুগে কোম্পানীর পরোক্ষ শত্রুতায় ধ্বংস হয়ে গেল শেঠবাড়ী।

সাঁয়ত্রিশ

খালসা কলকাতায় উঠে গেল। জগৎশেঠ খোসালচাঁদ ধাক্কা সামলাতে পারেনি। হেস্টিংসের কাছে আবেদন পাঠিয়েছিল জগৎশেঠ: 'তাদের বংশগত কাজ খালসার। এর দেখাশোনা করা শুধুমাত্র অর্থের জন্য নয়, সম্মানের জন্যও। জগৎশেঠ প্রার্থনা করেছে যেন তারা আবার খালসার ভার পায়।'

উত্তরে হেস্টিংস বলেছিল, 'ব্রিটিশ শক্তি এ দেশে প্রতিষ্ঠা করতে তাদের পূর্বপুরুষরা কত সাহায্য করেছিলেন। তাদের প্রতি হেস্টিংস কৃতজ্ঞ। শেঠ বংশের মঙ্গলের জন্য কোম্পানীর কিছু করা দরকার। তবে হেস্টিংস এখন খুব বিব্রত। খুব শীঘ্র তাকে বাংলা ছেড়ে যেতে হবে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে। ফিরে এসে জগৎশেঠ খোসালচাঁদের আবেদন বিবেচনা করে দেখবে।'

হেস্টিংস ফিরে এল। কিন্তু তার আগেই মারা গিয়েছে জগৎশেঠ খোসালচাঁদ। ১৭৮৩ সালের কথা। মৃত্যু তার আকস্মিক।

লোকে বলে, খোসালচাঁদের মৃত্যুর পর মৃত্যু হয়েছে শেঠদের সমৃদ্ধির। জগৎশেঠ খোসালচাঁদ নাকি তার সমস্ত ধনরত্ন পুঁতে রেখেছিল মাটির তলায়। তখনও অগাধ তার মণিমুক্তো। কুবেরেরও ভাণ্ডারে নাকি ছিল না এত মণি মাণিক্য। মাটির তলায় লুকিয়ে রেখে খোসালচাঁদ নির্ভয়ে থাকতে চেয়েছিল। মৃত্যু এসেছে অকস্মাৎ। এত আচম্বিতে আসবে বলে কেউ ভাবতেও পারেনি।

বয়সও হয়নি এমন কিছু। মাত্র চল্লিশ। মরবার আগে বলে যেতে পারেনি খোসাল চাঁদ। কণ্ঠরোধে মৃত্যু হয়েছে তার। মাটির ধন থাকলো মাটিতে।

কেউ কেউ আবার বলে, যক্ষরাজের হিংসে। তা ভিন্ন দশাসই মস্ত মানুষটা বলা নেই, কওয়া নেই, অমন ধড়ফড়িয়ে মারা যাবে কেন? কেনই বা হল অমন বাক্‌রোধ?

আবার কেউ বলে, মহাতপ চড় মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিল ঘরের লক্ষ্মীকে। পাপের ফল ফলেছে। মাটির ধন গিয়েছে মাটিতে। যক্ষরাজার জিনিষ গিয়েছে যক্ষপুরীতে।

কিন্তু গুপ্তধনের আশায় ঘুরেছে কত লোক। কতবার খোঁড়াখুড়ি হয়েছে। কখনও গোপনে, কখনও প্রকাশ্যে। মাটির তলা থেকে যদি ঝিকমিকিয়ে ওঠে মণি মাণিক্য। গুপ্তধনের আশায় এসে প্রাণ দিয়েছে কেউ কেউ সাপ খোপের বিষে।

পায়নি কিছুই, তবু লোকের বিশ্বাস অটুট। আছে লুকানো মাটির তলায়। একদিন পাওয়া যাবে।

খোসালচাঁদ মরার আগে মারা গিয়েছে তার একমাত্র ছেলে। অপেক্ষা করেছে জগৎশেঠ। আসবে নিশ্চয়ই আর কেউ। তার নিজের বংশের কেউ জগৎশেঠ উপাধি ধারণ করার জন্য। মনের ইচ্ছা মনেই শুকিয়ে যায়। চার বছর পরে খোসালচাঁদ দত্তক নিয়েছিল হরকচাঁদকে।

হরকচাঁদ সমীরচাঁদের ছেলে। সমীরচাঁদ খোসালচাঁদের ভাই। হরক চাঁদ তখনও ছোট। নিতান্ত নাবালক।

সীমান্ত প্রদেশ থেকে ফিরে এসেছে হেষ্টিংস। কিন্তু সরকারী রাজস্বের রক্ষক আর হতে পারেননি খোসালচাঁদ।

দুঃখ করেছিল হেষ্টিংস। হরকচাঁদ নাবালক। তাকে ত আর অত বড় দায়িত্ব দেওয়া যায় না। অথচ কিছু তাকে করতেই হবে। কথা দিয়েছে হেষ্টিংস, ফিরে এসে খোসালচাঁদকে বসাবে খালসায়। বড় উপকারী বন্ধু তাদের জগৎশেঠ। হিন্দুর টাকা আর ইংরেজের তলোয়ার না থাকলে কি কোনদিন বৃটিশ শক্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারত ভারতবর্ষে। বণিকের মানদণ্ড রাতারাতি হতে পারত না রাজদণ্ড।

নবাব মোবারকউদ্দৌলাকে চিঠি লিখলো হেষ্টিংস: আপনার সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের পর আমি যে কি আনন্দ পেয়েছি তা ভাষায় বর্ণনা করতে পারব না। আমি আপনাকে এক বিশেষ অনুরোধ করে এই চিঠি লিখছি। স্যার জন ডাঞ্জের মারফত আমি ছ' প্রস্ত পোষাক, পাগড়ীতে বসানোর জন্য অলঙ্কার, মণি পরানো পাগড়ী, মুক্তোর মালা একছড়া, মাকড়ী এক জোড়া, আর ঝালর দেওয়া পালকী পাঠালাম। আপনি দয়া করে এইগুলো শেঠ হরকচাঁদ সাহেবকে দেবেন। আমি আশা করি আপনি হরকচাঁদকে জগৎশেঠ উপাধি দান করবেন এবং নাম খোদাই করে একটা সিল মোহর পাঠাবেন। বংশ পরম্পরায় ওরা যে যেমন সম্মান ও যত্ন পেয়ে এসেছেন, এখন যেন তার কোন ব্যতিক্রম না হয়।

১১ই মার্চ, ১৭৮৪ সাল। জবাব পাঠালো নবাব মোবারকউদ্দৌলা। হেষ্টিংসের চিঠিটার পুনরুক্তি করে নবাব লিখেছে: আপনার চিঠি পেয়ে আমি আশাতিরিক্ত আনন্দ ও উৎসাহ পেয়েছি। আমি আপনার কথামত জগৎ-শেঠ উপাধি ও সিল মোহর দিয়েছি।

হরকচাঁদ হল জগৎশেঠ। কিন্তু তার জন্য আসেনি দিল্লীর ফরমান। দরবার বসেনি বাদশার। আনন্দ উৎসবও হয়নি। অত্যন্ত দীন হীন ভাবে জগৎশেঠ হল হরকচাঁদ, উপাধি দিল নবাব। সে মোগল সাম্রাজ্য গিয়েছে, গিয়েছে সেই মহিমাপুর।

শেঠদের মূলধনের হিসাব নেই। লোকে আন্দাজ করে। আন্দাজ বলেই কখনও এক সংখ্যা থাকেনি। তবু সবাই একমত যে মূলধন তাদের অগাধ। হয়ত কুবেরের চেয়েও বেশী।

আপশোষ করেছেন মুতাক্ষরীনের অনুবাদক। এখনও কি পারে শেঠেরা সরকারকে পঞ্চাশ ষাট কিংবা এক কোটি টাকার দর্শনী ভাঙিয়ে দিতে—যা তারা পারত আগে। মারাঠারা গদী থেকে দু' কোটি আর্কট টাকা লুট করে নেবার পরেও। সে আজ স্মৃতি মাত্র। এখন ১৪০,০০০ টাকার হুণ্ডি কিস্তিতেও ভাঙাতে পারে না তারা। এখন এই ১৭৮৭ সালে।

লোকে বলে, গোলাপচাঁদের সম্পত্তি পাওয়ার পর অবস্থা ফিরে ছিল জগৎশেঠ হরকচাঁদের।

হেষ্টিংসের পর এল কর্নওয়ালিশ। দশ শালার পর হল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। পুরুষানুক্রমিক ভোগ দখলের অধিকার পেল জমিদার। নিজামত আদালত উঠে এল কলকাতায়।

তিন সুবার চোখের মণির মত মুর্শিদাবাদ অন্ধ। কুঠির দরকার নেই। মজে আসছে ভাগীরথী। গতি পালটে সে এখন খালের মত। জাহাজ আসে না। চকবাজার উঠে গিয়েছে কলকাতায়।

বিরাট পুরীতে অল্প লোক। বাস করে নবাব। দরবারী স্ফূর্তি জমে না। ঝিমিয়ে এসেছে। ভাগীরথী গ্রাস করে অতীতের স্মৃতি। সময়ের নখের দাগ বসে গিয়েছে। বিরাট পুরীতে অতীতের স্মৃতিচারী নবাব এখনো দাঁড়ায় বারান্দায়। মাঝে মাঝে ধূমধাম হয়। কিন্তু সেও যেন বিকৃতির শেষ অঙ্ক। মনে হয়, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে শেষ দিনের উমিচাঁদ। উমিচাঁদ প্রতীক হয়ে গিয়েছে।

খসতে আরম্ভ করেছে মহিমাপুরের শেঠবাড়ী। ফোয়ারা শুদ্ধ। চার হাজার লোকের পুরী ক্রমাগত নিস্তেজ। জঙ্গলের আক্রমনে হার মানছে। শ্বেত পাথরের সিঁড়ি ভেসে গিয়েছে।

মসনদে বসেছে মোবারকউদ্দৌলার পর বাবর জঙ্গ, আলিজা, ওয়ালাজা, হুমায়ুজা। মোটামুটি বিত্তবান প্রজা। নবাবের পোষাক পরে নিরাভরণ নিজামত গদীতে আসে যায়। মূল্যহীন, গুরুত্বহীন, তাৎপর্যহীন নিরর্থক অস্তিত্ব। শুধু মাত্র একটি রেওয়াজ হিসাবে পায় পেনসন। লোকে বলে নবাব। হয়ত তারাও ভাবে নবাব।

শেষ বাহুল্যকে বর্জন করে এল হুমায়ূজার ছেলে মনসুর আলি খাঁ। গিয়েছিল বিলেতে। একটু সাহেব ঘেসা। এই প্রথম বিলেত ফেরৎ নবাব। লর্ড ডালহৌসির সঙ্গে বনিবনা হয়নি। বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব নাজিম উপাধি বিক্রি করে ফিরে এল মনসুর আলি খাঁ। ঘুচে গিয়েছে শেষ বাহুল্য। তারপর নবাব বংশধররা শুধু মাত্র মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর। জাফরগঞ্জ ভেঙে পড়েছে।

মুর্শিদকুলির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উন্নতি হয়েছে শেঠদের। নবাবদের অবনতির সঙ্গে মুছে গিয়েছে শেঠরা। মুর্শিদাবাদের ইতিহাস শুধু মাত্র নবাবদের ইতিহাস নয়। শেঠদেরও ইতিহাস। শুধু মাত্র মুকুট মোচন

যজ্ঞে প্রধান পুরোহিত তারা নয়। একদা সমৃদ্ধ বাণিজ্যের প্রধান উৎস তারাই। তারা এক বিনষ্ট মহা-সম্ভাবনার কান্না।

মুদ্রা অর্থনীতি যদি কোন ক্রমে ধ্বসিয়ে দিতে পারত, আত্মতৃপ্ত গ্রামীন অচলায়তন, যদি কোন ক্রমে মরা গাঙে আসত গতি স্রোত, কুশলী কারিগর পেত উন্নত যন্ত্রের পৌরুষ, তা হলে অন্য রকম হত বাংলার ইতিহাস। তা হলে এই চরিত্রহীন ব্যক্তিত্বহীন প্যানসে ভাবালুতা নিয়ে মহৎ ঐতিহ্যের রোমন্থনমদির ক্ষয়িষ্ণু, ভগ্নাংশ ও বিকৃত বৃদ্ধি হত না আমাদের। তা হলে ধর্ম ত্যাগ করতে হত না শেঠ পরিবারকে। তা হলে বৃটিশ নির্ভর পরগাছা বৃত্তি ত্যাগ করে উন্মোচিত হতে পারত আর একটি উজ্জ্বল দিগন্ত। স্বাধীন দৃপ্ত ও বলিষ্ঠ আর এক দল মানুষ আসত, যাদের চরিত্র আমরা এখনো কল্পনাও করতে পারি না। সামন্ততন্ত্রের পর আসত ধনতন্ত্র, ইতিহাসের একটি উন্নত স্তর।

কিন্তু শেঠেরা শুধুমাত্র বাট্টাদার, সুদখোর। তেজারতী মহাজনী কারবারে তারা বড়। আর কিছু নয়। বৈশ্যপুঁজি হয়নি শিল্পপুঁজি। তাদের পুঁজিতে বাণিজ্য চলেছে, শিল্প হয়নি। খেত খামার গরু ছাগল হরিনাম নিয়ে সাদা মাটা জীবন একটা নিটোল বৃত্তের ভেতর ঘুরে ঘুরে ক্ষয়ে যায়। অন্য দিকে জমিদার রাজা নবাব অলস জীবন ধারায়, লোভ আর লালসায় তাদের আত্মক্ষয়ের নিরলস সাধনা তারা ইতিহাসের আড়ম্বরময় আবর্জনা। এর মাঝে শেঠরা করুণ, বিবর্ণ, আত্মসর্বস্ব।

হরকচাঁদ ধর্মত্যাগ করেছে। সে জৈন নয় আর। সে এখন বৈষ্ণব। হরকচাঁদ নিঃসন্তান। অনেক চেষ্টা করেও কোনও ফল হয়নি। মনে বড় ক্ষোভ। যাগযজ্ঞ হোম করা হল কত। কিন্তু নিস্ফলা মাটি বালি কাঁকর বন্ধ্যা।

একদিন এক বৈষ্ণব গোঁসাই এসেছিল মহিমাপুরে। হরকচাঁদ মনের কথা বলেছিল তাকে। বিষ্ণুর উপাসনা করতে বলেছিল সে। মনস্কামনা পূর্ণ হল হরকচাঁদের। বড় ছেলের নাম রাখলো ইন্দ্রচাঁদ। তারপরে আর একটি ছেলে হল হরকচাঁদের। নাম হল তার কিষণচাঁদ।

দু'বছর পরে বিষ্ণু মন্দির তৈরী করেছিল হরকচাঁদ। মন্দিরের পায়ের কাছে সংস্কৃতে লেখা থাকলো :

এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছে জগৎবিখ্যাত মহাতপ রায়ের বংশধর। কুবেরের চেয়েও তিনি ধনবান। তার বংশধর হরকচাঁদ দয়াবান। তিনি রামানুজ দাসের শিষ্য। রামানুজদাস পরম বৈষ্ণব। তিনি এসেছিলেন বিন্ধ্যপর্বত থেকে। চাঁদের মত উজ্জ্বল তার প্রভা। সেই গুরুর প্রতি কৃতজ্ঞতায় এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হল ১৮০১ সালে। শ্রীগৌরহরি করুণার প্রতি নিবেদন করা হল একে।

বৈষ্ণব হলেও কুলধর্ম্ম ত্যাগ করেনি একেবারে। বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে চলে জৈনধর্মের রীতিনীতির পালন। বিয়ে সংকার ইত্যাদিতে তারা রাজপুতানার প্রথাকেই মান্য করে। বাড়ীতে ছিল তীর্থঙ্কর মূর্তি। সে মূর্তির কতকগুলি সোনার, কতকগুলি রূপোর। কতকগুলি আবার দুর্লভ ও দুর্মূল্য পাথরের। ১৯০২ সালে লর্ড কার্জন নিজে দেখে গিয়েছে সেই বিগ্রহ। বলেছে, এমন বিগ্রহ জীবনে কখনও দেখেনি।

কর্নওয়ালিসও বলেছিল হরকচাঁদের ব্যবস্থা করবে। খালসার ভার পাবে সে। কিন্তু ১৮১৪ সালে সেও মারা গেল। বড় ছেলে ইন্দ্রচাঁদ তখন নাবালক। নাবালককে ওই কাজ দেওয়া যায় না। কর্নওয়ালিস কিছুই করেনি।

হরকচাঁদের মৃত্যুর পর সম্পত্তি ভাগ হয়ে যায়। শেঠবাড়ী বলতে যা বোঝাত এখন আর তা বোঝায় না। কারবার বন্ধ হয়ে আসছে। এখন ভরসা শুধু সঞ্চয়। কিন্তু সঞ্চয় অফুরন্ত নয়। তারও শেষ হয়। দিন শেষ হয়ে গিয়েছে শেঠদের। ইন্দ্রচাঁদের বিয়ের সময় সরকার থেকে খেলাত দেওয়া হল। জগৎশেঠ উপাধিও পেয়েছিল ইন্দ্রচাঁদ। উপাধি দিয়েছিল বৃটিশ সরকার। বিষণচাঁদকে শেঠ উপাধি দিয়েছিল নবাব।

ইন্দ্রচাঁদের ছেলে গোবিন্দচাঁদ পেল জগৎশেঠ উপাধি। এখন তাদের অবস্থা খুব খারাপ। সংসার চালাবার জন্যে বিক্রি করতে হয় গয়না। বাধ্য হয়েই জগৎশেঠ গোবিন্দচাঁদ ব্রিটিশ সরকারের কাছে সাহায্য চায়। প্রার্থনা মঞ্জুর করেছিল সরকার। মাসিক বারোশ টাকা বৃত্তি ঠিক হয়েছিল জগৎশেঠের জন্য। এই বৃত্তি দেওয়া হল শুধু মাত্র জগৎশেঠ মহাতপ রায়ের বিশ্বস্ত বন্ধুত্বের স্মরণে। গোবিন্দচাঁদ কিছুই দাবী করতে পারে না। বৃত্তি দেওয়ার সময় সহজ ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে সরকার।

বিষণচাঁদের ছেলে কিষণচাঁদও আবেদন করেছে বৃত্তির জন্য। বিলেত থেকে উত্তর এসেছে আবেদনের, আমরা গোবিন্দচাঁদকে মাসিক বারোশ

টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করেছি। আমাদের ধারণা ছিল, এই টাকা আমরা শেঠ পরিবারের সকলকেই দিচ্ছি। যাই হোক গোবিন্দচাঁদ নিঃসন্তান। সে নিশ্চয়ই মাসোহারার কিছু অংশ দিতে পারবে কিষণচাঁদকে।

গোবিন্দচাঁদ মাসোহারা পুরোপুরি নেয়। ভাগ দেয়নি কিষণচাঁদকে। কিষণচাঁদ দরবার করেছে। ছোটলাট ১৮৫৮ সালে হুকুম করেছে গোবিন্দচাঁদকে মাসোহারা থেকে সিকি ভাগ দিতে। গোবিন্দচাঁদ তখন আবেদন জানিয়েছে বিলেতে। বিলেত থেকে নাকচ করে দিয়েছে ছোটলাটের আদেশ। গোবিন্দচাঁদ তখনও মানী লোক। নবাব-বাড়ীতে বিয়ে হল। গণ্যমান্য লোকদের মধ্যে বিতরণ করা হল পোষাক। জগৎশেঠ গোবিন্দচাঁদের পোষাকই সব চেয়ে দামী। মান বেশী সব চেয়ে গোবিন্দচাঁদের।

১৮৬৪ সালে মারা গেল গোবিন্দচাঁদ। গোপালচাঁদ তার পোষ্যপুত্র। গোপালচাঁদের বিয়ের সময় নিজামত তবিল থেকে দেওয়া হল পাঁচ হাজার টাকা।

গোপালচাঁদ আর কিষণচাঁদ এক সঙ্গে আবেদন করেছে সরকারের কাছে। গোবিন্দচাঁদের বারোশ' টাকা মাসোহারা থেকে গোপালচাঁদকে সাতশ' আর কিষণচাঁদকে পাঁচশ করে দেওয়া হোক।

সুবিধে হল সরকারের। সরকার ঠিক করলো, কিষণচাঁদকে দেওয়া হবে মাসে মাসে আটশ' টাকা। কিষণচাঁদই প্রতিপালন করবে সকলকে।

ক্ষুব্ধ গোপালচাঁদ আবার আবেদন জানালো। কিষণচাঁদের মাসোহারা কমিয়ে দিয়ে গোপালচাঁদকে মাসে মাসে তিনশ' টাকা দেওয়ার কথা পাকা। মন ওঠেনি গোপালচাঁদের। সামান্য মাসোহারা নিতে অস্বীকার করেছিল গোপালচাঁদ। তার অল্পদিন পরে মারা গেল সে।

কিষণচাঁদ মারা গেল ১৮৮০ সালে। গোপালচাঁদের স্ত্রী জগৎশেঠিনী প্রাণকুমারী মসোহারা পেত তিনশ টাকা। গোপালচাঁদ মারা গেলে প্রাণকুমারী দত্তক নিয়েছিল ১৮৯১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গোবিন্দচাঁদকে।

ভারতের বড়লাট আর নবাব বাহাদুরের চেষ্টায় নবাব বাড়ীর ছেলেদের পড়বার জন্য মাদ্রাসা হয়েছিল। গোবিন্দচাঁদ লেখা পড়া করত সেই মাদ্রাসায়।

গোবিন্দচাঁদ ধার্মিক, গোঁড়া জৈন। ছেলে বড় হবার পর প্রাণ-কুমারী আবার প্রার্থনা করেছিল সরকারের কাছে—গোবিন্দচাঁদের জন্য আলাদা মাসোহারা দেওয়া হোক। ছোটলাট এলিয়ট সাহেব গ্রাহ্য করেনি সেই প্রার্থনা। প্রাণকুমারী মারা যাবার পর গোবিন্দচাঁদ আবার প্রার্থনা নিয়ে দ্বারস্থ হয়েছিল সরকারের। কাম পাতেনি ছোটলাট। ছোট লাটের কাছে বিফল হয়ে বড়লাট। বড়লাটও যখন অগ্রাহ্য করলো গোবিন্দ চাঁদ আবেদন জানিয়েছিল ১৮৯২ সালের আগষ্ট মাসে বিলেতে ষ্টেট সেক্রেটারীর কাছে। গোবিন্দচাঁদ বিফল হল সেখানেও। পেয়েছিল নতুন বাড়ী তৈরী করার জন্য মাত্র পাঁচ হাজার টাকা।

১৯০২ সালে বড়লাট কার্জন সাহেব এসেছিল মহিমাপুরের শেঠবাড়ীতে। তখন বেলা আড়াইটে। কাশীমবাজারের গেটের কাছে কার্জন যখন গাড়ী থেকে নামলো, তখন জগৎশেঠ গোবিন্দচাঁদের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। লাট সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে এল গোবিন্দচাঁদ শেঠবাড়ী। জৈন-মন্দির খুব ভাল ভাবে দেখেছিল লাট সাহেব। দেখে অবাক হয়েছিল। শেঠবাড়ীর বহু প্রাচীন ও মহামূল্য জিনিষ পত্র তখন তাকে দেখানো হয়। বহু প্রাচীন মূল্যবান মূর্ত্তি, ফাররুকশেরের ফর্মান, আর পনেরো শতক থেকে সেই কালের নানান ধরনের টাকা দেখলেন কার্জন সাহেব।

বড়লাটকে দশ গিনি নজরানা দিয়েছিল জগৎশেঠ গোবিন্দচাঁদ। গিনি নেয়নি ক্লাইভের উত্তরসূরী লর্ড কার্জন। একবার স্পর্শ করে ফিরিয়ে দিয়েছিল সেই নজরানা। নিয়েছিল শুধু সোনার কাজ করা একছড়া মালা। আর গোবিন্দচাঁদ দিয়েছিল ফাররুকশেরের ফর্মান। কার্জন সেটা দিয়েছিল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে।

গোবিন্দচাঁদের চার ছেলে, এক মেয়ে। দুই ছেলে মারা যায়। থাকে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ আর শেঠ উদয়চাঁদ। গোবিন্দচাঁদ মারা গেল ১৯১২ সালে, ৮ই এপ্রিল, কলকাতায়।

১৮৯৬ সালের বিরাট ভূমিকম্পে মহিমাপুরের মাণিকচাঁদের বাড়ীর অবশিষ্ট ধ্বংস হয়ে গেল। তারই কিছু দূরে—এখনকার রাস্তার অন্য পাশে, তৈরী হল শেঠদের নতুন বাড়ী। সেই বাড়ীতে থাকত অষ্টম জগৎশেঠ ফতেচাঁদ। ভাগীরথীর গ্রাস থেকে জৈন মন্দিরের যতটুকু বেঁচে ছিল, তাই নিয়ে ১৯১৩ সালে তৈরী হল নতুন মন্দির।

তারপর আর কোন ইতিহাস নেই। হয়ত উপন্যাস আছে। অতীতের সমৃদ্ধ স্মৃতি এবং বর্ত্তমানের ক্লান্তি আর দৈন্যের টান-পোড়েনে মধ্যবিত্ত বাড়ীর কাহিনী।

সেই ধারার একজন ধারককে দেখলাম পুরানো ভিটার উপর। গায়ে হাফ সার্ট, চোখে সেলুলয়েড ফ্রেমের চশমা। যাকে দেখে বোঝা যায়নি। অতীত বর্ত্তমানের সাঁকো কোথায় যেন ভেঙে গিয়েছে। গ্রীষ্মের ভাগীরথী রূপোর পাতের মত বালির মাঠে। ওদিকে আম বাগানে, যেখানে ছিল শেঠবাড়ীর গদী, যখের ধন, সেখানে ঘু ঘু ডাকছে।

পরিশিষ্ট

বংশ তালিকা

Sing Raj

Akhay Raj

Karam Chand

Hiranand Saho

Seth Manik Chand | Golab Chand | Nanak Chand | Ameer Chand | Sadanand | Gobardhan | Dipchand

Jagat Seth Fateh Chand (by adoption)

Seth Anand Chand | Seth Daya Chand

Jagat Seth Mahatab Rao | Maharaja Swarup Chand

Maharaja Udwat Chand | Seth Abhoy Chand | Seth Maha Chand

Maharaja Kivat Chand | Seth Dukhal Chand

Jagat Seth Khusal Chand | Gulab Chand | Seth Sumer Chand | Seth Sukhal Chand

Jagat Seth Khusal Chand
- Jagat Seth Harak Chand (by adoption)
  - Jagat Seth Indra Chand
    - Jagat Seth Gobind Chand
      - Jagat Seth Golap Chand (by adoption)
        - Jagat Seth Fateh Chand
        - Seth Uday Chand
  - Seth Bissen Chand
    - Seth Kissen Chand

এক
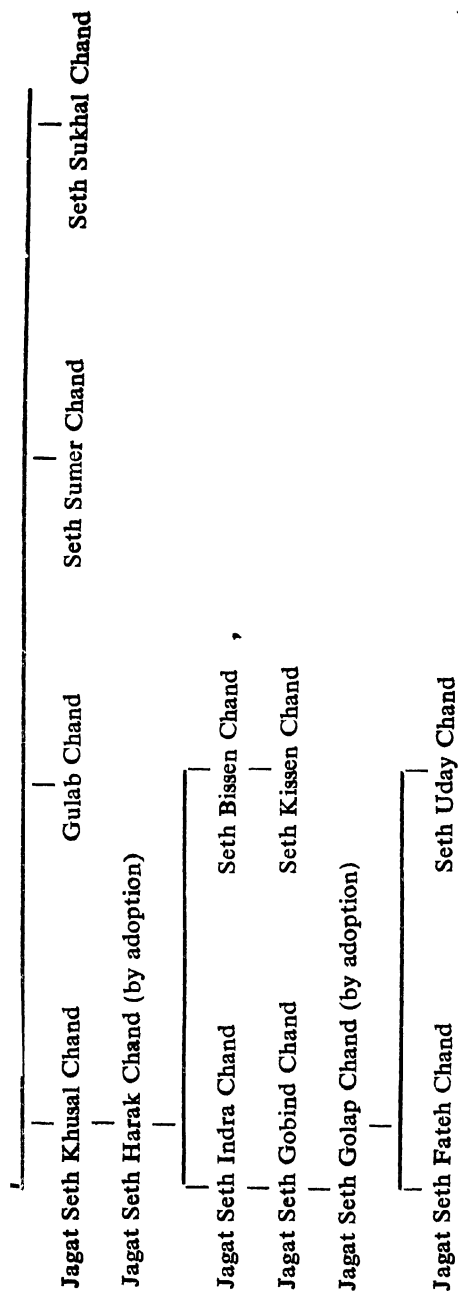
জগৎশেঠগণের ফার্মানের বাংলা অনুবাদ

মাণিকচাঁদের শেঠ উপাধির ফার্মান

পরমেশ্বরের নাম

(লাল কালিতে)

(দস্তখত লাল কালিতে)
মহম্মদ মহিমুদ্দীন
আ লমগীর শানা
ফারুখ সাএর
বাদশাহ গাজী
ফার্মান আবুল
মজঃফর

(গোল মোহর)
ঈশ্বরের নাম

১১
পুত্র
মীরণশাহ

১২
পুত্র
আমীর তৈমুর.
সাহেব কেরাণ

১
পুত্র
শাহ আলম
বাদশাহ

১০
পুত্র
সুলতান
মহম্মদশাহ

২
পুত্র
আলমগীর
বাদশাহ

১১২৫
মহম্মদ ফারুখসাএর পুত্র
আজিমুশ্বান, আবুল
মজঃফর মহিমুদ্দীন
আলমগীর শানী বাদশাহ
গাজী সন আহদ

৯
পুত্র
সুলতান
আবুসৈয়দ শাহ

৩
পুত্র
শাহজাহান
বাদশাহ

৮
পুত্র
উমর সেখশাহ

৪
পুত্র
জাহাঙ্গীর
বাদশাহ

৭
পুত্র
বাবর
বাদশাহ

৬
পুত্র
হুমায়ুন
বাদশাহ

৫
পুত্র
আকবর
বাদশাহ

এই জয় ও মঙ্গলযুক্ত সময়ে এই মহামান্য ও বিশ্বাসযোগ্য আদেশপত্র দ্বারা মাণিকচাঁদ, এই চিরস্থায়ী রাজ্য হইতে মাণিকচাঁদ শেঠ খেতাব প্রাপ্ত হইলেন। অধিকৃত রাজ্যের সমুদয় বর্তমান ও ভাবী হাকিম, আমলা ও মুৎসুদ্দী প্রভৃতির উচিত যে, তাঁহারা উল্লিখিত ব্যক্তিকে শেঠ লেখেন। ইহাতে বিশেষ যত্ন লওয়া আবশ্যক এবং হুজুর আলি হইতে তাগিদ জানেন। ইতি ঃ

তারিখ ৮ জিলহজ্জ

যিনি মহামান্য, রাজ্যের ন্যাসাধার স্বরূপ, যিনি সাম্রাজ্যের বিশ্বসনীয়, সম্ভ্রান্তবংশীয়, উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাপন্ন, যিনি রাজ্যের ও ধনের সুবন্দোবস্তকারী, যিনি তরবারি ও লেখনী পরিচালনে সুনিপুণ, যিনি পতাকার উন্নয়নে সমর্থ, যিনি সুবন্দোবস্তকারী নিরপেক্ষ উজীর, যিনি সাম্রাজ্যের দুরূহ ব্যাপারের অবলম্বনস্বরূপ, যিনি উজীরগণের মধ্যে বিশ্বাসী ও বন্ধু, সেই মিমুদ্দৌলা বাহাদুর জফরজঙ্গ শেপশালারের সেনানিবেশ বরাবরেষু ঃ

(মোহর)

মহম্মদ ফারুখ সাএর বাদশাহ গাজী
আলাহুল্লাহ শেপশালার ইয়ারবাওকা
ফিরদি কুতবল মুলক এমিনুদ্দৌলা
সৈয়দ আবদ খাঁ বাহাদুর জফরজঙ্গ।

দুই

ফতেচাঁদের জগৎশেঠ উপাধির ফার্মান

পরমেশ্বরের নাম

শাহ মহম্মদ	শাহ আবুল ফতেহ	এবনে শাহ
নাসিরুদ্দীন	নাসিরুদ্দীন এবনে	আলম বাদশাহ
আবুল ফতেহ	মহম্মদ জাহানশাহ	এবনে আলমগীর
বাদশাহ গাজী	বাহাদুর বাদশাহ গাজী	বাদশাহ
	সাহেব কেরাণশানী	

ইত্যাদি

এই জয়যুক্ত (শুভ) ও আনন্দযুক্ত সময়ে, এই চিরস্থায়ী সাম্রাজ্যের সূর্যের কিরণস্বরূপ জগন্মান্য ও জগদ্‌বশীভূতকারী আদেশ দ্বারা শেঠ ফতেচাঁদ বিশ্বস্ততা ও গৌরবের নিদর্শনস্বরূপ জগৎশেঠ উপাধি এবং মতির গোশওয়ারা অর্থাৎ কানবালা ও হস্তী এবং তাঁহার পুত্র আনন্দচাঁদ, শেঠ উপাধি ও মতির কানবালা খেলাত প্রাপ্ত হইলেন। অধিকৃত রাজ্যের সমুদয় বর্তমান ও ভাবী হাকিম, আমলা ও মুৎসদ্দী প্রভৃতির উচিত যে, তাঁহারা উল্লিখিত শেঠ ফতেচাঁদকে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ এবং তাঁহার পুত্রকে শেঠ আনন্দচাঁদ লেখেন। এ বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ প্রদান আবশ্যক।

৪ সাল জলুশ ১২ই রজব তারিখ।

যিনি রাজ্য ও রাজনীতির মহত্ব ও গৌরব অবগত আছেন, যিনি রাজধর্মের গূঢ়তত্ত্ব অবগত আছেন, যিনি রণস্থলে অগ্রগামী ও সৈন্যগণের পরিচালক, উপযুক্ত পরামর্শদাতা, যিনি সাম্রাজ্যের বিশ্বসনীয়, সম্ভ্রান্তবংশীয়, উচ্চপদস্থ, ক্ষমতাপন্ন, যিনি রাজ্য ও ধনের সুবন্দোবস্তকারী, যিনি পতাকার উন্নয়নে সমর্থ, সুবন্দোবস্তকারী নিরপেক্ষ উজীর, যিনি সাম্রাজ্যের দুরূহ ব্যাপারের অবলম্বনস্বরূপ, যিনি উজীরগণের মধ্যে বিশ্বাসী ও বন্ধু,—সেই নিজাম উল মুলক ফতেজঙ্গ বাহাদুর সেপাহশালার সেনানিবেশ বরাবরেষু :

নিজাম উল মুল্‌ক

তিন

মহাতপ রায়ের শেঠ উপাধির ফার্মান

পরমেশ্বরের নাম

(লাল কালিতে)

(দস্তখত লাল কালিতে)

শাহ মহম্মদ

নাসিরুদ্দীন

আবুল ফতেহ

বাদশাহ গাজী

(গোল মোহর)

ঈশ্বরের নাম

১১
পুত্র
মীরণশাহ

১২
পুত্র
আমীর তৈমুর
সাহেব কেরাণ

১
পুত্র
শাহ আলম
বাদশাহ

১০
পুত্র
সুলতান
মহম্মদশাহ

২
পুত্র
আলমগীর
বাদশাহ

শাহ আবুল ফতেহ
নাসিরুদ্দীন এবনে
মহম্মদ জানানশাহ
বাহাদুর বাদশাহ গাজী
সাহেব কেরাণ শানী

৯
পুত্র
সুলতান
আবুসৈয়দ শাহ

৩
পুত্র
শাহজাহান
বাদশাহ

৮
পুত্র
উমর শেখশাহ

৪
পুত্র
জাহাঙ্গীর
বাদশাহ

৭
পুত্র
বাবর
বাদশাহ

৬
পুত্র
হুমায়ুন
বাদশাহ

৫
পুত্র
আকবর
বাদশাহ

এই জয়যুক্ত (শুভ) এই মহামান্য ও জগদ্বশীভূতকারী আদেশ দ্বারা মৃত শেঠ আনন্দচন্দ্রের পুত্র মহাতপ রায়, শেঠ উপাধি এবং খেলাত মতির গোশওয়ারা অর্থাৎ কানবালা ও হস্তী প্রাপ্ত হইলেন। অধিকৃত রাজ্যের বর্তমান ও ভাবী হাকিম, আমলা ও মুৎসুদ্দী প্রভৃতি গণের উচিত যে, তাঁহারা উল্লিখিত ব্যক্তিকে শেঠ বলিয়া লেখেন, তৎসম্বন্ধে বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ প্রদান আবশ্যক। ইতি :

তারিখ ২ জেলহজ্জ ২৩ সন জলুশ।

যিনি মহামান্য, রাজ্যের ন্যাসাধারস্বরূপ, যিনি সাম্রাজ্যের বিশ্বসনীয়, সম্ভ্রান্ত বংশীয়, উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাপন্ন, প্রাধান্য ও আদেশ বিষয়ে ক্ষমতাবান, যিনি রাজ্যধর্মের (গূঢ়তত্ত্ব) অবগত আছেন, যিনি রাজ্য ও রীতিনীতি মহত্ত্বের গৌরব অবগত আছেন, যিনি সা ম্রা জ্যে র অবলম্বনস্বরূপ, রাজ্যের বিশ্বস্ত আদেশদাতা (বিচারপতি), যিনি দিগ্‌বীজয়ী রাজ্য ও ধনের সুবন্দোবস্তকারী, ভাগ্য ও ঐশ্বর্য সম্পত্তির পথ প্রদর্শক, যিনি সম্রাটের মনোনীত বন্ধু, যিনি রণস্থলে অগ্রগামী সৈন্যগণের মধ্যেও অগ্রগামী পরিচালক, যিনি উচ্চপদস্থ মন্ত্রিগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, যিনি মহামান্য আমীরগণের মধ্যে সর্বপ্রধান, যিনি তরবারি ও লেখনী পরিচালনায় সুনিপুণ, যিনি পতাকা উন্নতকারী, যিনি উপযুক্ত সুপরামর্শদাতা, যিনি সম্রাটের নিরপেক্ষ উজীর সমূহের মধ্যে বিশ্বস্ত বন্ধু, যিনি সমস্ত রাজ্যের দুরূহ ব্যাপারের অবলম্বনস্বরূপ, যিনি দরবারে বিশ্বাসী, সেই কামরুদ্দীন হোসেন বাহাদুর নসরতজঙ্গের সেনানিবেশ বরাবরেষু :

(মোহর)
মহম্মদ শাহ বাদশাহ গাজীসন্ ও মহম্মদ
শাহ কামরুদ্দীন খান হোসেন বাহাদুর
নহবতজঙ্গ এমাহেদউল্লা

চার

মহাতপ রায়ের জগৎশেঠ উপাধির ফার্মান

পরমেশ্বরের নাম

(লাল কালিতে)

(দস্তখত লাল কালিতে)

আহম্মদশাহ বাহাদুর
পুত্র মহম্মদশাহ
মজাহেদ্দীন সাহেব
কেরাণ শানী বাদশাহ
গাজী

(গোল মোহর)

ঈশ্বরের নাম

১
পুত্র
জাহানশাহ

২
পুত্র
শাহ আলম
বাদশাহ

৩
পুত্র
আলমগীর
বাদশাহ

৪
পুত্র
শাহজাহান
বাদশাহ

৫
পুত্র
জাহাঙ্গীর বাদশাহ

৬
পুত্র
আকবর বাদশাহ

৭
পুত্র
হুমায়ুন বাদশাহ

৮
পুত্র
বাবর বাদশাহ

৯
পুত্র
উমর সেখশাহ

১০
পুত্র
সুলতান
আবুসৈয়দ শাহ

১১
পুত্র
সুলতান
মহম্মদশাহ

১২
পুত্র
মীরণশাহ

১৩
পুত্র
আমীর তৈমুর
সাহেব কেরাণ

আহম্মদশাহ বাহাদুর
পুত্র মহম্মদ শাহ, আবুল
নাসীর মজাহেদ্দীন
সাহেব কেরাণ, শানী
বাদশাহ গাজী সন এক।

এই জয়যুক্ত (শুভ) ও আনন্দযুক্ত সময়ে, এই চিরস্থায়ী সাম্রাজ্যের জগন্মান্য ও জগদ্‌বশীভূতকারী আদেশ দ্বারা মহাতপ রায় বিশ্বাস ও গৌরবের মূলধনস্বরূপ জগৎশেঠ খেতাব প্রাপ্ত হইলেন। অধিকৃত রাজ্যের সমুদয় বর্তমান ও ভাবী হাকিম, আমলা ও মুৎসুদ্দী প্রভৃতির উচিত যে, তাঁহারা উল্লিখিত ব্যক্তিকে জগৎশেঠ মহাতপ রায় লেখেন। এই বিষয়ে বিশেষ যত্ন ও মনোযোগ প্রদান আবশ্যক। ইতি ঃ

তারিখ ২৭ জেলহজ্জ।

পরপৃষ্ঠায় মোহরাদি আবৃত থাকায়, তাহার উল্লেখ করিতে পারা গেল না।

পাঁচ

শেঠবাড়ীর নোট-বইএর ইংরাজী অনুবাদ

Translation from Hindi Note Book preserved in the Seth family—by J H. Little.

Hirananda Saha was an inhabitant of Nagore. He left Nagore and came to Patna on the third day of New moon on the month of Baisak in the Samvat year 1709 He died at Patna in the Samvat year 1768 on the fourth day of the full moon of the month of Mag. He had seven sons, Seth Manik Chand, Golab Chand, Nanak Chand, Ameer Chand, Sadanad, Gobardhan and Dip Chand. He had also a daughter whom he gave in marriage to a son of Udaichand.

Seth Manik Chand had two wives. He received the title of "Seth" from theEmperor Muhammad Farrakhsiyar on the 8th of Dilhaj in the third year of his reign. He died on the fourth year of the reign of this Emperor on the tenth day of the new moon of the month of Mag corresponding to the Samvat year 1771. He had no son; so he adopted Fateh Chand of Rai Udai Chand in the Samvat year 1757. From this time the boy lived with Seth Manik Chand at Dacca. When Murshid Kuli Khan made Murshidabad the Capital Manik Chand accompanied him and settled at Mahimapur in Murshidabad. When he died his remains were placed in the Manikbag.

Jagat Seth Fateh Chand married a daughter of Rai Udai Chand of Agra. After succeeding Seth Manik Chand he obtained the title of "Seth" from Emperor Farrakhsiyar in the fifth year of his reign at Delhi. In the fourth year of the reign of Muhammad Shah he was granted the title of "Jagat Seth". The reason why he received the title of Jagat Seth was this :—There was a great famine at Delhi and when the Emperor ordered him to bring relief and to take a duna (pan given to those present at the durbar as a mark of honour) he

respectfully prayed that it might be publicly announced that hundi should be circulated freely. The Emperor agreed to his proposal and proclaimed that those who wanted money should write hundis and obtain money. So the famine disappeared and money was plentifully in the city. The Emperor was highly pleased and conferred the title of 'Jagat Seth' on Fateh Chand in return for his services. After that he returned to Murshidabad and died in the Samvat year 1801. His remains were in the Jagat Bisram. He had two sons Seth Anand Chand and Dya Chand. He had also two daughters.

Seth Anand Chand was born at Patna. He received the title of Seth from the Emperor Muhammad Shah in the fourth year of his reign. He died before his father. He had a son named Mahatab Rao.

Jagat Seth Mahatab Rao was confirmed in the title of Jagat Seth by the Emperor Ahmad Shah in the fourth year of his reign. He had four sons Khusal Chand, Gulab Chand, Sumer Chand and Sukhal Chand. He had also one daughter. He was killed by Mirkasim in the Samvat year 1820 on the tenth day of the full moon in the month of Aswin.

Seth Khusal Chand was born at Dacca on the fifth day of the new moon of the month of Bhadra in the Samvat year 1810. He was confirmed in the title of Seth by the Emperor Alamgir II in the Hijri year 1170. He was confirmed in the title of Jagat Seth by the Emperor Alamgir II in the sixth year of his reign. He died in the Hijri year 1196. He had a son named Gokal Chand who was born in the Samvat year 1815 but he died in the presence of his father in the Samvat year 1836 at the age of 20. Seth Gulab Chand received the title of Seth from the Emperor Shah Alam in the Hijri year 1173 in the first year of his reign. He obtained the title of Jagat Indra in the Hijri year 1196. He died on the eighth day of the new moon of the month of Baisak in the Samvat 1853. He had no sons.

Seth Sumer Chand received the title of Seth from the Emperor Alamgir II on the 2nd Robi-ul-Awal in the sixth year of his reign. He died on the second day of the new moon of the month of Bhadra in the Samvat year 1838.

Seth Sukhal Chand received the title of Seth from the Emperor Alamgir II in the sixth year of his reign.

Jagat Seth Harak Chand was born on the third day of the new moon of the month of Mag in the Samvat year 1828. He married a daughter of Hukum Chand Mahanat of Azimganj. He died on eighth day of the full moon of the month of Asar in the Samvat year 1870. He had two sons named Jagat Seth Indra Chand and Seth Bissen Chand. Harak Chand was confirmed in the title of Jagat Seth by the British Government during the administration of Governor General Warren Hastings through Mubarak-ud-daula the Nawab Nazim ot Bengal, Behar and Orissa who presented him with a seal containing the words "Jagat Seth" in the year 1784.

Jagat Seth Indra Chand was born in the Samvat year 1852. He married a daughter of Rai Sing Singhee. He died on the fourteenth day of the new moon of the month of Mag in the Samvat year 1879. He had only one son nomed Jagat Seth Gobind Chand. The mother of Jagat Seth Gobind Chand died on the third day of the month of Agrahan in the Samvat year 1916.

Jagat Seth Gobind Chand was born on the tenth day of the full moon of the month of Aswin in the Samvat year 1867. He married a daughter of Harak Chand Raka of Baluchar in the Samvat year 1882. He died on the 12th December 1864 at 4 a.m. He had no son. He adopted a boy named Gopal Chand, The British Government granted him a pension of Rs. 1,200 a month on the 1st July 1843 during the administration of Lord George Auckland.

Seth Bissen Chand was born on the eighth day of the full moon of the month of Falgoon, on Wednesday, in the

Samvat year 1855. He received the title of Seth from Delar Jung the Nawab Nazim of Bengal, Behar and Orissa in the Hijri year 1221. He died at three in the morning on the eleventh day of the new moon of the Bhadra in Rangmahal Palace. He had only one son named Seth Kissen Chand.

Seth Kissen Chand was born on the third day of the month of Mag in the Samvat year 1873. He was granted the title of Seth by the British Government under Lord William Bentinck through Humayun Jah the Nawab Nazim of Bengal, Behar and Orissa on the third day of the full moon of the month of Mag in the Samvat year 1890. He received a pension a Rs. 800 after the death of Jagat Seth Gobind Chand. He died at Benares on the thirteenth day of the new moon of the month of Jaistha in the Samvat year 1939. He had no son.

Maharaj Gopal Chand was born on the fifth day of the new moon of the month of Aswin in the Samvat year 1896 and was adopted on the 23rd January 1845 A. D. He obtained the title of Maharaj from the Emperor Bahadur Shah with a gold umbrella on the eleventh day of the new moon of the month of Falgoon in the Samvat year 1909. He died on the 15th August in 1862 A.D. at 9 p.m. He had two sons the eldest died in his presence and the younger was named Gupi Chand. He was offered a pension of Rs. 300 which he thankfully declined.

Seth Dhokal Chand received the title of Seth from the Calcutta Council on the 13th Agpahan 1228 Hijri. He had a son and a daughter whom he gave in marriage to the son Harakh Chand Sethia.

Gupi Chand was born on the 12th December 1878 A.D. on Friday. He died at the age of twelve in the presence of Jagat Seth Gobind Chand and Kissen Chand.

Jagat Seth Golab Chand was born at Bikanir in Rajputana on tha 29th November 1867. He was taken as an adopted son by the widow of Jagat Seth Gobind Chand on the third day of new moon of the month of Baisak in

the Samvat year 1935. He married a daughter of Jay Chand Baid in the Samvat year 1941. He had four sons of whom the youngest died in his presence. The eldest, Jagat Seth Fateh Chand succeded him. Lord Curzon paid a visit to the old and new houses of Jagat Seth on the March, 1901, Sir John Woodburn on the 4th August, 1901 and Lord Kitchener on the 4th March, 1908. He was a staunch Jain. He died on the 7th April, 1912 at Calcutta.

Jagat Sethani Pran Kumari, the wife of Jagat Seth Gobin Chand, died on the 4th day after the full moon of the month of Aswin at 3 in the morning in the Samvat year 1947. She was granted a pension of Rs. 300 by the British Government after the death of Seth Kissen Chand. *

* শেঠ বাড়ির এই বিবরণ ও অন্যান্য সূত্রে প্রাপ্ত বিবরণের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

ছয়

একটি হিসাব

Extract of the Fort William General Consultations
Dated 29th January, 1772.

Dr. | Cr.

Statement of the Debt due to Juggat Seth, showing how much of it has been (paid) to this day.

Dr.		Cr.	
To amount due to Jugget Seth, which was agreed to be paid him in the space of 10years, in annual payment of 10,50,000 each as follows :	Rs.	By sundry payments to the 19th of Poos, Bengal year 1178,	
		From the Nabab	5,15,000-00
		From the Honourable Company	5,46,375-12
			10,61,375-12
By the Nabab	10,50,000		
		By Balance due	
By the Honourable Company	10,50,000	From the Nabab	5,35,000-0
	2,100,000	From the Honourable Company	5,03,624-4
			10,38,624-4
			21,00,000-0
		N.B.-Of the above balance there is due from the Nabab	
		to the end of the present year 1178	1,15,000-0
		From the begining of 1179 to the end of 1182	4,20,000-0
			5,35,000-0
		From the honourable Company to the end of the present Bengal year 1178	83,624-4
Murshidabad,		From the begining of the Bengal year 1179 to the end of 1182	4,20,000-0
the 31st December, 1771			10,38,624-4
		Compared as far as regards the Companies proportion	
Errors Excepted			

সাত

হেষ্টিংসের চিঠি

Translation of a Persian letter from the Governor General Warren Hastings to Mobarak-Ud-Daula Bahadur Nawab Nazim of Bengal, Behar and Orissa, in the year 1784.

Nawab Saheb of Exalted rank and dignity admiror of the brethern may be safe and sound.

After expressing my earnest desire for a happy interview with you which cannot be described in writtings, I bring to your kind notice that a robe of honour consisting of six pieces, an ornament that is worn in turban, turban set with jewels, necklace of pearls, a earing with pearls and a palanquin with frills have been sent by me through Sir John Daly Sahib to the kind gentleman Seth Hurrack Chand Saheb.

I hope your nobleself will be pleased to confer on the said Seth the title Jagat Seth to give him seal and to allow him the privilege of being looked upon with esteem and respect as his family has been for a long time.

(Sd) Warren Hastings

আট

গোলাপ চাঁদের দুটি চিঠি

To

His Excellency the most
Hon'ble Henry Charles
Keith Petty
Fitzmaurice,

Marquis of Landsdowne, G.M.S.I., G.C.M.G., G.M.I.E.
Viceroy and Governor General of India.

The Humble Memorial of Jagat Seth Golap Chand
of Murshidabad.

Most respectfully sheweth,

1. That your Excellency's Humble Memorialist is the adopted son of Jagat Seth Govind Chand and the sole surviving representative of the "Jagat Seths", known in History as the "Seths of Murshidabad" and that he has been in occupation of the guddi of the Seths ever since the time of his adoption in the year 1880.

2. That your Excellency's Memorialist need hardly remind your Excellency that the family to which he belongs has had no inconsiderable share in influencing some of the most notable events in the history of India during the English regime that from the time of the founder of the dynasty it has occupied a status of hereditary dignity in Bengal, and that in their better days the "Seths" were "the Rothschilds of India", and their transactions were as Mr. Burke said "as extensive as those of the Bank of England".

3. That the relations between the Seths and the English Government have all along been most cordial and that the treaty of February 1757, by which Suraj-ud-dowla satisfied the demands of the English, was concluded mainly through the exertions of Ranjit Roy, deputed by the Seths "to attend the Nawab and correspond with Lord Clive".

4. That the proposal for the over-throw of Surajud-dowla first came from your Excellency's ancestors ; and that these served the English Government considerably in their pecuniary transactions at a crisis when their finances were hardly in a satisfactory condition.

5. That the English of the period in question and specially Lord Clive, used to take a very kind and worm interest in the Seths ; and that his Lordship's opinion will be found embodied in a letter written by him to the Nawab Meer Kasim, in which appears the following :

"When your Excellency took the Government upon yourself, you and I and the Seths being assembled together it was agreed that as they are men of high rank in the country, you shall make use of their assistance in managing your affairs and never consent that they should be injured ; and when I had the pleasure of seeing you at Monghyr I spoke to you about them, and you set my heart at ease by assuring me that on no account you would do them any injury.

6. That Jagat Seth Khoshal Chand, the adopted son unto Jagat Seth Mahatab Rao named above was offered an annual stipend of Rs. 300000 by Lord Clive which, however, was unfortunately declined by him as being utterly inadequate to meet his expenses which would require a lakh per month ; that later on he represented his case to Mr. Warren Hastings praying to be reinstated to his hereditary office of Superintendent of the Receipts and Disbursement of Government Revenue, and that the Governor made the following reply :

"Your father has rendered very important services to the British Government and for its establishment in the East. Should it please God to return from my tour, your wishes shall be fulfilled"; that Khoshal Chand died shortly after, leaving his adopted son, Hurrak Chand, a minor ; that on Mr. Hastings' return he expressed great sorrow for the premature death of the Seth, and as a mark of regard for the deceased, invested his son with a Khelat and conferred on him the hereditory title of the

family, observing that when the son of the deceased came of age he would consider his case favourably, that before this came about Mr. Hastings proceeded to Europe ; that when Lord Cornwallis learnt the anticedents of the family of your Excellency's humble petitioner, he felt a lively interest in Hurrak Chand, great grand father to your Excellency's Memorialist ; and gave him every assurance of doing him good ; but that before anything could be done, Hurrak Chand unfortunately died, leaving two sons, minors both, Indra Chand grandfather of your Excellency's Memorialist and Bishen Chand.

7. That fortune soon after began to frown upon the family, and the remnant of the wealth of his ancestors was completely exhausted by Gobind Chand, the father of your Excellency's unfortunate Memorialist ; that family he had to subsist on the mercy of the Government in the shape of an annuity of Rs. 1200 per month, offered to him by the Honourable Company, "in consideration of the fallen fortunes and the previous services of the house"; that Jagat Seth Gobind Chand died in the month of December 1864, and that the elder brother of your Excellency's humble petitioner, Seth Gopal Chand and his uncle Seth Kishen Chand a descendant of the minor branch of the family, applied for the continuance to them of the said pension, agreeably to the Government order, which expressly stated that the pension of Gobind Chand was intended for the support of the whole family and not of the individual ; that the result was Kishen Chand received Rs. 800 instead of Rs. 500 as prayed for by him ; and that Gopal Chand, though refused at first, was ultimately offered Rs. 300 which he thankfully declined to accept.

8. That the mother of your Excellency's humble memorialist, Jagat Sethani Pran Kumari Bibi, after the death of Kishen Chand, her first adopted son, Gopal Chand having died before her, and while your Excellency's humble Memorialist was yet a minor, applied for and obtained a pension of Rs. 300 per month from

Government, which she enjoyed till her death in September 1891 and that during her life-time, she twice represented her grievances to the Government and prayed for the increase of her pension ; or for the settlement of a separate pension on your Excellency's Memorialist, but that owing to her bad luck her prayer was considered "premature". The reply of the Government was to the effect that Government would take into consideration the case of your Excellency's humble Memorialist after the death of his mother. That now she has departed this life leaving him behind to struggle with adverse circumstances, as best he can, your Excellency's poor petitioner has no other resource lift but to throw himself entirely on your Excellency's commiseration in the hope that your Excellency will not shut your Excellency's ear to the distressful cries for succour of one who albeit having an illustrious ancestry, has through unto ward fortune, been reduced to utter destitution and hideous want yawning at him to make his wretched and helpless self their prey.

9. That the status ot your Excellency's humble Memorialist, as the adopted son and heir of Jagat Seth Gobind Chand has been judicially established by the judgement of the Subordinate Judge of Murshidabad in suit No. 34 of 1889, instituted against him and his adoptive mother by Manick Chand Golecha, a representative of the Junior Branch of the Seth family, since dead which judgement was appealed from but confirmed by the Honourable High Court in appeal No.223 1890, the judgement being reported in Indian Law reports. Vol. XVII Calcutta Series pp. 518-538. That Her Gracious Majesty's Government is renowned for justice tempered with the dew of sweet mercy, and that your Excellency's humble Memorialist throws himself absolutely upon your Excellency's mercy, in the hope that his pitiable case will graciously be taken into consideration. That your Excellency's humble petitioner has to maintain a large number of temples dedicated to some of the notable duties of the Hindu

pantheon ; that he does not much mind his ignoble self, but that his duties he must maintain, or neglect them at the peril of his eternal soul ; that it would go right into his heart if his duties fared ill for lack of support ; that a Government connected with an Empire on which the sun never sets has showed great munific cense in its pensions and the hands of millions are raised in thanksgiving to Her gracious Majesty for her long life and peace ; that your Excellency's humble Memorialist as the sole surviving representative of a family which had the honour of serving the British Government in unusually critical times, has, if he can presume to say so, a servants' right to the elemency and consideration of the state ; that your Excellency in consideration of the absolute destitution and wretchedness of your Excellency's humble Memorialist, will graciously be pleased to smile upon his gloomy prospect and favour him with a pensionary grant of Rs. 1200 a month to enable him to carry on existence, and gratefully leave to his descendants the name and fame of the Government which has saved him from ruin and starvation.

I have the honour to be,
My Lord,
Your Excellency's humble and
obedient Memorialist

JAGAT SETH GOLAP CHAND

To

The Right Honourable

The Secretary of state for India.

India Office, London.

The Memorial of Jagat Seth Golap Chand
of Mahimapur in Murshidabad.

Respectfully Sheweth,

1. That your Lordship's memorialist is the only son and heir of the Late Jagat Seth Gobind Chand and the direct representative of the famous Jagat Seth Mahatab Rao, and the present head of the family. As such he respectfully claims for his case the attention and liberal consideration of the Government which his ancestors above-named, more than any other man, served to establish in Bengal a service in which he and his brother at last sacrificed their lives—and your lordship's memorialist trusts that these will not be denied to him.

2. That your lordship's memorialist does not deem it necessery here to refer in detail to the claims of his family upon the British Government. Not only did the English of the day who saw the services performed which created the claims, recognise them, but, even in the recent correspondence to which your Lordship's Memorialist shall have particularly to refer in the present case, the Governor General's Agent at Moorshidabad, the Bengal Government, the Government of India and the Government at home are unanimous in their recognition in them. Two testimonies only, as coming both from the highest authories, your Lordship's Memorialist would beg leave to quote. The late Court of Directors observed "that the services of Jagat Seth Mahatab Rao to our Government in times when such services were peculiarly valuable are matter of History" and the Right Honourable the Secretary of State for India spoke of the famous Bengal Banker Jagat Seth who

rendered such distinguished service to the British at the time of the Revolution in Bengal which laid the foundation of our Empire in the East. It is at once an honour to the Government and a relief and pleasure to your Lordship's Memorialist and the Government has not left to himself the delicate task of recounting the services of His House.

3. That with a disinterestedness which, your Lordship's Memorialist hopes, may be remembered, his ancestors did not ask any price for those services, although they might then command terms and owing a wealth reckoned by hundreds of crores and possessing an influence equally at the Courts of Moorshidabad, Lucknow, Delhi and Calcutta of a magnitude to which no subject could pretend, well might they be above the spirit which haggles for price. And well might they flatter themselves that even, should in the vicissitudes of fortune the affluence of their family at any future period depart, as long as the British Sovereignty which they helped to establish lasted in any corner cf India, no inheritor of this name would be allowed to be pressed for the means of an existence somewhat commensurate with their position.

4. That in the course of time the stars of your Lordship's Memorialist's house declined, and the family dwindled from generation to generation, until a Jagat Seth (your Lordship's Memorialist's adoptive father Jagat Seth Govind Chand) was reduced so low as to be dependent on the bounty of others for subsistence itself. In this extremity he naturally looked up towards the Government which his ancestors have done so much to establish for fraction of the price his ancestors were above seeking. To the credit of the Government his claims were not ignored, though Rs. 1200 per month was deemed an adequate allowance to a Jagat Seth and a compensation enough for the services which gained an empire for the served ; in reality it was indeed only a

trifle for the maintenance of a House which not long ago rolled in crores.

5. That the said Jagat Seth Govind Chand died in 1864 leaving Seth Gopal Chand, his son, whom he adopted in his life-time and Seth Kisen Chand, his first cousin, a descendant in the junior branch. As representative of the House, Gopal Chand applied to Government in cojunction with his uncle afore-named for an equitable distribution of the pension of the deceased. The joint application prayed for the continuance of the title of "Jagat Seth" to Gopal Chand and the settlement upon him of a pension of Rs. 700 from the stipend of his father agreeing to allow the balance Rs. 500 per month to be granted to his uncle. But unfortunately the order on it was a pension of Rs. 800 per month to Seth Kisen Chand to the utter exclusion of the claims of the representative of the senior branch, the rights of the trunk of the House. Thus disappointed in his hopes he subsequently appealed against the order—an order which seems to have been passed on but a partial knowledge and appreciation of the true circumstances of the case to the Viceroy and then to the Right Hon'ble the Secretary of State for India (Sir Charles Wood G.C.B.) when he was offered Rs. 300 per mensem by the agent to the Governor General at Moorshidabad (Lieutenant Col. W. A. A. Thomson) through Raja Prasanna Narayan Deb Bahadoor, the Dewan Nizamut, from out of the stipend granted to Seth Kishen Chand, and as the arrangements thus ordered making the true subordinate to its branch did not satisfy him, and since it was inconsistent with his position and dignity in society he was naturally compelled to decline the offer with thanks. He died shortly after leaving Seth Kishen Chand the undisturbed master of the stipend.

6. That Seth Kishen Chand afore-named died in 1880 leaving no heir except your Lordship's Memorialist then a minor and his adoptive mother Jagat Sethani Pran

Kumari Bibi, widow of the late Jagat Seth Govind Chand. As is usual when the affairs of an estate are in the hands of a Hindu widow, ignorant and illiterate, her advisers instead of putting forward the claims of your Lordship's Memorialist as then representing the House of Jagat Seth Mahtab Rao, to Government for some provision, induced her to apply for a portion of Seth Kishen Chand's pension and Rs. 300 per month was all that was granted to her. But gradually, as your Lordship's Memorialist began to enter the age of manhood and was being recognised as the Head of the Jagat Seth family and the social leader of the oswals, she began to discover her mistake. She at once memorialised the Government for increasing her own stipend, or for granting a seperate pension to her son but to her ill luck none of her prayers was favourably entertained. A few months before her death she made her last request to the Hon'ble Sir Charles Elliot K. C. S. I. Lieutenant Governor of Bengal, during his Honor's visit to Moorshidabad, to grant her a portion of her husband's pension, so that, before she breathed her last, she could have the satisfaction of seeing the liquidation of the heavy debts she had incurred to bring up your Lordship's Memorialist, to defray the cost of litigation to confirm his adoption and none the less to maintain his dignity and position as the head and representative of the family. But Government declined to take pity in her difficulties and she died a broken heart on the 21st September last.

7. That your Lordship's Memorialist submitted a memorial to His Honor the Lieutenant Governor of Bengâl on the 14th November last setting forth in detail the claims of his family to the patronage of Government and praying for a suitable pension to be granted to him commensurate with his status in society, but his distressing case failed to draw the attention of Government for what fault on the part of your Lordship's Memorialist he is unable to say. An appeal was however laid before the Government of India against his decision, but was

of no avail. Your Lordship's Memorialist however conjectures that the authorities must have acted upon the misapprehension, that the pension granted to the different members of his family was only for their life and not hereditary and that your Lordship's Memorialist being an adopted son, had no claim whatever upon the indulgence of the Government.

8. That with respect to the first objection, if such an objection has really been urged against him, your Lordship's Memorialist begs respectfully to deny that the pension of Govind Chand was limited to his life ; it was to all intents and purposes a hereditary stipend. It is true that when the pension was first granted to him the Government distinctly stated that it was for life. Nevertheless the spirit of the pension contradicted its verbal terms. The pension was secured by Jagat Seth, Govind Chand by no personal merit of his own ; it was simply a provision for the family of Jagat Seth though it was given in the name of its head, and though that head has passed away, the family for whose maintenance that pension was granted still subsists, and that in the person now of your Lordship's Memorialist, who, as successor to the headship, is entitled to draw the pension for himself. Such a provision for the family of Jagat Seth as the Government intended in the stipend of Govind Chand is essentially and in its nature hereditary. This argument is further strengthened by the fact that the successors to the headship of the family after Govind Chand, Seth Kishen Chand and Pran Kumari, had on this ground and this only been favoured with a pension. For what claim did the late Jagat Seth, Govind Chand possess to it which his surviving family does not ? The claims which gained the stipend were the claims of the family of Jagat Seth Mahatab Rao and those claims subsists as long as the family exists. The accident of the pension being named after Jagat Seth Govind Chand no more makes it a strictly personal pension of deceased than the accident of its being mentioned a

"life pension," takes away from it the essentially hereditary character.

9. That as regards the second objection, that adoption does not constitute a right to succession, it will never be asserted that adoption does not constitute a right according to law. But it may be urged, that pension does not fall within the domain of law. It is therefore necessary to consider whether adoption gives equal right to any one in transaction in the political department of Government. The truth is, that there can be nothing in the political relation of a great power with any of its weaker allies, dependants its or subjects which deserves the name of a right, the political policy of the British Government, however generous, has been guided by principles different from those which dictate its judicial and legislative proceedings. To the credit of the Government, the gulf which divides the two policies is being gradually bridged over ; but on the subject of adoption, the two policies have, happily for your Lordship's Memorialist, been harmonised since Her gracious Majesty the Queen Empress has assured the native princes and all her Indian Subjects through one of her former Viceroys Lord Canning in 1858 that any succession which may be legitimate according to Mohamedan or Hindu Law shall be upheld. If your Lordship's Memorialist's family does not fall strictly under the category of Princes, its services were bonafide political services and the political policy on any subject ought certainly to be uniform to all legitimately coming under its action. If it is wise and just to recognise the right of native Princes to adopt it is equally wise and just to allow the same privilege to essentially a political house like that of Jagat Seth, when therefore law and policy a like point to the same end, your Lordship's Memorialist cannot believe that the British Government would allow anything to deprive your Lordship's Memorialist of that privilege.

10. That it may, after all, be urged that blood is one

thing and adoption another that though the British Government is ready to show every consideration to the descendants of Jagat Seth, Mahtab Rao, it is under no obligation to respect the line continued by adoption. This view is opposed to the justice, liberty and generosity of the British Government—but it has a slight plausibility. Your Lordship's Memorialist would beg leave to state the moral and intellectual objections against it. The principal moral defect to this view is, that it lays the axe at the root of the ennobling doctrine of heritable obligation and duty. If adoption be held to extinguish all title to consideration, what is there in blood so peculiarly sacred as to entile it to all respect, Your Lordship's Memorialist is unable to comprehend. The argument, which would justify anyone in withholding, consideration from an adopted son, would uphold him also in denying it to an issue of the body. According to it, the obligation for services ceases with the party who serves and the party who is served and such obligation, does not bind by any tie the succeeding generations of those parties whether their lines be continued by adoption or by blood. But the incidents of obligation are hereditary ; and the services of one generation are often repaid by another. The British Government like all other civilized Gevernment has in its conduct, always accepted this principle, and your Lordship's Memorialist must be particularly unfortunate if in his case alone there should be any departure from it. And if primary principle be accepted it would apply equally to descendants by blood and those by adoption.

11. That indeed the fact of the British Government recognising Jagat Seth Govind Chand is ample proof that it abides by the right principle alluded to in the foregoing paragraph ; for though he (Jagat Seth Govind Chand) was the issue of the body of Jagat Seth Indra Chand and the latter that of Jagat Seth Huruck Chand, the last named was an adopted son brought up and recognised by Government as the son of Jagat Setn Khoshal

Chand, the son of the famous Jagat Seth Mahatab Rao. The British Government in 1782 made no scruple to invest Jagat Seth Huruck Chand with title of "Jagat Seth," and Your Lordship's Memorialist relies on this great precedent as removing all possible scruples for not recognising Your Lordship's Memorialist's right to the same family title and claim to equal consideration of the British Government.

12. That on the question of adoption, Your Lordship's Memorialist believes, he has demonstrated, that blood has no claims to which adoption is not entitled; that according to the manners, customs and religion of the people of this country, adoption is a sacred institution; that the law recognises adoption, that political expediency requires the recognition of adoption by Government, that Her Gracious Majesty has recognised the adoption of heirs to the native Princes and Chiefs who did the Government services in 1857-58; that although the House of Your Lordship's Memorialist does not surely fall under the category of Princes, the services of Jagat Seth Mahatab Rao and Maharaja Swarup Chand which gave its claims on the Government, were political services, and that therefore it is essentially a political house and hence the Government cannot with any justice or consistency deny to it the rights of adoption acquired by other houses by political services during the mutiny; that it is not Your Lordship's Memorialist alone who has been adopted for the first time in the family; that his house would have been long extinct with Jagat Seth Khoshal Chand, the son of Jagat Seth Mahatab Rao, if it had not been continued by adoption; that Jagat Seth Khoshal Chand adopted Hurruck Chand who was recognised by Government and invested with the title of "Jagat Seth", that the Government again recognised the claims of Mahatab Rao in the adopted line when it made pensionary provision for the family in the stipend granted to Jagat Seth Govind Chand, Seth Kishen Chand, that they with Gopal Chand and Your Lordship's Memo-

rialist belong equally to adopted line, and cannot have a whit more claim than Your Lordship's Memorialist himself and that having recognised the adopted line from generation to generation to Government cannot now repudiate the adoption of your Lordship's Memorialist.

13. That from all the above facts the recognition of Your Lordship's Memorialist follows, as a necessary consequence, the Government, by its previous acts, had recognised another's adoption in the family that of Gopal Chand— an adoption that was recognised not by implication but in word and deed. The Government of Bengal in its letter from the Under Secretary Mr. G. G. Morris to Colonel G. H. Macgregor C. B., Agent to the Governor General at Moorshidabad dated 18th February, 1856 ordered. a grant of Rs. 5000 expressly to defray the expenses of his marriage. In the Government order and correspondenc which led to the grant the Government spoke of him by name, and as the adopted son of Jagat Seth Govind Chand.

14. That Your Lordship's Memorialist is quite convinced that the Government is prepared to show every consideration to the family of Jagat Seth Mahtab Rao. It cannot, by any means, be said that it is bound only to the latter's descendants by blood. Your Lordship's Memorialist believes that there is nothing absolutely in blood to entitle it to that consideration which can by any pretext be withheld from adoption. He has shown that if the arbitrary distinction sought to be made between descendants of blood and those by adoption be pushed to its legitimate conclusion, it would suppress the claims of the benefactors descendants of either description to the consideration of the benefitted or his descendants—a conclusion which would startle mankind. Happily the wisdom and generosity of the world has imposed on itself a far more equitable rule. Men show consideration to the descendants of their benefactor, not only out of respect to the dead but chiefly as an example to the living and amidst the

various and often conflicting motives which incite men to assist and benefit their fellow creatures, not the least important is the confidence created by this example, that though they may die without rewards, those whom they love and leave behind them will certainly not be forgotten by the benefitted. If it went abroad that descendants by adoption had no claim to consideration, half the incentive among mankind to help others would disappear and Your Lordship's Memerialist has no hesitation in assuming that the British Government would not sanction a distinction and a policy so demoralising. In this country specially where the Great Houses are so invariably afflicted with the curse of barrenness that they would be extinct in a generation or two, if they were not continued by adoption the establishment of such a distinction and such a policy may, Your Lordship's Memorialist fears, have the effect (God forbid) of undermining the foundation of the entire Hindu Society.

15. That it is difficult to impress Europeans with the importance of those sanctions, which make the custom of adoption so peculiarly sacréd. One may here be mentioned. In the Sanskrit, the divine ancient language of India, the word for son is puttra (পুত্র), and Manu, the highest authority for Hindu institutions, says that a son is called puttra because he is the instrument and the only instrument for delivering his father and forefathers from the dread hell named Put ; and though this derivation has no philological value, it explains better than anything that passion to have male issue, or at least a substitute for male issue, which is the characteristic of the Hindus, and that unutterable woe which oppresses those who die without either. Among the objects for which a son is wanted by a Hindu is certainly the perpetuation of the family, but the prime function which a son is to fill is to offer cakes to the names of ancestors and perform those numerous religious ceremonies which are essential to their salvation. This function

cannot be performed by any other relative however near and in the case of the late Jagat Seth and his widow there was no other relative who could fill it until Your Lordship's Memorialist was adopted in 1880. But this function is filled by an adopted son quite as well as by a son of the body ; and indeed neither by custom nor by religion, nor by law is an adopted son in any way different from a son of the body. It may be well remarked here that the whole Hindu Law of inheritance turns on the relative rights of parties to offer cakes to the names of the deceased.

16. That the question may be viewed in another light Your Lordship's Memorialist begs respectfully to submit, that the character of the pension of his father Jagat Seth Govind Chand appears to have been entirely different from what has been assumed hitherto in the course of this memorial. Amidst the variety of claims of your Lordship's Memorialist's house and the want of perfect understanding between the donor and the receipient as to the particular claim or claims of the family to which the stipend allowed to the said Jagat Seth was conceded, that stipend seems to have been granted not only as a reward due to Jagat Seth Mahtab Rao's services but as some however infinitesimal compensation for the enormous sum of money with which the great Jagat Seth and his brother accommodated the British—a fact admitted and acknowledged by Lord Clive ;—Your Lordship's Memorialist does not deem this a suitable opportunity for formally bringing forward his monetary claims. He needs here only to remind the Government that this view of the nature of the grant to Jagat Seth Govind Chand appears distinctly in the letters of the Government in the correspondence which took place before that grant was sanctioned. It follows, therefore, that the Government gains nothing by insisting on the lifelong character of the said or the subsequent pensions--pensions which have been given to each successor on the demise of the previous stipendiary—

for, seeing that the pension was some payment towards repaying the money debt, or rather it was in the nature of a part payment of the interest of the money which was advanced to the Gevernment; then the payment towards clearing the debt must be made in some form or other, and Your Lordship's Memorialist has full confidence in the justice and fairness of the British Government, that it will be made to the legal and sole representative of Jagat Seth Mahtab Rao i.e., to Your Lordship's Memorialist. This view of the case—a view Your Lordship's Memorialist submits, quite warranted by the facts, at once disposes of all objections and scruples which may be entertained in any quarter—regarding the recognition of Your Lcrdship's Memorialist's status; this view transfers the matter from the province of state policy to that of law, and by law, as the legally and validly adopted son (vide Indian Law Reports Calcutta Series Vol. XVII pages 518-35) of Jagat Seth Govind Chand, he, Your Lordships Memorialist, is the one representative of the great and famous Jagat Seth Mahtab Rao.

17. That Your Lordship's Memorialist has the satisfaction to live under a most advanced form of civilised Government—a Government that looks with profound respect upon everything sacred and contributes greatly towards the preservation of the relics of historic antiquity to be found in its subject races, and has thus endeared itself wherever it has been its lot to establish itself. Not only is Your Lordship's Memorialist aware of the enlightened and liberal views and noble policy of your Government and of your nation but has been fortunate enough to see it actually carried out in his own city in the maintenance of the Nizamut Mosques and Tombs and the Mausoleums at Khoshbag, Roushnibagh and Motijhil for which your Lordship's Memorialist is told a fixed annual allotment has been set apart by Government for perpetuity. Such therefore being the renowned policy of your Government, Your Lordship's

Memorialist humbly submits that he cannot for a single moment lead himself to believe that his family shall be considered an exception in the matter of obtaining the same favour which has been accorded to families possessing equal if not less claims upon Government. The ancestors of your Lordship's Memorialist, who had made themselves illustrious by their loyalty and disinterested attachment towards the Paramount Power, had in their prosperous days established and consecrated a host of Temples and Gods at the different places of their business throughout the length and breadth of this country—some of which have subsequently passed under different hands—little knowing that their immense wealth shall in the course of a few generations, be reduced so low as not to leave their posterity means enough to keep up even a semblance of their glorious deeds intact. Alas what more miserable could be the circumstances of the man who has himself been the active agent in undoing the splendid works of pity and benevolance founded by his fore-fathers ! Your Lordship's Memorialist cares little about his ignoble self and does not therefore like to approach anybody so much for help for his support. He would however be lacking in his duty were he to remain aside from adopting what measures he could to make permanent provision for the continuance at least during the natural terms of his own life of those virtuous acts which as aforesaid have been started by his predecessors, and thus secure for his soul the end it seeks for, hopeless, though he may be, of success in his attempt. As your Lordship seems to him to be the only source and fountain from which to allay the thirst of and soothe his anxiety for religion, to obtain peace in his mind, he humbly prays that this consideration above, if not any other, will be too strong to move your Lordship to a compassionate hearing of his really hard and painful case.

And Your Lordship's Memorialist as in duty bound shall ever pray.

Murshedabad—Bengal. } JAGAT SETH GOPAL CHAND.
The August, 1892 }

নয়

আবেদনের সরকারী উত্তর

Appendix V.

COPY.

No. 3971.

POLITICAL DEPARTMENT.

From

H. LUSON Esqr.

Under Secretary to the Government of Bengal.

To

THE COMMISSIONER OF THE PRESIDENCY DIVISION

Dated Calcutta, the 24th December, 1891.

Sir,

With reference to your Memo No. 135 R.G. dated the 2nd instant, forwarding a memorial from Baboo Jagat Seth Gopal Chand, the adopted son of the late Jagat Sethani Pran Kumari Bibi, in which he prays for a pension, I am to request that you will inform the Memorialist that the Lieutenant Governor is unable to comply with his request.

I have the honour to be,

Sir,

Your most obedient servant

(Sd.) H. LUSON

Under Secretary to the Government of Bengal.

Memo No. 182 R.G.

PRESIDENCY COMMISSIONER'S OFFICE.

Calcutta 30th December 1891.

Copy Forwarded to the Collector of Murshidabad for information and guidance, with reference to his No. 314N, Dated the 24th November 1891.

(Sd.) ANNADAPRASAD GHOSE
Personal Assistant

Memo No. 278N.

Murshidabad Collectorate, Berhampur.

5th Jan. 1892.

Copy to Seth Gopal Chand with reference to his letter No. 59 dated the 14th November 1891.

(Sd.) MOHES CHANDRA SEN
Deputy Collector-in-Charge.